নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ

মফঃস্বল প্রাপ্তিস্থান

হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সুরবালা বিদ্যামন্দির

গরলগাছা, হুগলী

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদামির গ্রন্থ প্রকাশ-অনুদান প্রকল্প অনুযায়ী রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত।

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ

ডঃ ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

নিউ বুক ট্রাস্ট

৪, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা—৯

প্রকাশিকা :
বীথি বন্দ্যোপাধ্যায়
জনাই, হুগলী

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৯.

মুদ্রণ :
নিউ পাল প্রেস
বঙ্কিম চন্দ্র পাল
৬৭/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

উৎসর্গ

মাতৃসমা

শ্রীমতী আভারাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

পূজনীয়াসু !

লেখকের অন্যান্য উল্লেখ্য প্রকাশন

- বাংলা নাটকে শেক্‌সপীয়ারের প্রভাব
- চলচ্চিত্র দর্পণে শরৎচন্দ্র
- এই দেহ এই মন (উপন্যাস)
- বিজয়িনী (উপন্যাস)
- জয়ের জোয়ার (জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)
- পরশমণি
- পা বাড়ালেই পথ

• নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ •

• বিষয় ও উপাদান পরিচিতি •

● ভূমিকা ●

ডঃ অজিতকুমার ঘোষ
এম. এ. পি এইচ. ডি, ডি লিট্।
বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, কলা বিভাগের
ডীন এবং বিদ্যাসাগর অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী
বিশ্ববিদ্যালয়।

ফোন : ৩৭-৪৮১৪
এ. ই. ৫১০
সল্টলেক
কলিকাতা-৬৪

ডঃ ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় আমার অধীনে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের উপর দীর্ঘকাল গবেষণা ক'রে পি-এইচ.ডি. উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। অনেকদিন পরে তিনি সেই গবেষণা গ্রন্থটি প্রকাশ করছেন, খুবই আনন্দের কথা। স্বতন্ত্রভাবে ক্ষীরোদপ্রসাদের উপর আলোচনা খুব কমই হয়েছে। ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি নাটকের বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সামগ্রিক আলোচনাগ্রন্থ ছাত্রছাত্রী, সাধারণ পাঠক সমাজ ও নাট্যামোদী জনগণের কাছে আদৃত হবে, এ বিশ্বাস রাখি।

দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষীরোদপ্রসাদ সমসাময়িক নাট্যকার। দ্বিজেন্দ্রলাল অধিকতর জনপ্রিয়, কারণ তাঁর নাটকে চমক ও আবেগ বেশি এবং আবেদন তীব্রতর। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য অনেক বেশি। বিষয়-বিস্তৃতি ও অভিনব চরিত্রের সমাবেশও অধিক। ক্ষীরোদপ্রসাদের চরিত্রগুলির মধ্যে অন্তর্মুখীনতা ও অন্তর্গূঢ় রহস্যময়তা লক্ষ্য করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালে অহরহ তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিস্ফোরণ, বজ্রবিদ্যুতের হানাহানি, বিপরীত শক্তির ঘাতপ্রতিঘাত, প্রেম ও শক্তির সংগ্রাম আমরা দেখি। আর ক্ষীরোদপ্রসাদে অসহায় অন্তরাত্মার ক্রন্দন, চেতন-অবচেতনে নিরন্তর দ্বন্দ্ব, দৈব-পুরুষকারের প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যুক্তি ও পারম্পর্যের বিপর্যয় লক্ষ্য করি। তাঁর কল্পনার বিস্তার ও উদ্ভাবনী শক্তি অপ্রতিহত। উদ্ভট আখ্যায়িকার সন্ধানে, রোমান্সের সাতরঙা জগতের অভিসারে, পৌরাণিক জগতের দৈবলীলার রহস্য নির্ণয়ে এবং ইতিহাসের বর্ণাঢ্য পথে সর্বত্র তাঁকে বিচরণ করতে দেখেছি। লঘু ও গুরু, সরস ও গম্ভীর সকল রসে তাঁর সমান অধিকার।

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ও নাট্যপ্রয়োগকর্তা শিশিরকুমার ভাদুড়ীর এক আশ্চর্য সম্মিলন ঘটেছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখেছেন এবং কখনো কখনো শিশিরকুমার লিখিয়েছেন। কিন্তু দ্বৈত-প্রতিভার স্পর্শে কয়েকটি ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে—যথা, আলমগীর, কর্ণ, রঘুবীর ইত্যাদি। শিশিরকুমারের অন্তর্মুখী,

বিশ্লেষণধর্মী অভিনয়ে চরিত্রগুলির অস্ফুট, অবচেতন ভাব ও প্রবৃত্তিগুলি এমন শব্দাতীত ব্যঞ্জনা লাভ করেছে যে অন্য কোনো অভিনেতার ওই চরিত্রগুলিতে অভিনয় করার সাহস হয় নি। ক্ষীরোদপ্রসাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় গীতিনাট্য আলিবাবা ক্লাসিক থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের দ্বারা প্রযোজিত হয়ে যে জনউম্মাদনা সৃষ্টি করেছিল তা বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা।

লেখক বিপুল পরিশ্রম ক'রে ক্ষীরোদপ্রসাদ সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের ব্যক্তিজীবন ও নাট্যজীবনের বিস্তারিত আলোচনা এ-গ্রন্থে রয়েছে। তার নাটকের শ্রেণীবিভাগ ক'রে প্রত্যেকটি শ্রেণী সম্পর্কে সাধারণ আলোচনার পর প্রতিটি নাটকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করা হয়েছে। নাটকের অভিনয় সম্পর্কেও বহু বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ গ্রন্থ প্রকাশের ফলে ক্ষীরোদপ্রসাদ সম্পর্কে সকলের কৌতূহল ও আগ্রহ পুনরায় জাগ্রত হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের অশেষ উপকার সাধিত হবে। এরূপ একটি প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রে অবশেষে গ্রন্থরূপে এটি প্রকাশ করবার জন্য ভুবনেশ্বরকে অভিনন্দন জানাই।

অজিতকুমার ঘোষ

প্রাসঙ্গিক

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে গিরিশোত্তর যুগে মুষ্টিমেয় যে ক'জন নাট্যকার রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনভিত্তিক নাটক রচনা করে মঞ্চাভিনয়ের ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ তাদের মধ্যে অন্যতম। তার অজস্র নাটক রচনার অনায়াস সাফল্য শুধু সংখ্যার দিক দিয়ে নয়, বিষয়বস্তু আঙ্গিক ও বৈচিত্র্যের অবদান সে সাফল্যকে উজ্জ্বলতর করেছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধেয় পূর্ববর্তী বিশিষ্ট সমালোচকগণ কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রদ্ধেয় নাট্যসমালোচক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ডঃ অজিতকুমার ঘোষ ক্ষীরোদপ্রসাদ সম্পর্কে বহুদিন পূর্বেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। স্বর্গতঃ ডঃ সাধন ভট্টাচার্যের নাট্য সমালোচনার পরিধিতে ক্ষীরোদপ্রসাদের দু একটি নাটক বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। —এসব কিছুই আমার কাছে ক্ষীরোদপ্রসাদ সম্পর্কে গবেষণা ও প্রেরণার উৎসস্বরূপ।

ক্ষীরোদপ্রসাদ নাট্যকার হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত হলেও তাঁর বিপুল নাট্য সম্ভারের বিস্তৃত মূল্যায়নের প্রয়োজন বহুদিন থেকেই অনুভূত হয়ে আসছিল। এ সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধেয় আচার্য ডঃ অজিতকুমার ঘোষ আমায় ক্ষীরোদপ্রসাদের সমুদয় মূল নাটক পাঠ করে ক্ষীরোদপ্রসাদ সম্পর্কে বিস্তৃতমূল্যায়ন সম্ভব কিনা ভেবে দেখার পরামর্শ দেন।

নাটকগুলি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক মন্তব্যাদি লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে দেখি নাটকগুলিতে সমকালীন নাট্যসাহিত্যের যুগপ্রভাবের চিহ্নগুলি যথাযথভাবেই বিদ্যমান, তাছাড়া নাটকগুলি থেকে নাট্যকার সম্পর্কে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে এবং নাট্যরচনার আঙ্গিক ইত্যাদি সম্পর্কে যে বিশদ আলোচনার অবকাশ আছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হই।

শুধুমাত্র নাট্যসাহিত্যের সংজ্ঞায় ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকগুলির সমালোচনা হলে নাট্যকারের প্রতি সুবিচার করা হয় না। মঞ্চের চাহিদা, যুগরুচি, দর্শকদের ভাললাগা, মঞ্চমালিকদের ব্যবসায়িক দিক, যুগপ্রভাব ও প্রবণতা—সব কিছুকেই নাট্যালোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে তবেই নাটকের পূর্ণ মূল্যায়ন সার্থক ও সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। নাট্যকারের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন বুঝতে হলে নাট্যকারের জীবনীকেও গবেষণার পরিধির মধ্যে আনতে হবে। শুধু কবিতার মূল্যায়নের জন্যেই যে কবিমানস বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা আছে তা নয়, নাট্যকারের জীবন কাহিনীর নাটকীয় ঘটনার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ও স্বাদের নাটক রচনার সম্পর্কও

অনস্বীকার্য। তাই প্রারম্ভিকপর্বে গ্রন্থটির বিষয়বস্তুরূপে শুধু নাট্যকারের জীবনকাহিনীই লিপিবদ্ধ হয় নি, তার সঙ্গে তাঁর নাট্যরচনা প্রয়াসের উৎস সন্ধানে বিভিন্ন সময়ের, বিভিন্ন প্রকারের ও প্রকৃতির নাটকগুলির রচনায় নাট্যকারের মানস বিবর্তনের ধারাবাহিকতার লেখাচিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করা হয়েছে—'নাট্য প্রবাহ পরিচিত' অনুচ্ছেদটিতে।

গল্প-উপন্যাস কবিতার মতো সাহিত্যকর্মের পর্যায়ভুক্ত হয়েও নাটকের স্বাতন্ত্র মঞ্চাভিনয়ের মাধ্যমে তার আত্মপ্রকাশে। তার আবেদন শুধু সাহিত্য পাঠের রসাস্বাদনে নয়—মঞ্চাভিনয় দর্শনের পরম পরিতৃপ্তির মধ্যেও।

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকগুলির মূল্যায়নে সেগুলির মঞ্চপ্রয়োগের তথ্যাদি—সে সময়কার অভিনয়ের প্রতিক্রিয়ার ইতিকথা যেমন বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বাড়াবে বলে মনে হয়েছে, ঠিক তেমনি তা নাট্যামোদী সকলের কাছে কৌতুহলোদ্দীপক হয়ে উঠবে—এ অনুমানও অসঙ্গত মনে হয় নি। নাট্যরচনার সার্থকতার—মূল্যায়ন শুধু প্রথাগত নাট্য সাহিত্যের লক্ষণাদি বিচারের মানদণ্ডে হলে নাট্যকারের প্রতি অবিচার করা হয়, তাই আলোচ্য নাট্যকারের সমুদয় নাটকের মূল্যায়নে নাট্য প্রবাহ-পরিচিতির সঙ্গে তাঁর সমগ্র নাট্যসম্ভারের মঞ্চপ্রয়োগের ইতিবৃত্ত ও সংযোজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া সমীচীন বলে মনে করেছি।

সে যুগের বেশ কয়েকজন নাট্যকার ঐতিহাসিক নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন। সে সব নাটকের অনেকগুলি জাতীয়তাবোধের ভাবধারায় অভিষিক্ত ছিল। 'প্রতাপাদিত্য'—নাটক রচনার মাধ্যমে সর্বপ্রথম জাতীয়ভাবোদ্দীপক নাটক রচনার গৌরব অর্জন করেছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ। তাই নাটকটির রচনার প্রেরণা, ঐতিহাসিক উপাদান উপকরণ, রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরাণীর হাট' এ প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে কবির জীবনদর্শনের সঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদের জীবনদর্শনের তুলনামূলক আলোচনা সব কিছুই সংযোজিত হয়েছে। শিশিরকুমার ভাদুড়ী অভিনীত মঞ্চ সফল 'আলমগীর' নাটকটিরও বিশদ আলোচনাকে গ্রন্থটির অন্যতম আকর্ষণরূপে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি।

গীতিনাট্য, রঙ্গনাট্য, ব্যঙ্গনাট্য, নাট্যকাব্য—নাটকের সমস্ত শাখায় নাট্যকারের অবাধ ও অনায়াস গতিবিধি ছিল।

অপেরাধর্মী গীতিনাট্য 'আলিবাবা'র মঞ্চ সাফল্যের ও একালেও তার জনপ্রিয়তার রহস্য ও কারণানুসন্ধানের চেষ্টা গ্রন্থটিতে সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

পৌরাণিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদের ভক্তিবাদ অহৈতুকী নয়, যুক্তিবাদের উপর তা প্রতিষ্ঠিত। পৌরাণিক নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষ করে বহু পঠিত নরনারায়ণ নাটকটির বিশ্লেষণে তার সত্যতা নিরূপণের চেষ্টা হয়েছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক নাটক আলোচনায়—'পৌরাণিক নাট্যপরিক্রমা' অনুচ্ছেদটির পূর্বে 'পৌরাণিক নাটক প্রসঙ্গ' ও 'পৌরাণিক নাটকের পটভূমি'—

দুটি পৃথক শিরোনামায় ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক নাটকের মূল্যায়নে বৈচিত্র্য উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছি।

ক্ষীরোদপ্রসাদের সমগ্র নাট্য সম্ভারকে রচনার সময় অনুযায়ী কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে এবং সেগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে নাট্যকারের বিশেষ প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং রচনাশৈলীর অনুসরণে সেগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

যে সমস্ত পুস্তক ও সাময়িক পত্রপত্রিকা থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য পেয়েছি তার একটি তালিকাও শেষাংশে সংযোজিত হয়েছে।

নির্দেশক শ্রদ্ধেয় আচার্য ডঃ অজিতকুমার ঘোষের সময়োচিত মূল্যবান পরামর্শ, সতত উৎসাহদান, প্রত্যক্ষ নির্দেশ এবং নিত্য শুভেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্ত বর্ষণে সিক্ত না হলে গ্রন্থপ্রণয়নের এই দুরূহকার্য সমাধা হওয়া প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠতো।

এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্য ও নাট্য সমালোচকদের কাছে, যাঁদের গ্রন্থ বা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা প্রবন্ধ, নিবন্ধ থেকে তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে। সরকারি অনুদানের শর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পুস্তক প্রকাশ করার তাগিদে সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু কিছু মুদ্রণপ্রমাদ থেকে গেল। সে ত্রুটীর জন্য মার্জনা চেয়ে রাখছি।

ক্ষীরোদপ্রসাদের সমগ্র নাট্য সম্ভারের মূল্যায়ন সুধী সমাজে সমাদৃত হলে শ্রম সার্থক হবে—এই প্রত্যাশার প্রতীক্ষায় দিন গুণবো।

জনাই ষ্টেশন রোড

ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

● কৃতজ্ঞতা ঃ স্বীকৃতি ●

নাটকটি প্রকাশনার নেপথ্যে যাদের প্রত্যক্ষ প্রেরণা নথিভুক্ত না করলে সত্য প্রকাশ ন্যা করার অপরাধ স্পর্শ করবে তাদের তালিকায় বীথি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের সঙ্গে অতি নিকটজন বলাকা ভট্টাচার্য, স্বপন ভট্টাচার্য, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এর নাম যেমন উল্লেখ্য তেমনি বিভিন্ন প্রকার ও প্রকরণের মাধ্যমে যাদের পরোক্ষ সহযোগিতা ও প্রেরণার কল্যাণ স্পর্শে প্রকাশনার বৃহৎ কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং যারা কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন তাদের নাম প্রকাশ করার এই সুযোগের সদ্-ব্যবহার করতে পারছি বলে আনন্দিত। এই তালিকায় হাওড়া পুরসভার মেয়র স্বদেশ চক্রবর্তী অনুজ তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, ম্যানেজার ব্যাংক অফ্ বরোদা, হাওড়া শাখা, অনুজপ্রতিম তুষার মিত্র এবং তার সহধর্মিণী শোভা মিত্র ছাড়াও উল্লেখ্য নাম রণেন গুপ্ত, রাজা যোশী সহকর্মী সতীমোহন চক্রবর্তী, সহবোন্ধা প্রধান শিক্ষক হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রখ্যাত নাট্য-সমালোচক ও আচার্য ডঃ অজিতকুমার ঘোষ গ্রন্থটি প্রণয়নে বিলম্বের জন্য বারবার খোঁজ খবর নিয়ে পরোক্ষভাবে গ্রন্থটির প্রকাশনাকে বাস্তবায়িত করেছেন এবং স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাঁর কাছে গবেষণা কার্যের জন্য নানাভাবে ঋণী হওয়ার পরও গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যাপারে কৃতজ্ঞতার এই ঋণও যুক্ত হ'ল।

পুস্তকটির প্রকাশনাকে ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে নিউ পাল প্রেসের বঙ্কিম পালের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা উল্লেখযোগ্য।

সর্বোপরি আর্থিক অনুদান দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা আকাদেমি এবং তথ্যও সংস্কৃতি বিভাগ তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যে সুযোগ করে দিয়েছেন সে সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের নাম এই প্রকাশনার ব্যাপারে চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিন্দু নীড় বনবীথি
চিকরণ্ড/জনাই
হুগলী।

বিনীত
ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে নাটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নাটকের নাট্যকার সর্বদাই প্রচ্ছন্ন। নাট্যমঞ্চের দুই উইংগসের পাশে তার ভূমিকা অনেকটা যেন প্রমট্‌টারের বা স্মারকের। তিনি আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে আত্মগোপন করে থাকেন। সার্থক নাট্যকার দক্ষ বাজীকরের মত পুত্তলিবৎ চরিত্রগুলিকে অদৃশ্য নাট্যসূত্রের সাহায্যে নাচিয়ে আসর মাত্‌ করেন। যারা দর্শক তারা মুগ্ধ বিস্ময়ে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেন পুতুলগুলির অপূর্ব স্বাভাবিক অভিনয়। এক্ষেত্রে দক্ষ বাজীকরের সম্বন্ধে আমাদের কিছু না জানা থাকলেও বিশেষ ক্ষতি নেই, কিন্তু কৌতূহল দুর্নিবার। পুতুল নাচের আসর শেষে দক্ষ হোক অদক্ষ হোক বাজীকরকে দেখার আকাঙ্খাকে প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বাজীকর কোথায় থাকেন, বংশপরম্পরায় এ বিদ্যা তার পৈতৃক কিনা, এ পেশায় তার আকৃষ্ট হওয়ার কারণ কি, দক্ষতা অর্জনের পথে তাকে কোন কোন বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছে—এক কথায় তার কর্মময়জীবনের অনেককথাই আমাদের জ্ঞাতব্যের তালিকায় পড়ে যায়।

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের জীবনী কেন্দ্রিক সংক্ষিপ্ত আলোচনাও তাই আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাঁর নিষ্ঠা, সংস্কার, যুগরুচি এবং নাটক রচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রেরণা সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিবহাল থাকলে তাঁর বহুধাবিস্তৃত সাহিত্য সাধনার স্বরূপ নির্ণয় সহজসাধ্য হবে।

'ক্ষীরোদপ্রসাদ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক এবং কবিনাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে বছর জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁর জন্ম ঠিক সেই বছরেই। ১২৬৯ সালের বিষ্ণু-সংক্রান্তির দিন (১২ই এপ্রিল ১৮৬৩) ক্ষীরোদ প্রসাদের জন্ম। ক্ষীরোদপ্রসাদ উল্লেখ্য বংশ গৌরবের অধিকারী ছিলেন। তাঁর বংশের অনেকেই ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। পিতা মহানুভব গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরু। পিতার নাম গুরুচরণ ভট্টাচার্য্য শিরোমণি। ইঁহারা খড়দহের বিখ্যাত গুরুবংশ, উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়।'[১]

বিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন কাটে ব্যারাকপুরের গবর্ণমেণ্ট স্কুলে। ঐ স্কুলেরই ছাত্র হিসাবে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে তিনি পাশ করেন দ্বিতীয় বিভাগে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার থেকে জানা যায় পরীক্ষাদানকালে তাঁর বয়স ছিল সতের বছর। দু-বৎসর পরে যথারীতি এফ. এ. পাশ করেন ১৮৮৩ সনে দ্বিতীয় বিভাগে জেনারেল এসেমুব্লীজ ইনস্‌টিটিউসনের নিয়মিত ছাত্র হিসাবে। এরপর দীর্ঘ পাঁচ বছরের বিরতির পর ক্ষীরোদপ্রসাদ-এর প্রতি সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি ১৮৮৮ সনে। তিনি মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং ঠিক তার পরের বছর (ইংরেজী ১৮৮৯) প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে রসায়নবিদ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

---

১. বাংলা ভাষার লেখক—'জন্মভূমি' আষাঢ়—১৩০৩ পৃঃ ২১৩।

ছাত্র জীবনের সমাপ্তির পর কর্মজীবনের শুরু শিক্ষা বৃত্তিকে অবলম্বন করে। চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজে তাঁর প্রথম অধ্যাপনার হাতেখড়ি। কিছুদিন সেখানে থাকার পর কোলকাতার জেনারেল এসেম্ব্লীজ ইনস্টিটিউশনে রসায়নবিদ্যার অধ্যাপকের পদে বৃত হন। এই অধ্যাপনার কার্যকাল ১৮৯২ থেকে ১৯০৩ সন।

তাঁর কর্মজীবনের অনেকটা জুড়ে রয়েছে কৃত্রিম সোনা ফলানোর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টায় তিনি অনেকটা সাফল্যলাভও করেছিলেন। তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রস্তুত কৃত্রিম সোনা লাইমোডাইন্ একদা প্রসিদ্ধিলাভও করেছিল। কিন্তু পরবর্তী জীবনে যিনি সাহিত্যে সোনার ফসল ফলাবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবেন—তার পক্ষে কর্মজীবনের এই পরিশ্রমলব্ধ গবেষণা অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় বস্তুর সামিল বলে গণ্য হতে বাধ্য। 'আকরিক মূলধাতু সুবর্ণকে রসায়নাগারে সম্ভব করে তোলবার ঐকান্তিক চেষ্টায় তিনি জীবনের অনেকটা সময় অপব্যয় করেছিলেন।······অকস্মাৎ দেখা গেল লেখনী মুখে সেই বহু প্রত্যাশিত সোনার ঝর্ণাবয়ে চলেছে। রচনার চাতুর্যে, কল্পনার মাধুর্যে ভাষার ঐশ্বর্যে কাব্যরসের বিচিত্র রসায়নে তার অনেকগুলিই অতুলনীয়'।[২] বৈজ্ঞানিককে কবিরূপে পাওয়া কঠিন কিন্তু সেটাও তার মধ্যে সম্ভব হয়েছে।

ছাত্র জীবন থেকেই ক্ষীরোদপ্রসাদের সাহিত্য-প্রীতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বি. এ. পরীক্ষাদানের তিন বৎসর পূর্বেই তাঁর সাহিত্য সাধনার হাতেখড়ি—"আখ্যায়িকা··রাজনৈতিক সন্ন্যাসী" রচনার মধ্যমে। তার আগে থেকেই কবিতা রচনার প্রচেষ্টা চলছিল—সে প্রসঙ্গ নিয়ে একটু পরেই আলোচনা করবো। অধ্যাপনা-চলাকালীন ক্ষীরোদপ্রসাদের আত্মপ্রকাশ সৌখীন নাট্যকার হিসাবে। এবং শেষ পর্যন্ত নাট্যরচনার সুবিধার জন্য তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে অধ্যাপনাবৃত্তি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের পক্ষে অন্তরায়। শেষ পর্যন্ত নাট্যরচনার সুবিধার জন্য চাকরিতে ইস্তফা এবং নাট্যকারের জীবন বেছে নেওয়ার ঝুঁকি তিনি নিয়েছিলেন—তার আসাধারণ নাট্যপ্রীতির কারণেই। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর নাট্যরচনাই ছিল তাঁর জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায়। তার এই চাকরিতে ইস্তফা দেওয়া প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত জানা যায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সঙ্গে তাঁর এক সাক্ষাৎকার থেকে। "একটু বড় হও, তারপর বুঝবে এই নেশা যাকে পেয়ে বসেছে সে চাকরি কেন, ঘরবাড়ী আত্মীয়স্বজন সব কি করে ছাড়তে পারে—কিন্তু এই নেশাটুকু কেন ছাড়তে পারে না।"[৩]

অধ্যাপনাকার্যেরত থাকাকালীন তাঁর অন্ততঃ বারোখানি ছোটবড় পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রকাশিত এবং তিনটি বেশ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থও হয়ে গেছে। ছাত্রমহলেও তিনি

নাট্যকাররূপে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু সেই খ্যাতির বিড়ম্বনাই সম্ভবতঃ স্বেচ্ছায় তাঁকে অধ্যাপনাবৃত্তি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথার উদ্ধৃতি থেকে সেকথা জানা যায়। ক্ষীরোদপ্রসাদের সঙ্গে সংলাপের অংশবিশেষ—'তখন আমাদের পাঠ্যাবস্থা, আপনি অধ্যাপক। সবে 'বভ্রুবাহন' খানা লিখেছেন। একদিন কলেজে একটা এক্সপেরিমেণ্ট সুন্দর করে করাতে ছেলেরা হাততালি দিয়ে বলেছিল, 'ব্রাভো বভ্রুবাহন'। সেদিন আপনি রেগেমেগে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।······

তিনি খানিকটা খুব মনখোলা হাসি হাসলেন। বললেন, যখন বুঝলুম যে নাটক লিখলে অধ্যাপনা করা চলবে না, তখন কাজ ছেড়ে দিলুম।[৪]

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ বাল্যকাল থেকেই এবং পাঠশালা থেকেই মাতৃভাষায় কবিতা রচনা করে তিনি সাহিত্যবেদীতে কবিতার পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেছেন। অক্লান্তকর্মী ক্ষীরোদপ্রসাদের সাহিত্যসাধনা বিপুল এবং বহুধাবিস্তৃত। তাঁর নাট্যগ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক আলোচনার পূর্বে তাঁর সাহিত্যসাধনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাঁর জীবনের কয়েকটি দিক সম্বন্ধে আলোচনা করে নেওয়া অসঙ্গত হবে না বলে ধরে নেওয়া যায়।

'তিনি ছিলেন দীর্ঘাকৃতি শীর্ণদেহ, বিরলকেশ এবং সর্বদাই ভাবপ্রবণ। তাঁর গায়ের রঙ ছিল কৃষ্ণবর্ণ। মুখ প্রায় সব সময় হাসিমাখা। সরল এবং মিষ্ট কথাবার্তা। কোনরকম পোজ বা ভঙ্গী ছিল না তাঁর। দেখলেই সেকালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কথা স্মরণ হয়।'[৫]

বাল্যকাল থেকেই তাঁর কাব্য সাধনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৩১১ সনে জাহ্নবী পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কবিতা 'দধীচির অস্থিদান' তদানীন্তনকালে সবার প্রশংসা অর্জন করেছিল এবং এই কবিতাটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'দধীচির তনুত্যাগ' কবিত‌ার আদর্শে রচিত ছিল।

তিনি ছিলেন একাধারে কবি, নাট্যকার ঔপন্যাসিক, ছোটগল্প লেখক, দার্শনিক, পরলোকতত্ত্ববিদ, সাংবাদিক, সুবক্তা এবং বৈজ্ঞানিক। ১৩১৬ সালের বৈশাখ থেকে 'অলৌকিক রহস্য' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এ পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং তিনিই। 'পত্রিকাখানি' অনিয়মিতভাবে ছয় বৎসর চলিয়াছিল। ইহাতে তাঁহার অনেক রচনা স্থান পাইয়াছিল। আমরা ইহার ৬ষ্ঠ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা (ভাদ্র—১৩২২) পর্যন্ত দেখিয়াছি।[৬]

---

৪. কালিকলম, ফাল্গুন ১৩৩৪—ক্ষীরোদ প্রসাদ—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
৫. যাঁদের দেখেছি—ক্ষীরোদপ্রসাদ—হেমেন্দ্রকুমার রায়।
৬. সাহিত্যসাধকচরিতমালা — 'ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বস্তু বিশ্বের রাসায়ন তাঁকে বিজ্ঞানের রাজ্যে পরিক্রমা করিয়েছে বটে, কিন্তু তাঁকে নেশায় প্রমত্ত করতে পারে নি, ভাবজগতের রসায়নে তিনি হয়েছিলেন প্রমত্ত। তাই আমাদের ভাগ্যে লাভ হয়েছে তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি·····[৭] তাঁর বিপুল সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভার।

গীতিনাট্যে ঐতিহাসিক, ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাট্যে এবং রোমান্টিক নাট্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর বৈশিষ্ট্যের শ্বাশত প্রমাণ রেখে গেলেন। বাংলার নাট্যসাহিত্যের স্বর্ণযুগ স্রষ্টাদের মধ্যে তিনি অন্যতম।" গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ এই এয়ী প্রতিভার ত্রিস্রোতীমিলনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে নাট্যজগতের ত্রিবেণীসঙ্গম। এই সঙ্গমে অবগাহন স্নান করে বাঙালী জাতিও তীর্থপুণ্য সঞ্চয় করে চলেছে।[৮]

তিনি প্রায় আটান্নখানি গ্রন্থ লিখে গেছেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি এমন কিছু কিছু নাটক নাটিকা ও রঙ্গন্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে সাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'শিরী-ফরীদ' (ভারতী—১৩১৩, বৈশাখ থেকে ফাল্গুন)—নাটিকা, 'ফক্কানগর' রঙ্গন্যাস (সাপ্তাহিক বিজলী—১৩৩০, ৭ই হইতে ২১শে ভাদ্র) এবং একরাত্রি উপন্যাস (বার্ষিক বসুমতী ১৩৩৩)।

বাংলা রঙ্গালয় ও নাটক সম্বন্ধে নাট্যকারের কিছু বিছু আলোচনা বিক্ষিপ্ত আকারে তাঁর জীবনী এবং বিভিন্ন সংলাপের মধ্যে মিশে গেছে। এ ছাড়াও তাঁর নিজের লেখা দু-একটি প্রবন্ধেরও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। "নাটক" শিরোনামায় ১৩০২ সালের জন্মভূমি পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় তাঁর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও 'রঙ্গালয়ের উন্নতি ও অবনতি' শীর্ষক আর একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধও প্রকাশ করেছিলেন তিনি নাট্যমন্দির পত্রিকায় (১৩১৭ শ্রাবণ)।

ক্ষীরোদপ্রসাদের বিপুল সাহিত্যসম্ভারের মধ্যে তাঁর রচিত নাটকগুলির পৃথকভাবে কালানুক্রমিক আলোচনা করা হবে। পুস্তকাকারে মুদ্রিত কিংবা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম 'নিবেদিতা; 'গুহামধ্যে এবং 'নারায়ণ'। তাঁর লেখা উপন্যাস 'পতিতার সিদ্ধি' রচিত হয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার আর পরিচিতির সূত্র ধরে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্বে এবং 'দত্তা' বইটি পড়ার আগে পর্যন্ত তিনি শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে উন্নাসিক ছিলেন। তাঁর এই উন্নাসিকতা শেষ পর্যন্ত উগ্র আসক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে তাঁর কিছু কিছু অবদান উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। কিছু কিছু ছোট গল্পও তিনি লিখে গেছেন। তাঁর গল্প গ্রন্থের নাম 'বিরামকুঞ্জ।'

গিরীশপ্রতিভার দীপ্তির সম্মুখে তাঁর নাট্যজীবনের প্রথম অধ্যায় ভাস্বর নয়, কিন্তু প্রতিভাকে আবরণের মধ্যে ঢেকে রাখা যায় না। ক্ষীরোদপ্রসাদের সাহিত্য

সৃষ্টি তাই স্বমহিমায় প্রোজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাঁর অনেক রচনা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রয়েছে।

জীবনের অনেকগুলি মূল্যবান দিন তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিঃস্বার্থ সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পরিষদের জন্মাবধি তিনি এর সভ্য ছিলেন। কার্য্যনির্বাহক সমিতির সভ্যরূপে এই প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনায় সবিশেষ সাহায্য করার সুযোগ পান তিনি ১৩১১ সন থেকে ১৩১৯ সন পর্যন্ত। পরিষদের মাসিক অধিবেশনে মাঝে মাঝে তিনি প্রবন্ধ পাঠ করতেন। তাঁর লিখিত প্রবন্ধ 'নাটকের ইতিবৃত্ত' রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৩০২ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ-এর মাসিক অধিবেশনে পঠিত হয়েছিল। পরবর্তী ভাদ্র মাসে এটিকে মুদ্রিত জন্মভূমির পাতায় দেখা গিয়েছিল। পরিষদের সহকারী সভাপতির পদে তাঁকে মনোনীত করে সম্মানিত করা হয় ১৩২৫ এবং ১৩৩০ সনে।

বক্তা হিসাবে ক্ষীরোদপ্রসাদ তার সরস বুদ্ধিদীপ্ত ভাষণে সকলের মন জয় করতে পারতেন। বাংলা উপন্যাস এবং বাংলা নাটক সম্বন্ধে তখনকার দিনে পণ্ডিত সমাজে এক অস্বাভাবিক উন্নাসিকতার ভাব বিরাজ করতো। বাংলা উপন্যাস ছিল আপাংক্তেয় এবং অশ্রদ্ধেয় বস্তুর পর্যায়ভুক্ত। শ্রী নলিনীকান্ত সরকারের স্মৃতিচারণের একটি ঘটনা থেকে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত সরস বক্তৃতার কথা জানা যায়। নিমতিতার জমিদার বাড়ীতে এক সামাজিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় অমন্ত্রিত হয়েছেন, সে সভায় পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদকে সাদর আহ্বান জানানো হয়েছিল। পণ্ডিতপ্রবর যাদবেশ্বর সুপ্রাচীন যুগের সমাজ শিক্ষা ও ধর্মপ্রাণতার ভূয়সী প্রশংসা করলেন, আবার তেমনি নিন্দা করলেন আধুনিক যুবসমাজকে। দেশ কোন্ পথে চলেছে তার মতে লাইব্রেরিগুলি দেখলেই তা বোঝা যায়—শতকরা নিরানব্বইটি বই হয় 'উ' আর নয় 'না' (অর্থাৎ উপন্যাস না হয় নাটক)। যাদবেশ্বরের মূল বক্তব্যবিষয় ছিল : এই তো দেশের হালচাল—এই যদি দেশের বর্তমান হাল হয় তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই অন্ধকার।'

আবাল্য বাংলাসাহিত্য সাধনায় যিনি আত্মনিয়োগ করে আসছেন তাঁর সামনে বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবমাননাকর বক্রোক্তি তিনি কখনই সহ্য করতে পারেন না। ক্ষীরোদপ্রসাদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গোড়াতেই তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল, কিছু বলবার জন্য, তখন তাঁর কিছুই বলার প্রয়োজন হয়নি।

সভাপতি অনুমতি দিলেন কি না দিলেন কিছু বোঝা গেল না, ক্ষীরোদপ্রসাদের বক্তৃতা কিন্তু আরম্ভ হয়ে গেল।·····তাঁর ভাষণের কিয়দংশ অনেকটা এইরূপ— বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়কে আজ এখানে সভাপতিরূপে পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। আমরা তাঁর কাছ থেকে কিছ আশার বাণী শুনবো বলে উৎকর্ণ হয়েছিলুম। কিন্তু শুনতে হ'ল হতাশার বাণী-নিরাশার বাণী। তাঁর মতে বাংলদেশের বর্তমান আলোকরেখাহীন এবং

তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। বাংলাদেশের লাইব্রেরীগুলির মধ্যে ঢুকলেই নাকি এইসব ভাব মনে জাগে। সেখানে কেবল 'উ' আর 'না'। উপন্যাস আর নাটকে নাকি জাতির চরিত্রকে হীন করে তোলে। বাংলা সাহিত্যের প্রতি এরূপ অবমাননাকর উক্তি এর পূর্বে আর কখনও শুনিনি।'......শেকস্‌পীয়ারের নাটক যেমন ইংরেজ-জাতিকে গৌরবান্বিত করে তুলেছে, তেমনি আমাদের জাতিকে সমৃদ্ধ করে রেখেছে কালিদাস ও ভবভূতির নাটক। সভাপতি মহাশয়ের একথা নিশ্চয়ই জানা আছে। আর উপন্যাস ? আজ জাতির মধ্যে যে জাগরণের সাড়া পড়েছে, তার মূলে উপন্যাস। কোনো পাণিনি মুগ্ধবোধের সূত্র জাতিকে জাগাতে পারেনি, জাগিয়েছে 'আনন্দমঠ' আর তার বন্দেমাতরম্‌—ক্ষীরোদপ্রসাদ বক্তৃতা শেষ করলেন এই কথা বলে—সভাপতি মহাশয় চিন্তিত হবেন না দেশের বর্তমান দেখে। দেশের বর্তমান অতি উজ্জ্বল: আজ আমাদের দেশে জগদীশচন্দ্র—প্রফুল্লচন্দ্রের মতো বৈজ্ঞানিক আছেন, সুরেন্দ্রনাথ—বিপিনচন্দ্রের মতো বক্তা আছেন, রবীন্দ্রনাথের মতো কবি আছেন, তার যাদবেশ্বরের মতো পণ্ডিত আছেন।

আর এক সভার বিবরণ থেকে সুবক্তা ক্ষীরোদপ্রসাদের পরিচয় প্রত্যক্ষ। নিমতিতার স্থানীয় স্কুলের মুসলমান বোর্ডিং-এর ছেলেদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি পদে বৃত হয়েছেন বিখ্যাত উকিল মৌলবী এক্রমি-উল হক সাহেব। স্থানীয় বিশিষ্ট হিন্দুদের মধ্যে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ। মৌলবী মৌলানারা বক্তৃতা করে নেওয়ার পর ক্ষীরোদপ্রসাদকে পরিচিত করলেন সকলের কাছে সভাপতি মহাশয়। মৌলবী মৌলানাদের চোখে-মুখে বিরক্তির ভাব প্রকট হয়ে উঠল। ওঠাও স্বাভাবিক। এ হিন্দু আমাদের ধর্মসভায় কী বলতে যাচ্ছে—কী ই বা তার বলার থাকতে পারে।'[৯]

সুবক্তা ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমাণ দিলেন নাট্যসাহিত্যের মত বক্তৃতাদানেও তাঁর অধিকার আছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ উঠলেন বক্তৃতা করতে। উঠেই তিনি তাঁর প্রথম কথাটিতেই সভাস্থ মৌলবী মৌলানাদের চিত্তজয় করে নিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ যখন দাঁড়িয়ে উঠে বদ্ধাঞ্জলি ললাটে স্পর্শ করে উদাত্তস্বরে উচ্চারণ করলেন,... 'ওঁ নমো ভগবতে মহম্মদায়' তখন মৌলবী মৌলানাদের মুখে আর কথা নেই। মুগ্ধ বিস্ময়ে সকলেই চেয়ে আছেন ক্ষীরোদপ্রসাদের দিকে। অযুতাধিক ব্যক্তি সশ্রদ্ধ নীরবতায় অভিনন্দিত করলেন ক্ষীরোদপ্রসাদকে।'[১০]

রসায়ণ বিজ্ঞানের ছাত্র ও অধ্যাপক বিজ্ঞান সেবকের বাঞ্ছিত দায়িত্বের বোঝা ফেলে রেখে সাহিত্যের নামাবলী গায়ে নিলেন স্বেচ্ছায়। কথিত আছে একটি মকোদ্দমায় এজেহার দিতে গিয়ে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি ইংরাজী জানি না,

---

৯. শ্রদ্ধাস্পদেষু—(স্মৃতিচারণ) নলিনীকান্ত সরকার—
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রসঙ্গ।

১০. শ্রদ্ধাস্পদেষু—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রসঙ্গ—নলিনীকান্ত সরকার।

একসময় শিখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু অব্যবহারে ভুলিয়া গিয়াছি। বস্তুতঃ তিনি যেভাবে বঙ্গভারত'র সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন—ইহা তাঁহার পক্ষে অত্যুক্তি নাও হইতে পারে।"[১১]

ক্ষীরোদপ্রসাদ নাট্যকার হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করলেও তিনি মূলতঃ কবি, কলেজে অধ্যাপনা করার সময় তাঁর রচিত কবিতা বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় সাদরে গৃহীত এবং মুদ্রিতও হয়েছিল। তাঁর এই কবি সত্ত্বা নাট্যকারের নির্লিপ্ততাকে ক্ষুণ্ণ করেছিল স্বাভাবিকভাবেই। এইজন্যই তার 'ফুলশয্যা', 'রঘুবীর', 'ভীষ্ম', 'নরনারায়ণ', 'রামানুজ' কেবলাত্র নাটকই নয়, নাট্যকাব্য। তাঁর অন্যান্য নাটকগুলির সংলাপও কাব্যশ্রীমণ্ডিত। নলিনীকান্ত সরকারের একটি প্রশ্নের উত্তরে (প্রশ্নটি ছিল—এমন সুন্দর কবিতা আপনার, কবিতা লেখা ছাড়লেন কেন ?') ক্ষীরোদপ্রসাদ বলেছিলেন—নাটকের মধ্যেই এখন কবিতা লিখছি। টুকরো কবিতা লেখার সময় কই ?'[১২] ক্ষীরোদপ্রসাদের কবি প্রতিভার দীপ্তিতে তাঁর নাট্যকাব্যগুলি তাই অত প্রোজ্জ্বল। বাংলার মসনদ, আহেরিয়া প্রভৃতি নাটককে ঐতিহাসিক কাব্য বলে উল্লেখ করা চলে।

রঙ্গালয়ের নটনাট্যকাররা সাধারণতঃ নিজেদের রচনায় বা ভাষায় কাব্যরস বা সাহিত্যরস বিতরণের চেষ্টা করতেন না। ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন মূলত কবি, তাই নাটকেও উচ্চশ্রেণীর কাব্যরস পরিবেশনের প্রবণতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাননি, এবং এই কারণেই তাঁদের নাটক অন্যান্যনাট্যকারদের নাটকের তুলনায় অধিকতর পাঠোপযোগী এবং সাহিত্য রসপুষ্ট।

'একসময় বাংলা নাট্যজগতে ক্ষীরোদপ্রসাদ ছিলেন অপরিহার্য্য নাট্যকার। তাঁর আলিবাবা রঙ্গনাট্য ছিল ক্লাসিক থিয়েটারের 'বিজয় বৈজয়ন্তী'। আলিবাবার অভিনয় আজও চিরনূতন। তাঁর অপূর্ব কীর্তি 'আলিবাবা' রঙ্গনাট্য। তিনি যদি আর কিছু না রচনা করিতেন এই রঙ্গনাট্যটিই তাঁকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখিত। আলিবাবা চিরনূতন ও চির আনন্দদায়ক হইয়া আজিও এই শ্রেণীর নাট্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ স্থানে বিরাজ করিতেছে।'[১৩] তাঁর ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক নাটক 'প্রতাপাদিত্য' জনসাধারণকে সর্বপ্রথম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল। উনিশশো পাঁচের জাতীয় জাগরণের যুগে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে উপলক্ষ করে বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভাবের বন্যা বয়ে গিয়েছিল এবং তার অপ্রতিরোধ্য প্রবাহে বিপুল গতিবেগ সঞ্চারিত করেছিল বাংলাদেশের রঙ্গালয়গুলি। এই ভাববন্যা এবং তার অপ্রতিরোধ্য প্রবাহের বিপুল গতিবেগ সৃষ্টির

---

১১. ১২. সাহিত্য সাধক চরিতমালা—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।

১৩. সাহিত্যসাধক চরিতমালা : ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রসঙ্গ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঐতিহাসিক স্বাক্ষর ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য শীর্ষক জাতীয়তাবাদী নাটক। ইংরাজরাজ গিরিশচন্দ্রের ছত্রপতি শিবাজী, সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাশিম এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের নন্দকুমার, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ও দাদা ও দিদি নাটকগুলিকে রাজদ্রোহমূলক আখ্যা দিয়ে বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। স্বাধীন ভারতে আজ পর্যন্ত নাটকগুলির উদ্ধার সাধন হয়নি এবং পুনঃপ্রচারের ব্যবস্থা হয়নি। তাঁর শেষ বয়সের নাটকগুলি—যেমন আলমগীর, বিদুরথ, জয়শ্রী, ভীষ্ম প্রভৃতি নাটক সর্বজনসমাদৃত। এগুলি বাংলানাট্যসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ক্ষীরোদ-প্রসাদের লিখনশৈলী, বৈশিষ্ট্য এবং কাহিনীগ্রন্থনের চাতুর্যে নাট্যামোদীগণের ভাবনার অবকাশ আছে। কারণ তিনি উপলব্ধি করতেন যে নাটকে চিন্তার খোরাক নেই, সে নাটক রসসৃষ্টির অনুকূল নয়। সংখ্যার দিক দিয়ে অত্যল্প হলেও মনস্তত্ত্বমূলক নাটকের পথিকৃৎ হিসাবে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাম স্মরণীয়। তাঁর বিভিন্ন নাটকের নায়কনায়িকারা আজও আমাদের মনে দোলা দেয়। অশোকে, ধারিনী, বঙ্গেরাঠোরে ভোলাই, রঙ্গলাল, পলাশীর প্রায়শ্চিত্তে মীরজাফর—এমনি আরো কত চরিত্র। অপ্রধান চরিত্রগুলিও অনাদৃত নয়। তাঁর সৃষ্ট ক্ষুদ্র চরিত্র-গুলিও আমাদের মনে থাকে। প্রধান ভূমিকাগুলির সংস্পর্শে বা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তারা হারিয়ে যায় না। তাঁর আলমগীরে কামবক্স, বিদুরথে প্রসেনজিৎ, রঘুবীরে সাজাহান, দৌলতে দুনিয়ায় কেলা, অশোকে কুনাল, প্রতাপাদিত্যে রডা প্রভৃতি ক্ষুদ্র চরিত্রগুলিও আমাদের মনে রেখাপাত করে।'

নাট্যরচনাকালে তাঁর লেখনী চলত দ্রুতগতিতে, তার চরিত্রগুলিও আসতো যেন স্বাভাবিক নিয়মে—অনায়াস প্রচেষ্টায়। চরিত্রগুলি নিজেদের ভূমিকায় অংশ নিত নাট্যকারের ঘটনাসৃষ্টির পরবর্তী কল্পনার আমন্ত্রনে। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের অন্যতম সত্বাধিকারী স্বর্গত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর (ক্ষীরোদপ্রসাদের) বিশেষ সৌহার্দ্য। নাট্যশিল্পকলা ও রসমঞ্চের সঙ্গে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের বিশেষতঃ হরিদাসবাবুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যোগাযোগ ছিল। তাঁর মুখে শুনেছি ক্ষীরোদপ্রসাদ একটানা লিখে পাণ্ডুলিপির পাতাগুলি দেখতেন না, পরিবর্জন, পরিবর্ধন বা সংশোধনের প্রসঙ্গ উঠলে বলতেন, যা লিখে দেবার লিখে দিয়েছি, তোমারা দেখেশুনে যা হয় করে নেও গে। নেহাৎ চাপে না পড়লে তাঁর একটানা লেখা নাটকের কোন শব্দ, সংলাপ, দৃশ্য বা চরিত্র অদলবদল করতেন না।'[১৪] আমার মনে হয় ক্ষীরোদপ্রসাদের কোনো লেখারই নকল তাঁর ঘরে থাকতো না। তিনি যা লিখতেন ঐ একবারই লিখতেন। প্রথম লিখে সেই খসড়া থেকে পরিমার্জিত কপি তৈরি করা ক্ষীরোদপ্রসাদের অভ্যাস ছিল না। প্রথম-বারের লেখাই তাঁর প্রেসে দেওয়ার শেষ লেখা। বাঁ হাতের চেটোর ওপর কাগজ রেখে

সেটিকে সেই হাতেরই অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে চেপে ধরে ধীরে ধীরে লিখে যেতেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গোটা গোটা অক্ষর, কাটাকাটি নেই বললেই হয়—যেন তাঁর খসড়া লেখার সংস্কার করা কপি।'[১৪ক]

মুখ তাঁর সবসময়েই হাসিখুশি থাকতো।' মাঝে মাঝে থিয়েটারওলাদের ওপর চটে দপ করে জ্বলে উঠতেন বটে, কিন্তু একটু পরেই আবার ঠাণ্ডাজল। বজ্র আর বৃষ্টি।'[১৫ক]

নিজের রচনা সম্বন্ধে তাঁর ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্পর্শকাতর। হেমেন্দ্রকুমার রায় ক্ষীরোদপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তাঁর একটি কবিতার কথা উল্লেখ করতেই তিনি বললেন, 'আপনি পড়েছেন?'—হ্যাঁ, সেটি আমার একটি খুব ভালো কবিতা। প্রেরণা না পেলে তেমন কেউ লিখতে পারে না। ···তারপরেই সোজা হয়ে উচ্চকণ্ঠে ভাবভঙ্গীর সঙ্গে হাত নেড়ে গড়গড় করে সেই তিনচার যুগ আগেকার লেখা সমগ্র কবিতাটি আবৃত্তি করে গেলেন।' অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম—এত রাশি রাশি ভারি ভারি নাটকের চাপেও এত-বৎসর পরে একটি স্বরচিত কবিতা তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে লুপ্ত হয়ে যায়নি।'[১৫]

নাটক নিয়েও অনেক কথা বলতেন। বেশীর ভাগই নিজের নাটকের প্রসঙ্গ। সর্বদাই মশগুল হয়ে থাকতেন যেন স্বকীয় কল্পনালোকে।'[১৬]

মাসিক পঁচশো টাকা বেতনে ম্যাডান্ থিয়েটারের বৈতনিক নাট্যকাররূপে তিনি যোগদান করেছিলেন। তখনকার দিনে রঙ্গালয়ের কর্মরত কোন ব্যক্তির পক্ষেই, বিশেষকরে নাট্যকারের কপালে এরূপ উচ্চহারের বেতন মেলে নি।– শুধু এই আর্থিক স্বীকৃতিই নয়—একসময় তাঁর নাটক যুগপৎ দুটি রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হতে দেখা গেছে এবং তাঁর সমুদয় নাটকাবলী সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের উপহার-গ্রন্থাবলী-রূপে প্রকাশিত হওয়ার সংবাদও এক সময় সাময়িক পত্রের পাতায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের অনুমতি দিয়ে নাট্যকার তদানীন্তনকালে বিশ সহস্র মুদ্রা—পাচ্ছেন বলে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে।* এ দুর্লভ সম্মান ও অর্থপ্রাপ্তির নজীর তদানীন্তনকালে বিরলদৃষ্ট।

আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে তার কৌতূহলের কোন উত্তাপ পরিলক্ষিত হয় নি। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন প্রায় নিরুত্তাপ (অবশ্য পরে তিনি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল ও অন্যান্যদের ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন) আলাপ আলোচনা থেকে বোঝা গিয়েছিল

১৪ক. শ্রদ্ধাস্পদেষু : নলিনীকান্ত সরকার।

১৫ক. ১৫. ১৬. যাঁদের দেখেছি : ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—হেমেন্দ্রকুমার রায়

* নাট্যসংবাদ কণা—নাট্যমন্দির, কার্তিক ১৩১৮ থেকে সংগৃহীত।

তাঁর মতামত রক্ষণশীল। গতিশীল তথাকথিত আধুনিক সাহিত্যের প্রতি তাঁর কোন মমতা ছিল না।'[১৭]

নাটক লেখার সবচেয়ে বড় গুন তাঁর মতে কি?—এ প্রশ্নের আলোচনায় তাঁর মতামত : 'এর উত্তর অলঙ্কার শাস্ত্রে আছে—আত্মগোপন। নাট্যকার নিজেকে সব সময় যদি প্রচ্ছন্ন রাখতে না পারেন তো সব মাটি হয়ে যায়।…বড় বড় নাটক পড়ে কি কালিদাস, কি শেক্‌সপিয়র তাঁদের কোন পরিচয় নাটকের মধ্যে পাবেন না। লোক একদিন মনে করেছে বেকনই শেক্‌সপিয়র, কিন্তু নাটক পড়ে কিছুতেই একথা বলার উপায় নেই। চাষার কথা বলার সময় শেক্‌সপিয়র একেবারে চাষা, আবার রাজা আঁকবার সময় যেন সত্যিকারের রাজা। মনের এত বড় প্রসার না হলে নাটক লেখাই বিড়ম্বনা।'[১৮]

বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর স্বভাব ছিল বালকের মতই তাজা আর অকপট। শেষ বয়সেও তিনি যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে নাট্যরচনার পুণ্যকর্তব্য সম্পাদানে ব্রতী হতেন, তা অনেকের কাছে বিস্ময়কর বলে বোধ হবে। বৈকালীয় সংবাদ : 'ক্ষীরোদপ্রসাদ পৌরাণিক নাটক লিখছেন—নাট্যমন্দিরে অভিনীত হবে। ক্ষীরোদ-প্রসাদের সাহিত্যসাধনা উল্লেখযোগ্য ··এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যেভাবে নাটক লিখছেন—অনেক যুবনাট্যকারের সে অধ্যবসায় স্পৃহনীয়।'[১৯]

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে ক্ষীরোদপ্রসাদ নিজেই নিজের লেখা পড়ে আনন্দ পেতেন, প্রশংসাও করতেন। তার জন্যে তাঁর ভাগ্যে আত্মাভিমানীর কলঙ্ক জুটে-ছিল। কিন্তু সে কলঙ্কের বোঝা তাঁর প্রাপ্য নয়—কার্যতঃ তিনি ছিলেন সরল স্পষ্টবাদী এবং বালকের মতই প্রাণখোলা। মন ছিল পবিত্র, স্নেহপ্রবণ এবং প্রেমপিয়াসী।

শেষ জীবনে কবিনাট্যকারের নির্জনবাসের দিকে প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তাই তিনি যখনই সময় পেতেন বাঁকুড়া শহরের সন্নিকটে বিকনা গ্রামে চলে যেতেন। সেখানে এতদুদ্দেশ্যে একটি গৃহ নির্মাণও তিনি করেছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি বাঁকুড়ার পল্লী কুটীরে গিয়ে নির্জন বাসের নীরবতা আস্বাদন করেছিলেন।…'ভাবপ্রবণ লেখকের পক্ষে কোলকাতার নিবাস ছিল নিকৃষ্টতম স্থান। তাই তিনি বাঁকুড়ায় পালিয়ে যেতেন।…সেখানেই মৃত্যু।'[২০]

ক্ষীরোদপ্রাসাদের দেহান্তর ঘটে ৪ঠা জুলাই, ১৯২৭ (১৮ আষাঢ় রাত্রি দেড় ঘটিকায় সন ১৩৩৪) যখন তাঁর বয়স ৬৫ বৎসর। 'নাচঘর' পত্রিকায় তাঁর মৃত্যুতে

---

১৭. ১৮. কালিকলম, ফাল্গুন ১৩৩৪—'ক্ষীরোদপ্রসাদ' স্মৃতিকথা—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

১৯. নাচঘর ১৫ই ফাল্গুন।

২০. নাচঘর ১৩৩৪ শ্রাবণ।

শোকপ্রকাশ করা হয় এই বলে—'পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদনের অন্তর্ধান যে বাংলাদেশের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর সে কথা বাংলা আজ না বুঝুক এরপর হাহাকার করবে।' এ আক্ষেপের কারণ ছিল। তখনকার দিনের চলতি রঙ্গালয়গুলির সঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদের কোন না কোন ভাবে একদিন যোগ ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যু সংবাদে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাদের একদিনের অভিনয় বন্ধ রাখলে মাত্র একটি রঙ্গালয়। 'নাট্যমন্দির' ছাড়া কেউই একদিনের অভিনয় বন্ধ রাখেনি। কৃতজ্ঞতা বটে!'[২১]

দুঃখের কথা ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতিভার যোগ্যসমাদর আমরা আজও করতে পারি নি। কিন্তু নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ছিলেন এর বিপরীত, কারো মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণ দেখলে তার যথাযোগ্য সমাদার না করা পর্যন্ত তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন।

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তার রোগশয্যায় বালিশের নীচে তাঁর অন্তিমদিনের একটি কবিতাও পাওয়া গেছে।

গিরিশচন্দ্রের পর ক্ষীরোদপ্রসাদই একমাত্র নাট্যকার যাঁর প্রতিভার আলোয় এবং সৃষ্টির অজস্রতায় বাংলা মধ্যযুগের রঙ্গমঞ্চ আলোকিত হয়ে উঠেছিল। অবশ্য কিছুপরেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সে আলোর দীপ্তি আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষীরোদপ্রসাদের দীপ্তি একটুকু ম্লান হয়নি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যুর পর ক্ষীরোদপ্রসাদই ছিলেন নাট্যকাররূপে একছত্র সম্রাট 'শিবরাত্রের সলতে'। কিন্তু অদৃষ্টের নির্দেশে বাংলা রঙ্গমঞ্চ সে প্রতিভার আলো থেকে বঞ্চিত হল অকস্মাৎ।

।। নাট্য প্রবাহ পরিচিতি ।।

বিজ্ঞানের ছাত্র, বি. এ. পরীক্ষার তিন বৎসর পূর্বে লিখলেন 'আখ্যায়িকা' 'রাজনৈতিক সন্ন্যাসী'। রাজনৈতিক কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্বদেশী আন্দোলন প্রসূত প্রবল দেশাত্মবোধের রাজনীতিতে যিনি পরোক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়বেন তাঁর নাটকের মাধ্যমে তার ই ইঙ্গিতবাহী আখ্যায়িকা 'রাজনৈতিক সন্ন্যাসী'। ছাত্রজীবন থেকে কর্মজীবন শুরু চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে। সংস্কৃতির পীঠস্থান কোলকাতা সম্ভবত হাতছানি দিয়ে ডাকছিল অনাগত ভবিষ্যতের কবি-নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদকে। কোলকাতা জেনারেল এসেমব্লীজ অধুনা স্কটিসচার্চ কলেজে এ পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে যোগদান ১৮৯২ সালে।

সাহিত্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রথম আত্মপ্রকাশ কবিতার ডালি সাজিয়ে। প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'হরিনাম'। এরপর একে একে 'কে তুমি' ও 'প্রতাপ' কবিতা। ভনিতায় 'শ্রীকাল' ছদ্মনাম। পরিবারের অন্যান্য সবাই-এর তুলনায় গায়ের রঙ

---

২১. নাচঘর ১৩৩৪ আষাঢ়।

কিঞ্চিৎ কালো বলে ডাক নাম ছিল 'কালো'। ছদ্মনাম 'শ্রীকাল' এর উৎপত্তি অনুমান করতে কষ্ট না হওয়ারই কথা। অবশ্য পরে 'প্রসাদ' সংক্ষিপ্ত নামে তার একটি কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়।[১] কবিতা থেকে গদ্যজগতে বিচরণ 'গৃহবাসীরপত্র' লিখে। সমসাময়িক 'বিভা' পত্রিকায় সে রচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

এরপর কর্মজীবনের তন্ময়তা। কৃত্রিম সোনা তৈরির জন্য একাগ্র সাধনা ও ও লাইমোডাইন প্রস্তুতকরণের সন্ধানে সিদ্ধিলাভ। তারপর ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক ক্ষীরোদপ্রসাদের অবলুপ্তি আর নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক ক্ষীরোদপ্রসাদের আত্মপ্রকাশ।

বিশেষ করে একটি পাশ্চাত্ত্য প্রভাবপুষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার মধ্যে পরাধীন দেশে নিশ্চয়ই বিশেষ বাধ্যবাধকতা ছিল—বিধিনিষেধ থাকাও অসম্ভব ব্যাপার নয়। তাই ক্ষীরোদপ্রসাদের কর্মজীবনে রচিত নাটকগুলি সম্বন্ধে পৃথকভাবে তাঁর জীবনীকেন্দ্রিক তথ্যাভিত্তিক আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছি।

জেনারেল এসেম্ব্লিজ-এ অধ্যাপনাকালীন প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনায় হাত দেন নাট্যকার। ১৮৯৪ ২রা মে তাঁর নিজস্ব চিহ্নিত 'দৃশ্যকাব্য ফুলশয্যা'র আত্মপ্রকাশ। চাকুরীজীবনে প্রথম প্রথম যথেষ্ট চেষ্টা করেও তিনি রঙ্গালয়ের দরজা খোলা পান নি। কোন বড় চলতি রঙ্গালয়ের মালিকই তাকে কলকে দিতে রাজী হন নি। অবশেষে তাঁর কপাল ফিরল। এমারেল্ড থিয়েটার অত্যন্ত অচল অবস্থায় পড়ে তার 'ফুলশয্যা' নামে একখানি নাটক গ্রহণ করতে রাজী হল। কিন্তু তবুও নাট্যকার-রূপে ক্ষীরোদপ্রসাদ জাতে উঠতে পারলেন না। এমারেল্ড থিয়েটারও বাঁচল না।'[২]

প্রথমে শ্রীমধুসূদনের অংকিত পথে তাঁর পদযাত্রা। আনুপূর্বিক অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা হল প্রথম 'দৃশ্যকাব্য'। কাহিনী আশ্রয়ের জন্যে ইতিহাসের পাতা ওলটালেন। চরিত্র সংগ্রহ করা হল ইতিহাসের পাতা থেকে—কিন্তু সামগ্রিক চরিত্রে নয় শুধুমাত্র নামটুকু—পৃথিরাজ ও সঙ্গরাজ উভয়ের ভ্রাতৃবিরোধ ও পরিণামে তাদের মিলনই মূল উপজীব্য। এককথায় ইতিহাসআশ্রয়ী, কিন্তু রোমান্টিক। রোমান্সের পথে সূচনা থেকেই তাঁর পদচারণা, নামকরণ লক্ষ্য করলেই তা অনুধাবন করা যাবে। বিজ্ঞানের অধ্যাপকের নাট্যসাহিত্যের প্রতি প্রবণতার সূত্রপাত এই নাটক রচনার প্রসঙ্গ নিয়ে। উচ্চ কবিত্বপূর্ণ নাটক 'ফুলশয্যা' রচনার ঘটনা বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হবে। (জন্মভূমি লিখিয়াছিলেন এরূপ উচ্চকবিত্বপূর্ণ বাংলা নাটকের অভিনয় রঙ্গমঞ্চে অনেক দিন হয় নাই)। দুবছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই আর এক নূতন রসের নাটক উপহার

১. ভারতবর্ষ কার্ত্তিক ১৩২৬-এ প্রকাশিত—'হাজিরা' নামে।

২. যাঁদের দেখেছি ঃ হেমেন্দ্রকুমার রায়।

দিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ। নাম—'প্রেমাঞ্জলি', চিহ্নিত 'পৌরাণিক নাটক' বলে। নাটক প্রকাশের তারিখ হচ্ছে ১৮৯৬ (১৮ই জুলাই)। 'পৌরাণিক নাটকের' মোড়কে পুরাণ কিন্তু স্বতঃ উৎসারিত নয়। নাট্যকারের মানস প্রস্তুতির বিবরণ তাঁর নিজেরই স্বীকারোক্তি-তে—'বাংলা নাটকে নাচ না থাকলে নাটকত্ব হয় না। তাই 'নারদকে' মনের সুখে বাঁদর নাচাইয়াছি।' এই নাট্যকাব্য রচনার প্রেরণা ও উদ্দেশ্য থেকে একটা কথা পরিষ্কার, পৌরাণিক নাটক রচনার মন নিয়ে কি নাট্যকার লেখনী ধারণ করেছিলেন? নিশ্চয়ই নয়। লঘু রঙ্গরসিকতার মাধ্যমে সাধারণের বাহবা পাবার প্রবণতাই এর থেকে লক্ষ্যণীয়। বিষয়বস্তু মহাভারত শান্তিপর্ব সুতরাং নিঃসন্দেহে পুরণাশ্রয়ী, কিন্তু আসলে প্রেরণা ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পৌরাণিক নাটকের পরিচিতির অবলুপ্তি—স্বেচ্ছাকৃত রোমান্টিক রূপের মধ্যে। তবে এ নাটক পৌরাণিক নাটকের পর্যায়ে উন্নীত না হলেও এ নাটকে নূতন যুগের মানবতা-বোধের মূল্যায়ন যে সূচিত হয়েছে একথা বলা চলে।

'প্রেমাঞ্জলি'তে নারদকে বাঁদর নাচ নাচিয়ে যে রঙ্গ ব্যঙ্গ ও কৌতুক-প্রিয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন নাট্যকার সে পরিচয়ের রেশ কিন্তু তখনও মিলায় নি। প্রেমাঞ্জলির অব্যবহিত পরেই লেখা হল একটি রঙ্গন্যাস—'কবিকাননিকা' (১৮৯৬)।

নাট্যকার তখনও রঙ্গব্যঙ্গ ও কৌতুকের জগতেই বিরাজ করছেন। তারই প্রত্যাশিত ফলশ্রুতি অভিনব মঞ্চসফল রঙ্গনাট্য 'আলিবাবা', প্রেমাঞ্জলি ও কবিকাননিকা রচনার বৎসরকালের মধ্যে।

মঞ্চসফল নাটকগুলির অন্যতম নাটক যে আলিবাবা তা পূর্বেই বলা হয়েছে। ভরতচন্দ্র বসু কর্তৃক অনূদিত অমৃতলাল বসুর ইংরাজী রচনা থেকে নাটকটির মঞ্চসাফল্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। "আলিবাবা ছিল তার আর একটি বিজয় বৈজয়ন্তী। অমরেন্দ্রনাথ পরিচালিত ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে জীবনরসে অনুজীবিত হয়ে এই নাটকখানি বাঙলার ভিতরে ও বাহিরে সব স্থানেই অনেকদিন ধরে সাধারণের বিশেষ প্রীতি অর্জন করেছে। যে কোন অবৈতনিক সখের দল শুরুতেই লাগিয়ে দিত আলিবাবার অভিনয়! আলিবাবার গান, মর্জিনার ঘাঘরা এবং আবদালার কৌতুক নাট্যঅভিধানের প্রবাদবচন হয়ে দাঁড়াল।"[৩]

আলিবাবা প্রকাশিত হয় ১৩০৪ (ইংরাজী ১৮৯৭) সালে। ক্লাসিক থিয়েটারের পরিচালক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত নেমেছিলেন হোসেনের ভূমিকায়। নাট্যকারের রঙ্গালয়ের সঙ্গে প্রথম সংযোগ আলিবাবা নাটকের মাধ্যমে। মঞ্চের চাহিদা ও দর্শকবৃন্দের রুচির কাছে নাট্যকারের এই প্রথম আত্মসমর্পন। তাই মাঞ্চাভিনয়ের দিক দিয়ে কাহিনী নির্বাচন, ঘটনা সংস্থাপন এবং রঙ্গনাট্যটির রূপায়ণ সাফল্যের গৌরবে অভিনন্দিত। রঙ্গমঞ্চে নাটকটির সাফল্যের প্রমান-এর বেশ কয়েকটি গানের

৩. নাচঘর শ্রাবণ—১৩৩৪।

বহুল প্রচার। 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল, বাজে কাজে মিনসেকে আর যেতে দেবো না, আয় বাঁদী তুই বেগম হবি,' পাড়ায় পাড়ায় বাড়ী বাড়ী ছেলেদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। গানের প্রকারভেদগত বৈশিষ্ট্যও ছিল। নিধুবাবুর টপ্পা ও ঠুংরির চালের গান ও দেহতত্ত্বের গানও ছিল। যেমন 'লেও সাকী দেও ভর পেয়ালা'। কি শহর কি পল্লী অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে এইগুলি বারবার সুরেলা কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ত। নাট্যকারের রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে পূর্বে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না বলে 'আলিবাবা' নাটকটিকে মঞ্চের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন ও পরিবর্জন এর প্রয়োজন অনুধাবিত হয়েছিল। তারই ফলস্বরূপ নাটকটির কয়েকটি গান লিখে দেন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। সুতরাং এটা অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে ক্ষীরোদপ্রসাদের জনপ্রিয়তার মূলে ছিল প্রয়োগকর্তাদের পরোক্ষ হস্তক্ষেপ বা প্রভাব। নাট্যসম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী ও অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখ থেকে শোনা গিয়েছিল যে আলিবাবার দু' একটি গান এবং দু' চারটি সংলাপ প্রয়োগকর্তা অমরেন্দ্র দত্ত কৃত। অবিশ্বাস করার হেতু নেই। কারণ ক্ষীরোদপ্রসাদের সুক্ষ্ম কবিমন (তখন পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ব্যতিরেকে) এই ধরনের স্থূল রসিকতা ও গ্যালারী ভোলাইবার এই উপকরণ যোগাইতে পারিত কিনা সন্দেহ।"[৪] অমরেন্দ্রচন্দ্র দত্তের গ্রন্থাবলীতে অমরেন্দ্র দত্তের নিজের নাটক ছাড়াও আলিবাবার গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছিল। নাচঘর পত্রিকার সম্পাদকীয় অংশের বিভিন্ন স্থান থেকে জানা যায় যে আলিবাবার অভিনয় প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্যের নজীর রেখেছিল—'আলিবাবার অভিনয় ছিল চিরনূতন। নাটকের মধ্যে তার ভাষার প্রয়োগ কাব্যের চেয়ে মধুর, সঙ্গীতের মতই শ্রবণ সুখকর।'

ইংরাজী অপেরা শ্রেণীভুক্ত নাটকাটির মূল আকর্ষণ হাস্যচটুল নৃত্যগীত। আলিবাবা আরব্য পারস্যের রূপকথা-উপজীব্য—সেই হিসাবে গিরিশচন্দ্রের অনুবর্তী।'[৫] এ নাটকাটির আবেদন মূলতঃ গল্প ও নাচগান। নাট্যকার দর্শকবৃন্দের মনের এই কথাটির সন্ধান ইতিমধ্যে পেয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের রঙ্গালয়ের দর্শকবৃন্দ নাটক অপেক্ষা নাচগান বেশী ভালবাসেন এবং এইসব নাটকে নাচগানের প্রাচুর্য্য থাকাতে রঙ্গমঞ্চে ইহাদের সমাদরের অভাব হয় নাই। আলিবাবা ও কিন্নরীর সাফল্যই এর প্রমাণ। 'প্রেমাঞ্জলির ভূমিকাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে—'বাংলা নাটকে নাচ না থাকিলে নাটকত্ব হয় না। তাই মনের সুখে নারদকে বাঁদর নাচ নাচাইয়াছি।' রহস্যময় কাহিনী রঙ্গরসের উচ্ছল স্রোতে নাচিতে

নাচিতে চলিয়াছে। রোমান্স, কৌতুক এবং Adventure-এর বিচিত্র সমাবেশে অতিশয় উপাদেয় ও চিত্তাকর্ষক। রঙ্গব্যঙ্গ ও নৃত্যগীতই নাটকের প্রাণরস।[৬]

আলিবাবার অভিনয়সাফল্যের কথা সমসাময়িক নাট্য-পত্রিকাগুলিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে গেছে। সেগুলি আমাদের আলোচ্য বিষয়সূচীর অন্তর্গত নয়। তবুও আলিবাবার অভিনয়ে, রূপসজ্জায় নিত্যনূতন যে সজীবতার স্পর্শ পাওয়া যেত—একটি সংবাদকণিকা থেকে তা পরিষ্কার। নাচঘর ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় লিখছে—আলিবাবার বাবামোস্তাফার ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ীর রূপসজ্জার চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করার মত। তার কণ্ঠস্বরের অভিনবত্বও বিশেষত্বমণ্ডিত······।

রঙ্গব্যঙ্গের পরিধির মধ্যে তখনও ঘুরছেন নাট্যকার। সাধারণ লঘুবিষয়বস্তুকেই নাট্য উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে সন্তুষ্ট থাকছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ। তাই রঙ্গনাট্য প্রমোদরঞ্জন এর অবতারণা ১৩০৫ সালে (১৯শে অক্টোবর ১৮৯৮)। কিন্তু রঙ্গব্যঙ্গের ভাব থাকলেও রঙ্গ-সর্বস্ব প্রহসন নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই এর বক্তব্য। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর অবতারণা সরাসরি নয়, রূপকের মাধ্যমে। তথ্যবাদী ক্ষীরোদপ্রসাদের পক্ষে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম পরিচয় লক্ষ্য করার মত। তবে বস্তুবাদীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই নাট্যরচনার প্রয়াস। আদর্শবাদীর দৃষ্টি এতে নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রমোদরঞ্জনের মধ্যেও হিন্দু দর্শনবাদ, তত্ত্বকথা ইত্যাদির সন্ধান মিলবে। পরবর্তী অনেকগুলি নাটকেই এই প্রয়াস লক্ষ্য করা যাবে। যেখানে চিত্তের স্বাধীনতা নেই সাম্যমৈত্রীর ভাব নেই সেখানে কি শুধু পার্থিব তীর্থদর্শনেই আত্মার মুক্তি হবে? রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়ে প্রমোদরঞ্জন' গীতিনাটক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।

কবি নরেন্দ্রদেবের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়—'প্রমোদরঞ্জনের অভিনয় মন্দ জমে নি। যে খবরটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সেটি হল নাটকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রয়োগ।' নাটকে রবীন্দ্রনাথের রচিত ক'টি গান বোধ করি ক্ষীরোদপ্রসাদই সর্ব-প্রথম নাট্যকার যিনি—সাহসের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন।'[৭] এ যুগেও আমরা লক্ষ্য করেছি রবীন্দ্রসঙ্গীতের বহুল প্রচার সম্ভব হয়েছে যখনই রূপালী পর্দা বা মঞ্চের তারকাদের কণ্ঠে সে গান উচ্চারিত হয়েছে। তার সে উচ্চারণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত এককণ্ঠ থেকে অন্যকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের আবেগে।

প্রমোদরঞ্জনেরও একটি সুপ্রযুক্ত গান (রবীন্দ্রনাথের)—'আমার মনটি করিয়া চুরি এই আসি বলে গিয়েছিলে চলে এতদিনে এলে ফিরি' রঙ্গালয় থেকেই সেদিন সর্বসাধারণের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল।

গীতিনাট্য সে সময় লেখা হল কিন্তু রঙ্গালয়গুলির থেকে গীতিনাট্যাভিনয়ের অভিনয়ের তেমন উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়নি। ১৩ই চৈত্র ১৩৩১ নাচঘর-এর সংবাদে

প্রকাশ—'মিনার্ভায় শুনছি পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের জনপ্রিয় গীতিনাট্য প্রমোদ-রঞ্জন-এর পুনরাভিনয়ের আয়োজন করছেন। মিনার্ভাই এখন একমাত্র থিয়েটার যেখানে এখনও গীতনাট্যের অভিনয় দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ষ্টার ও মনোমোহন নাট্যমন্দিরের ঔদাসীন্য ও কার্পণ্যেরও সমালোচনা করা হয়েছিল। কিন্তু প্রমোদরঞ্জন ষ্টার থিয়েটারেও অভিনীত হয়। নাট্যকারের স্বদেশপ্রীতি ও দেশাত্মবোধের যে অংকুর থেকে বীজ ও পরে মহীরুহের আত্মপ্রকাশ তার প্রথম পরিচয় প্রমোদরঞ্জনে। দেশে প্রকৃত দেশপ্রেমিক মানুষের তখন অভাব। নাট্যকার মানুষের মত মানুষের আবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ। 'দে মা একটা মানুষ দে'। নাট্যকারের এই মানুষ খোঁজার অনিবার্য ফলশ্রুতি স্বদেশী আন্দোলনের অগ্রদূত 'প্রতাপাদিত্য' নাট্যরচনা ও তার যোগ্য অভিনয়ের আয়োজন। দেশে কি মানুষ আছে? কবির অন্তর্ব্যথা এবং তাঁর বহুবর্ষব্যাপী মর্মকাতরতা সত্য সত্যই দেশে মানুষ এনে দিয়েছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদ নিজেই বলেছিলেন (দেশবন্ধু স্বীকৃতি পাওয়ার পর) 'মানুষ চেয়েছিলুম, মানুষের মত মানুষ এসেছে।'

রঙ্গব্যঙ্গের জগৎ থেকে একটু একটু করে গভীর ও গম্ভীর বিষয়বস্তুর দিকে ঝুঁকছিলেন নাট্যকার তার আভাষ দেবার চেষ্টা করেছি প্রমোদরঞ্জনের আলোচনায়। 'রঙ্গব্যঙ্গের ভাব থাকলেও রঙ্গসর্বস্ব প্রহসন নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই এর বক্তব্য।··· অবতারণা সরাসরি নয়—রূপকের মাধ্যমে।' প্রমোদরঞ্জনের পরবর্তী নাটক—নাট্যকাব্য কুমারী ১৩০৫ (ইং ১৮৯৯)। প্রথম অভিনীত রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে। বিষয়বস্তু অপেক্ষাকৃত গুরুগম্ভীর। হিন্দু সমাজের কুসংস্কার, জাত্যাভিমান, প্রায়শ্চিত্ত বিধান ও তদ্দ্বারা সামাজিক অনিষ্টসাধন ইত্যাদি বিষয় উপজীব্য। পতঞ্জলির কিছু কিছু মতবাদের প্রভাবও এতে মিলবে। ক্ষীরোদপ্রসাদ সামাজিক নাটক লেখেননি, সমস্যামূলক সামাজিক নাটক না হলেও এই নাটকটি রোমান্টিক-ধর্মী। তত্ত্ব ও সমস্যার জটিলতায় বিভ্রান্ত রসস্ফূর্তিহীন নাটক বলেই হয়তো বা এর বহুল অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায় না। গত শতাব্দীতেই মহাত্মা গান্ধী অচ্ছুত বা অস্পৃশ্যদের পক্ষাবলম্বন করার আগেই তিনি 'কুমারী' নাটকে সেই সমস্যার সমাধান করেছিলেন।

আবার সেই গীতিনাট্যের পরিধির মধ্যে অনুবর্তন। 'জুলিয়া' গীতিনাট্য লেখা হল ১৩০৬ সালে ইংরাজী ২৪শে জানুয়ারি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে। মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় নাটকটি ১৬ই পৌষ ১৩০৬ সালে। মাত্র তিনবছর আগেকার 'আলিবাবা' গীতিনাট্যের সাফল্যের রেশ তখনও অম্লান। অভিনয়ও অব্যাহত। যতদূর মনে হয় 'জুলিয়া' 'আলিবাবা'র সাফল্যের প্রেরণা-প্রসূত নাট্যাবদান। কাহিনী মৌলিক নয়, আলিবাবার কাহিনীর মত আরব-পারস্য-উপকথাভিত্তিক। আদর্শবাদ এ নাটকের অন্যতম উপজীব্য। বাগদাদের

স্বনামধন্য কালিফ—ন্যায়পরায়ন সত্যনিষ্ঠ হারুণ-অল-রসিদের অনুপম মহত্ব বিষয়ক একটি আখ্যান। কালিফের অসাধারণ উদারতার নিদর্শন মেলে নাটকটিতে। নাটকটি বহুল অভিনয়ে ধন্য হওয়ার সুযোগ পায় নি।

পরবর্তী নাটক 'বভ্রুবাহন' নাট্যকাব্য। নাট্যকার এখানেও সজ্ঞানে কবি। গীতিনাট্য থেকে কাব্যনাট্যে উত্তরণ নয়, অনুবর্তন। একই পরিধি, আরব্য পারস্য উপকথা, ইতিহাসআশ্রয়ী কাহিনী আর পৌরাণিক কাহিনীর পটভূমিকায় কিছু কিছু স্বেচ্ছাকৃত রোমান্স সৃষ্টি। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের পরিমণ্ডল থেকে বাইরে আসতে পারেন নি তখনও ক্ষীরোদপ্রসাদ। মহাভারতের সুপরিচিত অর্জুন চিত্রাঙ্গদা ও বভ্রুবাহন কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি রচিত হয়েছিল। চরিত্রগুলি পৌরাণিক। সুতরাং অলৌকিকতার অবাধ ছাড়পত্র। অলৌকিকতায় ভারাক্রান্ত চরিত্রগুলি সার্থক অভিনয়ের পথে অন্তরায় হয়ে থাকবে। তাই ক্ষীরোদপ্রসাদের বহুল অভিনীত নাটকের তালিকায় নাটকটি স্থান করে নিতে পারেনি। 'বভ্রুবাহন' পাদপ্রদীপের আলোকে আসে সর্বপ্রথম রয়েলবেঙ্গল থিয়েটারে। কিছুকাল পরেই তিনি প্রধান নাট্যকার রূপে ষ্টার রঙ্গালয়ে যোগ দেবার সুযোগ পান এবং ষ্টারে অভিনয়ের জন্যে একে একে উপহার দেন 'সাবিত্রী', 'সপ্তম প্রতিমা', 'বেদৌরা', 'প্রতাপাদিত্য' ইত্যাদি নাটক। একই সময়ে শ্রীমদ্‌ভগবদগীতার ওপর রচনা লিখছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ। ধর্মভাবের আবেশে কবিমন তখন অনেকটা স্থিতিশীল ধর্মীয় ভাব জগতে। প্রেমাঞ্জলি রচনার সময় যে হালকা মন ছিল, রঙ্গব্যঙ্গ জগতের লঘুচিত্তের যে উচ্চকিত উচ্ছ্বাস ছিল তা বহুলাংশে স্তিমিত। তাই স্বাভাবিকতার পথেই পৌরাণিক নাটক 'সাবিত্রী'র আত্মপ্রকাশ ১৩০৯ সালে (৪ঠা অক্টোবর, ১৯০২) কবি নাট্যকার হঠাৎ নিজের পাণ্ডিত্যের নামাবলী গায়ে নেমে পড়লেন আসরে। 'সাবিত্রী' নাটকে নাট্যকারের উপস্থিতি যত না গন্য, পণ্ডিতপ্রবরের সজাগ অবস্থিতি ঠিক ততটা প্রকট। সংস্কৃত পাণ্ডিত্য কণ্টকিত নাটকটির ভাষা ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যান্য নাটকের মত সরল ও অনাড়ম্বর নয়। তবে এরমধ্যেও প্রকৃতি বর্ণনায় কবি ক্ষীরোদপ্রসাদের উপস্থিতি সুস্পষ্ট। প্রথম অভিনয় ষ্টার থিয়েটারে। পৌরাণিক পরিমণ্ডল থেকে এবার সাময়িক অবসর যাপন। অলৌকিক স্বপ্নবৃত্তান্তকে মূল উপজীব্য করে ১৩০৯ সালে (১৩ই ডিসেম্বর ১৯০২) ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখলেন, 'সপ্তম প্রতিমা।' প্রথম অভিনয় ষ্টারে। পরিবর্তিত নাম 'দেলিতে দুনিয়া'। প্রায় ছ'বছর পরে (১৫ই জানুয়ারি ১৯০৯) এর অভিনয়ের পুনঃপ্রয়োজন কোহিনুর থিয়েটারে। কল্পনাপ্রবণ নাট্যকার এ নাটকে কবির সঙ্গে যেন হাত ধরাধরি করে চলেছেন। বহুল অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়নি নাটকটির।

আবার সেই আরব্য উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে লেখা নাটক।—পরের বছর ১৯০৩ (১৫ই জানুয়ারি) সালে লেখা হল 'বেদৌরা' গীতিনাট্য। প্রথম

অভিনয়ের তারিখ ২৫শে ডিসেম্বর ১৯০৩ সাল। অভিনয়ের আসর ষ্টার মঞ্চ। আবার গীতিনাট্য। মঞ্চের চাহিদা ছিল না আগেই বলেছি। তবে কেন এই নাট্যপ্রয়াস? নাট্যপ্রয়াস সম্পূর্ণ মনের তাগিদে, মঞ্চের তাগিদে নয়। কারণ বাঁধা মাইনের নিশ্চয়তা ছিল যাঁর, মঞ্চের গোলামীর প্রশ্ন তাঁর কাছে অবাস্তব। ঠিক এই কারণে নাট্যকারের (চাকুরী) কর্মজীবনের নাট্যসাধনার পৃথক মূল্যায়নের কথা বলেছি। এই গীতিনাট্য রোমাণ্টিক লক্ষণাত্মক, অবলম্বন আরব্য উপন্যাসের কাহিনী। আগেই বলা হয়েছে সাবিত্রী নাটক রচনার পর পৌরাণিক পরিমণ্ডল থেকে তাঁর সাময়িক অবসর যাপন। উদ্ভট এবং অসম্ভব ঘটনাশ্রয়ী রূপকথার সামিল কাহিনীর দিকে নাট্যকারের আগ্রহ সুস্পষ্ট। 'বেদৌরা' নাটকটি তাই স্বাভাবিকভাবে অলৌকিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রঙ্গনাট্য, নাট্যকাব্য, গীতিনাট্য এবং পৌরাণিক নাটক এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও ক্ষীরোদপ্রসাদের অশান্ত মনের স্ফূর্তির অবকাশ মেলে নি—'হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে'। ঐতিহাসিক নাটক না লিখতে পারলে যেন কিছুই লেখা হল না। 'আলিবাবা', 'প্রমোদরঞ্জন' প্রভৃতি হালকারসের নাটক থেকে তাই নাট্যকারের উত্তরণ 'প্রতাপাদিত্যে'। রচনাকাল ২৯শে আগষ্ট ১৯০৩ (ভাদ্র ঃ ১৩১০)।

দেশে স্বদেশী আন্দোলনের যে হাওয়া বইছিল এই নাট্যপ্রয়াস সেই হাওয়ার বেগকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলছিল। 'বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতেই বাংলার ঐতিহাসিক বীর চরিত্র অবলম্বন করিয়া নাটক রচনার যে প্রেরণা দেখা দিয়েছিল 'প্রতাপাদিত্য' নাটক ক্ষীরোদপ্রসাদের সেই বিষয়ক সর্বপ্রথম প্রয়াস। বিশবৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ একই বিষয়বস্তু অবলম্বন করে লেখেন উপন্যাস 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট'—'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক এর অনেক পরে রচিত। প্রতাপাদিত্য নাটকের সর্বপ্রথম নাটকরূপ দেবার কৃতিত্ব ক্ষীরোদপ্রসাদের। কিংবদন্তীই প্রধান উপজীব্য। ঐতিহাসিক তথ্য এখনও পর্যন্ত সুধী-সমাজে অজ্ঞাত। ঐতিহাসিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর।[৯] ক্ষীরোদপ্রসাদের এই বিশেষ নাটকটি রচনার পিছনে যে সম্ভাব্য প্রেরণা ছিল এবং সেই প্রেরণার উদ্দাম স্রোতে ঐতিহাসিক মূল্যবোধ যে ভেসে গিয়েছিল উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকেই তা স্পষ্ট। তাছাড়া ঐতিহাসিক তথ্য তখনও সুধী সমাজে অজ্ঞাত ছিল। শুধু অজ্ঞাতই নয়, নীরস তথ্য দেশবাসীর মনে সাড়া জানাতে অক্ষম ছিল—ঘুমন্ত দেশবাসীকে সজোরে নাড়া দিয়ে দেশের দুরবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার সাধ্যও তাঁর ছিল না। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর 'বঙ্গীয় ভৌমিকগণের স্বাধীনতা সমর' প্রসঙ্গে লিখিত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে কথাটি সহজেই অনুধাবন করা যায়। নিখিল নাথ রায়ের উদ্যম 'প্রতাপাদিত্য' চরিত্র সৃষ্টি কিন্তু তার আগেই বাংলাদেশ স্বদেশী আন্দোলনপ্রসূত প্রবল দেশাত্ম-বোধের বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। দক্ষশিল্পী ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য নাটকে

৮. যাদের দেখেছি—ক্ষীরোদপ্রসাদ—হেকেন্দ্রকুমার রায়।
৯. বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

প্রতাপাদিত্য তখন স্বাধীন প্রয়াসের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রতাপাদিত্য তখন বাংলাদেশের হৃদয়কে এমনি অধিকার করিয়াছিল তথায় এমনি ভাবের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিল যে ঐতিহাসিক বিচার রূপ ঐরাবতের সাধ্য ছিল না সেই স্রোতের সম্মুখীন হয়।'[১০]

প্রমোদরঞ্জনে এই স্বাদেশিকতার উন্মাদনার প্রছন্ন সূত্রপাত—'দে মা, একটা মানুষের মত মানুষ দে'। দেশে মুক্তি সংগ্রামের জন্য সংগ্রামীচেতনায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশে একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক-এর সন্ধান এবং সেই চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরম পাওয়া (দেশবন্ধুর আবির্ভাব)-এর মাঝখানে প্রতাপাদিত্য নাটক রচনার তাৎপর্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়। দেশাত্মবোধের প্রথম উন্মেষ এই নাটকে। এ নাটক প্রকারভেদ বিচারে যত না ঐতিহাসিক এই নাট্যরচনা এবং নাটকটির অভিনয় তার চেয়ে বেশী ঐতিহাসিক।

একটি উদ্ধৃতি ঃ—দেশকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয় এ নাটকেই তার পরিচয়। দেশে এক নূতন ভাবের বন্যা বয়ে গেল। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী—শ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারিলাম। আগ্রা প্রত্যাগত প্রতাপের উক্তি··· আগ্রার ঐশ্বর্যময়ী হেম অট্টালিকা, নন্দন-লাঞ্ছন অপসরাগার উদ্যান, কিছুতে কোন প্রলোভনে আমাকে যশোরের শ্যামসৌন্দর্য ভোলাতে পারে নি। মা বঙ্গভূমি। তোমার এই প্রণোন্মাদকর নামের ভিতরে এত মধুরতা। এমন কোমলতা, এরূপ ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য জড়ান আছে, তা ত জানতুম না। মা তোমাকে নমস্কার।'—বাংলার তৎকালীন জীবনে এক অনাস্বাদিত অনুভূতি বহন করে এনেছিল। স্বদেশিকতার স্রোতে ভাসমান এই ঐতিহাসিক চরিত্রটি তাই স্বাভাবিকভাবে ইতিহাসের অনুগামী হাওয়ার সুযোগ পায়নি। পরাধীন জাতির প্রাণে দেশাত্মবোধ ও মাতৃবন্দনার মন্ত্র উচ্চারণেই নাট্যকার মূলতঃ ব্রতী হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে নাট্যজগৎ থেকে সর্বপ্রথম সাড়া দিয়েছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ জাতীয় ভাবদ্যোতক নাটক 'প্রতাপাদিত্য' রচনা করে।

এই নাটক সৃষ্টির সময় পর্যন্ত নাট্যকারের মঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপন হয়নি। হওয়ার সুযোগও ছিল কম। কারণ তখনও তিনি জেনারেল এসেম্বিলিতে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত। কিন্তু তা সত্বেও স্বাদেশিকতায় অভিষিক্ত এই নাটকটির অভিনয় রীতিমত সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। অমৃতলাল বসুর ইংরাজী রচনা থেকে অনূদিত প্রবন্ধের উদ্ধৃতি ক্ষীরোদপ্রসাদের তিনচারখানি নাটক ভালোই অভিনন্দন পেয়েছিল। কিন্তু ১৯০৩ সালে ষ্টারে অভিনীত প্রতাপাদিত্য নাটকের প্রথম রজনীর পরবর্ত প্রভাতে তিনি নিজেকে নাট্যকারের যশে মণ্ডিত হতে দেখেছিলেন।'[১১]

---

১০. বিচিত্রা—১৩৩৪-৩৫—নলিনীকান্ত ভট্টশালী।

১১. নাচঘর ১৩৩৪ শ্রাবণ—ভরতকুমার বসু অনূদিত।

প্রথম পর্যায়ে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর অভিনয় শেষ হয় নি। নবপর্যায়ে বারবার এটির অভিনয় হতে দেখা গেছে বিভিন্ন মঞ্চে—মিনার্ভা, মনোমোহন থিয়েটার, এলফ্রেড, মিত্র আর্ট থিয়েটার, নাট্যমন্দির এবং ম্যাডান—কোন থিয়েটার থেকেই এর অভিনয় বাদ পড়েনি।

লব্ধ প্রতিষ্ঠ নট নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রথম আত্ম-প্রকাশের ইতিহাস সৃষ্টির মূলে এই 'প্রতাপাদিত্য' নাটক এবং এই নাটকের নাম ভূমিকা। এ ঘটনা ১৯২২ সালের ম্যাডান থিয়েটার ছেড়ে শিশিরকুমারের চলে যাওয়ার অব্যবহিত পরের ঘটনা।

নাট্যাচার্য শিশির কুমারের অভিনয় জীবনের সঙ্গে জড়িত থাকায় প্রতাপাদিত্য নাটকটি বিশেষ স্মরণীয়। দেশাত্মবোধক নাটক রচনায় অনুপ্রাণিত নাট্যকার এবার লেখার চেষ্টা করলেন কিছুটা মনস্তত্ত্বমূল নাটক রঘুবীর (১৩১০-১৯০৩)। কতটা সার্থক হলেন সে বিচারের সুযোগ মিলবে পরে। তবে এই মানসিক দ্বন্দ্বের ব্যাপারটা শিশরকুমারের 'রঘুবীর' ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার আগে কারুরই ঠিক চোখে পড়েনি। এ নাটকে হিংসা-অহিংসার চিরন্তন বিরোধের সংঘাত সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এ নাটকে যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় মেলে।

রঘুবীরের মধ্যে যথেষ্ট নাটকত্বের উপাদানও আছে। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের ওপর সর্বপ্রথম একে পাংক্তেয় করেছেন শিশিরকুমারই। রঘুবীর হচ্ছে একটি অদ্ভুত চরিত্র। আমাদের নাট্যসাহিত্যে এরূপ চরিত্র পূর্বে ছিল বলে স্মরণ হয় না। জন্ম তার ডাকাতের ঘরে, দেহের মধ্যে আছে তার দুর্দান্ত ভীল রক্ত। কিন্তু সে লালিত-পালিত হয়েছে ঋষিকল্প সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের কাছে। অহিংসাব্রতের পূজারী রঘুবীরের পৈশাচিক ভয়াবহ অত্যাচারের প্রতিবাদে কুম্ভকর্ণের মহাজাগরণ—এই আদর্শবাদ-দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ স্বদেশ প্রেমিক নাট্যকারের পক্ষে সহজগ্রাহ্য হবে এ অনুমান অসঙ্গত নয়। তাছাড়া প্রতাপাদিত্য নাটকে ঐতিহাসিক চরিত্র ভিত্তি করে ইতিহাসকথা-কাহিনী রচনার আমেজ নাট্যকার তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাই প্রতাপাদিত্য নাটকেরই অনুরূপ নিজের প্রয়োজনমত কল্পনাশ্রয়ী হয়ে অভিনব ঘটনা এবং চরিত্রের সমাবেশ করে তিনি রচনা করেছেন রঘুবীর। এ নাটকে তাই ইতিহাসের বিশ্বস্ত অনুবর্তন নেই। ঐতিহাসিক চরিত্রভিত্তিক কল্পিত কাহিনীর অন্যতম 'রঘুবীর'।' (অন্যান্য খাঁজাহান, আহেরিয়া এবং বঙ্গেরাঠোর।)[১২]

নাটকটির প্রথম অভিনয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে তখনকার একটি হ্যাণ্ডবিলের উদ্ধৃতি—সুপ্রসিদ্ধ ক্লাসিক থিয়েটারের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ও সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্তবাবু অমরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় আমাদের সবিশেষ সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং আপাততঃ আমাদের প্রথম অভিনয় রজনীতে ক্ষীরোদবাবুর নূতন পঞ্চাংক নাটক

১২. বাংলা নাটকের ইতিহাস : ডঃ অজিতকুমার ঘোষ

'রঘুবীর' পুস্তকে রঘুবীর-এর অংশ গ্রহণ করিয়া আমাদের যারপরনাই উৎসাহিত করিয়াছেন।[১৩]

এরপরেই ক্ষীরোদপ্রসাদের চাকরি ত্যাগ করার ঘটনা। এর অনেকগুলি কারণ সম্ভাব্যতার তালিকায় পড়ে। দেশাত্মবোধক নাটক 'প্রতাপাদিত্য' নাটকটির বহুল প্রচারের পর সম্ভবতঃ বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে ইউরোপিয়ান-পুষ্ট প্রতিষ্ঠান ছেড়ে আসতে হয়েছিল। তাছাড়া দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে একটা চাপা বিক্ষোভ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল।

এ ও সম্ভব যে নাট্যরচনার সুবিধার জন্য মঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্যে শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় তিনি চাকরিতে ইস্তাফা দিয়েছিলেন এবং নাট্যকারের জীবন বেছে নিয়েছিলেন।

মতান্তরে আলিবাবা প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি কয়েকটি নাটকের মঞ্চসাফল্যে অনুপ্রাণিত নাট্যকার অধ্যাপনাবৃত্তি ছেড়ে নাট্যসাহিত্য সৃষ্টি কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত নাট্যকার হিসাবে তখনকার দিনে ম্যাডান কোম্পানী থেকে তাকে পাঁচশত টাকা মাসিক বেতন দেওয়া হল।

আর একটি কারণের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর জীবনী শিরোনামায়—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে। 'যখন বুঝলুম যে নাটক লিখলে অধ্যাপনা করা চলবে না, তখন কাজ ছেড়ে দিলুম।'[১৪]

চাকরি ছাড়ার পর নাট্যকারের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ব্যাপারে ধীরে ধীরে পরিবর্তন লক্ষিত হতে লাগল। কখনও গীতিনাট্য কখনও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের গল্পাবলম্বনে লেখা নাটক এবং ঠিক তার পরেই পৌরাণিক কাহিনীনির্ভর নাট্য সৃষ্টির রেশ মেলাতে না মেলাতেই আবার ঐতিহাসিক নাটকের ধারাবাহিকতা।—এবং এই ঐতিহাসিক নাটকের অন্তরালে দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগরঞ্জিত দেশাত্মবোধক নাটক। রঘুবীর নাটক রচনার পর থেকে নাট্যকারের এই পদযাত্রার ইতিবৃত্ত তাঁর নাট্যসম্ভার বৈচিত্র্যের মধ্যে বিধৃত। রঘুবীরের অব্যবহিত পরের রচনা বৃন্দাবনবিলাস (৩১ জানুয়ারি, ১৯০৪) গীতিনাট্য। এরপর অন্যরসের নাটক রঞ্জাবতী (৪ অক্টোবর ১৯০৪) রচনার পর নাট্যকারের নাট্যজগৎ থেকে সাময়িক অবসর যাপন উপন্যাসের বিস্তৃত ক্ষেত্রে। তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি নারায়ণী (উপন্যাস) অগ্রহায়ণ ১৩১১, ইং ১৯০৪। পরবর্তী প্রয়াস পৌরাণিক বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে। উলুপী নাট্যরচনার কাল ১৩১৩ (১৫ই জুলাই ১৯০৬) পৌরাণিক নাটকের পরিমণ্ডল থেকে আবার ইতিহাসের পাতায় কাহিনী নির্বাচন

---

১৩. পুরানো হ্যাণ্ডবিল—শনিবার ২৯শে কার্তিক ১৩১০—রাত্রি ৯টার অভিনয় সম্বন্ধে।

১৪. কালিকলম ঃ ফাল্গুন ১৩০৪—ক্ষীরোদপ্রসাদ (স্মৃতিকথা) সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

করে দেশাত্মবোধের মগ্নচৈতন্যকে জাগ্রত করার ঐকান্তিক চেষ্টার প্রয়োগ। তাই ঐতিহাসিক নাটক 'পদ্মিনী'র (১৫ই নভেম্বর ১৯০৬) রচনাকালের দুই মাসের মধ্যেই আর এক ঐতিহাসিক জ্বলন্ত দেশপ্রেমের নাটক 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (৫ই জানুয়ারী, ১৯০৭)।

এই পর্বের উল্লিখিত সবকটি নাটকই স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতে দেখা গিয়েছে। কারণ তখন নাট্যকাররূপে তিনি স্টার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জড়িত। একটানা বহুরাত্রি 'প্রতাপাদিত্য' নাটক চলেছে, ফলে স্টারের বেশ অর্থাগম হয়েছিল। প্রতাপাদিত্যের পর অন্য কোন নাটক ভালো জমেনি, তাই স্টার পেছিয়ে পড়তে লাগল। ঠিক এই সময় মঞ্চস্থ হয় একের পর এক 'রঞ্জাবতী' 'উলূপী', 'পদ্মিনী' এবং 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৭)। শেষোক্ত নাটকটিতে অত্যাচারী ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে নাট্যকারের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ প্রথমে ইংরাজরাজের চোখে পড়েনি, চোখে পড়ে নাটকটি অনেকদিন অভিনীত হওয়ার পর। ১৯১১ সাল বৃটিশ রাজ্যের দমননীতি প্রচণ্ডরূপ ধারণ করল। বৃটিশ সিংহ নাট্যশালার উপর তার থাবা বসাল। সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী, দাদা ও দিদি, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, নন্দকুমার এর অভিনয় বন্ধ হল, ঐ সব পুস্তিকাগুলিও বাজেয়াপ্ত হল।'[১৫]

ঐতিহাসিক নাটক লেখার জন্যে নাট্যকারের মন প্রায় প্রস্তুত এবং নবপর্যায়ে সে প্রস্তুতির সূত্রপাত 'পদ্মিনী' নাটক রচনায় (১৫ নভেম্বর ১৯০৬)—এবং এই পর্বের ঐতিহাসিক বা ইতিহাস আশ্রয়ী নাটক রচনার সীমারেখা 'অশোক' নাট্যে। এই একটানা পরপর ছ'খানি ঐতিহাসিক নাটক রচনার মধ্যে (পদ্মিনী ১৫ই নভেম্বর ১৯০৬ পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, চাঁদবিবি, নন্দকুমার, দাদা ও দিদি এবং অশোক ২৫শে জুন ১৯০৮) বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় পরপর দুখানি ঐতিহাসিক নাটক পদ্মিনী (১৯০৬) এবং পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৭) রচনার পর বৈচিত্র্যের সন্ধানপিয়াসী নাট্যকারের বিষয়বস্তু নির্বাচনের প্রয়াস কাল্পনিক প্রেমমূলক কাহিনীর মধ্যে। তাই পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (৫ই জানুয়ারি ১৯০৭) ও চাঁদবিবি (২৪ আগষ্ট ১৯০৭)—দুখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনার মধ্যে নাট্যকারের বৈচিত্র্যের আস্বাদ গ্রহণ একটি কাল্পনিক প্রেমমূলক নাটকে যাতে রাক্ষস শৈলেশ্বরের প্রতি মানবী সর্বানীর ভালবাসা-করুণার সেতুবন্ধ দুটি হৃদয়ের মিলন[১৬] —এই বিষয়বস্তু উপজীব্য একটি নতুন স্বাদের রোমান্টিক নাটক রচনার মাধ্যমে। নাটকটির নাম রক্ষ ও রমনী (১৯০৭)।

চাঁদ-বিবি নাটক রচনার পর আবার সেই বৈচিত্র্যের সন্ধান। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১৯০৭ (বাংলা ১৩১৩) সাল ক্ষীরোদ-নাট্য-প্রবাহে জোয়ারের সাল। পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, রক্ষ ও রমণী ও চাঁদ বিবির সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক পত্রেও লিখে চলেছেন

---

১৫. অথনটঘটিত—সূত্রধার।

১৬. নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার—ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য।

একটি ধারাবাহিক নাটক—শিরী-ফরীদ (নাটিকা)। এটি তখন প্রকাশ হচ্ছিল ভারতী পত্রিকায় (বৈশাখ-ফাল্গুন ১৩১৩)।

'আলাদিন' নামে তার একখানি নাট্যগ্রন্থ (প্রকাশিত হয় ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলীর ১ম ভাগে) – লিখিত হয় এই সময়ে। (ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে দেখা যায় না) আলাদিনের কাহিনী নিয়ে রূপকথার সামিল নাটিকা লেখার নজীর এর আগে রেখে গেছেন গিরিশচন্দ্র। তবে সে নাটকে গিরিশ প্রতিভার চিহ্ন মাত্রও ছিল না। পূর্বেই বলা হয়েছে একটানা কয়েকটি ঐতিহাসিক নাট্যরচনার ফাঁকে রক্ষ ও রমণী, শিরী-ফরীদ এবং আলাদিন নাটিকা তিনটি রচিত হয়েছিল।

আলাদিনের পর আবার এক বৎসরের মধ্যে পরপর তিনটি ঐতিহাসিক নাটক—দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ নাট্যকারের দেশমাতৃকার পায়ে জ্বলন্ত দেশপ্রেমের শ্রদ্ধাঞ্জলি। নন্দকুমারের ফাঁসির ব্যাপারটি পুরোপুরি ঐতিহাসিক ব্যাপার এবং দেশাত্মবোধক সাহিত্য সৃষ্টির তালিকায় অবস্থিত। এ নাটকটি শেষ পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করে ইংরাজ রাজ ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। পরের নাটক 'দাদা ও দিদি' যদিও ঐতিহাসিক নাটক নয়—রঙ্গনাট্য, তবুও নাটকটিকে ঐতিহাসিক নাটকের বিকল্প বলে ধরে নেওয়া যায়। এতে চন্দ্রলোকের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ রূপক—আসলে পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ও নন্দকুমারের মধ্যেকার দেশপ্রেম দাদা ও দিদির মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে, অবশ্যই প্রকারগত বৈষম্য সত্ত্বেও ভাব ও বক্তব্যের দিক দিয়ে তিনখানি নাটককেই সগোত্র বলে চিহ্নিত করতে অসুবিধা হয় না।

দেশাত্মবোধক নাটকে উচ্ছ্বাসের অভাব থাকলে নাটক জমে না। সিরাজদ্দৌলার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'মীরকাশিম' নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 'মীরকাশিম প্রজাবৎসল ছিলেন—তিনি ইংরাজদের খেলার পুতুল হয়ে নবাবী করতে চাননি—ইংরাজদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলেন—তাঁদের সঙ্গে লড়েছিলেন, শেষ অবধি হৃতসর্বস্ব হয়ে যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। ইতিহাসের এইটুকু ভিত্তির ওপর তিনি নাটক রচনা করলেন। সেটা ১৯০৫ সাল। দেশ স্বদেশী আন্দোলনে মেতে উঠেছে। প্রতিরাত্রে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ। অনেকদিন এর অভিনয় চলল ঃ মিনার্ভা ফেঁপে উঠল। থিয়েটারের মালিকরা দেখলেন দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক নামাতে পারলে স্বদেশী আন্দোলনকে সহায়তা করা হবে, সঙ্গে সঙ্গে মুনাফা ঘরে আসবে। সে নাটকে যথাযথভাবে ইতিহাস অনুসরণ করলে চলবে না। তার মধ্যে যে দেশসেবক থাকবে তাকে প্লাটফরমু স্পীকার হতে হবে। উচ্ছ্বাসে নাটকখানি ভরা থাকবে, তবেই সে নাটক জমবে।'[১৭]

স্টারের জন্য রচিত পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ও নন্দকুমার—দুটি নাটকে এই উচ্ছ্বাস ও আবেগের তীব্রতা না থাকায় নাটক দুটি জমে নি এবং অভিনয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের দেশাত্মবোধক নাটক ছত্রপতি অভিনয়ের পর অনুপ্রাণিত

---

১৭. অথনটোদ্ঘাটিত—সূত্রধার।

মিনার্ভার কর্তৃপক্ষ ক্ষীরোদপ্রসাদের দ্ব্যর্থব্যঞ্জক রাজনৈতিক চুটকি 'দাদা ও দিদি' রঙ্গনাট্য হিসাবে মঞ্চস্থ করলেন। এই পর্যায়ের শেষ ঐতিহাসিক নাটক 'অশোক'। অশোক ঐতিহাসিক ব্যক্তি—এইটুকু মেনে নিয়ে কিংবদন্তী ও অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার চাকায় গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া নাটক 'অশোক' লেখার পর নাট্যকার বেশ কিছুদিন ইতিহাসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

আবার গীতিনাট্য রঙ্গনাট্যের প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতার প্রশ্রয়। অশোক (১৯০৮)-এর পরবর্তী নাটক ঠিক পরের মাসেই বাসন্তী গীতিনাট্য (৫ই জুলাই ১৯০৮)। স্বাভাবিক নিয়মে এরপর লেখনী ছাড়পত্র পেয়েছে পরপর বরুণা গীতিনাট্য (১৫ই জুলাই ১৯০৮), ভূতের বেগার রঙ্গনাট্য (২৮শে ডিসেম্বর ১৯০৮), সপ্তম প্রতিমার নব্যরূপায়ণ চার অঙ্কের নাটক 'দৌলতে দুনিয়া'—(এটি উপকথামূলক কাল্পনিক রোমান্টিক কমেডি—রঙ্গ ও গীতিনাট্যেরই প্রায় সমপর্যায়-ভুক্ত)। তারপর আবার এই পর্যায়ের নাট্যজগত থেকে সাময়িক অন্তর্ধান এবং অবতরণ গল্প ও পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যে। গল্পগ্রন্থ এবং পৌরাণিক আখ্যানের নাম—যথাক্রমে বিরামকুঞ্জ (গল্পলহরী—২০শে আগস্ট ১৯০৯) ও দুর্গা (৯ই অক্টোবর ১৯০৯)। এটির পর চিন্তাশীল নাট্যকারের নাট্যচিন্তা এবং সৃষ্ট নাটকের মঞ্চপ্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু মতামত চোখে পড়ে 'নাট্যমন্দির'-এর (১৩১৭ শ্রাবণ। ১৯১০ খৃঃ) পাতায়। প্রবন্ধের শিরোনামা ছিল 'রঙ্গালয়ের উন্নতি ও অবনতি'। কল্পনা, রোমান্স, উপকথার তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে নাট্যকার বাস্তব জগতের তীরে ভিড়ে অতীত ইতিহাসের দিকে তাকাবার প্রয়োজন রোধ করতে লাগলেন পরবর্তী কয়েকটি বিচিত্রস্বাদের নাটক রচনার ফাঁকে ফাঁকে। যেমন বাসন্তী, বরুণা, ভূতের বেগার, দৌলতে দুনিয়া, বিরামকুঞ্জ, দুর্গার পর বাঙ্গলার মসনদ—ঐতিহাসিক নাটক (১৩১৭ সাল—১৬ই জুলাই ১৯১০)।

ক্ষীরোদপ্রসাদ সময় পেলেই চলে যেতেন নিমতিতায়। সেখানে বিশ্রাম যাপনের সুযোগের সঙ্গে ছিল তার এক অতিরিক্ত আকর্ষণ। জমিদার মহেন্দ্রবাবু তার প্রায় প্রত্যেকটি বই কোলকাতার মতই রীতিমত খরচ করে মঞ্চস্থ করতেন। কোলকাতার যে থিয়েটারের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন সেখান থেকে খবর পাওয়া গেল সামনে দোলপূর্ণিমার জন্যে নাট্যকারকে একটি নাটক লিখে পাঠাতে হবে! তখন তিনি রীতিমত পেশাদার নাট্যকার। দোলযাত্রায় অভিনয়ের জন্য মাত্র দুদিনে লিখে ফেললেন—এক কাল্পনিক গীতিনাট্য—বাসন্তী।

বরুণার প্রথম অভিনয়ের তারিখ ২৭শে আষাঢ় ১৩১৫। এ কাহিনীর মধ্যেও রোমান্টিক পরিবেশে নাট্যকারের স্বচ্ছন্দ বিহারের পূর্ণ স্বাধীনতা 'ভূতের বেগার' রঙ্গনাট্যে, এতে নাট্যকারের সামাজিক নাটক-সৃষ্টির অপূর্ণতা পূরণের প্রতিশ্রুতি ও প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। এ নাটকে শিক্ষাবাণী প্রচারের ইচ্ছা নাট্যকার ঠিকমত লুকোতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। প্রহসনের মাধ্যমে অন্তর্বেদনার করুণ সুর

ধ্বনিত হয়েছে নিতাই-এর মুখে 'এখনো চিনতে পারো নি বাবু। এখানে থাকলে পারবে ও না। সেই কর্দমাক্ত কোমল মৃত্তিকার স্পর্শ না পেলে এ কুহকময় শহরে জ্ঞান ফিরবে না। সেই কেদার-বাহিনী নদীর স্নিগ্ধ জল চোখে না দিলে দৃষ্টি ফিরবে না।' গ্রাম-বাংলার প্রতি নাট্যাকারের মমত্ববোধ তাঁর নাট্যসম্ভারের বৈচিত্র্যের দিগন্তকে প্রসারিত করেছে।

জাতীয়তাবোধমূলক নাটক পুলিশের কাছ থেকে পাস করিয়ে নেওয়া দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে সেই অবস্থায় মিনার্ভায় অভিনীত হল ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বাংলার মসনদ'। এরপর আবার দেশবিদেশের কাহিনী থেকে গল্প সংগ্রহের অভিযান চালালেন নাট্যকার। তুরস্কের সুলতান আলমামুনের কাহিনী নিয়ে লিখলেন 'পলিন' গীতিনাট্য—(১৩১৭ সাল ২রা মার্চ ১৯১১)। এরপর কল্পনা-মূলক বিজ্ঞানভিত্তিক নাটক লিখলেন নাট্যকার 'মিডিয়া' শিরোনামায়।—(১৩১৯ সাল—১৪ই জুলাই ১৯১২)। নাট্যকার সাময়িকভাবে ফিরে পেলেন তার পুরাতন বিজ্ঞান সাধনার দিনগুলি। নাটকে বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক সত্যকে অবলম্বন করার ঘটনার ইতিহাস সৃষ্টি করলেন তিনি। এটিরও প্রথম অভিনয় হয়েছিল মিনার্ভায়।

'খাঁজাহান' নাটকে ইতিহাসের সামগ্রীকে কাজে লাগলেন নাট্যকার—কিন্তু ইতিহাস নয় ইতিহাসের সামগ্রী অবলম্বন তার প্রহেলিকাময় রোমান্স সৃষ্টির-প্রলেপ নির্মাণের জন্যে।

'দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো'র মত খাঁটি সামাজিক নাটক না লিখলেও নাট্যকারের সামাজিক উপন্যাস লেখার বাঁধা কই? তাই 'পুনরাগমন' সামাজিক উপন্যাস সৃষ্টি ১৩১৯ সালে (২৬শে অক্টোবর ১৯১২)। সাবিত্রীর পর (১৯০২) পৌরাণিক নাটক রচিত হয়নি অনেকদিন। দীর্ঘ চার বৎসরের ব্যবধানে পৌরাণিক আখ্যানবস্তুনির্ভর নাটক রচনা করেছিলেন নাট্যকার উলুপী নাটকের মাধ্যমে ১৯০৬ সালে। তারপর পৌরাণিক জগৎ থেকে আবার প্রায় সাত বছরের বিচ্ছিন্নতা, অবশ্য নাটকের মাধ্যমে। অবশ্য ১৯০৯ সালে তিনি রচনা করেছিলেন একটি পৌরাণিক আখ্যান 'দুর্গা'।

ভীষ্মের বিরাট জীবনের নাট্যরূপ 'ভীষ্ম' নাটক সম্বন্ধে তৎকালীন একটি বিশিষ্ট মঞ্চ-পত্রিকার মন্তব্য:—ডি এল রায় ও শিশিরবাবুর মৃত্যুর পর ক্ষীরোদপ্রসাদই এখন আমাদের শিবরাত্রের সলতে।——ক্ষীরোদপ্রসাদের বারাণসী ধামে অবস্থিতি তার এই পৌরাণিক নাটক রচনার অন্যতম প্রেরণা।——ভীষ্মের প্রথম পরিকল্পনা: 'শান্তনু'।[১৮]

তিনজন নাট্যকার একই কালে ভীষ্ম নামে তিনখানি নাটক রচনা করেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ আর হরিশ্চন্দ্র সান্যাল। কিন্তু কি

---

১৮. নাট্যমন্দির—১৩২০ অগ্রহায়ণ।

কারণে জানি না, রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হল ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীষ্ম। দ্বিজেন্দ্রলালের ভীষ্ম অভিনীত হল না বটে কিন্তু মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হল বাজারে। হরিশ্চন্দ্র সান্যালের ভীষ্মের মুদ্রিত রূপ আমি দেখিনি।[১৯]

রূপের ডালি (২৩শে অক্টোবর ১৯১৩) রঙ্গনাট্যের পর আবার এক উপকথা-মূলক বা কল্প ঐতিহাসিক নাটিকা 'নিয়তি' (১৯১৪)। নাটিকাটি মিনার্ভায় অভিনীত হয়। কৌশাম্বীরাজ উদয়নকে কেন্দ্র করে কয়েকটি কল্পিত পরিস্থিতির পটভূমিকায় নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাবের ইতিবৃত্ত নিয়ে কাহিনী রচিত। নাটক সমালোচনাপ্রসঙ্গে একটি বিশিষ্ট নাট্যপত্রিকার অভিমত—প্রতাপাদিত্য ও চাঁদবিবির নাট্যকার তাঁর স্নিগ্ধ লেখনীকে ইতিবৃত্তের অবদান কীর্ত্তনে নিরস্ত রাখিয়া রূপের ডালি ও নিয়তি প্রভৃতি আজগুবি গল্পের প্রসাধন প্রক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করিয়াছেন। উচ্চাকাংখী নাট্যানুরাগীদের মুষ্টি ভিক্ষাদানে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।[২০]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ক্ষীরোদ প্রসাদের চাকরি জীবনে নাট্যসাধনার মধ্যে বিধিনিষেধ থাকাই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু এ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে নাট্যরচনার ক্ষেত্রে তিনি বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলতে রাজী হন নি, একটানা এক ধরনের বিষয়বস্তুর সীমারেখার মধ্যে তিনি নিজেকে ধরে রাখতে চান নি, তাই বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে তাঁর নাট্য সম্ভার বারবার পূর্ণতার পরশ পেয়েছে? লক্ষ্য করার মত, 'নিয়তি নাটিকার পর একে একে বিচিত্র স্বাদের নাটক—আহেরিয়া (ঐতিহাসিক নাটক ১৩২১, ২০শে জানুয়ারি ১৯১৫), বাদশাজাদী (কল্পনামূলক নাটক ১৩২২, ৩১শে ডিসেম্বর ১৯১৫) রামানুজ (ধর্মমূলক নাটক ১৩২৩, ৩০শে জুলাই ১৯১৬) প্রভৃতি লিখিত হয়। ভীষ্মের মত 'রামানুজ' নিয়েও সমস্যা দেখা দেয়। ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ আর অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—দুজনেই একসঙ্গে 'রামানুজ' লিখতে শুরু করে সমস্যার সূত্রপাত করেন। ভীষ্মের বেলায় ক্ষীরোদপ্রসাদের ভাগ্যলক্ষ্মী জয়লাভ করেছিল এবার কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে হার মানলেন। একদা এক অশুভ লগ্নে ক্ষীরোদ প্রসাদ দেখেন যে তাঁর গৃহ থেকে রামানুজের পাণ্ডুলিপি-খানি চুরি হয়ে গেছে। আশ্চর্য রকমের চুরি! সহস্র চেষ্টাতেও তাঁর চোরাই মালের উদ্ধার হল না। ওদিকে অপরেশচন্দ্র-এর রামানুজের রিহার্সাল আরম্ভ হয়ে গেল। অপরেশচন্দ্রের রামানুজ মঞ্চস্থ হবার প্রাক্‌কালে ক্ষীরোদপ্রসাদ একদিন অকস্মাৎ দেখতে পেলেন তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে রামানুজের পাণ্ডুলিপিখানি কক্ষ মধ্যে ফিরে এসেছে।*[২১] পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেলেও ক্ষীরোদ প্রসাদের রামানুজ সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পায়নি।

---

১৯. শ্রদ্ধাস্পদেষু—নলিনীকান্ত সরকার (ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রসঙ্গ)।

২০. নাট্যমন্দির ১৩২০ ফাল্গুন-চৈত্র।

২১. শ্রদ্ধাস্পদেষু—ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রসঙ্গ—নলিনীকান্ত সরকার।

মাত্র দুটি নাটকের ব্যবধানের পর আবার ইতিহাসের পাতায় কাহিনী চয়নের প্রচেষ্টা কিন্তু ইতিহাসের মোড়কে নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত রোমান্সের রসে অভিসিক্ত বিষাদান্ত নাটক। বঙ্গে রাঠোর (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫) নাটকের পর আবার জনপ্রিয় গীতিনাট্যের ক্ষেত্রে অবতরণ। কিন্নরী নাটক প্রকাশিত হল ১৭ই আগষ্ট ১৯১৮ সালে। মিনার্ভায় কিন্নরীর অভিনয় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্নরী বইটি যেমনই হোক না কেন এতে আলিবাবার আবদালা-মর্জিনার প্যাটার্নে দুটি চরিত্র ছিল উৎপল আর মকরী। ষ্টারেও কিন্নরীর অভিনয় শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ষ্টার মিনার্ভার মধ্যে কিন্নরীর অভিনয় নিয়ে বিতর্কে ও দ্বন্দ্বে মামলার উপক্রম হয় এবং সে ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়ায়।

নাটকের পরিচিত পরিবেশ থেকে নাট্যকার আবার সাময়িক অবসর নেন দু বছরের জন্যে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে একটি সামাজিক উপন্যাস (পুনরাগমন) লিখে নাট্যকার বৈচিত্র্যের আস্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। এবার সে আস্বাদের আধার 'নিবেদিতা' (১১ই মাঘ ১৩২৫—৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯) এবং 'গৃহামধ্যে' (পৌষ ১৩২৬—১২ই জানুয়ারি ১৯২০) শীর্ষক দুখানি উপন্যাস!

কথাশিল্পের মুক্তাঙ্গনে স্বচ্ছন্দ বিহারের পর নাট্যকারের পুনঃপ্রত্যাবর্তন পৌরাণিক পরিমণ্ডলীর পুরাতন পরিবেশে এবং তারই ফলশ্রুতি 'মন্দাকিনী' নাটক (১৩২৮—১৪ই এপ্রিল ১৯২১)।

এবার নাট্যকারের খেয়াল হল অনেকদিন ঐতিহাসিক নাটক লেখা হয়নি। বঙ্গে রাঠোর লেখা হয়েছিল ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। তাই ইতিহাস সৃষ্টিকারী ঐতিহাসিক নাটক আলমগীরের অবতারণা—৯ই ডিসেম্বর ১৯২১ সালে।

একবার কোলকাতা থেকে তিনি ফিরে এলেন মুর্শিদাবাদে নিমতিতায়। প্রতিবছরই পাঁচ ছ মাস তিনি বাস করতেন ঐ গ্রামে। দারুণ উত্তেজিত। বললেন: 'এতদিন পরে থিয়েটারওলারা আমায় অপমান করলে হে? আমার নাটক ফিরিয়ে দিলে!' যে নাটকটি থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাকে অমনোনীত বলে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন সে টি তিনি সঙ্গে করেই এনেছিলেন। নাটকটির মূল নাম ছিল 'ভীমসিংহ'। এই অমনোনীত নাটকটি তিনি যাত্রাদলে বিক্রি করতে গিয়েছিলেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'ভীমসিংহ' নাটক সামান্য পরিবর্তনের সূত্রে আলমগীর নাটকরূপে আত্মপ্রকাশ করে।* শিশিরকুমারের অভিনয়দৃপ্ত এই নাটকটির মঞ্চ প্রয়োগ সম্বন্ধে পরে পৃথক

---

২২. শ্রদ্ধাস্পদেষু—নলিনীকান্ত সরকার।

* ক্ষীরোদবাবু একখানি ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন। তখন তার নাম ছিল 'ভীমসিংহ'। সে সময় তিনি যে থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তার কর্তৃপক্ষ মনোনীত না করে নাটকখানি ফিরিয়ে দিয়েছে। এই অমর্যাদার জন্যে নিদারুণ মর্মাহত হয়ে তিনি আমাদের কাছে মনের দুঃখ প্রকাশ করলেন। একদিন সকালবেলায় দেখি (মথুর-সা'র যাত্রার দল—যারা পদ্মিনী নাটক অভিনয় করেছিল—

পরিচ্ছেদের মধ্যে আলোচনা করা হবে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রচারের মহানব্রতে এ নাটকে নাট্যকার সোচ্চার। তাঁর আলমগীর নাটকে দেখি পরস্পরের প্রবল শত্রু হয়েও জাতির ও দেশের কল্যাণের জন্য হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হতে পারে।

আবার ঐতিহাসিক নাটক রচনার জন্য তাঁর মানসিক প্রস্তুতি লক্ষ্য করা গেল। সম্ভবতঃ তাঁর আলমগীর নাটকের মঞ্চসাফল্যে উৎসাহিত নাট্যকার আরও দু'একখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনায় প্রয়াসী হচ্ছিলেন। তাই তাঁর পরবর্তী নাটক 'বিদুরথ' ইতিহাসের কাহিনী আশ্রয় করে লেখা হয়েছিল। কিন্তু বৈচিত্র্যের পিয়াসী নাট্যকার এরই ফাঁকে একখানি ভিন্নস্বাদের নাটক রচনার কাজ সেরে রাখলেন। নাটকটির নাম রত্নেশ্বরের মন্দির (২৮শে ডিসেম্বর ১৯২২)। কোশল সম্রাট প্রসেনজিতের পুত্র বিদুরথ। তারই কাহিনীভিত্তিক মনস্তত্ত্বমূলক ঐতিহাসিক নাটক বিদুরথ। নাটকটির সৌন্দর্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে কল্পনার অবাধ আশ্রয়, যার ফলে মূল ইতিহাস থেকে বিচ্যুতি এবং নাটক স্বভাবতই ইতিহাসের অনুবর্তী হতে পারেনি। বিদুরথ-এর রচনাকাল ফাল্গুন ১৩২৯ (১০ই মার্চ ১৯২৩)।

আবার কথাসাহিত্য রচনার তন্ময়তায় পরপর তিনখানি উপন্যাস লিখে ফেললেন ক্ষীরোদপ্রসাদ। রচনাকাল ১৯২৩-২৪। তিনখানি উপন্যাসের কালানুক্রমিক নাম—'গৃহামধ্যে', 'পতিতার সিদ্ধি' এবং 'চাঁদের আলো'। বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসার পর এবং দু একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষীরোদপ্রসাদ হঠাৎ সামাজিক উপন্যাস রচনায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। 'পতিতার সিদ্ধি' শরৎচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসপাঠের অব্যবহিত পরেই ক্ষীরোদপ্রসাদের লেখনী থেকে নিঃসৃত হয়। এই সময় একটি রঙ্গন্যাসও লিখেছিলেন নাট্যকার।* ক্ষীরোদপ্রসাদের শেষ চারটি নাটক তাঁর মিশ্র মানসের স্পষ্ট প্রতিফলনের চিহ্ন বহন করে চলেছে।

গোলকুণ্ডা (২০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫) নাট্যকারের আর একটি ঐতিহাসিক চিহ্নিত অথচ ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই যথারীতি যে নাটকটি ষ্টার রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোয় আত্মপ্রকাশ করেছিল।

গোলকুণ্ডার ইতিহাসের পাতা থেকে সরে গিয়ে হঠাৎ নাট্যকার পাড়ি জমালেন

সেই যাত্রার দলের ম্যানেজার ক্ষীরোদ বাবুর ঘরে বসে। দু'জনের কথাবার্তা শুনে মনে হ'ল, ক্ষীরোদবাবু ভীমসিংহ নাটকখানি যাত্রার দলেই দেওয়া স্থির করেছেন। দরদস্তুর চলছে এই নিয়ে। জমিদার মহেন্দ্রবাবু জানতে পেরে নিরস্ত করলেন ক্ষীরোদবাবুকে। এই নাটকখানির পরিবর্তিতরূপ 'আলমগীর'।

* রঙ্গনাট্যটির নাম ফক্কানগীর—'বিজলী' (সাপ্তাহিক) পত্রিকায় প্রকাশকাল ধারাবাহিকভাবে ৭ই, ১৪ই ও ২১শে ভাদ্র ১৩৩০।

বৌদ্ধযুগের স্বপ্নলোকে। 'এই শ্রেণীর নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত নাট্যকার শেষ বারের মত তাঁর অমৃত নিস্যন্দিনী ভাষার সাহায্যে (তিনি) আমাদের আলো আঁধারের রহস্যময় আবছায়ার ভিতর দিয়ে কবিকল্পনার যে মধুর স্বপ্নলোকে টেনে নিয়ে যান, মুগ্ধ মোহাভিভূতের মত আমরা সেখানে গিয়ে একেবারে আনন্দে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যাই। '...কল্পলোকের কবি ও নাট্যকার পরিণত বয়সের নবনাট্য-লীলায় যে অননুভূতপূর্ব শীকরোচ্ছ্বাস প্রবাহিত করেছেন—তা পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।'[২৩] বৌদ্ধযুগের আখ্যায়িকা নির্ভর নাটকটির নাম 'জয়শ্রী'—এটি মূলতঃ গীতিনাট্য (২০শে ডিসেম্বর ১৯২৬)।

একই বৎসরে লেখা হয় আরও একটি গীতিনাট্য রাধাকৃষ্ণ (১৯২৮)। জয়শ্রী গীতিনাট্য রচনার আমেজ তখনও কাটেনি, তারই অনিবার্য ফল ঐ গীতিনাট্য 'রাধাকৃষ্ণ'। কিন্তু বিষয়বস্তুর জন্য এবার আর ইতিহাস নয়, কিংবদন্তী নয়—বৌদ্ধআখ্যায়িকা নয়, কিংবা আরব পারস্যের উপকথা নয়—তিনি শরণাপন্ন হলেন হিন্দু পুরাণের। রাধাকৃষ্ণের চিরন্তন প্রেমকাহিনী অবলম্বন করে নাট্যকার পুরাণের পরিচিত কাহিনীর নাট্যরূপ দেবার চেষ্টা করলেন নূতনরূপে। প্রায় একই সময়ে আকস্মিকভাবে একেবারে ভিন্নখাতে প্রবাহিত হতে দেখা যায় তার সাহিত্যভাবনাকে। (সম্ভবতঃ সম্পাদকের তাগিদে) তাকে একটি মৌলিক উপন্যাস প্রকাশ করতে দেখা যায় শারদীয় বার্ষিক বসুমতীতে (১৩৩৩) উপন্যাসটির নাম—একরাত্রি।

এরপরই তার কাছ থেকে বহু প্রত্যাশিত একটি অপূর্ব কাব্যনাট্যের উপহার এসে যায় তাঁর পরিণত প্রয়াসের স্বাক্ষর বহনের পথ ধরে। ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থনের এ এক অনাস্বাদিত অমৃত-কাব্য নাটক। এ পর্যন্ত তিনি যত পৌরাণিক নাটক লিখেছেন এবং সামগ্রিকভাবে তাঁর নাট্যসম্ভাবরের মধ্যে নাট্যকারের যে কবিমনের পরিচয় প্রচ্ছন্ন ছিল:—এই নাটক 'নরনারায়ণে' তা যেন দিনের আলোয় ভাস্বর হয়ে উঠল।

আলিবাবা কিন্নরী প্রভৃতি হালকা চটুল নাটকের নাট্যকারের পৌরাণিক বিষয়বস্তুর উপর উচ্চকবিত্বপূর্ণ নাট্যরচনার ঘটনা নিঃসন্দেহে তাঁর নাট্য প্রবাহের গতিকে ঈপ্সিত পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে নাট্যকারের প্রথম বিয়োগান্ত নাটক 'ফুলশয্যা' (দৃশ্যকাব্য) রচনাকাল (১৮৯৪)এর মধ্যেও তার এই ক্রমিক পূর্ণতার প্রতিশ্রুতি ছিল। কারণ ফুলশয্যা নাটকটি সম্বন্ধে জন্মভূমি পত্রিকার সুচিন্তিত অভিমত ছিল—এরূপ উচ্চকবিত্বপূর্ণ বাঙ্গলা নাটকের অভিনয় জাতীয় রঙ্গমঞ্চে অনেকদিন হয় নাই। উচ্চকবিত্বপূর্ণ বাঙ্গলা নাট্যরচনা প্রতিভার যে বীজের অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল ১৮৯৪ সালে—মহীরুহরূপে তার-ই আত্মপ্রকাশ নরনারায়ণ কাব্যনাট্যে ১৯২৬ সালে। মাত্র বত্রিশ বছরের নাট্যসাধনার অজস্র তরঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যপ্রবাহ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে—আর

---

২৩. নাচঘর—৭ই শ্রাবণ—১৩৩৩

সেই তরঙ্গের স্পর্শে বাংলা সাহিত্যের তটভূমি তীর্থের গরিমায় গৌরবান্বিত হয়ে উঠেছে।

নরনারায়ণ রচনাকালেই নাট্যকার পরপারের ডাক শুনতে পেয়েছিলেন এবং তিনি বুঝতেও পেরেছিলেন এরপরও অন্যকোন নাটকে যদি তিনি হাত দেন তাহলে তা ধর্মীয় কোন চরিত্র অবলম্বন করেই তাকে লিখতে হবে। লেখায় হাতও দিয়েছিলেন এবং পরে নাট্যকার 'কৃষ্ণ' নাটকের প্রথম দৃশ্য মাত্র লেখেন কিন্তু শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র-নারায়ণের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকাহত ও নিরুৎসাহ হইয়া এবং নিজের স্বাস্থ্যও ভাঙ্গিয়া পড়ায় লেখা বন্ধ করেন। 'মৃত্যুর দু একদিন পূর্বে (জুলাই ১৯২৭) তিনি বলিয়াছিলেন, 'কৃষ্ণচরিত্র যতই উপলব্ধি করিতেছি ততই অনুভব করিতেছি যে কৃষ্ণ চরিত্র এ পারে লিখিবার নহে।' ইহাই নাটক সম্বন্ধে তাঁহার শেষ কথা।'[২৪] কথায় কথায় মহাপ্রস্থান নাটকের কথা উঠল। শিশিরকুমারের স্মৃতিচারণ—মহাপ্রস্থান দুটি লোক লিখতে পারতেন। ক্ষীরোদ পণ্ডিত ও গিরিশচন্দ্র। গিরিশবাবু লিখলে ভীষণ ট্রাজিক হত। তবে এর চেয়ে ট্রাজিক আর কী হতে পারত। তবে উনি বোধহয় 'মহাপ্রস্থান' পর্যন্ত যেতেন না। অর্জুন যেখানে গাণ্ডীব তুলতে পারলেন না, সেইখানেই শেষ করতেন। ক্ষীরোদবাবুকে বলতে উনি লাফিয়ে উঠলেন, কিন্তু একদিন ভেবে এসে বললেন, ভায়া এখন ষাট পেরোয় নি, এরিমধ্যে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণের মৃত্যু, সেখানে কি আর বাঁচব।[২৫]

এ একপ্রকার নিশ্চিত ক্ষীরোদপ্রসাদ এরপরেও যদি জীবিত থাকতেন তাহলে 'কৃষ্ণ' নাটক যথাসময়ে শেষ করতেন এবং সম্ভবতঃ ধর্মীয় চরিত্র অবলম্বন না করে কোন নাটকই লিখতে পারতেন না।

।। নাটক ও তার মঞ্চ প্রয়োগ ।।

বাংলা রঙ্গমঞ্চ :—ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকাভিনয় :—বিশিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্রী

পেশাদার থিয়েটারের পত্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী নাটকের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। নাট্যালয়ের মধ্যে থেকে এই চাহিদা মেটাবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল। এরা মঞ্চে অভিনয় উপযোগী নাটক লিখতেন অজস্র কিন্তু তা ও চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং বাইরের শক্তিশালী নাট্যকারদের সাদরে বরণ করার প্রশ্নটা অনিবার্য হয়ে দেখা দিল। সেই সূত্রেই অধ্যাপনা করতে করতে ক্ষীরোদপ্রসাদ আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিলেন সৌখীন নাট্যকার হিসাবে। আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের অধিকাংশ পালাই অভিনেতা ও রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই রচনা করতেন, যদিও এখানকার পাবলিক থিয়েটারগুলি গড়ে উঠেছিল সর্বপ্রথমে

২৪· ২৫· নরনারায়ণ—৬ষ্ঠ সংস্করণ—'নিবেদন'—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্যিকদের অবলম্বন করে। ক্রমে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে বাইরের কোন নাট্যকারেরই রঙ্গালয়ের ভিতরে পাত্তা পাবার উপায় রইল না। তারপর সেই ধারা বদলে দেন ক্ষীরোদপ্রসাদ ও ডি. এল. রায়।[১]

চাকুরী জীবনের প্রথমে ক্ষীরোদপ্রসাদ আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, রঙ্গালয়ের দরজা খোলা পান নি। রঙ্গালয়ের সঙ্গে যোগ নেই—কাজেই সে রকম নাট্যকারের আমল পাওয়ার কথা নয়। কোন বড় রঙ্গালয়ের মালিকই তাঁকে কলকে দিতে রাজী হন নি। অবশেষে তাঁর কপাল ফিরল। এমারেল্ড থিয়েটার অত্যন্ত অচল অবস্থায় পড়ে তাঁর 'ফুলশয্যা' নামে একখানি নাটক গ্রহণ করতে বাধ্য হল।*[২] বাংলা রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যোগসূত্র হিসাবে এটাকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। নাট্যকাররূপে জাতে উঠতে, স্বীকৃতি লাভ করতে ক্ষীরোদপ্রসাদের এখনও দেরী। কারণ তাঁর নাটক মঞ্চস্থ করেও এমারেল্ড থিয়েটার বাঁচেনি।

মঞ্চ সফল নাটক লেখার কতকগুলি টেক্‌নিক্ বা কৌশল প্রচলিত ছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদ রঙ্গমঞ্চের বাইরে থেকেও সেই কৌশল বা টেক্‌নিকের গোপন সূত্রটি কতকাংশে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। শিক্ষিত নাট্যকাররা তদানীন্তনকালে নাট্যরচনার ক্ষেত্রে এলিজাবেথীয় রীতি অনুসরণ করে চলতেন। কেবল একটু পার্থক্য ছিল এই যে আমাদের গীতিকাব্যের দেশে গীতকে বর্জন করা হত না, আজও যেমন হয় না। ইংরাজী নাটকের আদর্শ গ্রহণ করলেও যাত্রার পদ্ধতি আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এড়িয়ে যেতে পারি না বা তখনও পারিনি। নাটকে আমরা কোমলবৃত্তিগুলির সহায়ক হিসাবে সঙ্গীতকে স্থান দিই। সঙ্গীতবিহীন নাটক আমাদের অধিকাংশের কাছে বিরস বলে বোধ হয়।[৩] এই সূত্র ধরেই গীতিবহুল রঙ্গ ও গীতিনাট্য 'আলিবাবা' রচনা করে এমারেল্ডে 'ফুলশয্যা' অভিনয়ের দুবছর পরেই ক্ষীরোদপ্রসাদ আবার রঙ্গালয়ের দ্বারস্থ হলেন। আমার দ্বারা সম্পাদিত নাচঘরে প্রকাশিত নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্রের আত্মজীবনী পাঠ করে জানতে পারি আলিবাবা নাটকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ গিয়েছিলেন তার কাছে।··অতুলবাবুই আলিবাবার অভিনয়ের ব্যবস্থা করে দেন। ক্লাসিক থিয়েটার নবপ্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয় হয়েও তখন দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছিল না, এবং রঙ্গালয়ের দুর্ভাগ্যই হল ক্ষীরোদপ্রসাদের সৌভাগ্যের হেতু। এই আলিবাবাই হল নাট্যকারের পক্ষে রঙ্গালয়ে প্রবেশপত্রের মতো।'[৪] রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে প্রথম আসার সুযোগ পেয়েছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ এই আলিবাবা গীতি-নাট্যেরই মাধ্যমে। আলিবাবার অভিনয় স্মরণীয় হয়ে উঠেছিল সেদিন। আলিবাবার অনেক গান 'বাজে কাজে মনসেকে আর যেতে দেব না', 'ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল',

---

১. ২ যাঁদের দেখেছি—হেমেন্দ্রকুমার রায়।

৩. নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র কথাসাহিত্য

৪. যাঁদের দেখেছি—হেমেন্দ্রকুমার রায়

'আয় বাঁদী তুই বেগম হবি' পাড়ায় পাড়ায় বাড়ী বাড়ী ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। ক্লাসিক থিয়েটারে সর্বদিক দিয়ে সার্থক হয়ে উঠেছিল আলিবাবার অভিনয়। বিজ্ঞাপনে ফলাও করে প্রচার হতে থাকল 'আলিবাবা ক্লাসিকের বিজয় বৈজয়ন্তী' বলে। শিশির ভাদুড়ীর একটি উদ্ধৃতি :—'আলিবাবাতে খুব বিক্রি হয়েছিল পাঁচরাতে একুশ, বাইশ, তেইশ'শ পর্যন্ত। আমি কিন্তু নাবি নি।' মালিকের ঘরে আসতে থাকল কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। ক্লাসিক থিয়েটারে হুসেনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন অমরেন্দ্র দত্ত। প্রিয়দর্শন অমরেন্দ্রনাথ। হুসেনরূপে মহামূল্য সাজসজ্জায় স্টেজে যখনই প্রথম দর্শন দেন, দর্শক দশ মিনিট ধরে হাত-তালি দিতে থাকে। হ্যাঁ, এতদিনে স্টেজে নতুনের আবির্ভাব হল।'[৬] ক্লাসিক থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথের প্রথম নাটক হরিরাজ জমে নি। তার ভাগ্য খুলে গেল ক্লাসিকে আলিবাবা খোলার সঙ্গে সঙ্গে। তদানীন্তনকালের প্রখ্যাত নৃত্য-শিক্ষক নৃপেন্দ্রনাথ বসু ক্লাসিকে যোগ দিয়ে নতুন নতুন নৃত্য পরিকল্পনায় মেতে উঠলেন। 'আলিবাবা' যেমন ক্ষীরোদপ্রসাদকে রাতারাতি রঙ্গজগতের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়েছিল এবং তাঁর সৌভাগ্যের সূচনা করেছিল, নৃপেন্দ্রনাথ বসুও আলিবাবা খোলার সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়লেন অথচ দানীবাবুকে কীর্তির শিখরে উঠতে হয়েছিল ধীরপদক্ষেপে। নৃত্য পটিয়সী কুসুমকুমারীও মিনার্ভা ছেড়ে চলে আসেন ক্লাসিকে। তাদের দুজনের আবদালা মর্জিনার নাচ কলকাতা শহরকে মাতিয়ে দিল। ক্লাসিক প্রেক্ষাগৃহে থিয়েটারি ভাষায় যাকে বলে বাদুড় ঝুলতে লাগল। যুবকরা চলল, প্রৌঢ়রা চলল, বাড়ীর কর্ত্রী কন্যা বধু নিয়ে সেকেণ্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ির দরজা জানলা সব বন্ধ করে ছুটলেন আবদালা মর্জিনার নাচ দেখতে। আর শুধু কি নাচ। আলিবাবার গানেও দেশবাসী মশগুল হয়ে গেল। গৃহস্থ বধূ স্নানের ঘরে গুনগুন করল—'বাজে কাজে মিনসেকে আর যেতে দেবো না'। কোচম্যান ঘোড়ার রশি হাতে পাদানি ঠুকতে ঠুকতে জোর গলায় আরম্ভ করল—'ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল'। এত্তা জঞ্জাল।'[৭]

ক্ষীরোদনাট্যে যে সমস্ত বিশিষ্ট নটনটী বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে নৃপেন্দ্রনাথ বসুর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলিবাবা নাটকে তার হুসেন-এর ভূমিকার কথা আগেই বলা হয়েছে। কেবল নৃত্যশিক্ষকরূপেও নয়, নর্তকরূপেও বাংলা রঙ্গালয়ে তিনি অদ্বিতীয় হয়ে রয়েছেন আজ পর্যন্ত। আলিবাবায় আবদালা-ভূমিকায় অভিনয়ের সঙ্গে তিনি যে অনুপম নৃত্যচাতুর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন এখানে তার আগে বা পরে কেউ তা দিতে পারে নি। এমন কি নৃত্যে গুরু রানুবাবু পর্যন্ত আবদালার ভূমিকা গ্রহণ করে শিষ্যের সমকক্ষ হতে পারেন নি। এইজন্যেই যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন আবদালার ভূমিকায় তার

৫. শিশির সান্নিধ্যে—রবি মিত্র, দেবকুমার বসু

৬. ৭. অথনটঘটিত :—সূত্রধার।

নাম বিজ্ঞাপিত হলেই প্রেক্ষাগৃহ জনতায় পূর্ণ হয়ে যেত। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বে যখন তার বয়স ষাট বছর তখনও তাকে ঐ ভূমিকায় অভিনন্দিত করেছিল বিপুল জনতা।৮

আলিবাবার একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় তদানীন্তন কালের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল। আলিবাবায় বাবামোস্তাফার ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ীর রূপসজ্জার চমৎকারিত্ব ও কণ্ঠস্বরের অভিনবত্ব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।৯

আলিবাবার কয়েকটি গান গিরিশচন্দ্র নিজে লিখে দিয়েছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের জনপ্রিয়তার মূলে ছিল নাটকের প্রয়োগ-কর্তাদের পরোক্ষ হস্তক্ষেপ বা প্রভাব। 'অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় ও নাট্যসম্রাজ্ঞী তারা সুন্দরীর মুখে শুনিয়াছি—দু একটি গান (আলিবাবার) ও দু একটি সংলাপ অমরেন্দ্র দত্তের। অবিশ্বাস করার হেতু নাই, কারণ ক্ষীরোদপ্রসাদের সূক্ষ্ম কবিমন এই ধরণের স্থূল রসিকতা গ্যালারী ভোলাইবার এই উপকরণ যোগাইতে পারিত কিনা সন্দেহ।'১০ জনপ্রিয়তার স্রোতে ভাসতে ভাসতে জীবনরসে অনুজীবিত নাটক আলিবাবা রঙ্গালয়ের বাইরেও বহুস্থানে বহু বছর ধরে অভিনীত হয়ে সাধারণ নাট্যমোদীদের আনন্দ দান করেছে। যে কোন অবৈতনিক সখের দল শুরুতেই লাগিয়ে দিত আলিবাবার অভিনয়। আলিবাবার গান, মর্জিনার ঘাঘরা এবং আবদালার কৌতুক নাট্যাভিধানের প্রবাদ বচন হয়ে দাঁড়াল।'১১

ছাত্র ও অধ্যাপকজীবনে নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার-এর প্রযোজনায় ক্ষীরোদপ্রসাদের যে সমস্ত নাটক ইনস্টিটিউটে মঞ্চস্থ হয়েছিল তার মধ্যে আলিবাবা অন্যতম।

ক্লাসিকে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের জনপ্রিয়তায় উদ্দীপ্ত নাট্যকারের কলম থেকে বেরিয়ে প্রমোদরঞ্জন সোজা রঙ্গমঞ্চের সিংহদ্বার দিয়ে প্রযোজকদের হাতে পড়ল। রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়ে (১৮৯৮ খৃঃ) তার প্রমোদরঞ্জন নাটকটিও জনপ্রিয়তার আশীর্বাদ কুড়িয়ে নিল। প্রমোদরঞ্জন শীর্ষক রঙ্গ-নাট্যটি পরে ষ্টার থিয়েটারেও অভিনীত হয়। একজন বিশিষ্ট কবির স্মৃতিচারণ—'প্রমোদরঞ্জনের অভিনয় মন্দ লাগে নি। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকে রবীন্দ্রনাথের রচিত ক'টি গান বোধকরি ক্ষীরোদপ্রসাদই সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন।'১২

---

৮. যাঁদের দেখেছি—হেমেন্দ্র কুমার রায়।

৯. নাচঘর—১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ।

১০. কথাসাহিত্য

১১. নাচঘর—শ্রাবণ ১৩৩৪।

১২. কথাসাহিত্য

সাময়িক পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ :—মিনার্ভায় শুনেছি পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের জনপ্রিয় গীতিনাট্য প্রমোদরঞ্জনের পুনরাভিনয়-এর আয়োজন করছেন। মিনার্ভাই এখন একমাত্র থিয়েটার যেখানে এখনও গীতিনাট্যের অভিনয় দেখতে পাওয়া যায়।'১৩ এর আগের অভিনয়েরও কিছু খবর পাওয়া যায়। প্রথমদিকের অভিনয়ের বিবরণ :—বেঙ্গল থিয়েটারের সেই পুরাতন পুস্তক এক্ষণে অরোরায় অভিনীত হইতেছে। পুস্তকখানি আলিবাবার ন্যায় নৃত্যপূর্ণ। সুতরাং নৃত্যগীত সম্বন্ধেই দুই কথা বলিব। চঞ্চলের নৃত্য ভালো হয়, কিন্তু তার গানগুলি একেবারেই শোনা যায় নি। শান্তির অভিনয় ভালো হয়। গানগুলিও ভালো লাগে। সখীদের নৃত্যগীতও মনোহর। প্রমোদের অভিনয় মন্দ হয়নি। ১৪ প্রমোদরঞ্জনের আর এক দফা অভিনয়েরও খবর পাওয়া যায় :—১৯১১ সালে বেঙ্গল থিয়েটার উঠে গেল। তার আগে চলেছিল প্রমোদরঞ্জন ও বভ্রুবাহন।' ১৫

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে প্রমোদরঞ্জন-এর সার্থক অভিনয়ের পর 'কুমারী' নাট্যকাব্য ১৮৯৯ ইং, বাংলা ১৩০৫ একই রঙ্গমঞ্চের পদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। নাট্যকার হিসাবে এইভাবে ধীরে ধীরে ক্ষীরোদপ্রসাদের রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সবার অলক্ষ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল।

নাট্যকাররূপে ক্লাসিক ও রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারের স্বীকৃতি পাওয়ার সূত্রে বৎসরকালের মধ্যে মিনার্ভা থিয়েটারে (প্রথম রজনী ১৩০৬।১৬ই পৌষ) 'জুলিয়া' গীতিনাট্যের আত্মপ্রকাশ।

মিনার্ভা থেকে ষ্টার। নাট্যকার তখনো পেশাদার নাট্যকারের পরিচিতি বহন করেন না।—জেলারেল এসেম্ব্লিজ-এর রসায়ণবিদ্যার অধ্যাপক। ষ্টারে মঞ্চস্থ হল সাবিত্রী। ক্লাসিকে যখন হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড, ষ্টার তখন মিটমিট করছে। ডি. এল. রায়ের বিরহ ক্ষীরোদপ্রসাদের সাবিত্রী, সপ্তমপ্রতিমা এবং বেদোরা প্রভৃতি অভিনীত হতে থাকল। কোনটাই জমল না।'

অভিনয় যে খুব উচ্চাঙ্গের হয়েছিল সেরকম কোন সমর্থিত সংবাদ না পাওয়া গেলেও অভিনয় যে অনেকেরই ভালো লেগেছিল তার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ষ্টারে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের সাবিত্রী নাটক অভিনয় হচ্ছিল। শরৎচন্দ্র সৌরীন্দ্রবাবুর (কথাসাহিত্যিক সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়) কথায় সাবিত্রী অভিনয় দেখে তখন যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন সে সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রবাবুই লিখেছেন : 'ষ্টার থিয়েটারে ক্ষীরোদপ্রসাদের সাবিত্রী অভিনয় হচ্ছিল। সে অভিনয় দেখে এসে আমি তার সুখ্যাতি করেছিলুম। সে সুখ্যাতি শুনে শরৎচন্দ্র একদিন অভিনয় দেখতে গেলেন। পরের দিন আমাকে ব্যঙ্গবানে জর্জরিত করে

---

১৩. নাচঘর—১৩ই চৈত্র ১৩৩১।

১৪. রঙ্গালয়—১৪ই ভাদ্র ১৩০৯ (৩০শে আগষ্ট ১৯০২)

১৫. অথনটঘটিত—সূত্রধার।

তুললেন। বললেন, বাপরে! কি বলে তোমার ভালো লাগল। সত্যবান যে সেজেছে তাকে দেখাচ্ছিল সাবিত্রীর ছোট ভাই যেন। তারপর টেক্‌কা পড়ল যখন সত্যবান বেচারা মারা গেল। সাবিত্রী তার মৃতদেহ কোলে তুলে গান ধরলো। এমন অবস্থাতেও মানুষকে গানে পায়! আমি তর্ক তুললুম - ওটাকে ঠিক সুরে লয়ে গড়া গান বলে ধরছো কেন? ও অবস্থায় মানুষ চিৎকার করে কাঁদে—ওগো তুমি কোথায় গেলে গো। আমার কি হল গো। এই সব বলে। শোকের সেই আবেগটুকু নাট্যকার প্রকাশ করেছেন গানের ছন্দে সুরে। শরৎচন্দ্র বললেন, তা বলে দুটো গান। একটা হলেও রফা ছিল।'১৭

আগেই বলা হয়েছে সপ্তম-প্রতিমা স্টারে টিম্‌টিম্‌ করে চলছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদের রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যোগসূত্র দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছিল। সপ্তম প্রতিমার পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত সংস্করণ 'দৌলতে দুনিয়া' কোহিনুর থিয়েটারে আত্মপ্রকাশ করে। সাময়িক পত্রের পাতায় স্টারে দৌলতে দুনিয়ার একরাত্রির অভিনয়ের বর্ণনা এইরূপঃ—গত শনিবার স্টারে সপ্তম প্রতিমা······। স্টারের দৃশ্যপট ও পোষাক পরিচ্ছদগুলি চিরদিনই ভালো। পুরুষ অভিনেতাদের মধ্যে হরজন দাসের অভিনয় সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়েছিল। তাহার অঙ্গভঙ্গি হইতে বাক্যবিন্যাস পর্য্যন্ত সকলগুলিই স্বাভাবিক। তবে গ্রন্থকারের দোষে তাহার মুখ দিয়া এমন কতগুলি বিসদৃশ কথা বাহির হইয়াছিল যাহা সাধারণ ভদ্রলোকের মুখে শোনা যায় না। যেমন হরজন দাসের মুখে—'তুই শালা, তোর বাপ শালা, তোর মা শালা, তুই শালার বেটা শালা।' মিহিরের অভিনয় ভালো হয় নাই। কর্কশ কণ্ঠে প্রাণপন চিৎকার আমাদের ভালো লাগে নাই। পুরুষোত্তমের অভিনয়ে ভালো হইয়াছিল। তবে তাহার বর্ণ পরিবর্তন করা উচিত ছিল। পদ্মনাভের অভিনয়ও মন্দ হয় নাই। ঢণ্টরামের আবির্ভাব কেন বুঝিলাম না! লোক হাসানোই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে কথাই নাই। পুস্তক হইতে ঢণ্টরাম চরিত্র বাদ দিলে কি বিশেষ ক্ষতি হইত? গজুয়ার অভিনয় বেশ হইয়াছিল। তাহার গীত গুলিও সুশ্রব্য ছিল। অভিনেত্রীদের মধ্যে মায়ার অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল। তাহার অভিনয় কোন দোষই ছিল না। বিশেষতঃ তাহার গীতগুলি আরো ভালো হইয়াছিল। অপরাপর থিয়েটারের মত গীতগুলি নাকি-সুরে গীত হয় নাই। সত্যবতীর অভিনয়ও ভালো হইয়াছিল। বিশেষত রামবাগকুটিরে সত্যবতীর নারায়ণের নিকট করুণ প্রার্থনাটি সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। ছায়া ভালো হয় নাই। খাণ্ডারী মন্দ হয় নাই। তবে বয়স যেন হরজন দাস অপেক্ষা বড় বলিয়াই মনে হয়! নিয়তি বালকগনের গীতগুলিও মন্দ হয় নাই, তবে তাহাদের নৃত্য দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে স্টার থিয়েটার নৃত্য বিষয়ে অপরাপর থিয়েটার হইতে এতদিন যে

১৬, ১৭. রঙ্গালয়ের নানা গল্প—গোপাল রায়।

স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে ছিল তাহা আর রাখিতে পারিল না। তবে দেশের রুচি অনুযায়ী লোকের মনোরঞ্জন করা চতুর ব্যবসায়ীর উপযুক্ত বুদ্ধি সন্দেহ নাই।'১৮

স্টার থিয়েটারে তখনও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যকাররূপে কদর কমেনি। তাই বেদৌরা গীতিনাট্যে প্রথম আবির্ভাব স্টার রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপে। প্রথম অভিনয়ের তারিখ ২৫শে ডিসেম্বর ১৯০২।

রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারের পর একের পর এক নাটক মঞ্চস্থ করে স্টার কর্তৃপক্ষ ক্ষীরোদপ্রসাদকে নাট্যকাররূপে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি প্রধান নাট্যকাররূপে স্টার থিয়েটারে যোগ দেন এবং ঐ সম্প্রদায়ের জন্য একমাত্র রঘুবীর ছাড়া পরপর অশ্রান্তভাবে রচনা করেন—'সপ্তম প্রতিমা', 'সাবিত্রী', 'বেদৌরা', 'প্রতাপাদিত্য', 'বৃন্দাবনবিলাস', 'রঞ্জবতী' (১৯০৪)।১৯

একটানা ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক নিয়ে স্টার রঙ্গমঞ্চ টিম্‌টিম্‌ করে ঢিমেতালে চলছিল। ডি. এল. রায়ও ইতিমধ্যে নাট্যকাররূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। স্টারে তাঁর নাটক চলছিল। ঠিক এই সময় চমক লাগানো নাটক লিখে ক্ষীরোদপ্রসাদ স্টারের ভাঙ্গা আসরকে মাতিয়ে তুললেন! স্টার তখন টিমটিম করছে ডি. এল. রায়ের বিরহ, ক্ষীরোদপ্রসাদের 'সপ্তম প্রতিমা,' 'সাবিত্রী', 'বেদৌরা' প্রভৃতি অভিনীত হতে লাগল, কোনটাই জমল না। হঠাৎ ১৯৩০ সালে একদিন চাকা ঘুরল, স্টার রঙ্গমঞ্চে ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য দেখা দিল। স্টারে এতলোক সমাগম বহুকাল হয়নি। তাছাড়া এ নাটকটি ইতিহাস সৃষ্টি করল।''২০ ষ্টারের জমাট আসর চলল বেশ কয়েকদিন। কারণ এই নাটকে ছিল স্বাদেশিকতার উম্মাদনার প্রথম উন্মেষ। ষ্টারে প্রতাপাদিত্য অভিনয় দর্শককে মাতিয়ে তুলল। তখন ইংরাজ-রাজ নিজমূর্তি ধারণ করল। দর্শক যখন প্রতাপের মুখে শুনল, হয় যশোর নয় মৃত্যু, তখন তার দেহের রক্ত দ্রুত সঞ্চালিত হতে লাগল।······যাক, প্রতাপাদিত্য সুঅভিনীত হল। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন—প্রতাপ—অমৃতলাল মিত্র, বিক্রমাদিত্য ও রাজা—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, গোবিন্দ দাস বাবাজী—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়া—নরী-সুন্দরী। বহুরাত্রি নাটকটি চলল। স্টারের বেশ অর্থসমাগম হতে লাগল।······স্টারে তখন প্রতাপাদিত্যর অভিনয় শেষ হয়েছে চুনীবাবু অর্ধেন্দু শেখরকে নিয়ে এলেন। অর্ধেন্দু শেখর এসেই বললেন প্রতাপাদিত্য খোলো। তাই হল, তিনি হলেন আগেকার বিক্রমাদিত্য ও রাজা, চুনীলাল দেব প্রতাপ, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-শংকর, তারা সুন্দরী-কল্যানী। এত হল কিন্তু, বিক্রীর অংক মোটেই ভালো হল না।২১

---

১৮. রঙ্গালয়—শনিবার ১৪ই ভাদ্র ১৩০৯ (৩০শে আগস্ট ১৯০২)

১৯. যাঁদের দেখেছি—হেমেন্দ্র কুমার রায় (ক্ষীরোদপ্রসাদ।)

২০. অথনটঘটিত—সূত্রধার।

প্রতাপাদিত্যের অভিনয় সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। যেমন সুদর্শন নট নির্মলেন্দু লাহিড়ীর প্রথম আত্মপ্রকাশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই প্রতাপাদিত্য নাটক। ১৯২২ সালের আগস্ট মাস। শিশির কুমার ম্যাডান থিয়েটার ছেড়ে চলে গেছেন। ম্যাডান মঞ্চস্থ করল ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য নাটক। এই নাটকের নাম ভূমিকাতেই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী।

প্রতাপাদিত্য নাটকে শিশির কুমার-এর অভিনয় সম্বন্ধে অনেক চিত্তাকর্ষক কাহিনী ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। ১৯৩৪—৭ই নভেম্বর। শিশিরকুমার ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য নাটকে রডা চরিত্রটির নূতন রূপ দেখালেন। এর আগে প্রতাপাদিত্যের ভূমিকাতেও তিনি অভিনয় করেছিলেন। রডা প্রসঙ্গে বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার সম্বন্ধে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।...... নবনাট্য মন্দিরে ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য।......নাটকে রডার সংলাপ হিন্দিতে।-কিন্তু নাট্যাচার্য কয়েকদিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ঘুরে ঘুরে প্রচুর বই সংগ্রহ করে পড়ে নিলেন। যথা সময়ে প্রতাপাদিত্য আরম্ভ হল। দেখা গেল রডা হিন্দিতে কথা না বলে চাটগেঁয়ে ভাষায় বলছে। অভিনয় চলার পর ২।১ টি দৃশ্যের পর প্রেক্ষাগৃহ থেকে কয়েকজন মন্তব্য করলেন—রডা আবার চাটগেঁয়ে ভাষা শিখল কবে থেকে? কথাটা নাট্যাচার্যের কানে গেল। একটা সাদা চাদরে রূপসজ্জা ঢেকে হাতে কয়েকখানি বই নিয়ে দর্শকদের সামনে এগিয়ে এলেন। পিছনে তাঁর থিয়েটারের ভৃত্য ভিখা, হাতে মানচিত্র।......আপনাদের ভেতর কে বললেন রডা চাটগেঁয়ে ভাষা শিখল কবে?—দেখুন রডা আগে পর্তুগীজদের হয়ে ধরা পড়ে চাটগাঁয়ের দিকে। তখন ইংরাজ গভর্নমেণ্ট ছিল না এবং রডা দিল্লী আগ্রাও যায় নি। ইংরাজদের রাজধানী দিল্লী, তাই তাদের সংস্রবে এলে হিন্দি বলা স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে রডার সে অবকাশ ছিল না। বরঞ্চ তার পূর্ববঙ্গীয় ভাষাতেই কথা বলা স্বাভাবিক। তারপর ম্যাপ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন—কোন পথ দিয়ে জল পথে আসে। এসব ওভারলুক করা প্রসঙ্গে—এসব ওভারলুক করতে পারি না আপনাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতা দেখে। আপনারা আসেন নাচ দেখতে, তাই আমাকে রাগ করতে হয় শিক্ষা দিতে হয়।'২২

প্রতাপাদিত্য ইতিহাসও নয়, নাটকও নয়—অথচ মঞ্চসফল নাটক কিনা জানা না গেলেও মঞ্চে সদাবাঞ্ছিত নাটকগুলির অন্যতম নাটকটি সাহিত্য বিচারেও কতখানি টেকসই সে সব কথা বলতে গিয়ে অনেকে বলে থাকেন যে নাটকটি কতকগুলি কিংবদন্তী দিয়ে রচিত আর বহু অনৈসর্গিক ঘটনায় ভারাক্রান্ত। কিন্তু নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ মঞ্চোপযোগী নাটকের গুণাগুণ সম্বন্ধে ততদিনে পূর্ণ সজাগ হতে

---

২২. নাট্যাচার্য্য শিশিকুমার—শঙ্কর ভট্টাচার্য্য।

পেরেছিলেন এবং যুগ প্রয়োজনের ডাকে তিনি সাড়া দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি জানতেন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটককে সমালোচক যে দৃষ্টিতে দেখেন, দর্শক সে চোখে দেখেন না। প্রতাপাদিত্য নাটকের মঞ্চ প্রয়োগ সম্বন্ধে আর একটি মন্তব্য :— (ক্ষীরোদপ্রসাদের) 'তিনচারখানি নাটক ভালই অভিনন্দন পেয়েছিল। কিন্তু ১৯০৩ সালে ষ্টারে অভিনীত প্রত্যাপাদিত্য নাটকের প্রথম রজনীর পরবর্তী প্রভাতে তিনি নিজেকে নাট্যকারের যশে মণ্ডিত হতে দেখেছিলেন।'২৩ ষ্টার ছাড়া বিভিন্ন সময়ে এই সর্বজনপ্রিয় এবং বাঞ্ছিত নাটকটির অভিনয় হয়েছিল বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে। এইসব রঙ্গমঞ্চগুলি হল—কর্ণওয়ালিস থিয়েটার, মিনার্ভা, মনোমোহন এলবেড, মিত্র, আর্ট থিয়েটার লিঃ, নাট্যমন্দির লিঃ, ম্যাডান থিয়েটার এবং ষ্টারে পুনরাভিনয়। এই নাটকটির চলচ্চিত্রে অভিনয়েরও সংবাদ পাওয়া যায়। প্রতাপাদিত্য নাটকের নামভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয় সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবৃতি পাওয়া যায়। সেইরকম একটি বিবৃতির অংশ বিশেষ 'ক্ষীরোদ প্রসাদ তার বহু অভিনীত পুরাতন নাটক প্রতাপাদিত্য কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে ম্যাডানদের হাতে দিলেন। নাম ভূমিকা গ্রহণ করলেন নির্মলেন্দু। নাটকের আকর্ষণ বাড়াবার জন্য ইংরাজীতে চুটকি অভিনয় বিখ্যাত ফ্যানিম্যানকে (ভদ্রলোক আসলে বাঙালী) ডেকে আনা হল এবং নাট্যকার তার জন্য রডার ভূমিকাটি আরো বাড়িয়ে দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি বাংলা রঙ্গালয়ে রডার ভূমিকাটিতে বোধহয় তিনিই করেছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয়। নির্মলেন্দুর অভিনয় দেখতে গেলুম। রঙ্গমঞ্চের উপরে প্রতাপাদিত্যের প্রথম অবির্ভাবটি হল অত্যন্ত চমৎকার। পুরুষোচিত পরম সুন্দর দেহ নিয়ে নির্মলেন্দু গোড়া থেকে করলেন দর্শকদের চিত্ত জয়—দৃশ্যের পর দৃশ্য, অঙ্কের পর অঙ্ক যতই এগিয়ে চলল নির্মলেন্দুর অনবদ্য ভাবভঙ্গি দেখে এবং উদাত্ত কণ্ঠের মোহনীয় আবৃত্তি শুনে ততই আমরা মুগ্ধ হতে লাগলুম। শেষ যবনিকাপাতের পর বুঝলুম বাংলা নাট্যজগতে আর একটি নূতন তারকা হল উর্ধ্বগামী। এইখানে আরো দুজন অতিবিখ্যাত অভিনেতাকে দেখেছিলুম প্রতাপাদিত্যের ভূমিকায়। নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয় কোথাও ওদের চেয়ে নিরস তো হয় নিই বরং স্থানে স্থানে হয়েছিল অধিকতর উচ্চশ্রেণীর।' ২৪

প্রধান নাট্যকাররূপে স্টারে একটানা নাটক লেখার ফাঁকে ক্লাসিক থিয়েটারের জন্য নাট্যকার লিখে দিয়েছিলেন রঘুবীর নাটকটি। তখনকার একটি হ্যাণ্ডবিলের উদ্ধৃতি শনিবার ২১শে কার্তিক ১৩১০ সাল, রাত্রি ৯টা।—সুপ্রসিদ্ধ ক্লাসিক থিয়েটারের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ও সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় আমাদের

২৩. নাট্যাচার্য্য শিশির কুমার—শঙ্কর ভট্টাচার্য্য।

২৪. যাঁদের দেখেছি—হেমেন্দ্রকুমার রায়।

সবিশেষ সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং আপাততঃ আমাদের প্রথম অভিনয় রজনীতে ক্ষীরোদবাবুর নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক রঘুবীর পুস্তকে রঘুবীরের অংশ গ্রহণ করিয়া আমাদের যারপরনাই উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

ক্লাসিকে রঘুবীর কিন্তু জমে নি, দেখতে দেখতে ক্লাসিকের নাভিশ্বাস উঠতে লাগল, গতি নিম্নমুখী হলে লাগল। ক্লাসিক থেকে রঘুবীরের আত্মপ্রকাশ মিনার্ভা থিয়েটারে। ক্লাসিক থিয়েটারের গতি যখন নিম্নমুখী সেই সময় মিনার্ভা থিয়েটারের ভার নিয়ে অমরেন্দ্র দত্ত রঘুবীর খুলেও তাঁকে বাঁচাতে পারেন নি। শিশিরকুমা র সেইাতলে পালটি দু'এক রাত্রির জন্যে ম্যাডান থিয়েটার খুলে তার অপরূপ রূপ দেখিয়ে সকলকে অবাক করে দিলেন। সবাই সেই সঙ্গে আরো বুঝলে কেবল গদ্যে নয়, পদ্যেও তাঁর কতখানি অধিকার।'২৫ ম্যাডান থিয়েটারে শিশির কুমার বোধ করি পুরা এক বৎসরও অভিনয় করেন নি, কিন্তু ওরি মধ্য দুখানি পুরানো নাটককে নূতন করে মঞ্চস্থ করে তিনি কেবল আংশিকভাবে প্রয়োগ পটুতার নিদর্শন দিলেন না; সেই সঙ্গে দেখালেন তার প্রতিভার বৈচিত্র্য। নাটক দুখানি হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত ও রঘুবীর' ২৫ক

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইনস্টিটিউটে ক্ষীরোদপ্রসাদের রঘুবীর নাটক অভিনীত হয়। দুবার এই অভিনয় হয়। বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্যে প্রথমবার, স্যার আশুতোষের সম্মানার্থে দ্বিতীয়বার। নাম ভূমিকায়, অবতীর্ণ হয়েছিলেন শিশির-কুমার স্বয়ং।

শিশিরকুমারকে কেন্দ্র করে রঘুবীর নাটকের অভিনয় সম্পর্কে নানান চিত্তাকর্ষক তথ্য পাওয়া যায়। শিশিকুমারের গলার জোর নেই বলে যে জনশ্রুতি ছিল তার উত্তরে রঘুবীর নাটক প্রসঙ্গে শিশিরকুমারের উক্তি—'গলা দেখাতে হলে রঘুবীর অভিনয় করতে হয়। ইনষ্টিটিউটে করেছিলুম······'গলা যা বার করার করবো রঘুয়া রঘুয়া বলে। মানুষ চমকে উঠবে।২৬

রঘুবীরের নাট্যচিন্তা একসময়ে বিশিষ্ট অভিনেতৃবৃন্দকে কীভাবে মাতিয়ে রেখেছিল ম্যাডানে রঘুবীর মঞ্চস্থ হওয়ার প্রস্তুতিপর্বে ওল্ড ক্লাবের একটি রাত্রির অভিজ্ঞতার কথায় তা প্রকাশ পেয়েছে। লিখেছেন বিখ্যাত গায়ক নলিনীকান্ত সরকার—'একটি রাত্রির কথা-শিশরকুমার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের রঘুবীর নাটকখানি কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে মঞ্চস্থ করার উদ্যোগ আয়োজন করছেন। রিহার্সাল চলছে। সে সময় শিশিরকুমারের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান রঘুবীর। এই রঘুবীর নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বেশীদিন চলে নি। কিন্তু শিশিরকুমার এই অচল নাটকটিকে

২৫· ২৫ক· গল্পভারতী—পৌষ ১৩৬৯—হেমেন্দ্রকুমার রায়।
(বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক)

২৬· নাট্যাচার্য শিশিরকুমার—শংকর ভট্টাচার্য।

সচল করার জন্য মনোনীত করেছেন।……অনেক রাত্রি পর্যন্ত এই অভিনয় প্রসঙ্গ চলত। সদস্যরা ক্রমে ঘুমিয়ে পড়তেন। কিন্তু শিশিরকুমারের চোখে ঘুম নেই। বোধহয় রাত্রি দুটো কি তিনটে। গাঢ়নিদ্রায় মগ্ন হয়ে আছি। শিশিরকুমার ঈষৎ ধাক্কা দিয়ে নাম ধরে ডাকলেন। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। বললাম, ব্যাপার কি? একটা বিশেষ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান শিশিরকুমার বললেন ঐ কোনটিতে একটু দাঁড়ান তো। আপনাকে জাফর হতে হবে। জাফর? হ্যা, রঘুবীরের সঙ্গে জাফরের সাক্ষাতের সেই সিনটা—দাঁড়ান না এখানে, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন। একটা প্যাঁচ মাথায় এসেছে। আর তিনি একই কথা বারবার বিভিন্ন ধারায় উচ্চারণ করে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ভাবের ব্যঞ্জনায় রঘুবীরের ভূমিকাটি রূপায়িত করতে লাগলেন '২৭

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ ম্যাডান থিয়েটারে রঘুবীর মঞ্চস্থ হল। শিশিরকুমার রঘুবীর ভূমিকায় নামলেন। এ অভিনয় দেখে গ্যালারিও মেতে উঠল। হ্যা, শিশির ভাদুড়ীর গলা আছে। এই অভিনয়ের কিছু ঐতিহাসিক তথ্যও পাওয়া যায় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের পাতায়। এই অভিনয় প্রসঙ্গে সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন লিখেছেন: রাত্রে রঘুবীর খোলা হবে। সেদিন মহাত্মা গান্ধী হলেন এ্যারেষ্ট। এ খবর কোলকাতায় পৌঁছিবামাত্র সন্ধ্যার প্রাক্কালে দোকান পাট বন্ধ হল। যারা রঘুবীরের পোষাক দেবে, তারা দিতে পারল না। অভিনয় বন্ধ দেওয়া হল না—উপায়? শিশিরকুমার মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আমি—তিনজনে পরামর্শ করে স্থির হল খদ্দর পরে রঘুবীর নামবেন। খদ্দর কোথায় পাওয়া যায়? দোকানপাট সব বন্ধ। হাতিবাগানের মোড়ে কর্ণওয়ালিস থিয়েটারের প্রায় সামনে আমার জানা এক ভদ্রলোকের কাপড়ের দোকান ছিল। ভদ্রলোক থাকতেন শ্যামপুকুর লেনে। তাকে ধরে নিয়ে এলুম, প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝিয়ে বললুম। …দোকান খুলে চুপিচুপি খদ্দর এনে আমার হাতে দিলেন তার গৃহে। সেই খদ্দর নিয়ে আমি এলুম কর্ণওয়ালিশে এবং শিশিরকুমার সেই খদ্দর পরে নামলেন মঞ্চে রঘুবীরের ভূমিকায়।'২৮

রঘুবীরের অভিনয় সে যুগে এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল। রঘুবীরের অভিনয়ে শিশিরকুমার সর্বত্রই বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছিলেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির লেখা থেকে সে সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য জানা যায়। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র লিখেছেন—ক্ষীরোদপ্রসাদের রঘুবীর নাটক নিয়ে শিশিরকুমার যখন পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর, দৃপ্ত বীরত্ব-ব্যাঞ্জক ভঙ্গিমা সমস্ত দর্শকদের চিত্রার্পিত করে প্রেক্ষাগৃহে রেখে দিলে। সারা নাট্য জগতে

---

২৭. হাসির অন্তরালে—নলিনীকান্ত সরকার।

২৮. নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার—শংকর ভট্টাচার্য্য।

বিরাট আন্দোলন উপস্থিত হল। দলে দলে দর্শক আসতে লাগল শুধু শিশির-কুমারের অভিনয় দেখতে।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মনীষী দিলীপকুমার রায় রঘুবীর অভিনয় দেখে শিশির-কুমারের অভিনয় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তার কিয়দংশের উদ্ধৃতি :······ তিনি রঘুবীরের ভূমিকায় প্রথমে উদ্বেল দ্বন্দ্বকে শান্ত করার চেষ্টার সময় যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন সেটাও যেমন কলাকারু-সম্মত, শেষে প্রতিহিংসার বাঁধাবন্ধন ছেদনের অসংযম প্রকাশের ভঙ্গিটিও তেমনি অশান্ত।' পুরাতন নাটক হলেও রঘুবীরের মধ্যে সত্যিকার নাটকত্বের উপাদান আছে যথেষ্ট। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের উপর সর্বপ্রথম তাকে পাংক্তেয় করেছেন শিশিরকুমারই। হেমেন্দ্রকুমার রায়-এর লেখা থেকে উদ্ধৃতি :—'রঘুবীর হচ্ছে একটি অদ্ভুত চরিত্র। আমাদের নাট্যসাহিত্যে এরূপ চরিত্র আছে বলে মনে হয় না। জন্ম তার ডাকাতের ঘরে, দেহের মধ্যে আছে দুর্দান্ত ভীলরক্ত। কিন্তু সে লালিত পালিত হয়েছে ঋষিকল্প সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের কাছে। নিজের দেহে অসুরের মত শক্তি থাকলেও তাকে ব্যবহার করতে চাইত না। ····· তারপর একদিন পিশাচের ভয়াবহ অত্যাচারে হল কুম্ভকর্ণের মহাজাগরণ। খসে পড়ল সংযম ও সাত্ত্বিকতার খোলস। রঘুবীর ফিরে পেল তার বনবাসী নির্মম ও দুর্দমনীয় ভীল প্রকৃতি। রঘুবীর চরিত্রের এই দুই পরস্পর বিরোধীভাব শিশিরকুমারের অভিনয়ে চমৎকার ফুটে ওঠে। 'রঘুবীরের রঘুয়াতে রূপান্তরিত হওয়ার দৃশ্যে তার যে অভিনয় তা তুলনাবিহীন। যে ভঙ্গিটা সাধারণ দৃষ্টিতে হাস্যকর, সেইটা কী করে বিরাট climex রচনা করতে পারে তা জানতে গেলে ঐ দৃশ্যের অভিনয় দেখা দরকার। রঘুবীরের অভিনয় বাংলার মঞ্চে অবিস্মরণীয় কীর্তি। প্রান্তর দৃশ্যে শিশিরকুমারের অবিস্মরণীয় অভিনয় সম্পর্কে এ অভিমত প্রখ্যাত অভিনেতা শম্ভু মিত্রের। ঐ দৃশ্যের অপরূপ অভিনয় সাফল্য সম্পর্কে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের অভিমত—রঘুবীর ভীল দস্যু—অন্যায় অত্যাচার দেখে যেদিন তার মন হল সচেতন সেদিন সে উঠলো যেন নবজন্মে জেগে। অন্যায়ের-প্রতিকার-কল্পে সে শানিত ছোরা হাতে মার-মূর্তিতে জাগলো—নাটকে অত্যাচার সম্বন্ধে আভাসে বিদেশী শাসকদের অত্যাচার পীড়নের ইঙ্গিত ছিল—ছোরা লুফতে লুফতে যেভাবে শিশিরকুমার এ দৃশ্যে মঞ্চ থেকে নিক্রান্ত হতেন, সে দৃশ্যে দর্শকরা উপলব্ধি করতেন এ শুধু রঘুয়ার জাগরণ নয়—আমাদেরও এমনি ভাবে জাগতে হবে। রঘুবীরের এ অভিনয় বাংলার মঞ্চে অবিস্মরণীয় কীর্তি।

রঘুবীর অভিনয়ের সেদিনের বিশিষ্ট দর্শক মনি বাগচির মন্তব্য :···নর্মদার উদ্দেশ্যে 'উত্তাল তরঙ্গময়ী ভীষণ নর্মদা' বলে রঘুবীররূপী শিশিরকুমার যে দীর্ঘ উক্তি করতেন সেই উদাত্ত স্বরলহরী দর্শকচিত্তকে সহজেই আপ্লুত করতো। রঘুবীরকে চিনতে পেরে অনন্তরাও যখন বললেন, এ কী মূর্তি ! রঘুবীর রঘুবীর। সেই চরম মুহূর্তে রঘুবীরের কণ্ঠে তখন শোনা যেত—'রঘুয়া। 'রঘুয়া। রঘুয়া। রঘুবীর নহি আর পিতা—মরে গেছে রঘুবীর।' তখন স্তব্ধ বক্ষে রুদ্ধশ্বাসে

নির্বাক নিস্পন্দ নিথর হয়ে দর্শকগণ উপলব্ধি করতেন নাটকের সমগ্র নাট্যরসকে শিশিরকুমার কোন Hieght. এ পৌঁছে দিলেন। এ অভিনয়ের তুলনা নেই।

রঘুবীর অভিনয় সম্বন্ধে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আরো অনেক স্মৃতিচারণ-এর ইতিবৃত্ত থেকে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। যেমন একটি সাময়িক পত্রের বর্ণনার একাংশ ঃ—গত বুধবার নাট্য মন্দিরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় রঘুবীর নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। সেদিন দর্শকদের ভীড় এতবেশী হয়েছিল যে অনেককে ক্ষুন্ন হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। শিশিরকুমারের রঘুবীরের অভিনয় একটা অদ্ভুত ব্যাপার। যেখানে ভীল সন্তান রঘুবীর তার ব্রাহ্মণত্বের খোলস ফেলে দিয়ে আবার সেই হিংস্র ও প্রতিহিংসাপরায়ণ ভীল মনঃস্তত্ব ফিরে পেয়েছে—ব্রাহ্মণত্ব ও ভীলত্বের দ্বন্দ্ব ও জাফরকে হত্যা করবার দৃশ্যে শিশির বাবুর অভিনয় দেখে দর্শকদের মনে সময় সময় সত্য সত্যই ভীতির সঞ্চার হত।'২৯ শিশির ভাদুড়ীর স্মৃতি চারণ থেকেও রঘুবীর এর অভিনয় এবং সাজসজ্জার কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। 'ক্ষীরোদবাবুর রঘুবীর ম্যাডান কোম্পানিতে করিয়েছিল। খুব ভালো সাজগোছ করিয়েছিল। রঘুবীরকে মাথায় পালক পরিয়েছিল। কিন্তু রঘুবীর যে ব্রাহ্মণ সে কথা ভুলে গিয়েছিল।'৩০

ক্ষীরোদপ্রসাদ তখনও ষ্টার থিয়েটারে প্রধান নাট্যকাররূপে যুক্ত রয়েছেন। একটানা ষ্টারের জন্য সপ্তমপ্রতিমা, সাবিত্রী, বেদৌরা, প্রতাপাদিত্য রচনা করে দেওয়ার পর তিনি ষ্টারে অভিনয়ের জন্য একটি পৌরাণিক নাটক লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন—তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি বৃন্দাবনবিলাস। বৃন্দাবনবিলাস গীতি-বহুল নাটক। ধর্মপ্রাণ বাঙালীর কাছে এর আবেদন নাট্যাভিনয়ের জন্যে যতখানি, বিষয়বস্তুর জন্যে তার চেয়ে অনেকবেশী। গীতিবহুল নাটকে গানের প্রধান্যের জন্য সুর সৃষ্টির ভার নিয়েছিলেন রামতারণ সান্ন্যাল ও প্রভুপাদ মোহিতলাল গোস্বামী। বাংলার রঙ্গমঞ্চে এই পর্বে ক্ষীরোদপ্রসাদ এর নাট্যকাররূপে স্বীকৃতি পাওয়া সত্বেও এক আলিবাবা, প্রতাপাদিত্য ছাড়া অন্যান্য নাটকগুলি দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন পায় নি। বহুরাত্রি প্রতাপাদিত্য নাটকটি চলল। ষ্টারের বেশ অর্থসমাগম হল। প্রতাপাদিত্যের পর ষ্টার আবার পিছিয়ে পড়তে লাগল। মঞ্চস্থ হল ক্ষীরোদপ্রসাদের রঞ্জাবতী·····।'৩০ক এ নাটকে দানীবাবুর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা অবিস্মরণীয়। ষ্টারে তিনি রঞ্জাবতীতে করেছিলেন বলাই-এর ভূমিকা।

রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগ না থাকলে সার্থক নাটক লেখা সম্ভব নয়—সে সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাঁর পূর্বেকার রচিত কয়েকটি নাটকের

২৯. নাচঘর—চৈত্র, ১৩৩১।

৩০. ৩০ক. অথনটঘটিত—সূত্রধার।

সাফল্যে অনুপ্রাণিত এবং অন্য কয়েকটির দর্শকগণকে আকৃষ্ট করার অক্ষমতাজনিত বেদনায় উন্নতমানের মঞ্চসফল নাটক রচনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নাট্যকার অধ্যাপনা বৃত্তি ত্যাগ করে নাট্যরচনার জন্যে মনোনিবেশ করলেন।

অধ্যাপনাবৃত্তি ত্যাগ করার পর নাট্যরচনার ক্ষেত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদ আরো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রতাপাদিত্য রচনার পর থেকেই দেশে স্বাদেশিকতার বন্যা বইতে থাকে। স্বদেশ প্রেমের বন্যার উন্মাদনার ফাঁকে ফাঁকে নাট্যকার বৈচিত্র্যের সন্ধানে নানা বিষয়বস্তুর ওপর নাটক লিখে মঞ্চের দর্শকদের খুসী করার প্রয়াস পেয়েছেন। এই সূত্রেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়েও উলূপী নাটক অভিনয় হতে দেখা যায়।

স্বাদেশিকতার প্রবহমান বন্যায় একে একে স্বাভাবিকভাবেই মঞ্চস্থ হয়েছে' পদ্মিনী' (১৯০৬) এবং পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৭)—ঐতিহাসিক নামের মোড়কে ইতিহাস আশ্রয়ী জাতীয়তাদী নাটক। এসব নাটকের মঞ্চসাফল্য নাটকীয় গুণাবলীর মানদণ্ডে নয়, যুগোপযোগী নাট্য উপাদানের আবেদনে। সিরাজদৌলা, মীরকাসিম, ছত্রপতি শিবাজী প্রভৃতি নাটকগুলির সঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদের পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত-এর অভিনয়ও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রাজনৈতিক কারণে—বৃটিশ রাজের দমননীতির প্রচণ্ড আঘাতের ফলশ্রুতি হিসাবে।

অনুল্লেখ্য নাট্যানুষ্ঠান রক্ষ ও রমনীর পর ঐতিহাসিক নাটক চাঁদবিবি মঞ্চস্থ হল। কোহিনুর মঞ্চে এটির প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১১ই আগস্ট। অভিনেত্রী তারাসুন্দরীর অভিনয় জীবনের সঙ্গে নাটকটি বিশেষভাবে জড়িত। ক্ষীরোদপ্রসাদের চাঁদবিবি সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী তারাসুন্দরীকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা দান করে।'৩১ চাঁদবিবি নাটকে আর একজন অভিনেতার উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের কথা স্মরণ করা যায়। শ্রীমান মন্মথ পাল (হাঁদুবাবু) একজন সুযোগ্য অভিনেতা। সর্বরসাভিনয়ে ইহার তুল্য কৃতিত্ব লক্ষিত হয় না। চাঁদবিবি নাটকে রঘুবীর ভূমিকা অভিনয় করিয়া ইনি স্থায়ী যশের আসন লাভ করিয়াছেন।'৩২

চাঁদবিবি অভিনয়ের একই বছরে নাট্যামোদীদের রুচি বৈচিত্র্যের চাহিদার যোগান হিসাবে 'আলাদিন' নাট্যানুষ্ঠান-এর আয়োজন করতে হয় সর্বপ্রথম স্টার থিয়েটারে। প্রথম অভিনয়-এর তারিখ ২৫শে ডিসেম্বর ১৯০৭।

সর্বপ্রথম দেশাত্মবোধক নাটকের মঞ্চসাফল্যের সূচনা নাট্যকারের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে গিরিশচন্দ্রের একের পর এক মঞ্চসফল নাটক রূপায়িত হ'য়ে সে সাফল্যের দিগন্তকে বিস্তৃত করে। সিরাজদৌলার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে গিরিশচন্দ্র মীরকাশিম রচনায় হাত দিলেন। সেটা ১৯০৬ সাল। দেশ স্বদেশী আন্দোলনে মেতে উঠেছে। প্রতিরাত্রে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ। অনেকদিন

৩১. অপূর্ব ভট্টাচার্য—প্রবন্ধ—ভারতবর্ষ

৩২. নাট্যমন্দির—ফাল্গুন—চৈত্র ১৩২০।

তার অভিনয় চলল। মিনার্ভা কেঁপে উঠল। মীরকাশিম অভিনয়ের বছর মিনার্ভা প্রায় একলাখ টাকা অর্জন করল। থিয়েটারের মালিকরা দেখলেন, দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক নামাতে পারলে স্বদেশী আন্দোলনকে সহায়তা করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে দুপয়সা ঘরে আসবে। সে নাটককে যথাযথভাবে ইতিহাস অনুসরণ করলে চলবে না। তারমধ্যে যে দেশ-সেবক থাকবে তাকে প্লাটফরম-স্পীকার হতে হবে, উচ্ছ্বাসে নাটকখানি ভরা থাকবে। তবেই সে নাটক জমবে। (অথনট ঘটিত, সূত্রধার)। এইসব মঞ্চসাফল্যের অনিবার্য ফলশ্রুতি ক্ষীরোদপ্রসাদ-এর' পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' ও 'নন্দকুমার 'ঐতিহাসিক নাটক—১৩১৪—১লা ফেব্রুয়ারী ১৯০৮)। পলাশীর প্রায়শ্চিত্তের মীরকাশিম-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন অমৃতলাল মিত্র। নতুন নাটকে এই তাঁর শেষ অভিনয়। যে কণ্ঠস্বর ছিল তাঁর প্রধান সম্পদ ক্যানস্যার রোগে তা চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। নন্দকুমারের নাম ভূমিকায় নামলেন একজন নবাগত, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তিনি আগেও নামেন নি। পরেও নামেন নি। অপূর্ব অভিনয় করে গেলেন ঐ চরিত্রে।"৩৩

নন্দকুমারের পর দাদা ও দিদি রঙ্গনাট্য। স্বাদে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা। আসলে কিন্তু রূপকের মাধ্যমে স্বাদেশিকতার উন্মাদনায় আত্মনিয়োগ করা। অভিনয় হয়েছিল মিনার্ভায়—নাটকটিকে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল 'দ্ব্যর্থবোধক রাজনৈতিক চুটকি'। একটি স্মৃতিচারণ—হাঁদুবাবু নিয়েছিলেন দাদার পার্ট। তিনি যখন লাফ দিয়ে উঠে নেচে নেচে বলতেন, জিঘাংসা জুগুপিসা, টিকিমিসা, বিজীলিসা তখন হাততালিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হয়ে উঠত। আমি এই বই-এর অভিনয় সাত আটবার দেখেছি।'৩৪

ঐতিহাসিক নাটক 'অশোক' মঞ্চস্থ হওয়ার অল্পদিন পরেই বাসন্তী গীতিনাট্যের আবির্ভাব। এই গীতিনাটকটির একটু ইতিহাস আছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ তখন রয়েছেন নিমতিতায়, কোলকাতার যে থিয়েটারের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন সেখান থেকে ফরমায়েশ এল—দোলযাত্রার অভিনয়ের জন্য অতি সত্বর একখানি নূতন নাটিকার প্রয়োজন। দোলযাত্রার আর দেরী নাই, দিন দশেক বাকি। মাত্র দুটি দিনে তিনি বাসন্তী রচনা করে পাঠিয়ে দিলেন কোলকাতায়।'৩৫

গীতিনাট্যের চাহিদা মেটাতে 'বাসন্তীর' পরেই বরুণার প্রথম আত্মপ্রকাশ গীতিনাট্যের পরিচিতি নিয়ে কোহিনুর থিয়েটারে। তারিখ ১৩১৫—২৭শে আষাঢ়। একদিনের অভিনয় সংবাদ—অভিনেতাদের মধ্যে শিববর্মারূপে কার্তিক-বাবু ও অভিরামরূপে হাঁদুবাবুর অভিনয় অতুলনীয়। দর্শকদেব মধ্যে বোধহয় অতি গম্ভীর লোক ও এদের অভিনয় দেখে উচ্চহাস্য সংবরণ করতে পারেন নি।

৩৩. অর্থনটঘটিত—সূত্রধার।
৩৪. কথাসাহিত্য—পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।
৩৫. শ্রদ্ধাস্পদেষু— নলিনীকান্ত সরকার।

পুণ্ডরীকের ভূমিকায় সত্যেনবাবু যথাযথ নন। পুণ্ডরীক যেখানে বরুণাকে হত্যা করতে উদ্যত যেখানে বরুণার গান—প্রাণ নেবে ও কথা প্রাণ কয়ো না···। গান শুনে তার হাত থেকে ধনুক খসে গিয়ে হত্যার পরিবর্তে তাকে ভালবেসে ফেল্লে—এই স্থানটিই বরুণার সর্বপ্রধান স্থান। বরুণার মূলকথা সেটা। মানবহৃদয়ের মিলন ও বিরহের চিরন্তন খেলা এরা রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। সমস্ত অভিনয়ের মধ্যে এইটাই সবচেয়ে উপভোগ্য হয়েছিল।'৩৬

শিক্ষামূলক রঙ্গনাট্য ভূতের বেগার-এর অভিনয়ের পর মঞ্চে দেখা দিল 'বাংলার মসনদ'। মিনার্ভা থিয়েটারে একটি অভিনয় সম্বন্ধে সংবাদ—'জাতীয়তামূলক নাটক পুলিশের কাছ থেকে পাশ করিয়ে নেওয়া দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে।······ এরপর অভিনীত হল ক্ষীরোদপ্রসাদের বাংলার মসনদ। সিরাজদ্দৌলার পূর্বেকার ঘটনা নিয়ে নাটকখানি রচিত। বাংলার মসনদের ওপর ভগবানের অভিশাপ। এই কথাই নাটকে বলা হয়েছে। নাটকখানি জমল না।'৩৭ বাংলার মসনদ নাটকটি মঞ্চে যে সাড়া জাগাতে পারেনি সংবাদটি থেকে সেকথা সহজেই অনুমান করা যায়। গীতিনাট্য পলিন-এর পর কল্পনামূলক নাটক মিডিয়া প্রথমে অভিনীত হয় মিনার্ভা থিয়েটারে—১৩১৯—২২শে আষাঢ়, শনিবার। বিজ্ঞানভিত্তিক নাটকটিকে আপ্রাণ চেষ্টায় যারা প্রাণবন্ত করার চেষ্টার ত্রুটি করেন নি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)—আলমনসুর ভূমিকায় এবং মিডিয়া ভূমিকায় তারাসুন্দরী এবং নীরদা-সুন্দরী।

আবার একখানি ঐতিহাসিক নাটক খাঁজাহান কোহিনুর-এ মঞ্চস্থ হওয়ার পর বহু আলোচিত পৌরাণিক 'ভীষ্ম' মঞ্চস্থ হয়। একসঙ্গে একই সময় তিনখানি নাটক লেখা হয়েছিল ভীষ্মের জীবনী নিয়ে। নাট্যকার তিনজন হলেন— ডি এল. রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং হরিশচন্দ্র সান্যাল। ডি এল. রায়ের ভীষ্ম অভিনীত হয় নি, তবে বাজারে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। একমাত্র ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীষ্মই মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। মঞ্চাভিনয়ের ব্যাপারে এই নাটকটির চরিত্র ও সংলাপে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রায় সমস্ত নাটকই আমাদের নিমতিতা হিন্দু থিয়েটারে অভিনীত হতো। স্বয়ং নাট্যকারের উপস্থিতিতে ভীষ্মেরও রিহার্সাল আরম্ভ হল আমাদের থিয়েটারে। থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ও শিক্ষক স্থানীয় জমিদার মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় ক্ষীরোদ-প্রসাদকে বললেন, দাদা ডি. এল. রায়ের ভীষ্ম পড়লাম। ব্যাসের চরিত্রটি তার নাটকে অনেকটা স্থান অধিকার করেছে, আপনি কিন্তু ব্যাসকে একেবারে বাদ দিয়ে গেছেন।······মহেন্দ্রবাবুর মন্তব্য শুনে ক্ষীরোদবাবু উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন, 'ব্যাস? ব্যাস কি তুমি চাও? ও আর এমন কি কঠিন কথা। কালই তোমার ব্যাসের ব্যবস্থা করে দেবো।'৩৭

৩৬. নাচঘর—১১ই পৌষ ১৩৩১।

৩৭. অথনটঘটিত—সূত্রধার।

পরের দিন সন্ধ্যায় আমরা রিহার্সালে বসেছি, ক্ষীরোদপ্রসাদ বসলেন তার সদ্য লেখা ব্যাসের চরিত্রটি শোনাতে। ব্যাস কবি, সুতরাং ব্যাসের সংলাপ যতদূর কবিত্বপূর্ণ হতে পারে, নাট্যকার তাতে কোন ত্রুটি রাখেন নি। একটি দৃশ্যের মাঝখানে এই ব্যাস চরিত্রটি সংযোজিত হয়েছে। আমরা সকলেই খুশী হলুম ব্যাস চরিত্রটি পেয়ে, কিন্তু নাট্য-সরস্বতী কি ভাবলেন, তা তিনিই জানেন। কোলকাতার রঙ্গমঞ্চ কিন্তু ভীষ্ম অভিনয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদের এই নব সংযোজিত অংশ গ্রহণ করেনি।'৩৮

'ভীষ্মের প্রথম পরিকল্পনা—শান্তনু। ডি. এল. রায়ের ভীষ্মের প্রকাশকাল ১৯১৪ খৃস্টাব্দ (৮ই জানুয়ারি) তুলনামূলক বিচারে মঞ্চ সাফল্যের মাপকাঠিতে ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীষ্ম অধিকতর সফলতা অর্জন করেছে।'৩৯

'ভীষ্মের অভিনয় সম্বন্ধে আরো কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। যেমন মনোমোহন থিয়েটার (নাট্য মন্দির) ভীষ্ম—নবম আবির্ভাব। ভীষ্মের ভূমিকায় শিশিরকুমার ভাদুড়ী। আর একটি সংবাদ কণা—ইনষ্টিটিউটে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর ভীষ্ম নাটকের অভিময় হল। শিশিরকুমার এই নাটকে অভিনয় শিক্ষক ছিলেন। একটি আমাত্যের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালের ভাইসচ্যানসেলর স্বর্গত নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত। শিশিরকুমার-এর ভীষ্মের অভিনয় প্রসঙ্গে বলেছে।··· ভীষ্মের প্রথম অভিনয় হয় মনোমোহনে। প্রথমে অম্বা আর শিখণ্ডী করেছিল চারুশীলা। খুব ভালো করেছিল।'৪০

অনুল্লেখ্য রঙ্গনাট্য 'রূপের ডালি' মঞ্চস্থ হওয়ার পর 'নিয়তি' নাটক নিয়ে মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ালেন নাট্যকার। মিনার্ভা থিয়েটারে নাটকখানি যথারীতি মঞ্চস্থ হয়। তবে এ নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে মার্জিত রুচির শিক্ষিত দর্শক সম্প্রদায় আশানুরূপ খুশী হতে পারেন নি। তাদের আক্ষেপ···প্রতাপাদিত্য ও চাঁদবিবির নাট্যকার তাঁহার স্নিগ্ধ লেখনীকে ইতিবৃত্তের অবদান কীর্ত্তনে নিরস্ত্র রাখিয়া রূপের ডালি ও নিয়তি প্রভৃতি আজগুবি গল্পের প্রসাধন প্রক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করিয়াছেন। উচ্চাকাংখী নাট্যানুরাগীদের মুষ্টি ভিক্ষাদানের দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।'৪১ মিনার্ভায় একধিনের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা—পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'নিয়তি' নামে একখানি তিন অঙ্কে পরিপুষ্ট উপন্যাসমূলক নাটক লিখিয়াছেন। মিনার্ভায় অভিনীত হইতেছে। নিয়তির ক্ষমতা যে অপ্রতিহত ইহা সপ্রমান করাই যেন নাটকটির

---

৩৮. শ্রদ্ধাস্পদেষু—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—নলিনীকান্ত সরকার।

৩৯. নাট্যমন্দির অগ্রহায়ণ—১৩২০।

৪০. শিশির সান্নিধ্যে—রবি মিত্র।

উদ্দেশ্য। নাট্যকারের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র গল্পকে ফেনাইয়া ভাষার চটকে জমজমাট করিয়া কৃতী নাট্যকার তাহাকে দর্শকবৃন্দের উপভোগের সামগ্রী করিয়াছেন। নাটকে সব চরিত্রই বেশ পরিপাটিরূপেই ফুটিয়াছে। নাট্য নৃত্যগীতেরও অভাব নাই।······শ্রীমান সুরেন্দ্র ঘোষ (দানীভায়া) সুস্থ হইয়া বারাণসী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং মিনার্ভায় অভিনয়ানুষ্ঠানে পুনরায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নিয়তি নাটকে সুরেন্দ্রনাথ ধনাঢ্য······ভাড়ু দত্তের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। স্বভাব অভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ যে কারণেই হোক এই ভূমিকায় তেমন সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই।'৪২

আহেরিয়া বাদশাজাদীর পর রামানুজ শীর্ষক একটি ধর্মমূলক নাটকের অভিনয়ের ব্যাপারে কিছু চিত্তাকর্ষক তথ্য পাওয়া গেছে। ভীষ্ম নাটকের মত রামানুজ নাটক নিয়েও গোল বেধেছিল। এই নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়নি। কেন অভিনীত হয়নি সেই প্রসঙ্গে—'ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ আর অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দু'জন নাট্যকারই একসঙ্গে রামানুজ রচনা আরম্ভ করেছিলেন। ভীষ্মের বেলায় ক্ষীরোদপ্রসাদের ভাগ্যলক্ষ্মী জয়লাভ করেছিল। এবারে কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে হার মানলেন। একদা এক অশুভলগ্নে ক্ষীরোদপ্রসাদ দেখেন যে, তার গৃহ থেকে রামানুজের পাণ্ডুলিপিখানি চুরি হয়ে গেছে। আশ্চর্য্য রকমের চুরি। সহস্র চেষ্টাতেও তার চোরাইমালের উদ্ধার হলো না। ওদিকে অপরেশচন্দ্রের রামানুজের রিহার্সাল আরম্ভ হয়ে গেল। অপরেশচন্দ্রের 'রামানুজ' মঞ্চস্থ হওয়ার প্রাক্কালে ক্ষীরোদপ্রসাদ অকস্মাৎ একদিন দেখতে পেলেন তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে রামানুজের পাণ্ডুলিপিখানি কক্ষমধ্যে ফিরে এসেছে। পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সে নাটক আর অভিনীত হল না কোলকাতার রঙ্গমঞ্চে। মহেন্দ্রবাবু তাঁর হিন্দু থিয়েটারে রামানুজ মঞ্চস্থ করে ক্ষীরোদপ্রসাদকে খুসী করলেন।'৪৩

'বঙ্গে রাঠোর'-এর পর আবার সাড়া জাগানো গীতিনাট্য 'কিন্নরী'। নাচে গানে উপভোগ্য এই নাটক সেযুগে স্মরণ করিয়ে দিল 'আলিবাবা' নাটকের কথা। মঞ্চের চাহিদা মেটানোর জন্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যান্য নাটকের সঙ্গে তুলনা করলে 'কিন্নরী'র প্রশংসা করা যায় না। কিন্তু গ্যালারী দেবতাদের লীলা খেলা বোঝা দায়। ক্ষীরোদপ্রসাদের কোন কোন উৎকৃষ্ট নাটক তাদের মনে ধরে নি অথচ কিন্নরী দেখবার জন্যে মিনার্ভা থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহে ভিড় ভেঙ্গে পড়তে লাগল। পালাটির আগাগোড়া ছেলে মানুষীতে ভরা থাকলেও তার দুটি ভূমিকা উৎপল ও মকরী ছিল প্রধান আকর্ষণ। আলিবাবার হুসেন ও মর্জিনার মত তাদেরও নাচ-

---

৪১. ৪২. নাট্যমন্দির ফাল্গুন চৈত্র—১৩২০।

৪৩. শ্রদ্ধাস্পদেষু : ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—নলিনীকান্ত সরকার

গান হাসির কথা দর্শকরা অত্যন্ত উপভোগ করতো। উৎপল ও মকরীর ভূমিকা গ্রহণ করতেন যথাক্রমে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু ও চারুশীলা।'৪৪

মিনার্ভায় ১৯১৮ সালে কিন্নরীর অভিনয় হয়েছিল এবং সে অভিনয় দেখতে দেখতে বেশ জমে উঠেছিল এবং জনপ্রিয়ও হয়েছিল। 'নাচঘর'-এর সংবাদে প্রকাশ —কিন্নরীতে উৎপল-এর ভূমিকায় নৃপেন্দ্রচন্দ্র অভিনয়ের দিক দিয়ে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এই নাটকটির নাট্যসত্ত্ব নিয়ে ষ্টার ও মিনার্ভার মধ্যে দ্বন্দ্বও দেখা দিয়েছিল। নাটকটি দেখার জন্য লোক ভেঙ্গে পড়তে লাগল। কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পর নৃপেন বসু মিনার্ভা ছেড়ে চলে যাওয়ায় তারাসুন্দরী পুরুষ বেশে অবতীর্ণা হলেন উৎপলের ভূমিকায়। দ্বিগুণ জমে উঠল কিন্নরীর অভিনয়। এই দেখে ষ্টার মিনার্ভা থেকে তারাসুন্দরীকে ছাড়িয়ে এনে তাকে দিয়েই ঐ কিন্নরীর অভিনয় আরম্ভ করল। দর্শক এখন মিনার্ভা ছেড়ে ষ্টারে ভিড় করল। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আদালত পর্যন্ত গড়াল।

পৌরাণিক নাটক 'মন্দাকিনীর' অভিনয়ের পর বহু আলোচিত শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় ধন্য 'আলামগীর' নাটক-এর মঞ্চাভিনয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। নাটকটি হয়তো আদৌ কোলকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হত না যদি না একদিন একটা ঘটনার মোড় ঘুরতো। 'একবার কোলকাতা থেকে তিনি (ক্ষীরোদ-প্রসাদ) ফিরে এলেন। দারুন উত্তেজিত। বললেন, এতদিন পরে থিয়েটার-ওয়ালার আমাকে অপমান করলে হে? আমার নাটক ফিরিয়ে দিলে,।······ক্ষীরোদ-বাবু একখানি ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন, তখন তার নাম ছিল 'ভীমসিংহ'। সে সময় তিনি যে থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তার কর্তৃপক্ষ মনোনীত না করে নাটকখামি ফিরিয়ে দিয়েছে। এই অমর্যাদার জন্যে নিদারুণ মর্মাহত হয়ে তিনি আমাদের কাছে মনের দুঃখ প্রকাশ করেছেন! নিমতিতার জমিদার বাড়ীতে দোলযাত্রার উৎসবে কোলকাতা থেকে মথুরা-শার যাত্রার দল এসেছে।······অভিনয় হচ্ছে পদ্মিনী নাটকের। যাত্রার দলের ম্যানেজার ক্ষীরোদবাবুর ঘরে বসে। দুজনের কথাবার্তা শুনে মনে হলো, ক্ষীরোদবাবু ভীমসিংহ নাটকখানি যাত্রার দলে দেওয়াই স্থির করেছেন। দরদস্তুর চলছে এ নিয়ে। এ খবরটি জমিদার মহেন্দ্রবাবু জানতে পেরে ক্ষীরোদপ্রসাদকে নিরস্ত্র করলেন একার্য থেকে। এই উপেক্ষিত নাটক-খানির সংস্কৃত (মার্জিত) রূপ পরবর্তী যুগের 'আলমগীর' যার অভিনয় আজ পর্যন্ত সগৌরবে চলেছে।'৪৫

আলমগীর মঞ্চস্থ হওয়ার আরো কিছু নেপথ্যকাহিনীও আছে। শিশির ভাদুড়ীর ভাষায়—'বইটা অপরেশবাবু নিয়েছিলেন। মদন কোম্পানির ওখানে

---

৪৪. যাঁদের দেখেছি—হেমেন্দ্রকুমার রায়।

৪৫. শ্রদ্ধাস্পদেষু—নলিনীকান্ত সরকার

আমি কোন বই পছন্দ করছি না। ওরাও আমাকে তাড়াতে তৈরি। এমন সময় মহেন্দ্রবাবু বললেন, ক্ষীরোদবাবুর নাটক প্লে করো। খোঁজ করতে উনি বললেন, বই তো আছে, কিন্তু সেটা যে অপরেশবাবুর কাছে আছে। বললুম, পড়াতে পারেন ?······পড়া হল, খুব খারাপ লাগল না। ওকে বললুম, কিছু বদলান দরকার। বললেন, না ভায়া কোটোটেটো না। আমি আর ললিত মিলে বেশ করে কাটলুম। তখন বইটার নাম ছিল 'ভীমসিংহ'। অভিনয় ব্যবস্থা হল। মহেন্দ্রবাবু পাঁচশ টাকা দিয়ে 'রাইট' কিনে নিলেন। সবাই বলল, ও বই দাঁড়াবে না। কিন্তু প্রথমদিনেই স্বপ্নদৃশ্য থেকে বইটা আলোড়ন তুললো।'৪৬

গিরিশচন্দ্রের আকস্মিক পরলোক-গমনের অব্যবহিত পরেই বাংলা রঙ্গালয়ে এবং নাট্যজগতে ঘন অন্ধকার নেমে এল। ঠিকমত বলতে গেলে গিরিশ যুগের অবসান হল। দ্রুত অগ্রগতি ব্যাহত হল—বাংলা রঙ্গমঞ্চ অবনতির পথে পা বাড়াতে বাধ্য হল। এদিকে বাঙালীর মনে যে নাট্যপিপাসা জাগিয়ে গিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র সে পিপাসা চরিতার্থ না হওয়া পর্যন্ত রঙ্গালয়গুলির কর্তৃপক্ষের মনে স্বস্তি ছিল না। বাংলা নাটকের অভিনয়ের ক্ষেত্রে দীর্ঘ দশ বছরের বন্ধ্যাবস্থা কেটে যাওয়ার পর বাঙালীর প্রাণে সদা জাগা নাট্য পিপাসা মেটাবার জন্যে সৃজনশীল শিল্পী সন্ধানের কাজ চলতে লাগল। কোলকাতার তিনটি নামকরা নাট্যমঞ্চ, স্টার, মিনার্ভা ও মনোমোহন-এর তখন নাভিশ্বাস উঠছে। 'বাংলা' নাট্যমঞ্চের এই শোচনীয় অধঃপতনের পূর্ণ সুযোগ নিলেন ম্যাডান থিয়েটার স্বত্বাধিকারী পারসী ধনকুবের জে এফ্ ম্যাডান। নতুন প্রতিভার সন্ধানে প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর মাধ্যমে ম্যাডান কোম্পানি পেশাদার অভিনেতা হিসাবে লাভ করলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে। বিজ্ঞাপন বেরুল ঃ—কর্ণওয়ালিস রঙ্গমঞ্চে বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানির নাট্যনিবেদন পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম. এ বিরচিত নূতন ঐতিহাসিক নাটক আলমগীর। নাম ভূমিকায় শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী এম.এ.।' বিজ্ঞাপনের প্রতিক্রিয়ায় তুমুল চাঞ্চল্য ও বিরাট আলোড়ন জেগেছিল সে যুগের শিক্ষিত সমাজ ও নাট্যরসিক মহলে। সে ঘটনা ছিল অভাবনীয়। ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রধান নাট্যকাররূপে মর্যাদা পেলেন ম্যাডান কর্তৃপক্ষের কাছে। তারা তাঁকে প্রধান নাট্যকাররূপে নিয়োগ করলেন। আলমগীর নাটকটি শিশিকুমারের অভিনয় জীবনের অন্যতম কীর্তিস্তম্ভ রূপে চিহ্নিত হওয়ায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণে নাটকটির কোন অসুবিধা হয়নি।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মতে তিনটি বিস্ময়কর বস্তুর মধ্যে অন্যতম শিশির ভাদুড়ীর বাদশা আলমগীররূপে আত্মপ্রকাশ। 'তিনটি বিস্ময়কর আবির্ভাব দেখেছি। একটি আকাশে, একটি জীবনে আর একটি স্টেজে।'

---

৪৬. শিশির সান্নিধ্যে—রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু।

আলমগীর নাটক দর্শনে শ্রীমণি বাগ্‌চির মন্তব্য :—মঞ্চে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পিছনে দুটি হাত রেখে একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ক্ষিপ্রপদে পাদচারনা করতে করতে শিশিরকুমার সেই স্বগত উক্তিটিকে এমন ভঙ্গীতে রূপ দিতেন যা মুহূর্তের মধ্যে দর্শক মনকে উন্মুখ করে তুলতো। প্রথম অভিনয়রাত্রে উপস্থিত ছিলেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। শিশিরকুমারকে দেখলুম আলমগীর বাদশার ভূমিকায়। শিশিরকুমারের শিক্ষার গুণে কুসুমকুমারী তার চিরাচরিত মজ্জাগত থিয়েটারী সুর ভুলে শিশিরকুমারের সুরে সুর মেশাতে পেরেছিলেন এবং তার ফলে অভিনয় হয়েছিল অতি অপূর্ব। আলমগীরের দৃশ্যসজ্জা, বেশভূষা সমস্তই অপরূপ লেগেছিল। রূপনগরের রাজকন্যা রূপকুমারীর ভূমিকায় প্রভা আমাদের চমৎকৃত করেছিলেন। তরুন তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কামবকস ছবির মত মনের পটে আঁকা আছে। আলমগীরের অভিনয় কতবার দেখেছি বলতে পারি না এবং যতবার দেখেছি ততবারই ভালো লেগেছে। একঘেয়ে মামুলি বলে কোনদিনই মনকে পীড়া দেয়নি। এমন জীবন্ত জাগ্রত সে অভিনয়।'

আলমগীর প্রসঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের মন্তব্য, এমন একজন মানুষ এলেন যিনি বাংলা রঙ্গমঞ্চ-কে আবার খাড়া করে তুলতে পারবেন।'

বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের ভাষায়—'দিল্লীর প্রাসাদের অভ্যন্তরে মহাকূটকৌশলী অথচ সহৃদয় সম্রাট আলমগীর যেন প্রত্যক্ষ,দর্শকদের চোখের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন।" আলমগীরের মঞ্চাভিনয় সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অভিমত :—আলমগীর কূটকৌশলী আত্মগোপন-দক্ষ মোঘল সম্রাটের এক অপূর্ব প্রতিকৃতি। তাহার লৌহবর্মের পিছনে যে আবেগস্পন্দিত কোমল রক্ত মাংসে গড়া হৃদয় নিঃসঙ্গতার ছদ্মবেশের মধ্যে সহানুভূতির কাঙাল প্রকৃতি লুকান ছিল—তাহা কোন ঐতিহাসিক আমাদিগকে বুঝাইতে পারেন নাই। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ইহার ক্ষীণ ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু নটশ্রেষ্ঠ শিশিরকুমারই ইহাকে পরিপূর্ণ সর্বজনগ্রাহ্য রূপ দিয়াছেন। দূর ইতিহাসের আলোছায়ায় আবৃত, নাট্যকলায় ঈষৎ প্রতিভাত, রহস্যময় চরিত্রটি একেবারে আমাদের কাছের মানুষ আমাদের সহজ উপলব্ধির বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। মনে হয় চিরপরিচিত প্রহেলিকাময় আলমগীরের ইহাই যেন সত্য প্রতিকৃতি, যেন অন্তরলোকের যে গোপন চাবিকাঠির দ্বারা তাহার মনের কলকবজার জটিল প্যাচ খোলা যায়, তাহাই শিশিরকুমার আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন।'

শিশিরকুমারের আলমগীর দেখে প্রেমাঙ্কুর অতর্থীরও সন্তুষ্টচিত্তের অভিবাদন :—আলমগীর যেদিন খোলা হয়, সেদিনকার কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ইংলণ্ডের রাজপুত্র ভারতবর্ষে আসায় সমস্ত ভারতবর্ষ নানাভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করছিল। সেদিন তিনি কোলকাতা পৌঁছালেন। ম্যাডান থিয়েটার-পাড়া অন্ধকার। কাছাকাছি কোথায় নাকি মারামারি চলছে। যতদূর মনে পড়ছে বোধহয় হেমেন্দ্র

কুমার ও মণিলাল সত্যমিথ্যা জানবার জন্যে ম্যাডান থিয়েটারের দিকে চলে গেল। পরে শোনা গেল বিশেষ কিছু গোলমাল হয়নি, তবে দর্শক সামান্যই হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আরও একদিনের ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা—পৌনে একঘণ্টা আগে গিয়েও দেখলুম প্রেক্ষাগৃহ একেবারে জনপূর্ণ। কর্তৃপক্ষ কিন্তু তখনও টিকিট বেচতে ছাড়েন নি। আমরা সত্যেন দত্ত, মণিলাল, হেমেন্দ্রকুমার, সুরেশ বাড়ুয্যে ইত্যাদি কয়েকজন কোন রকমে দাঁড়ে বসার মত একটু একটু জায়গা করে বসলুম। অভিনয় দেখার পর সত্যেন দত্ত বললেন: এতদিন লোকের মুখেই সৌখীন শিল্পী শিশির কুমারের নাম শুনে আসছিলুম। আজ নিজের চোখে দেখে বুঝতে পারছি সত্যই তিনি অতুলনীয়।'

আলমগীর নাট্যাভিনয় ও শিশির কুমারের অভিনয় সম্বন্ধে শ্রীশম্ভু মিত্রের মত: ছাপার অক্ষরে যা একান্ত নির্জীব তা হঠাৎ রোদ্দুরের আলোর মতন ঝলমল করে ওঠে তাঁর ভাষণে। নাটকটা যখন আমি প্রথম পড়ি এবং ভাদুড়ী মশাই কীভাবে সেটিকে মঞ্চোপযোগী করার জন্য কেটেছেন ও সাজিয়েছেন সেটা দেখি তখন যে কী পরিমান মুগ্ধ হয়েছিলুম তা বলা যায় না। আলমগীর নাটককে ভাদুড়ী মশায় নিজেও ঠাট্টা করতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যেসব নাটক করে গেছেন তার মধ্যে আমলগীর একটি। 'নাটকটার মধ্যে অনেক অসঙ্গতি ও অবাস্তব কথা আছে। অনেক স্থলে নাটকটার উদ্দেশ্যও আমি বুঝতুম না, তবু এই অভিনয় অংশটা যদি ঘটনাচক্রে কোনদিন খারাপ হয়ে যেত তাহলে আমার দুঃখের সীমা থাকতো না।' নাটকটির অভিনয় সম্বন্ধে শিশির কুমার প্রসঙ্গে শ্রীমিত্রের বিশ্লেষণ-নাটকটি অভিনয়কলার ইঙ্গিতবাহী: সেই নাটকে একটা দৃশ্য ছিল যেখানে আলমগীরের একটি মোহাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে তয়বর খাঁ এসে তাকে কুর্ণিশ করে দাঁড়ায়। আলমগীর নিজেরই বিভ্রান্ত অবস্থায় তয়বর খাঁকে চিনতে পারেন না। তয়বর খাঁ নিজের নাম বলে। আলমগীর যেন অশ্রুতপূর্ব অজানা একটা নাম শুনেছেন এইভাবে আপন মনে উচ্চারণ করেন, তয়বর? এই উচ্চারণের ফলেই যেন তার স্মৃতির অত্যন্ত গভীর প্রদেশে কী একটা আলোড়ন শুরু হয়ে যায়। আলমগীর যেন সেই নামটাকে উদ্ধার করতে চান। যেন নিজের মনের মধ্যে ডুবে এই নামটাকে হাতড়ে হাতড়ে খোঁজেন। আপন মনে বলেন, তয়বর, তয়বর। হঠাৎ যেন নামটা পরিচিত বলে বোধহয়। চোখে মুখে সেইরকম আভা আসে। প্রশ্নসূচক-ভাবে বলেন, তয়বর? যেন বলতে চান যে, তয়বর, না? হ্যাঁ হ্যাঁ এ নামটা তো আমি জানি। তারপরেই সব কথা যেন দ্রুত মনে পড়তে থাকে, ও হ্যাঁ, তাইতো, তয়বর—সেনাপতি তয়বর, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার বিশ্বস্ত অনুচর তয়বর, বুঝতে পেরেছি তয়বর, ঠিক তয়বর।

এই সমস্ত ভাবটা তিনি প্রকাশ করতেন কেবল বারংবার নানা রকমে ঐ তয়বর নামটি উচ্চরণ করে। এবং সেই বলবার ধরণে আমরা স্পষ্ট অনুভব করতে

পারতুম যে ঐ মানুষটির মনটা কি রকমভাবে আস্তে আস্তে আবার আমাদের এই দৈনন্দিন জগতের স্তরে ফিরে আসছে। সে এক আশ্চর্য্য অনুভূতি।

সেকালে এই নাটকটির অভিনয় সম্বন্ধে আরো কিছু কিছু তথ্য পরিবেশন করা যেতে পারে। 'সে সময় স্টার মনোমোহন সব থিয়েটারেরই একদশা, সব কটাই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। ম্যাডান কোম্পানি পাকা ব্যবসাদার, ওৎ পেতে ছিলেন, তারা বাংলা থিয়েটার গ্রাস করতে এগিয়ে এলেন। কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি নাম দিয়ে তারা একটি থিয়েটার খুললেন। হিন্দি নাটকের বাংলা অনুবাদ 'অপরাধীকে'? বইটির অভিনয় দেখে বাঙালী দর্শকরা একবাক্যে বলল—যারা ঘরের পয়সা খরচ করে এ বই দেখতে আসে অপরাধী তারাই। তিনচার রাত্রি অভিনয়ের পর প্রেক্ষাগৃহ একেবারে খালি থাকতে লাগল। ম্যাডান কোম্পানি ভাবলেন, এরকম করে তো চলবে না। নামজাদা বাঙালীকে তাদের এই বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে। অন্য থিয়েটারগুলি থেকে যখন ভাঙ্গানো চলল না, তখন তাদের নজর পড়ল থিয়েটারের বাইরে। অভিনেতা হিসাবে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। শেষ তবধি তাঁকে পেলেন। আর নাটক লেখার জন্যে পেলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে। মঞ্চস্থ হল আলমগীর। নামভূমিকায় শিশিরকুমার যে কৃতিত্ব দেখালেন তা অতুলনীয়, অবিস্মরণীয়। তার পূর্বকীর্তিকে তিনি অতিক্রম করলেন। নতুন নট তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কামবকস লোককে আনন্দ দিল। কিন্তু উদীপুরীরূপে কুসুম-কুমারী আগেকার অভিনয়রীতি একটুও বদলাতে পারেন নি। সমস্ত নাটকটি খাপছাড়া হয়ে গেল। এরকমভাবে নাটক মঞ্চস্থ করাতে শিশিরকুমার খুব অস্বস্তি বোধ করলেন। ১৯২১ সালের কথা। পরের বছরও কিছুদিন অভিনয় করে শিশির কুমার ম্যাডানদের থিয়েটার ত্যাগ করলেন।'৪৭

ভারতী গোষ্ঠীভুক্ত সাহিত্যিকদের অনেকেই তখন বাংলা রঙ্গালয়ের ভালোমন্দ ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। প্রেক্ষাগৃহের দিকে উঁকিঝুঁকি মারতেন বটে কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিলেন—এমনকি নটনটীর নাম মুখে আনারও বিরোধী। আলমগীর নাটকের অভিনয়ে শিশিরকুমারের বৈপ্লবিক অভিনয়-কলা প্রদর্শন এবং নাটকটির মঞ্চপ্রয়োগের অদ্ভুত ক্ষমতা প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার রায় এর স্মৃতিচারণ উল্লেখ্য :—

'তৃতীয় রাত্রে আমরা আলমগীরের নাট্যাভিনয় দেখতে গমন করলুম। আমরা বলতে সতেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আমি।...প্রথমেই সুদীর্ঘকাল ধরে দেখলুম সেই গিরিশোত্তর যুগের মার্কামারা খাড়াবড়ি থোড়, আর থোড়বড়ি খাড়া বা গড্ডালিকা প্রবাহের একঘেয়ে লীলা। মনের ওপর একটুও দাগ পড়ল না। আচম্বিতে দ্বিতীয় অঙ্কে শিশিরকুমারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই অভাবিত পরিবর্তন। প্রথমেই এমন কৌশলে তিনি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন যে একটিমাত্র

৪৭. অথনটঘটিত—সূত্রধার।

বাক্যব্যয় না করে কেবল মৌন ভাবাভিনয়ের দ্বারাই মুহূর্তমধ্যে এই অচল নাট্যাভিনয়কে চলমান ও প্রাণবান করে তুললেন। স্বয়ং মোঘল সম্রাটের পদমর্যাদা-সূচক চলন ও সাধারণ থিয়েটারি রাজাদের মত কোথাও কৃত্রিম ও হাস্যকর হয়ে ওঠে নি।···এবং সেই স্মরণীয় ও সুদীর্ঘ স্বপ্নদেখার দৃশ্য। কেবল আলমগীরের স্বপ্নদর্শনজনিত আচ্ছন্নতার জন্যে নয়, পয়তাল্লিশ মিনিট ধরে প্রায় একই স্থান পরিবর্তন করে নাটকীয় যাদুমন্ত্রবলে দর্শক ভুলিয়ে রাখা এক অসাধারণ ও অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। (বিসদৃশ দৃশ্যের অবতারণা প্রসঙ্গে)—নাটকে প্রযোকজকদের নেপথ্যে হস্তক্ষেপে সাজানো ও জমকালো দৃশ্য-পটের সামনে হঠাৎ ঝিনিক ঝিনিক করে চটুল ঝুমুর বাজিয়ে নাচতে নাচতে এসে দাঁড়াল জনৈক নর্তক এবং তারপর যে নাচটা নেচে গেল মোঘল সম্রাটের রাজত্বকালে তেমন আজব নাচ কেউ বোধ করি স্বপ্নেও দেখবার সুযোগ পায় নি। গুরুগম্ভীর আলমগীর নাটকের মধ্যে এই প্রহসনসুলভ চটুল দৃশ্যটিকে নিক্ষেপ করে দর্শকদের রসবোধকে এমন চণ্ডালের মত হত্যা করলে কে? কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। কিন্তু এখানে বেরসিক কর্তাটি কে? নিশ্চয়ই শিশিরকুমার নন। মনে পড়ল পার্সী প্রভাবগ্রস্ত রঙ্গালয়ের মধ্যে বসে আছি এবং এটা হচ্ছে পার্সী থিয়েটারের চিরাচরিত রীতি। এখানকার কর্তা ব্যক্তিরা দারুণ ট্রাজেডির মধ্যেও উদ্ভট প্রহসনের জোড়া ঘোড়া না চালিয়ে স্থির থাকতে পারেন না। কর্ণওয়ালিস থিয়েটার প্রসঙ্গে: এখানে পার্সি মনোবৃত্তির বিসদৃশ প্রকাশ দেখতে আমরা বাধ্য। তার কাছে একান্ত অসহায় নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ও প্রধান অভিনেতা নাট্য শিক্ষাদাতা শিশিরকুমার। তারপর রংদার জাঁক দেখানো দৃশ্যপটের কথা। এক হ-য-ব-র-ল। সাজ পোষাকও তেমনি, এ বলে আমার দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ্। গিরিশচন্দ্রর গানের ভাষায় —কে হারে, কে জিতে দুজনে সমান। কেবল ঐশ্বর্য্যের বড়াই-সৌন্দর্য্যের ছিটেফোঁটাও নেই। উল্লেখযোগ্য ছিল শুধু আলমগীরের পরিচ্ছদ।'৪৮

নাটক হিসাবে আলগীরের বিভিন্ন ত্রুটী থাকা সত্বেও শিশিরকুমার কেন এই নাটক গ্রহণ করলেন সেটি একটি প্রধান প্রশ্ন। এ নাটকে অভিনয়ের উৎকর্ষ দেখানো অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তা সত্বেও এ নাটক অবলম্বনে শিশিরকুমার নিজের অভিনয়ের জোরেই নাটকটিকে সার্থক অভিনীত নাটক বলে চিহ্নিত করতে পেরে-ছিলেন। আলমগীরের নাট্যাভিনয় হচ্ছে শিশিরকুমারের ব্যক্তিগত প্রতিভার জ্বলন্ত নিদর্শন। আলমগীরের অভিনয় সম্বন্ধে আরো কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায় শিশিকুমারের স্মৃতিচারণ থেকে।

'আলমগীর প্রথম করি ১৯২১ সালের ১০ই নভেম্বর। তারপর ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ৩৫তম বার্ষিকী পর্যন্ত করি আমার বাড়ীতে।···আলমগীরের

---

৪৮. বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক: গল্প ভারতী পৌষ ১৩৬ —হেমেন্দ্রকুমার রায়।

পোষাকটোষাক সব সময়েই ভালো ছিল। রাখালদাসকে দিয়ে দেখিয়ে নিয়েছিলুম —সে অবশ্য ১৯২৪ সালে। কিন্তু মদন কোম্পানির সময়েও বেশ ভালো ছিল পোষাক।

···আলমগীর করতে কি আমায় কম কষ্ট পেতে হয়েছে। যে যা আবদার করেছে সব শুনতে হয়েছে। কুসুম (কুমারী)কে নিয়েও কম হাঙ্গামা। সে আমায় এসে বলল, ম্যানেজারবাবু (তখন সবাই আমায় ম্যানেজারবাবু বলত), দেখুন, আমি দুপুর বেলায় আসবো। কারণ ছোট ছেলেমেয়েদের সামনে রিহার্সাল দিতে লজ্জা করে।

আলমগীর করার সময়ে প্রথমদিকে একদিন খুব গোলমাল হয়েছিল। এদিকে তো খুব টিকিট বিক্রি হচ্ছে, তারও পর লেডিসসিটের কোন নম্বর নেই, যত পেরেছে বিক্রি করেছে। বসবার যা জায়গা ছিল, সব ভর্তি হয়ে গিয়ে বক্স পর্যন্ত ভর্তি করে বসে আছে তারা। কালীবাবু, জ্যোতিবাবু সব ছুটোছুটি করছে। এদিকে বক্স কিনেছে যেসব বড়লোকেরা তারাও এসে হাজির। মহাবিপদ! মেয়েদের বলতে যেতেই তারা ধমকে উঠল। একজন বলল, জায়গা যখন নেই, টিকিট বেচেছো কেন? যেখানে জায়গা পেয়েছি সেখানেই বসেছি। ওঠাবে কেমন করে দেখি। বেশী কথা বললে একচড় মারবো। বীরাঙ্গনা তখনও ছিল এদেশে। সেদিন থিয়েটার আরম্ভ করতে একঘণ্টা দেরী হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কী করে মিটমাট হয়েছিল জানি না। রাজসিংহ করতেন ললিতবাবু। প্রথমে অবশ্য করেছিলেন প্রবোধ ঘোষ। পার্ট খুব মন্দ করে নি। তবে সুরটা তো ছিলই।···

নাট্যজগতে আলমগীরের আলোড়নের পর ক্ষীরোদপ্রসাদের পরবর্তী নাটক রত্নেশ্বরের মন্দিরে, সর্বপ্রথম অভিনীত হয় কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে ২২শে ডিসেম্বর, ১৯২২ সালে। নির্মলেন্দু লাহিড়ী সেজেছিলেন রত্নেশ্বর আর শ্রীমতী প্রভা অবতীর্ণা হয়েছিলেন সরমার ভূমিকায়। শিশিরকুমার ম্যাডানদের থিয়েটার ত্যাগ করার পর নতুনযুগের নট নির্মলেন্দু লাহিড়ীর আবির্ভাব ঘটে রত্নেশ্বরের মন্দিরে নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার মাধ্যমে। এরপর অবশ্য ম্যাডান কোম্পানি কর্ণওয়ালিশ রঙ্গমঞ্চে বাংলা থিয়েটারের অভিনয় বন্ধ করে দেন। অবশ্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে তারা বাংলা অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের পিছনে হ্যারিসন রোডের ওপর এ্যালফ্রেড থিয়েটারে (পরে গ্রেস সিনেমা)। গুণ্ডামি ও জুলুম-বাজীর জন্যে তখন ও পাড়া কুখ্যাত ছিল, সেইজন্য ও পাড়ায় বাঙালী দর্শকরা অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে থিয়েটার দেখতে যেতে চাইতেন না।

এর পরের বছর ১৯২৩ সালের ১০ই মার্চ (ফাল্গুন ১৩২৯) মোঘল সম্রাট প্রসেনজিতের কাহিনী অবলম্বনে লেখা নাটক বিদূরথ অভিনীত হল আলফ্রেড থিয়েটারে বেঙ্গল থিয়েট্রিকাল কোম্পানির উদ্যোগে। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন

বন্ধ—প্রবোধ বসু, চিত্রা—আঙুরবালা, বিদূরথ—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, অম্বালিকা —কুসুমকুমারী।

শিশু প্রকৃতির ক্ষীরোদপ্রসাদ অনেকক্ষেত্রে অনুরোধে অভিভূত হয়ে অহেতুক নাটকের দু একটি চরিত্রকে অনাবশ্যক দীর্ঘ করেছেন, ফলে অনিবার্যভাবেই চরিত্রগুলি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বিদূরথ সম্বন্ধে নলিনীকান্ত সরকারের স্মৃতিচারণ:— বিদূরথ নাটকের মহলা চলেছে কোনো একটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে। সেই রঙ্গমঞ্চের একজন অভিনেতা সেদিন ক্ষীরোদপ্রসাদের কাছে উপস্থিত।···এসো ভায়া এসো। রিহার্সাল কেমন চলছে?

অভিনেতাটি বললেন, রিহার্সাল তো সবে কাল থেকে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু স্যার একটা কথা ছিল যে—

বলো।

অভিনেতাটি বললেন, আমাকে অমুক পার্টটি দিয়েছে স্যার। বড্ড ছোট পার্ট, একটি মাত্র দৃশ্যে দু তিনটি কথা।

অভিনেতাটির দুঃখে ক্ষীরোদপ্রসাদের শিশু হৃদয় যেন গলে গেল। বললেন; তা আমাকে কি করতে হবে বলো? আমি কি ওদের বলবো, ও পার্টটি বদলে তোমাকে বড় পার্ট দিতে। হতাশার সুরে অভিনেতাটি বললেন, কিন্তু সব পার্টটিই যে বিলি হয়ে গেছে স্যার।···অভিনেতাটি কাকুতি মিনতি করে বললেন, এই পার্টটিকেই বড় করে দিন না, স্যার। আপনার হাতেই তো সব—আপনি ইচ্ছা করলে ছোটকে বড় করতে পারেন, আবার বড়োকেও ছোট করতে পারেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ তার কথায় খুসী হয়ে বললেন, তা যা বলেছো, ওতো আমার হাতেই। তুমি কাল সকালে একটিবার এসো।

অভিনেতাটি আশ্বাস পেয়ে কৃতার্থ হয়ে চলে গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে আমি গেলাম ক্ষীরোদপ্রসাদের বাড়ীতে। দেখি সেই অভিনেতাটিও উপস্থিত হয়েছেন। বিদূরথ নাটকের সেই ছোট চরিত্রটিকে টেনে বাড়ানোর ফলে দু তিনটি দৃশ্যকে ঢেলে সাজাতে হয়েছে, এই পরিবর্তিত দৃশ্য কটি তিনি অভিনেতাটিকে পড়ে শোনাচ্ছেন।

পড়া শেষ হল। অভিনেতাটি খুব খুশী হলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। মারা গেল নাটকখানি।'৪৯

এরপর ম্যাডানরা বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী বন্ধ করে দিলেন। খালি হল এলফ্রেড থিয়েটার।

ঐতিহাসিক নাটক গোলকুণ্ডার প্রথম অভিনয় আর্ট থিয়েটার কর্তৃক ষ্টার রঙ্গমঞ্চে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯২৫। 'কাহিনীর দুর্বলতা, অশম্ভব্যতা, ঐতিহাসিক অবাস্তবতা

৪৯. শ্রদ্ধাস্পদেষু—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—নলিনীকান্ত সরকার।

ও অনাবশ্যক কাহিনীর জটিলতার জন্যে অভিনয় তেমন উল্লেখযোগ্য হয়নি। একমাত্র নির্মলেন্দু লাহিড়ীর হাসান ভূমিকাটি ছাড়া।'৫০ নাচঘরের ৮ই ফাল্গুণ সংখ্যায় অবশ্য অভিনয়ের ক্রমোন্নতির কথা বলা হয়েছে।

বৌদ্ধযুগের এক অদ্ভুত কাহিনী অবলম্বনে রচিত পরবর্তী নাটক জয়শ্রীর প্রথম আবির্ভাব মিত্র থিয়েটারের পাদপ্রদীপের সামনে ১লা শ্রাবণ ১৩৩৩ সালে।

নাচঘরের একটি বিশেষ সংখ্যায় জয়শ্রীর প্রথম অভিনয়ের যে সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়েছে তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কল্পলোকের কবি ও নাট্যকার পরিণত বয়সের নবনাট্য লীলায় অননুভূতপূর্ব যে শীকরোচ্ছাস প্রবাহিত করেছেন তা পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে—মিত্র থিয়েটারের তরুণ সম্প্রদায়ের অক্লান্ত যত্নে, চেষ্টায় উদ্যমে ও অধ্যবসায়ে।... ...বেশভূষা ও সাজসজ্জার বৈশিষ্ট্য—জয়শ্রী দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল যেন অজন্তার সেই গিরি-গহ্বর গাত্রে অঙ্কিত নরনারীরা আজ সহসা কার মন্ত্রবলে সজীব হয়ে উঠেছে। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী সতীশচন্দ্র সিংহের রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক এই প্রথম।

কাহিনীতে সংঘাত সনাতন হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্যের পরি-প্রেক্ষিতে।.... মনুষ্যত্বের প্রভাবে মরণকে জয় করে জয়শ্রীকে লাভ করেছে উদয়ন। নিপুণ নাট্যকার ও সুকবি ক্ষীরোদপ্রসাদ এইটাই অতি চিত্তাকর্ষক ও চমৎকার করে তুলে ধরেছেন। কিন্তু মনুষত্ব ও পৌরুষের চেয়েও রূপসম্পদেরই জয়গান বেশী, কারণ উদয়ন সুপুরুষ।

জয়শ্রীর ভূমিকায় শান্তাদেবীর (জনার) নাচগান প্রসঙ্গে—দেবসেনারূপে শ্রীমতী আশ্চর্যময়ী তার কলকণ্ঠের অজস্র মধুকাকলিতে রঙ্গগৃহ মুখর করে তুলেছিলেন। দর্শকরা বারংবার তার গান শুনেও আবার শোনবার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু নাটকগুলির মধ্যে বৌদ্ধযুগের বৈশিষ্ট্য ছিল। সুপ্রসিদ্ধ নৃত্য শিক্ষক শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্রের শিক্ষার গুণে রমনীরা সকলেই নেচেছেন অতিসুন্দর কিন্তু সে নাচ অবন্তীপুর বা কৌশাম্বীর নয়। উদয়নের ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত অভিনয় করেছেন। কেবল তার শবরবেশের প্রশংসা করতে পারছি না। তিনি যেন দয়া করে বিলাতী থিয়েটারের নর্ত্তকীদের উপযুক্ত ঐ পোষাকটি না পরেন। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুস্তোফীর চণ্ডদেবের অভিনয় মন্দ হয় নি। তবে তিনি তার কণ্ঠস্বর আরও একটু হ্রস্ব করলে ভালো হয়। হরি-মোহনবাবু পুরোহিতের ভূমিকায় এবং ইন্দুবাবু প্রবর সেনের ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেছেন। ধীরেন গাঙ্গুলীর উদ্দালক-এর অভিনয়ে ছ্যাবলামির ভাব বেশী মাত্রায় প্রকট। 'মহিরঙ্গ' তেমন ভালো অভিনয় করতে পারেনি, কিন্তু যশমা তার অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রভুগুপ্ত আরও একটু প্রাণবন্ত হলে তার অভিনয়ও

৫০. নাচঘর—১লা ফাল্গুণ ১৩৩১।

নিতান্ত মন্দ হবে না। (জয়শ্রী) শান্তাদেবীর অভিনয়ে ভবিষ্যতের আশা লক্ষ্য করা গেছে। পট্টমহাদেবী সুমিত্রার ভূমিকায় সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী শ্রীমতী কুসুম কুমারী সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় করেছেন। তার দুর্ভাগ্যের বেদনা, তার অগাধ পুত্রপ্রেম ও অজেয় বীরপুত্রের গৌরবগর্ব, তার রাজরানীর মর্যাদা ও অভিমান প্রভৃতি তার চরিত্রের বিশেষত্বগুলি তিনি দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথম দিনের অভিনয় নিখুঁত সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত। সাজসজ্জার পরিবেশ, মঞ্চে পুরাণযুগের আবির্ভাব, ঘটানো—অদ্ভুতপূর্ণ।'৫১

পর্যায়ক্রমে বৈচিত্র্য সন্ধানী নাট্যকারের পরবর্তী নাট্যোপহার একটি পৌরাণিক গীতিবহুল নাটক। নাটকটি বহুল অভিনীত নাট্য তালিকার মধ্যে পড়ে না। এটির অভিনয়ের প্রতি দর্শকদের যা কিছু আবেদন ছিল ধর্মীয় ভাব এবং সঙ্গীত-গুলির জন্যে। নাটকটির নাম রাধাকৃষ্ণ। প্রথম অভিনয় মিনার্ভা থিয়েটারে ২২শে আষাঢ়, শনিবার। (সালের উল্লেখ নেই)

পরিণত বয়সের সর্বশেষ পৌরাণিক নাটক নরনারায়ণ। উদ্বোধন রজনী ১লা ডিসেম্বর, ১৯২৬। কর্ণের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় আজও ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রথমদিনের ভূমিকালিপি: পরশুরাম ও অর্জুন-মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, দ্রৌপদী—চারুশীলা, যুধিষ্ঠির —যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। পরবর্তীকালে দ্রৌপদীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন শ্রীমতী কঙ্কাবতী। সে সময়কার একটি দিনের মহলার অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন যশস্বী প্রচারবিদ্ সুধীরেন্দ্র সান্যাল। তিনি লিখেছেন, নর-নারায়ণের মহলা বসেছে। কঙ্কাবতী বারবার একটিমাত্র লাইনই আবৃত্তি করে যাচ্ছেন। শিশিরকুমারের যেন মনে হল আবৃত্তিতে প্রাণ নেই। তখন শ্রীকৃষ্ণের সংলাপটুকু কণ্ঠে তুলে নিয়ে শিশিরকুমার আবৃত্তি করলেন—'কেঁদো না, কেঁদো না কৃষ্ণা এনো না কৃষ্ণের চোখে জল।' সেই মুহূর্তে চোখের জলের ধারা বয়ে গেল কৃষ্ণার চোখেও। ভাবের আবেগে বিহ্বল হয়ে গেল শিল্পীর সত্ত্বা। যে কান্না তার অন্তরের অন্তরালে থেকেও সখা কৃষ্ণার মনেও যে দোলা দিয়ে গেল শিশিরকুমারের অভিব্যক্তিতে তা গোপন থাকে নি।

এই নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির অনেক লিখিত অভিমত আছে। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ক্ষীরোদপ্রসাদের নরনারায়ণ নাটকে শিশিরকুমারের কর্ণ, তার শিক্ষায় পদ্মার ভূমিকার কৃষ্ণভামিনী, দ্রৌপদীর ভূমিকায় চারুশীলা যে অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন তা অবিস্মরণীয়।

নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখেছেন, নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ক্ষীরোদ প্রসাদের নরনারায়ণকে জনপ্রিয় করেছিলেন এবং প্রযোজনার গুণে অতি সহজ সংকেত দ্বারা বিরাটকে রূপ দিয়েছিলেন সার্থকভাবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধও তিনি

৫১· নাচঘর—৭ই শ্রাবণ ১৩৩৩।

প্রতিফলিত করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার জন্যে কাঠের রথ বা মাটির ঘোড়া দেখাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি, দুটো ভাঙা রথের চাকা, কিছু দলিত মথিত বৃক্ষশাখা এবং একটা থমথমে আবহ সৃষ্টি করে দর্শকদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে একটা দ্বৈরথ সংগ্রাম হয়ে গেছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের কাব্য-সম্পদ অপরেশ চন্দ্রের চেয়ে বেশী ছিল এবং কাব্যবৃত্তিতে নাট্যাচার্য্য এবং তার শিষ্যরা অধিকতর দক্ষ ছিলেন বলেই নরনারায়ণে বেশী জটিলতা থাকলেও নাট্যাচার্য্য তাকে সার্থক সৃষ্টি করে তুলতে পেরেছিলেন। দুইটি থিয়েটারের সব পৌরাণিক নাটক আলোচনা না করেই একথা বলা যায় যে নাট্যাচার্য্যের সৃষ্টিতে যে কাব্য পাওয়া যেত আর্ট থিয়েটারের সৃষ্টিতে তা পাওয়া যেত না।

নরনারায়ণের অভিনয় প্রসঙ্গে আচার্য্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অভিমত— শিশিরকুমার যে অসাধারণ অভিনেতা ছিলেন তা নয়। তিনি ছিলেন জগতের নাট্যসাহিত্যের এক বিরল অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন রসবোদ্ধা ও সমালোচক, নাট্যতত্ত্বে এক অদ্বিতীয় বিদগ্ধ মানসের অধিকারী।

নরনারায়ণ মঞ্চস্থ হওয়ার ব্যাপারে কিছু নেপথ্য কাহিনী আছে। দেবনারায়ণ গুপ্তের লেখা থেকে সে কথা জানা যায়। থিয়েটারে তখন কর্ণার্জুন চলছে। শিশির কুমারের কাছে যখন নাটকটি অভিনয় করার প্রস্তাব এল, তখন তাঁর অভিমত—আর্ট থিয়েটারে যে ব্যয়ে কর্ণার্জুন চলছে, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের দৃশ্যটিতে যে মঞ্চকৌশল—তার সঙ্গে তিনি পাল্লা দিতে পারবেন না। কাজেই একই বিষয়-বস্তুর ওপর লেখা নাটক জমবে না।

ক্ষীরোদপ্রসাদ – বস্ত্রহরণ আমি সংলাপের মাধ্যমে করবো। নরনারায়ণে দর্শক-চিত্ত জয় করবো সংলাপের মাধ্যমে।'৫২

সংলাপের মাধ্যমে সত্যিই তিনি দর্শকচিত্ত জয় করেছিলেন। আজ আমরা যখন আলোক ও দৃশ্য সম্ভার দ্বারা দর্শক মনোরঞ্জনে ব্যস্ত তখন বারবার ক্ষীরোদ প্রসাদের সংলাপ-প্রধান বলিষ্ঠ লেখনীর কথা স্মরণ করতে হয়। সংলাপর মাধ্যমে সুকৌশলে তিনি দুরূহ দৃশ্যের অবতারনা করেছিলেন। আধুনিক যুগ—নাটকে দুর্বলতা ঢাকার জন্য যান্ত্রিক সাহায্য নেওয়ার যুগ। ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণে প্রকৃত নাটক পরিবেশনের সুযোগ মেলে, অভিনেতা অভিনেত্রীদের ও প্রকৃত নাট্যাভিনয়ের সুযোগ প্রাপ্তি ঘটে।

নরনারায়ণের মঞ্চসাফল্যের আরো কিছু কিছু সংবাদ সহজেই লিপিবদ্ধ করা যায়। 'ষ্টারে শ্রীকৃষ্ণের অভিনয় জমল না, কিন্তু ষ্টার এরজন্যে অনেক অর্থব্যয় করলো। ক্ষীরোদপ্রসাদ বহু নাটক রচনা করেছেন, অধিকাংশই তেমন কিছু নয়,

---

৫২. ৫৩. সংহতি—বৈশাখ ১৩৭১—দেবনারায়ণ গুপ্ত।

কিন্তু নরনারায়ণে তিনি সাফল্যলাভ করলেন, আর শিশিরকুমার তা যথাযথভাবে প্রযোজনা করলেন।৫৪

নরনারায়ণের অভিনয় এবং অভিনয়ের নেপথ্য কাহিনী সম্বন্ধে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের স্মৃতিচারণ অনেক কৌতূহল নিরসন করতে পারবে।

শেষজীবনে ৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটে গ্রন্থজগৎ-এর ঘরে নব্যবাংলা নাট্য পরিষদ-এর নাট্য রসিক ও নাট্যামোদী সভ্যবৃন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন, 'নরনারায়ণে বৃষভামিনী করত পদ্মা ও চারু দ্রৌপদী। দুজনেই অপূর্ব অভিনয় করেছিল। যেখানে দ্রৌপদী বলছে—

সেই আমি, মুক্ত কেশরাশি লয়ে
সহিতেছি হে মাধব—নিত্য সহিতেছি
অগ্নিজিহ্ব সহস্র ফণার
বজ্রজ্বালা প্রচণ্ড দংশন।

সেখান থেকেই জমে যেত। এরপর দর্শকরা আর নিঃশ্বাস ফেলতে পেত না। নব্য নাট্যপরিষদের আর একদিনের বৈঠকে শিশিরকুমার বলেছিলেন, চারুর উচ্চারণে কতকগুলি দোষ ছিল, তবে চেষ্টা করলে কি করা যায় দ্রৌপদীতে তার প্রমাণ দিয়েছিল। 'হে কেশব তুমি নাকি বিরাট হইয়াছিলে কুরু সভাস্থলে।' এ কথাগুলোর মূল সুর সে ফোটাতে পেরেছিল।

শিশিরকুমারের স্মৃতিচারণ থেকে নরনারায়ণ নাটকের সাফল্যের কিছু কিছু ইতিবৃত্ত জানা যায়। নরনারায়ণের ভূমিকাটি ক্ষীরোদবাবুর মেজো ছেলে ভিকুর লেখা। ওতে ঘুরিয়ে আমাকে একহাত নিয়েছে।······ক্ষীরোদবাবুর সংস্কৃত জ্ঞান খুব। জায়গায় জায়গায় সংস্কৃত কথাগুলো খুব সুন্দর ভাবে ব্যবহার করেছেন। ক্ষীরোদবাবুর লেখার মধ্যে কত ভালো জিনিষ আছে তা ওরা দেখে না।······ (এবার নরনারায়ণের কথা উঠল)—বইটা খুব ভালো, কিন্তু ছেলেদের জন্যে গোলমাল হয়ে গেছে। এই দেখ আমার কাছে অরিজিনাল লেখা রয়েছে, আর এই বই মিলিয়ে দেখ, যেখানে সেখানে দু চার লাইন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন কি চোদ্দটা অক্ষর করার জন্যে দু একটা অক্ষরও ঢুকিয়েছে। এগুলো এর জিনিয়াস পুত্রদের কাজ। যখন যেখানে যা পেরেছে লিখিয়েছে!

নিজের কথা বলতে লজ্জা করে, কিন্তু আমার থিয়েটার না থাকলে ক্ষীরোদদা ও বই লিখতে পারতেন না। উনি তো আরও বই লিখেছেন। আলমগীর, রঘুবীর, ভীষ্ম, কিন্তু কোন বইটাকে মেনটেন করতে পেরেছেন। এজন্য দুদিন ওকে আবদ্ধ রাখতে হয়েছিল। ওর নরনারায়ণ সত্যিকারের ভালো বই। বললে ভাববে গর্ব

---

৫৪. অথনটর্ঘটিত—সূত্রধার।

করছি, কিন্তু নরনারায়ণ সবটা আমার বাড়ীতে বসে লেখা। ওখানে খাওয়া দাওয়া করেছেন বসে বসে লিখেছেন আর আমরা তিনজনে কেমন হয়েছে বলেছি। ওর লেখা পোষ্টকার্ড আমার কাছে আছে, বলেছেন যা ভালো বোঝ করো। শিশিরকুমারের আক্ষেপ ঃ—একজন সত্যিকারের ভালো নাট্যকার পেলুম না। এক হতে পারতেন ক্ষীরোদপ্রসাদ। যথেষ্ট পড়াশোনা ছিল তার, বুদ্ধিও ছিল। কিন্তু চালাতে হত। তিনজনের জন্যে তা হল না—ওর দুই ছেলে আর মহেন্দ্রবাবু।……ঐ তিনজনের জোরে ক্ষীরোদবাবু ভাবলেন, কে ভেড়ের ভেড়ে শিশির ভাদুড়ী যে তার কথা শুনতে হবে।"৫৫

অভিনয় কলা সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনার উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নরনারায়ণ-এর কাব্য সমৃদ্ধ সংলাপ ও উপমা ইত্যাদি নাটকের সুষ্ঠু ও সাবলীল অভিনয়ের পক্ষে অনুকূল কিনা সে সম্বন্ধে শিশিরবাবুর মতামত : বিনয়দা তর্ক আরম্ভ করলেন, এতবেশী উপমা আরম্ভ করেছেন যে বুঝতে কষ্ট হয়।

শুনে বললেন, উপমার কথা বলছো, অভিনয়ের গুণে সেগুলো চোখের সামনে দেখতে পাবার মতো হবে। দেখবে যেন চোখের সামনে পারা গলে ছড়িয়ে যাবে। তাই যদি না পারল ত অভিনয় কি হল? আর এতই যদি বোঝার কষ্ট হচ্ছে বল তপতীর বেলায় কি করবে?……একজন বললেন, নরনারায়ণে আপনি তো কর্ণ করতে পারেন।

হাসলেন—আমি এখনও কর্ণ করলে হয়? কিন্তু কমবয়েসী একটি ছেলে পেলে ভালো হত। এখন দম কমে গেছে। তাছাড়া যৌবনের সে কণ্ঠ পাবো কোথায়? এখন তিনটে কি বড় জোর চারটে দৃশ্য পড়ার ফলে যে কষ্ট হচ্ছে, তাতে পুরো করতে পারি? পড়াতে তো আর ফাঁক নেই, তাছাড়া Pause দিতে পারছি না, তার জন্যে মনের মধ্যে মোচড় দেয়।

অপরেশবাবুর কর্ণার্জুনের কথা তুললেন কে একজন। সে কথার উত্তরে বললেন, অপরেশবাবু ক্ষীরোদবাবুর অনেক পরে লিখেছেন। তাছাড়া দুজনের মধ্যে তুলনা করাও উচিত নয়। সেক্সপীয়ারের কথা বাদ দিচ্ছি। কেন না, বড্ড বড় হয়ে যায়। শ'এর সঙ্গে সি এইচ মলরোর কি তুলনা হয়? ক্ষীরোদবাবুর ড্রামাটিতে সেন্স বড় ভালো ছিল, ঠিক জায়গা মাফিক প্যাচগুলো দিয়েছেন।

এবার নরনারায়ণ বইটা খুললেন। পড়া আরম্ভ করার আগে বললেন ক্ষীরোদবাবুর ছেলে বইটাতে ঘুরিয়ে লিখেছে তিনি মস্তবড় ছিলেন, কিন্তু অন্য নাটকগুলিতে লেখা তার পূর্ণতা পেতে পারে নি নানাকারণে, এই বইটাই পেয়েছে। কিন্তু তোমরা পড়ে দেখো যেখানে সেখানে কত বাজে লাইন ঢুকিয়েছেন। এই

---

৫৫. শিশির সান্নিধ্যে—রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু।

খাতাতে যা লেখা দেখছ, এইটাই প্রথম লেখা।······এরপর আছে বিশ্বরূপ দর্শন। আমরা প্রথম থেকেই ওটা বাদ দিয়ে দিয়েছিলুম। বইতে কিন্তু ঠিক ঢুকিয়েছে।'৫৬

নাটক ভালো না হলেও যে অভিনেতার গুণে দাঁড়ায় তার প্রমান রেখেছেন শিশিরকুমার আলমগীরে। অনেকের ধারণা, নরনারায়ণের সাহিত্যিক মূল্যের জন্যেই নাটক হিসাবে এর মূল্য কমে গেছে। শিশিরকুমার এর মতে নাটকের Literary valueর জন্যে তাকে বোঝা যায় না—কথাটা ঠিক নয়। বোঝই যদি না গেল তাহলে অভিনেতা আছে কি করতে? অভিনেতার সেইটাই বড় গর্ব যে সে দর্শককে নিজের সঙ্গে একান্ত করে ফেলেছে। নিজের ইচ্ছামত সে তাকে নাচাতে পারে, কাঁদাতে পারে। নরনারায়ণ নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর অভিমতের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব করেছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ সম্বন্ধে তাঁর প্রায় শেষকথা:—

ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটক লিখতেনও ভালো, বুঝতেনও ভালো কিন্তু জিনিয়াই পরিবৃত্ত থাকাতেই গোলমাল হল। নরনারায়ণে দুর্বল লেখা খুব কমই আছে, যেটুকু আছে তা ঐ ছাপা বইয়েতেই। নরনারায়ণের ভূমিকাতে লেখা আছে ক্ষীরোদ-দা বইটা নিজেই লিখেছেন ······কি ঝগড়া ক্ষীরোদ-দার সঙ্গে বই নিয়ে।

বললেন, আমি বই লিখে অন্য থিয়েটারে অভিনয় করতে দিতে পারি।

বললুম নিশ্চয়ই পারেন।'৫৭

শিশিরকুমারের এতকথা বলার প্রয়োজন হয়েছিল ক্ষীরোদপ্রসাদের পুত্র শ্রীসতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নরনারায়ণ-এর ৬ষ্ঠ সংস্করণের নিবেদন অংশের কয়েকটি মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে।

এই নাটক প্রণয়নের একটি ইতিহাস আছে। সেজন্য আমার এই নিবেদন লেখার ধৃষ্টতা।······পরে তিনি (পিতৃদেব) বুঝিয়াছিলেন নিজের মনোমত নাটক লিখিতে হইলে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষের মুখ চাহিয়া বা তত্রস্থ অভিনেত্রীর দিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিতে গেলে চলিবে না। অথচ এইরূপ সর্বপ্রকার প্রভাবমুক্ত হইয়া একখানি নিজ মনোমত যথার্থ নাটক লিখিবার ইচ্ছা তাহার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। (তার কর্ণ নাটক লেখা দীর্ঘদিন অসমাপ্ত থাকার কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে বিভিন্ন রঙ্গালয়ের তাগিদে 'কিন্নরী' প্রভৃতি ২।৩ খানি নাটক লিখিবার জন্য কর্ণ লেখা বন্ধ হয়।) পরে যখন পুনরায় লেখা আরম্ভ করেন নবগঠিত আর্ট থিয়েটার লিমিটেড কর্তৃক সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় অপরেশচন্দ্রের কর্ণার্জুন নাটক অভিনয় আয়োজন সংবাদে কর্ণ লেখা বন্ধ করিয়া 'আলমগীর' প্রভৃতি অন্যান্য নাটক লিখিতে বাধ্য হন। কারণ কর্ণ অভিনয় করিবার জন্য অন্যান্য রঙ্গালয়ের চাহিদা কমিয়া যায়। ৫৮

কর্ণ নাটকের সমাপ্তি এবং সে নাটকটি নরনারায়ণে রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনায় ক্ষীরোদপ্রসাদ যে শিশিরকুমারের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তার স্পষ্ট প্রমান পাওয়া গেছে শিশিরকুমারের স্মৃতিচারণে।

---

৫৬. ৫৭. শিশির সান্নিধ্যে—রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু।

নরনারায়ণ-এর ভূমিকা লিপিতে নিবেদন অংশে ক্ষীরোদপ্রসাদ পুত্র সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর লেখায় তারই কৌতুককর প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

গ্রন্থকার ১৭।১০।২৪ তারিখে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নারায়ণকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ···"প্রিয় মহেন্দ্র ভাই······তোমার কথামত সেই দৃশ্যগুলি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।······আমি এবার নিজের মনোমত করিয়া এ পুস্তক লিখিতেছি। অভিনয় হউক বা না হউক কাহারো কোন Suggestion লইতে ইচ্ছা নাই। এই পুস্তকই মনে হইতেছে আমার শেষ, দেহ স্বাভাবিকভাবেই দিন দিন দুর্বল হইতেছে। ······কর্ণ সম্বন্ধে বহুদিন হইতে যে একটা ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, সেইটাই পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিবার বাসনা। কর্ণ এক দৈবনিগৃহীত পূর্ণ-শক্তিধর মহাপুরুষের জীবনকাহিনী। পয়সার জন্য তাহা কুণ্ঠিত করিতে ইচ্ছা নাই। কতকগুলো অর্বাচীনের মতের তলায় নিজের চিরপোষিত কল্পনাকে বিধ্বস্ত করিতে পারিব না। কেহ না লয়, তুমি কাছে রাখিও। তোমার ষ্টেজে (বাড়ীর) নিশ্চয়ই তা উপাদেয় হবে। (ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রায় প্রত্যেকটি নাটক নিয়মিতভাবে মহেন্দ্রবাবুর বাড়ীর স্টেজে একবার না একবার মঞ্চস্থ হয়েছে।) এই তৃতীয় অঙ্ক পাইলেই আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে। যখন বই ধরিয়াছি এবার ইহাকে শেষ না করিয়া আমি অন্য বই লিখিতেছি না। কর্ণের মত আমিও এখন নিজেকে দৈব-নিগৃহীত বোধ করিতেছি। তাঁর চরিত্র রহস্যই এখন আমার প্রিয় বোধ হইতেছে। ইতি······

১৯২৫ সালে কর্ণ লেখা শেষ হয়। ইতিপূর্বে স্বনামধন্য প্রথিতযশা নট ও নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয়ও এই নাটক রচনায় ও অভিনয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিলে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণের সৌজন্যে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমারের প্রযোজনা, অধ্যক্ষতা, ও নাম-ভূমিকা অভিনয়ে নরনারায়ণ নামে ইহা ১লা ডিসেম্বর ১৯২৬ তারিখে নাট্যমন্দির লিমিটেড কর্তৃক সর্বপ্রথম অভিনীত হয়।

নাটকটির অভিনয় সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। নাট্যমন্দিরে নাটকটির অভিনয়ের পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সর্বপ্রথম অভিনয়

বুধবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ সাল। (১লা ডিসেম্বর ১৯২৬)

উদ্যোক্তা

প্রযোজক শিক্ষক ও নাট্যাচার্য	—	শিশিরকুমার ভাদুড়ী
মঞ্চমালাকার	—	শ্রীরমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ	—	শ্রীহরিগোপাল মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত শিক্ষক	—	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে। (অন্ধ গায়ক)
নৃত্য সঙ্গীত	—	শ্রীব্রজবল্লভ পাল

৫৮.৫৯. নরনারায়ণ ৬ষ্ঠ সংস্করণ নিবেদন—সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

॥ অভিনেতা ॥

শ্রীকৃষ্ণ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, সূর্য ও সাত্যকি—জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ইন্দ্র ও বিদুর—অয়স্কান্ত বক্সী, পরশুরাম ও অর্জুন—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য অকৃতবন—বিভূতিভূষণ গোস্বামী, সঞ্জয়—মিহিরকুমার নন্দী, দ্রোণাচার্য্য—অমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃপাচার্য্য—জিতেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, ভীষ্ম ও তাপস—শীতলচন্দ্র পাল, ধৃতরাষ্ট্র—রামময় চক্রবর্তী, যুধিষ্ঠির—যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, ভীম—অমিতাভ বসু (এমেচার), নকুল—অমলেন্দু লাহিড়ী, সহদেব—শৈলেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, অভিমন্যু—হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দুর্যোধন—গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, দুঃশাসন—সুহাসনকুমার সরকার, শকুনি—নৃপেন্দ্রনাথ রায়, কর্ণ—শিশিরকুমার ভাদুড়ী, বৃষকেতু—বীরেন্দ্রনাথ দাস, ঘটোৎকচ—চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, বৈতালিক—কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক)।

॥ অভিনেত্রী ॥

গান্ধারী	—	শ্রীমতী হরিসুন্দরী (ব্লাকী)
দ্রৌপদী	—	শ্রীমতী চারুশীলা
পদ্মাবতী	—	শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী
অস্তি ও শ্রীকৃষ্ণ	—	শ্রীমতী উষাবতী (পটল)

॥ ঐতিহাসিক নাটক ও ঐতিহাসিক নাট্য ধারাবাহিকতায় ক্ষীরোদপ্রসাদ ॥

॥ এক ॥

মানুষের স্বাভাবিক সৃজনশক্তি আত্মিক তাগিদে কিংবা কোন ব্যাহ্যিক প্রেরণায় আপন কার্য্যে তন্ময় হয়ে থাকে। সৃষ্টির মধ্যে বৈচিত্র্যের সন্ধানে—সৃজনশীল মন বিষয়বস্তুর বিভিন্নতায় বিচরণ করে বেড়ায়। ঘটমান বাস্তবতার বিষন্নতায় অবসাদগ্রস্ত নাট্যকার মাঝে মাঝে বিষয় বস্তুর জন্যে অতীতের দিকে মুখ করে দাঁড়ান। অন্ধকারের মধ্যে আলোকশিখার মত ইতিহাসের পাতা থেকে বিশেষ কয়েকটি চরিত্র হাতছানি দিয়ে ডাকে। ঘটমান বাস্তবতার তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতার জাল ছিঁড়ে—সেই আলোকশিখার দুরন্ত আকর্ষণের শিকার না হয়ে উপায় থাকে না। অতীত জগতের আলো আঁধারের রহস্যময়তার মধ্যে নাট্যকার তার সৃজনশীল মনের চারপাশে এক অদ্ভুত পরিবেশের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন। উদার গম্ভীর অতীত জগতের মধ্যে উত্তরণের আনন্দে নাট্যকার মশগুল হয়ে থাকেন। এই আনন্দের আবেগে ইতিহাসের পাতা কতখানি অবিকৃত থাকে—বিষয়বস্তুর প্রামাণিকতা প্রসঙ্গে তা অবশ্যই বিচার্য।

ঐতিহাসিক নাটকের 'ঐতিহাসিকতা' বিচারে ইতিহাস কথাটা অপরিহার্য। ইতিহাস কী? তার সংজ্ঞাই বা কী নির্ণয় করে নেওয়া যেতে পারে। ঐতিহাসিক

নাটকের বিষয়বস্তু যে ইতিহাসের সামগ্রী থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে—সেই ঐতিহাসিক সামগ্রীর সত্যতা সম্বন্ধে কোন সংশয় আছে কিনা—পূর্বেই সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ার প্রয়োজন থাকা উচিত বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে "ইতিহাসের সত্য নির্ণয় করা বড়ো কঠিন। কথা সজীব পদার্থের মত বাড়িয়া চলে; মুখে মুখে কালে কালে তাহার পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। সৃজনশক্তি মনের স্বাভাবিক শক্তি—যে কোনো ঘটনা, যে কোনো কথা তাহার হস্তগত হয় তাহাকে সে অবিকৃত রাখিতে পারে না। কতকটা নিজের ছাঁচে ঢালিয়া তাহাকে গড়িয়া লয়। এইজন্য আমরা প্রত্যহই একটি ঘটনার নানা পাঠান্তর নানা লোকের নিকট পাইয়া থাকি।"১

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক তাহ'লে ঐতিহাতিহাসিক তথ্যের সত্যতা নিরূপিত হবে কী করে? ঐতিহাসিক সত্যতা 'ঐতিহাসিক' ঘটনার জনশ্রুতির বহুমনে প্রতিফলনের মধ্যে বিবৃত'। 'অতীত সময়ের অবস্থা কেবল ঘটনার দ্বারা নির্ণয় হয় না, লোকের কাছে কিরূপ ঠেকিয়াছিল সেও একটা প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। অতএব ঐতিহাসিক ঘটনার জনশ্রুতিতে বাস্তব ঘটনার সহিত মানবমন মিশ্রিত হইয়া যে পদার্থ উদ্ভূত হয়, তাহাই ঐতিহাসিক সত্য। এই বিচিত্র জনশ্রুতি এবং জীর্ণ উপকরণ-মূলক ইতিহাসে এমন অনেকটা অংশই থাকে যাহার প্রমাণ অপ্রমান ঐতিহাসিকের ব্যক্তিগত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।' ২ সুতরাং ব্যক্তিগত প্রকৃতিনির্ভর ঐতিহাসিক উপাদান অবলম্বন করে লেখা নাটকে ঐতিহাসিকতা বিচার করার সময় এই সত্যটি সমনে রাখলে নাট্যকারের প্রতি সুবিচার করা যাবে। একথা বলার কারণ এমন অনেক ঐতিহাসিক চরিত্রের বা ঘটনার উল্লেখ করা যায়—যার সম্বন্ধে একাধিক ঐতিহাসিক একমত হতে পারেন না। সেক্ষেত্রে নাট্যকারের নাটকের বিষয়বস্তুর ঐতিহাসিকতা বিচারের মানদণ্ড কী হওয়া উচিত—তা সমালোচকদের কাছে যেমন সমস্যামূলক, নাট্যকারদের পক্ষে তার চেয়ে বেশী বিভ্রান্তিকর।

'ঐতিহাসিক নাটক'—কথাটিকে বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে 'ইতিহাস' ও 'নাটক' দুটি পৃথক অর্থবহ শব্দের অস্তিত্ব সহজেই ধরা পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে শব্দটিকে পৃথক দুটি শব্দে ভাঙ্গা গেলেও ঐতিহাসিক নাটক 'ইতিহাস' ও 'নাটক'-এর যোগফল নয়। ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাস ও নাটকের কোন মিশ্রিত পদার্থের সগোত্রও নয়। ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাস ও নাটক অবিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ এক মৌলিক সৃষ্টি। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যৌগিক পদার্থে যেমন দুয়ের মিশ্রনে দুয়ের অস্তিত্বের সমন্বয়ে এক পৃথক ও সম্পূর্ণ নূতন বস্তুর উদ্ভব, ঐতিহাসিক নাটক তদ্রূপ।

কিন্তু নাটকে বা সাহিত্যে ইতিহাসের স্থান কতটা সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ

১. ইতিহাস—ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাপকাঠি না থাকলে বিচার অসম্পূর্ণ থাকা স্বাভাবিক। সাহিত্যে ঐতিহাসিকতার অনুশাসনের রক্তচক্ষুকে রবীন্দ্রনাথ গ্রাহ্য করেন নি কিংবা তার ইতিহাসআশ্রয়ী সাহিত্যের প্রেরণা ইতিহাসের উপাদান—একথা স্বীকার করতে রাজী হন নি। 'এই কথা কাহিনীর রূপ ও রস একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মনে আনন্দের আন্দোলন তুলেছিল, ইতিহাস তার কারণ নয়।'২ সাহিত্যে ইতিহাস প্রাধান্য পেলে সাহিত্য সাহিত্য থাকে কি না সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে চিন্তার অবকাশ আছে। যেমন সাহিত্যে 'প্রচার' যদি মুখ্যস্থান জুড়ে থাকে—তাকে প্রচারধর্মী সাহিত্য বলে প্রচার করা হলেও প্রচার প্রকটতার জন্যে তাকে সাহিত্যের সীমানার মধ্যে রাখা সম্ভবপর কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের মতে আত্মাই কর্তা। তাকে নেপথ্যে রেখে ঐতিহাসিক উপকরণের আড়ম্বর করা কোনো কোনো মনের পক্ষে গর্বের বিষয় এবং সেইখানে সৃষ্টিকর্তার আনন্দকে সে কিছু পরিমাণে আপনার দিকে অপহরণ করে আনে। কিন্তু এ সমস্তই গৌণ। সৃষ্টিকর্তা জানে। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত বৌদ্ধ ইতিহাসের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কী মহিমায় এ কী করুণায় প্রকাশ পেয়েছিল! এ যদি যথার্থ ঐতিহাসিক হত তাহলে সমস্ত দেশজুড়ে 'কথা ও কাহিনীর' হরিরলুট পড়ে যেত।'৩

কাব্য নাটক উপন্যাসে ইতিহাসের আনুগত্য সম্পর্কে স্রষ্টারা প্রায় সবাই একমত। সাহিত্যে ঐতিহাসিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে স্রষ্টাদের সোচ্চার হওয়াই স্বাভাবিক। আপন সৃষ্টির আনন্দে—মনের অবাধ স্বাধীন বিচরণের ক্ষেত্রে ইতিহাসের যে যে ঘটনা অনুকূল বলে মনে হয়—সেগুলি সাহিত্যে সাদরে স্থান পায়—প্রতিকূল ঘটনা তা যত ঐতিহাসিকই হোক না কেন—স্রষ্টারা তা কৌশলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন। কিছু কিছু ঘটনা সম্পর্কে ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে সেগুলির অনৈক্য সম্বন্ধে স্রষ্টারও কিছু কিছু কৈফিয়ৎ থাকে। 'অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না—কারণ নাটক ইতিহাস নহে।'৪

নাটক ইতিহাস নয় ঠিক কথা কিন্তু ঐতিহাসিক উপকরণের বিকৃতিকরণ এর কোন কৈফিয়ৎই গ্রাহ্য হওয়া উচিত হয়। নাটক ইতিহাস নয় কথাটি নাটকের রস নিষ্পত্তির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নাট্যরস সৃষ্টির অনুকূলে ইতিহাসকে নাটকে পরিণত করতে কোনো কোনো স্থলে কল্পনার আশ্রয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই কল্পনার পরিমিতিবোধ এবং ঐতিহাসিক উপাদানের সঙ্গে তার সমন্বয়ই ঐতিহাসিক নাটককে সঠিক নাটক রূপে চিহ্নিত করার সুযোগ এনে দেয়। নাটক ঐতিহাসিকই হোক কিংবা পৌরাণিকই হোক—সব সময় স্মরণ রাখতে হবে—নাটকে নাটকীয় দোষগুণই প্রধান বিচার্য—ইতিহাস কিংবা পুরাণপ্রসঙ্গ উপকরণ মাত্র—

২. সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা—রবীন্দ্রনাথ
৩. সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা—রবীন্দ্রনাথ
৪. তারাবাই ভূমিকা—ডি. এল. রায়

লক্ষ্যবস্তু কিংবা ঈপ্সিত পরিণতি নয়। 'নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হল মানব চরিত্র সৃষ্টি, ইতিহাস বর্ণনা নয়।'৫ বিশিষ্ট নাট্যকারের নাট্য সমালোচকদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সুচিন্তিত কৈফিয়ৎ—'সমালোচকদিগকে বুঝাইতে কিছুদিন লাগিয়াছে যে নাটক কাব্য, নাটক ইতিহাস নহে।'৬ প্রাচীন কীর্তির মতোই মূল্যবান কিন্তু মৃত ঐতিহাসিক চরিত্র রসের ক্ষেত্রে আশ্রয় লাভ করলে তার জীবন্ত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'কিন্তু সেই রসের ক্ষেত্রে তাকে স্থান পেতে গেলে তাকে ইতিহাসের শান বাঁধানো পথে গেলে চলবে না, পথের এদিকে ওদিকে যেখানে বিচিত্র সৌন্দর্যলোক ও মানুষের রহস্য-গম্ভীর অন্তর্লোক উদ্ঘাটিত হয়েছে সেখান দিয়ে তাকে যেতে হবে।'৭

ইতিহাসের উদ্দেশ্য কী এবং নাটকের উদ্দেশ্যই বা কী বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। জীবনের ঘটনাকে উপজীব্য করে দুয়েরই বিস্তৃতি—দুয়েরই প্রাণস্পন্দন। তাই আপাতদৃষ্টিতে দুয়ের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন বলেই মনে হয়। উদ্দেশ্যের এই একমুখীনতা সূত্রে ঐতিহাসিক নাটকের ইতিহাস ও নাটক একেবারে কাছাকাছি এবং পাশাপাশি হওয়ার এবং জীবনের ঘটনা প্রকাশ করার কাজে একযোগে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ পায়।

কাব্য সাহিত্য নাটকে—যা ঘটছে শুধু তার ফটোগ্রাফিক বিবরণ থাকার কথা নয়—যা ঘটছে স্রষ্টার মনের তুলিতে তার বিচিত্ররূপে প্রকাশই ঈপ্সিত। শুধু তাই নয় যা ঘটেনি অথচ যা ঘটতে পারে,ঘটলে অসম্ভব কিছু হবে বলে মনে হবে না তার শুধু নিছক বিবরণ নয় বর্ণনার বর্ণাঢ্য বিবরণ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় নাটককে। অথচ ইতিহাস কি করে? যা ঘটেছে—তাকে অবলম্বন করেই তার যাত্রাপথ নির্দ্ধারিত। ইতিহাস শুধু ঘটনার বিবরণ—কাব্য নাটকের কাছাকাছি থেকেও ঐখানে তার কর্মধারার পার্থক্য। ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাস শুধু উপাদান, তার বেশী কিছু হতে দিলে নাটকে জীবনের আদর্শায়ন বাস্তবতার কঠিন মাটিতে আঘাত পেতে পারে। কারণ কাব্যসাহিত্য নাটকের উদ্দেশ্যই জীবনকে ঘিরে একটি পরিপূর্ণ বৃত্ত রচনা—জীবনকে আদর্শায়িত করা (Idealise) এবং সেই অর্থেই 'Art is more philosophical than history' ঐতিহাসিক নাটক বিচারের সময় তাই লক্ষ্য রাখতে হবে—নাটকে ঐতিহাসিক উপাদানের রসরূপ দেওয়া সার্থক হয়েছে কিনা। 'ব্যক্তিরূপ' সে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক যাই হোক না কেন, ভাবের অঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত, আর যাই হোক শিল্পসুন্দর নয়। ……পৌরাণিক, কাহিনীর অথবা ঐতিহাসিক কাহিনীর কৌতূহল মূল্য যতই থাক

৫. নাটকের কথা—ডঃ অজিত কুমার ঘোষ

৬. নাটক প্রসঙ্গে—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৭. নাটকের কথা—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ।

অর্থাৎ সামাজিকতার প্রশ্ন কৌতূহল বা ধর্মোদ্দীপনা মেটাবার উপযোগিতা তাদের যতই থাক, যতই তারা পুরাণের বা ইতিহাসের আনুগত্য রক্ষা করুক যে পর্যন্ত না তারা রসরূপ লাভ করে, সে পর্যন্ত তারা শিল্পের মর্যাদাই পায় না।'৮ সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা বা ট্র্যাজেডী নাটকে ঐতিহাসিক নিষ্ঠা (Historical Accuracy) প্রসঙ্গে লেসিড-এর সমালোচনা থেকে উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে। 'In short, tragedy is not history in dialogue History is for tragedy nothing but a storehouse of names wherewith we are used to associate eertain characters. If the poet finds in history circumstances that are convenient for adornment on individualising of his subjects, well let him use them.৯ ঐতিহাসিক নাটক সমালোচনার ক্ষেত্রে বিচারকে নিরপেক্ষ রাখার জন্যে ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবন বা কোনো ঐতিহাসিক ঘটনানির্ভর নাটক প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে—নাট্যকারের উদ্দেশ্য দৃশ্যাকারে ইতিহাস রচনা নয়, উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তির রূপের মাধ্যমে জীবন-ভাষ্য রচনা করা। নাট্যকারের কাছে ইতিহাস রসসৃষ্টির উপায় বিশেষ, তার লক্ষ্য রসসৃষ্টি।'১০

আস্বাদন ও রসসৃষ্টির পথে পরিপন্থী ঘটনা বা চরিত্র তা ইতিহাসের দলিলে নথিভুক্ত হয়ে থাকলেও কৌশলে বর্জন করে নেওয়া প্রয়োজন। জীবনভাষ্য রচনার প্রয়োজনে নাটকের সর্ত মেটাতে সে বর্জন একান্তভাবেই অনিবার্য। ইতিহাসের বস্তু সত্যকে কিছুটা বর্জন করে ও কিছুটা রঞ্জন করে নাট্যকার একটি ভাবসত্যের জগৎ সৃষ্টি করেন। সেজন্য তিনি ইতিহাসের অনেক বড় ঘটনাকে উপেক্ষা করেন। আবার কোনো উপেক্ষিত ঘটনার ওপর আলোকপাত করে তাকে রসসৃষ্টির পক্ষে অনুকূল করে তোলেন।'১১

তবে ঐতিহাসিক নাটকে নাট্যকারের একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে। ঐতিহাসিক নাটকে একটি ঐতিহাসিক যুগের পরিমণ্ডল সৃষ্টি অত্যাবশ্যকীয়। চরিত্রগুলির আচরণও লক্ষ্য করতে হবে যুগের পটভূমিতে সঠিকভাবে বিন্যস্ত কি না। ঐতিহাসিক নাটকে এই ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই সংলাপ প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছান দরকার। ঐতিহাসিক নাটকে নাট্যকারকে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে যথোচিত নিষ্ঠার ও পরিচয় দিতে হবে। ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্রের একটি প্রচলিত রূপ এবং অনেকাংশে সংস্কার লোকের মনে দৃঢ়বদ্ধমূল হয়ে থাকে। অনেক সময় নাটকের সর্ত পূরণ করতে গিয়ে নাট্যকার ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনার প্রচলিত রূপের বিকৃত বা বিরূপ কল্পনা করে বসেন। রসরূপের প্রয়োজনের তাগিদ

---

৮. ১০. নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার—ডঃ সাধন ভট্টাচার্য।

৯. লুই হোল্ড এফ্রায়েম লেসিড-এর প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃতি।

১১. নাটকের কথা—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ।

—এই দোহাই দিয়েও নাট্যকার প্রচলিত চরিত্র বা ঘটনার বিকৃতিকরণের সাফাই গেয়ে পার পান না। সংস্কারের মূলে আঘাতকে দর্শক কিংবা পাঠকবৃন্দ কেউ ই ক্ষমা করে না এবং নাট্যকারের এই আচরণ ব্যাভিচার বলেই গণ্য হয়ে থাকে। এই ধরণের আচরণ কাব্য নাটকের প্রয়োজনে হলেও নাট্যকারের কাছে বিরাট ঝুঁকি নেওয়ার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। সংস্কারেব মূলে আঘাতজনিত ক্ষোভ রসাস্বাদনের পক্ষে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় এবং অনিবার্য ফলশ্রুতিতে নাট্যকার দর্শক বা পাঠকের মনে ঈপ্সিত আবেদন সৃষ্টি করতে পারেন না। অবশ্য এর যে ব্যতিক্রম হয় না তা নয়। অনেক অনৈতিহাসিক ঘটনা এবং ঐতিহাসিক চরিত্রের অসৎ আচরণের পরিবর্তে সদাচারণ এর ঘটনা নাটকে চিত্রিত করে নাট্যকার ঈপ্সিত ফলেরও অধিক পেয়েছেন এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই বাংলা নাটকে। বিশেষ করে জাতীয় জাগরণের পরম লগ্নে যে সমস্ত বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের জন্মলাভ ঘটেছিল সে সব নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যকাররূপে তারা তাদের নাটকের অভিনয় সাফল্য সংবাদে অভিনন্দিত হতে পেরেছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য; গিরিশচন্দ্র ঘোষের সিরাজদ্দৌলা; ডি. এল. রায়ের তারাবাঈ; প্রভৃতি নাটকে এমন অনেক দৃষ্টান্ত মিলবে।

ঐতিহাসিক নাটকে নাট্যকায়ের দায়িত্ব ও ইতিহাস চেতনার আলোচনায় নাট্যকারকে কিভাবে বিপদগ্রস্ত হতে হয় সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের উদ্ধৃতি উল্লেখ্য। 'সর্বজনবিদিত সত্যকে একেবারে উল্টা করিয়া দাঁড় করাইলে রসভঙ্গ হয়, হঠাৎ পাঠকদের যেন একেবারে মাথায় বাড়ি পড়ে। সেই একটা দমকাতেই কাব্য একেবারে কাত্ হইয়া ডুবিয়া যায়।'১২ নাট্যকারের স্বাধীনতা স্বীকার করেও একটি বিষয় সম্বন্ধে সতর্ক হতে হবে। কোনো সর্বজনবিদিত এবং চিরস্বীকৃত ঐতিহাসিক সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করবার ক্ষমতা নাট্যকারের নেই।'১৩ ঐতিহাসিক নিষ্ঠা এবং উপাদানের যাথার্থ্য-এর প্রতি যথাযথ আনুগত্য স্বীকার করে নিলে ঐতিহাসিক নাটকের ঐতিহাসিকত্ব এবং পৌরাণিক নাটকের পৌরাণিকত্বের পরিমাণ নির্দ্ধারণের প্রশ্নটি এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। ঐতিহাসিক নাটকে 'অন্য কারণেও ঐতিহাসিকত্ব যাচাই করার প্রশ্ন উঠতে পারে। ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবন-কথা যেখানে প্রকাশ্য বিষয়, সেখানে প্রকাশের যথার্থ্য বিচার করতে হলে ঐতিহাসিকত্বের হিসাবনিকাশের প্রশ্ন একবার উঠবেই।'১৪ ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবনালেখ্য ইতিহাসের অনুগামী কিনা বিচার করতে বসলে ইতিহাসের পাতাটায় একবার চোখ মেলে না দেখলেই নয়।

ঐতিহাসিক নাটকের সমালোচনার ক্ষেত্রে—সাহিত্যে বাস্তবতার মতো—'নাটকে

১২. ঐতিহাসিক উপন্যাস—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৩. নাটকের কথা—ডঃ অজিত কুমার ঘোষ।
১৪. নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার—ডঃ সাধন ভট্টাচার্য।

ঐতিহাসিকতা' প্রসঙ্গটি বিচার করে দেখার প্রয়োজন। সাধারণভাবে সাহিত্য বিচারে বাস্তবতা সম্পর্কে বিচারের কথায়—আলোচ্য সাহিত্যের ঘটনা বা চরিত্র দেখতে হবে How far true to life ঠিক তেমনি ঐতিহাসিক নাটক বিচারের ক্ষেত্রেও একদিকে যেমন দেখতে হবে—নাটকটি How far true to life। তেমনি অন্যদিকেও দেখার দরকার—তা How far true to History হয়েছে।

যুগধর্ম ও প্রবণতার প্রবাহে তখন ভাসছিল এক ধরণের ঐতিহাসিক রোমাণ্টিক চেতনা—জাগছিল রোমাণ্টিক ঐতিহাসিক রচনার পাত্রে জাতীয় শৌর্য্য বীর্য্যের সঞ্জীবনী সুরা পরিবেশনের উদগ্র বাসনা।

জাতীয় ভাবোদ্দীপনার এই যুগটাকে রবীন্দ্রভাষ্যে ছায়াকে 'কায়াময়ী' এবং কায়াকে 'মায়াময়ী' করার যুগ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এককথায় এ যুগ সংক্ষিপ্তভাষ্যে 'বাস্তব রূপকথা'র যুগ। তাই এই নব্য ইতিহাস চেতনার আলোকে ইতিহাসের প্রতাপ রূপকথার পরিমণ্ডলে ইতিহাসের ক্যানভাসে এক অভিনব চরিত্র রূপে আবির্ভূত। অনুরূপভাবে গিরিশচন্দ্রের হাতেও সিরাজদ্দৌলা নাটকের সিরাজ এক নূতন সৃষ্টি।

ঐতিহাসিক নাটক রচনার মূলে জাতীয়তাবোধের প্রেরণা, জাতীয় জাগরণের সংগ্রামী চেতনার উন্মেষ এবং ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ ক্ষীরোদপ্রসাদের যে কিছু পরিমাণে ছিল—প্রতাপাদিত্য নাটকের প্রেরণা ও উপাদান প্রসঙ্গে সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা হয়েছে।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ইতিহাস চেতনা মনে দৃঢ় বদ্ধমূল না হওয়া পর্যন্ত শুধু যুগধর্মের তাগিদেই ঐতিহাসিক নাটক সৃষ্টি সম্ভব নয়। ক্ষীরোদপ্রসাদের ক্ষেত্রে তাঁর ঐতিহাসিক নাটক রচনার পিছনে যুগধর্মের তাগিদ ছাড়াও তাঁর নিজস্ব জাতীয়তাবোধের মৌলিক প্রেরণাও যে ছিল সে কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে ঐতিহাসিক তথ্য প্রয়োগের নিষ্ঠার প্রশ্নে ক্ষীরোদ-প্রসাদ এর অনুকূলে মতামত দিতে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত হবেন—এটাই স্বাভাবিক।

ঐতিহাসিক নাটক্যের অবলম্বন ঐতিহাসিক ঘটনা—না হয় ঐতিহাসিক চরিত্র—যা ইতিহাস প্রসিদ্ধ—ইতিহাসে যার প্রাধান্য স্বীকৃত এবং যা মর্যাদামণ্ডিত।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক চরিত্রের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়ে—ঐতিহাসিক বীরগাথা অবলম্বনে ক্ষীরোদপ্রসাদ বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন। এরূপ নাট্যগুচ্ছের তালিকায় পড়ে—প্রতাপাদিত্য, নন্দকুমার, আলমগীর, চাঁদবিবি খাঁজাহান, পদ্মিনী ও অশোক।

ঐতিহাসিক ঘটনানির্ভর ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক চরিত্র সমাবেশে রচিত নাটকের নমুনাও ক্ষীরোপ্রসাদের নাট্য সাহিত্যে মিলবে। এই পর্যায়ের নাটকের মধ্যে ফেলা যায়—বঙ্গে রাঠোর, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, বাংলার মসনদ প্রভৃতি নাটকগুলিকে।

রোমাণ্টিক ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিকল্পরূপে রোমাণ্টিক ঐতিহাসিক নাটকের সংজ্ঞায় ফেলা যেতে পারে বিদূরথ ও আহেরিয়া—এই দুটি নাটককে।

ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত ধর্মমূলক নাটক হিসাবে চিহ্নিত করতে হলে—অশোক ও বঙ্গে রাঠোর এ দুটির দাবীই সর্বাগ্রগণ্য বলে মেনে নিতে হয়।

ঐতিহাসিক নাটকের একটি বিশিষ্ট শ্রেণীবিন্যাসের কথা জরুরী হয়ে ওঠে 'দাদা ও দিদি'কে নাটকের পর্যায়ে ফেলা যাবে কিনা—এই প্রশ্নের বিচার নিয়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহকে আশ্রয় করে শ্লেষাত্মক বা ব্যঙ্গাত্মক ছন্দবন্ধপদ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য শাখার গদ্যদর্পণে, কাহিনী, গল্প এবং নাটকও সৃষ্টি হতে থাকে। এই পর্যায়ের প্রায় বিরল দৃষ্টান্তের প্রতীক ক্ষীরোদপ্রসাদের একমাত্র নাটক 'দাদা ও দিদি' নানা কারণে সবিশেষ উল্লেখ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বাদেশিক জোয়ারধারায় বিধৌত হয়েছিল এবং হিন্দু মুসলিম ঐক্যের বা 'একজাতি এক প্রাণ একতার' মন্ত্রোচ্চারণে পবিত্র হয়ে উঠেছিল সে যুগের বেশ কয়েকটি নাটক।' এই পর্যায়ের নাটকগুলির মধ্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত প্রাচীনতম সর্বাগ্রগণ্য নাটক ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য। এ ছাড়াও এই শ্রেণীর নাটকের পর্যাভুক্ত হতে পারে তাঁর অন্যান্য নাটক—যেমন পদ্মিনী, নন্দকুমার, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, আলমগীর, চাঁদবিবি ও খাঁজাহান।

স্বাধীনতাআন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকগুলি সমসাময়িক অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকেয় ন্যায় তদানীন্তন যুগ চেতনার বাহন হয়েছিল। নিজস্বরীতি ও রচনাশৈলীতে ঐতিহাসিক তথ্যের নূতন তাৎপর্য বিশ্লেষণের যে প্রয়াস তখন সহজলভ্য ছিল—সেই প্রয়াসের সূত্র ধরেই কল্পনার তুলিতে ক্ষীরোদপ্রসাদ ও ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে জাতীয় বীররূপে চিত্রিত করেছেন—যার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে ভাবাবেগের প্রলেপে ঐতিহাসিক তথ্য কোন কোন স্থানে চাপা পড়ে গেছে। 'ঐতিহাসিক সত্য নিষ্কাষণ, ঐতিহাসিক চরিত্রের যথাযথ মর্যাদারক্ষণ-এ সকল ভাব ঐতিহাসিক নাটক হইতে ক্রমশঃ সরিয়া গিয়াছে। Sensation বা উত্তেজনাই ঐতিহাসিক নাটকের মূল মন্ত্র হইয়া নাট্যসাহিত্যকে এমনই হীনস্তরে নামাইয়া দিয়াছে যে সেকথা স্মরণ করিতেও লজ্জা হয়। সত্য অপেক্ষা মিথ্যা আস্ফালন এবং মিথ্যা অভিমানই বহু ঐতিহাসিক নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। দেশময় তখন একটা উত্তেজনার প্রবল তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে। সেই উত্তেজনাকে অবলম্বন করিয়া বাংলার নাট্যশালা উদর পূর্ণ করিয়াছে, কিন্তু মনের খোরাক বিশেষ কিছু আহরণ করিতে পারে নাই'।১৫ তবে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভাবোদ্দীপক নাট্য রচনার পথিকৃৎ হিসাবে 'প্রতাপাদিত্য' নাটক এর নাম

---

১৫. অপরেশ মুখোপাধ্যায়—রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর—পৃঃ ১৩৮।

চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এক সময় দেশাত্মবোধক নাটক হিসাবে প্রত্যাপাদিত্য নাটক জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল।

ঐতিহাসিক তথ্যানুসরণের নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন নাট্যকার বাংলার মসনদ নাটকে। পদ্মিনী নাটকের মূলচরিত্র—পদ্মিনী নয়, নসীবন। টডের রাজস্থান-এর কাহিনী এ নাটকেও নিষ্ঠার সূত্রে গাঁথা। 'চাঁদবিবি' নাটকের চাঁদ সুলতানের প্রাধান্য নাটকে যথাযথভাবে ফুটে ওঠেনি বহু ঘটনার সমারোহে মূল কাহিনী আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার জন্যে। বহু অভিনীত আলমগীর নাটকের ঔরঙ্গজেব চরিত্রালেখ্য ও তার দ্বন্দ্বময় জীবনকে কেন্দ্র করে সংঘাতময় কাহিনীর আকর্ষণ নাটকের অসম্ভব্যতার ত্রুটীকে ঢেকে দিয়েছে।

বৌদ্ধ যুগের কাহিনী অবলম্বনে লেখা দুখানি নাটক 'অশোক' ও 'বিদুরথ'। অশোক ইতিহাসের ছায়ায় কল্পলোকের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বিদুরথ ভারাক্রান্ত অলৌকিকতায় ও তত্ত্বকথার ভারে।

কোন একটি বিশেষ চরিত্রমাহাত্ম্য প্রদর্শন করতে গিয়ে হয়তো নাট্যকারকে অনৈতিহাসিক তথ্যের অবতারণা করতে হয়। যেমন ডি. এল. রায়ের দুর্গাদাস চরিত্র (দুর্গাদাস নাটকের)। নন্দকুমার, চাঁদবিবি, পদ্মিনী, আলমগীর, প্রতাপাদিত্য, খাঁজাহান নাটকের ঐতিহাসিক উপাদানের প্রতি নাট্যকারের নিষ্ঠার পরিমানের সঙ্গে তার অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকের নাট্য উপাদান ও নিষ্ঠার সম্পর্কে নাট্যকারের দৃষ্টি ভঙ্গির কিছুটা পার্থক্য দেখা গেছে। যে নামে নাটক পরিচিত—সেই সব নামধারী চরিত্রগুলিই উল্লিখিত নাটকগুলির কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাদের জীবনালেখ্য এবং পরিণতি ইতিহাস স্বীকৃত। সুতরাং তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পুরোপুরিভাবে কল্পনার আশ্রয় নিতে কিংবা অনৈতিহাসিক ঘটনার. অনুপ্রবেশ ঘটাতে সুযোগ সন্ধানী নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ঠিকমত সাহস করেন নি, যদিও ঐতিহাসিক লক্ষণাত্মক অন্যান্য নাটকে সে সুযোগ স্বভাবতই বেশী ছিল—যেমন 'আহেরিয়া', বিদুরথ, বঙ্গে রাঠোর বাংলার মসনদ প্রভৃতি নাটকে। কিন্তু পদ্মিনী নাটকে একেবারেই নয়। পদ্মিনী নাটকের ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্রায়ণ—সব কিছুর যাথার্থ্যের দায়িত্ব একান্তভাবেই টডের বা টডকৃত 'রাজস্থান' এর।

বাংলা নাট্যসাহিত্যধারায় ঐতিহাসিক নাটক পর্যায়ের প্রাথমিক পর্বে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী' ইত্যাদি নাটকে ইতিহাস চেতনা বহিরঙ্গভিত্তিক—কল্পনার ভাগই বেশী। ডি.এল. রায় সম্পর্কেও দু এক জন বিশিষ্ট সমালোচকের অভিযোগ—"ইতিহাসের প্রতি তার আনুগত্য আদৌ ছিল না। কি ঘটনা বিন্যাসে, কি নামকরণে, কি সংলাপে, কি চরিত্র চিত্রণে দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসের বিন্দুমাত্র মর্যাদা রাখেন নাই।" ডি.এল.রায়ের ক্ষেত্রে একথা সর্বৈব সত্য নয়। ক্ষীরোদপ্রসাদ সম্পর্কেও প্রচলিত মতবাদ—"গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় ক্ষীরোদপ্রসাদ

ঐতিহাসিক নাটক লিখিতে যাইয়া ইতিহাসকে খুব বিশুদ্ধভাবে অনুবর্তন করেন নাই। অনেকস্থলেই তিনি নিজের প্রয়োজনমত কল্পনাশ্রয়ী হইয়া অভিনব ঘটনা এবং চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন।"১৬ —বহুলাংশে সত্য হলেও ইহা সর্বৈব সত্য নয়। অন্ততঃ পদ্মিনী নাটকটি এরূপ মন্তব্যের আওতায় পড়ে না। টডের রাজস্থান থেকে সংগৃহীত কাহিনী টডের বর্ণনার সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একইভাবে সংযোজিত হয়েছে। টডের ইতিহাসকল্প রাজস্থান কাহিনীর প্রতি আনুগত্যের ত্রুটী ঘটতে দেন নি ক্ষীরোদপ্রসাদ এই নাটকে। তবে টডের রাজস্থান এ ঐতিহাসিক তথ্যের যদি কিছু বিকৃতি বা হেরফের হয়ে থাকে তাহলে তার দায়িত্ব ক্ষীরোদপ্রসাদের নয়—টডের প্রতি তাঁর আনুগত্যের বা নিষ্ঠার—তাঁর কল্পনার অবাধ বিস্তার প্রবণতার নয়। সুতরাং ক্ষীরোদপ্রসাদ সম্পর্কে প্রচলিত মতবাদ যে তিনি ঐতিহাসিক নিষ্ঠার ধার ধারেন নি—এ মতবাদ সর্বৈব সত্য নয়। অন্ততঃ টডের রাজস্থান কাহিনী তা ইতিহাস স্বীকৃত হোক বা প্রচলিত কিংবদন্তী নির্ভরই হোক—তার প্রতি তাঁর আনুগত্য সন্দেহাতীত।

ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে প্রচলিত অভিযোগ—তাঁর নাটকের ঐতিহাসিক উপাদান এর রূঢ় বাস্তবতার ওপর তিনি রোমান্সের প্রলেপ দিয়েছেন প্রায় সর্বত্র। রোমান্সের অনুপ্রবেশে এবং কল্পনার রঙীন তুলিতে ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতির অভিযোগ কিন্তু সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। ক্ষীরোদনাট্যের এই ত্রুটিকে নাট্যকারের নাট্যরীতি বা স্বাভাবিক প্রবণতা বলে ধরলে অভিযোগের গুরুত্ব কমে যায়। কারণ নাট্যকার এর ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে রোমান্টিক, ঐতিহাসিক নাটকের পর্যায়ে ফেললে তার নাট্য-সম্ভারের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুটা স্পষ্ট ধারণা হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ তিনি বহুক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয—কিন্তু আসলে সে অভিযোগ ঠিক তথ্য বিকৃতির অভিযোগ বলে চিহ্নিত হওয়া উচিত নয়। আপাত দৃষ্টিতে বা বিচারে যা বিকৃতি তা আসলে কল্পনার মেঘাচ্ছন্নতায় ঐতিহাসিক তথ্যের অস্পষ্টতা এবং অস্বচ্ছ আত্মপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

যা স্বভাবসুলভ তা দোষের হোক গুণের হোক নাট্য রচনাকালে তার প্রকাশ অনিবার্য—সেই হিসাবে ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটক এর সঙ্গে অনিবার্যভাবে দুটি শব্দ 'রোমান্সের মায়ালোক' ও 'কল্পনার ঐশ্চর্য্য' সর্বত্রই সংযোজিত হয়ে থাকবে।

---

১৬. নাট সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার—ডঃ সাধন ভট্টাচার্য্য।

।। ঐতিহাসিক নাটক ।।

এবং

ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক

কালানুক্রমিক

তালিকা

১)	বঙ্গের প্রতাপাদিত্য	—	২৯শে আগস্ট, ১৯০৩
২)	পদ্মিনী	—	১৫ই নভেম্বর, ১৯০৫
৩)	চাঁদবিবি	—	২৪শে আগস্ট, ১৯০৭
৪)	নন্দকুমার	—	১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯০৮
৫)	দাদা ও দিদি	—	৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৮
৬)	অশোক	—	২৫ জুন, ১৯০৮
৭)	বাংলার মসনদ	—	১৬ই জুলাই, ১৯১০
*৮)	খাঁজাহান	—	২৫শে জুলাই, ১৯১২
*৯)	আহেরিয়া	—	২০শে জানুয়ারি, ১৯১৫
*১০)	বঙ্গে রাঠোর	—	৮ই সেপ্টেম্ব, ১৯১৭
১১)	আলমগীর	—	৯ই ডিসেম্বর, ১৯২১
*১২)	বিদুরথ	—	১০ই মার্চ, ১৯২৩
১৩)	গোলকুণ্ডা	—	২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৫

খাঁটি ঐতিহাসিক নাটকের পর্যায়ভুক্ত না হওয়ার জন্য খাঁজাহান, আহেরিয়া, বঙ্গে রাঠোর এবং বিদুরথ এই চারখানি' ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হ'ল না।

।। প্রতাপাদিত্য ।।

ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকের প্রেরণা এবং তার নিজস্ব জাতীয়তাবোধ সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে সমসাময়িক স্বদেশী আন্দোলনের ইতিবৃত্তের কথা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যরচনার কাল ১৮৯৪-১৯২৬। প্রথম ঐতিহাসিক নাটক বঙ্গের প্রতাপাদিত্য (১৯০৩) এবং শেষ ঐতিহাসিক নাটক গোলকুণ্ডার রচনা-কাল ১৯২৫।

নাট্যকারের জন্মলগ্নের (১৮৬৩) কিছু পূর্বে পরাধীন দেশে আত্মসম্মান বোধের সাহিত্য মারফৎ প্রথম আত্মপ্রকাশ দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকে। শুধু আত্মসম্মানবোধের প্রকাশ নয়, শাসক ইংরাজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণের স্পর্ধার

বলিষ্ঠ প্রকাশে এক সংগ্রামশীল নাট্যকারের ভূমিকা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক নাটকে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছিল। ১৮৫৯-৬১ এর নীল বিদ্রোহের ইতিহাসের প্রাণস্পন্দন আজও শোনা যায় নীলদর্পণ নাটকের মধ্যে কান পাতলে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক রচনার পূর্ব পর্যন্ত নীলবিদ্রোহের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর দিকে একবার তাকিয়ে নেওয়া দরকার। মোটামুটি রাজনীতির দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি পরপর সাজালে দাঁড়ায়—

১৮৬৭—হিন্দুমেলা, ১৮৭৮—প্রেস অ্যাক্ট, ১৮৭৬ - সুরেন্দ্রনাথের ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা, ১৮৮৩—ইলবার্ট বিল, ১৮৮৫—বোম্বাইতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন, ১৯০১—কোলকাতায় অনুশীলনী সমিতি স্থাপন, ১৯০২—ডন সোসাইটি : দেশসেবার আদর্শে আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। ডন সোসাইটির স্থায়ী সভাপতি ছিলেন মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউসনের অধ্যক্ষ ও ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রিকার সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

উল্লিখিত রাজনৈতিক ঘটনাবলী, রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে বেশ খানিকটা প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। ইংরাজ সরকার কঠোর দমন নীতির সঙ্গে সঙ্গে বিভেদনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে স্বদেশী আন্দোলনের কন্ঠরোধ করতে চেয়েছিল। এই ভেদনীতির বিরুদ্ধে সাহিত্যিকরা তাদের সৃষ্ট সাহিত্যের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাবার প্রয়াসী হতে চেয়েছিলেন। নাট্যকাররাও পেছিয়ে ছিলেন না। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকেও এইসব প্রচেষ্টার স্বাক্ষর দুর্লভ হবে না।

জাতীয়তাবোধের আদর্শ যখন ধীরে ধীরে সাহিত্যের অঙ্গনে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল, জাতীয়তাবোধের ভাবাদর্শে সর্বপ্রথম অনুপ্রাণিত নাট্যকার হিসাবে ক্ষীরোদপ্রসাদের বঙ্গের প্রতাপাদিত্য নাটকের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। স্বদেশী আন্দোলনের ধারাবাহিকতার পূর্ণ লক্ষণ তখন বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য সবগুলি শাখায় সুস্পষ্ট। জাতীয় জীবনের অসাধারণ লগ্ন তখন মুখর হয়ে উঠেছিল সঙ্গীত-কাব্য-নাটকে। বাংলা সাহিত্যের ওপর স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব তখন পূর্ণ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল।

নাটকে এই জাতীয়তাবোধের আদর্শের সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ মেলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে। নাটকে ইতিহাস কিংবা ঐতিহাসিক কাহিনীভিত্তিক নাটক রচনার পথিকৃৎ অবশ্য মধুসূদন, কিন্তু উপাদানের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক ছাড়া মধুসূদনের প্রেরণা জাতীয়তাবোধের আত্মিক তাগিদে নয় বরং ট্র্যাজেডী নাটক রচনার ঝোঁকের তাগিদেই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকেই সর্বপ্রথম দেশপ্রেমের বাণী সোচ্চার হয়ে ওঠে। দেশপ্রেমের মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত আবেগে জাতীয় ভাবাবেগাপ্লুত কয়েকখানি নাটক রচনা করেন। এই পর্যায়ের নাটকগুলির মধ্যে অশ্রুমতী, সরোজিনী ও পুরুবিক্রম সবিশেষ

উল্লেখযোগ্য। এককথায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে জাতীয়তাবোধ দীপ্ত। ঐতিহাসিক নাটক রচনার যে মনন ও প্রেরণার উন্মেষ ক্ষীরোদপ্রসাদের জাতীয়তা ভাবসিক্ত ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক বঙ্গের প্রতাপাদিত্যের মধ্যে তার সর্বপ্রথম বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে।

'বাঙ্গালীর আত্মসচেতনতা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠাকামনা' অতীত ঐতিহ্য স্মরণ আত্মসমালোচনার আকারে শুরু হয়েছিল এবং পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কীর্তিকাহিনী আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক থেকে এই জাতীয় রোমান্টিক ঐতিহাসিক নাটক লেখার আবেগ প্রবল ভাবে দেখা দিয়েছিল। হরলাল রায়, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ নাট্যকারদের নাটক তার নিদর্শন। স্বাধীনতাকামনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই আবেগও বৃদ্ধিলাভ করেছিল। রোমান্টিক ঐতিহাসিক রচনার পাত্রে জাতির অতীত শৌর্যবীর্যের সঞ্জীবনী সুরা পরিবেশন করার আগ্রহ অনেক পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল।'১৭

ইতিহাসের আনুগত্য স্বীকার করতে গিয়ে দেশপ্রেমিকের স্বপ্ন-সুন্দর একটি মূর্তির গায়ে সামান্য দাগও তারা লাগতে দেন নি।

ক্ষীরোদপ্রসাদের পূর্ববর্তী যেসব নাট্যকারদের নাটকে স্বদেশপ্রীতি স্বতঃউৎসারিত কিংবা প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত তাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামোল্লেখ পূর্বেই করেছি। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার চেয়ে বীরের কাছে অধিকতর গৌরবের আর কি থাকতে পারে—একথা মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে যেমন ঘোষিত হয়েছিল তেমনি তার কৃষ্ণকুমারী নাটকেও হিন্দু মহিমা স্মরণের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল পরাধীনতার দুঃসহ অন্তর্জ্বালা। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকে স্বজাতি-প্রীতি ও স্বদেশবাসীর অসহায় অবস্থার সম্যক পরিচয় মিললেও একথা ভুললে চলবে না যে দীনবন্ধু নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের রূপ তুলিয়া ধরিলেও ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে পরাধীনতার বিরুদ্ধে কোন সচেতন প্রতিক্রিয়া দেখান নাই।'১৮

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশী ভাবাদর্শে রচিত নাটকগুলির পর দুচারটি স্বল্প পরিচিত নাটক স্বদেশী ভাবাদর্শে রচিত হতে দেখা গিয়েছিল। অমৃতলাল বসুর নবজীবন (১৩০৮) নক্সা নাটিকাটিতে স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থন মিলেছিল। অররেন্দ্রনাথ দত্তের 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' নাটকটি ও সমসাময়িক কালের জাতীয় আবেগের আধাররূপে সহজেই চিহ্নিত হতে পারে। (অবশ্য এই নাটকটি ১৯০৫-এর ৯ই আগস্টের আগে অভিনীত হয়নি)। এছাড়া ক্ষীরোদপ্রসাদের পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বনবীর' নাটকটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

১৭. নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার—ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য।

স্বদেশী আন্দোলনের অনন্যসাধারণ প্রভাব কাটিয়ে ওঠা কোন সাহিত্যিকের পক্ষেই তখন সম্ভব ছিল না। সক্রিয় প্রতিরোধ ও কর্মচঞ্চল জাতীয় জীবনের অভীপ্সাকে রূপ দেওয়ার জন্যে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটককেই উপযুক্ত মাধ্যম বলে গ্রহণ করেন। পরিবেশের রাজনৈতিক চেতনা নাট্যকারকে প্রথম জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত নাটক রচনায় প্রবৃত্ত করেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। জাতীয়তা ভাবাদর্শে রচিত প্রথম ঐতিহাসিক নাট্যরচনার প্রাক্‌কালে যে অবস্থা বিরাজমান ছিল তার কিছুটা পরিচয় মিলবে একটি উদ্ধৃতি থেকে-'অন্তরে বাইরে জাতি মুক্তি চাইছে ঐকান্তিক আবেগে।......"একদিকে প্রাচীন ভারতের উদার আধ্যাত্মিকতার এবং প্রতীচ্যের কাছ থেকে নূতন করে পাওয়া মানবতার ও বিশ্বমানবতার প্রেরণা, অন্যদিকে জাতি হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রাণশক্তির এবং জাতীয়তাবাদের মধ্যেই উত্তেজনা।'১৯ যুগের দাবী মেটাতেই ক্ষীরোপ্রসাদের লেখনীতে বঙ্গের প্রতাপাদিত্য এর আবির্ভাব একথা স্বীকার না করার যুক্তি আছে। কারণ সাহিত্যক্ষেত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রথম আবির্ভাব গল্পের নৌবিদ্য বহন করে। সে গল্পের নামকরণ 'রাজনৈতিক সন্ন্যাসী' (১ম খণ্ড ১লা জুন, ১৮৮৫, ২য় খণ্ড—১৫ জুলাই ১.৮৫) ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটক রচনার মূলে তার নিজস্ব জাতীয়তাবোধ ও ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ যে কিছু ছিল তা কল্পনা করা কষ্টসাধ্য নয়। 'জাতীয় জাগরণ সত্যিকার সংগ্রামের রূপ নেয় ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ভেতর দিয়ে। কিন্তু তার দুবছর আগে ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য ও রঘুবীর।' ......প্রতাপাদিত্য নাটকে নাট্যকার দেশেব স্বাধীনতা মন্ত্র অগ্নিগর্ভ ভাষায় বজ্রনির্ঘোষে প্রচার করেই ক্ষান্ত হন নি, স্বাধনিতালাভের পন্থারও নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সে পন্থা অহিংসা নয়, বরং অহিংসাকে তিনি বাংলাদেশ থেকে বৃন্দাবনে নির্বাসিত করেছেন। তখনও স্বদেশী আন্দোলনের নামগন্ধ নেই। গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে বাংলার বিপ্লবীদের সংগঠন কার্য্য চলছে। কারো কারো মতে ক্ষীরোদপ্রসাদের সঙ্গে এই বিপ্লববাদী দলের সংযোগ ছিল। তিনি নাকি তদানীন্তকালের বিপ্লবীদের প্রচারপত্র যুগান্তরের লেখক ও ছিলেন। অনুমান মিথ্যা নাও হতে পারে। পরবর্তীকালে তাকে দেখি সদ্য বরোদাপ্রত্যাগত এবং জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অধ্যক্ষ শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মীরূপে তিনি উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ খাঁটি দেশপ্রেমিক মহাশক্তির একনিষ্ঠ সাধক।'২০ সুতরাং নাট্যকার যে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যুগচৈতন্যের পরে আত্মিক তাগিদে জাতীয় ভাবাদর্শে তার প্রথম ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইতিহাসকে অবলম্বন করে যে ইতিহাসাশ্রয়ী কাল্পনিক

---

১৮. ১৯. নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার—ডঃ সাধন ভট্টাচার্য্য।
২০. কথা সাহিত্য—নলিনী কান্ত সরকার-এর প্রবন্ধ,

নাটক সৃষ্টি করলেন সেগুলিকে ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স নাট্য নামে অভিহিত করাই বোধ হয় সঙ্গত হবে। বাংলা নাট্যসাহিত্যে এই বিশেষ ধারাটির ধারাবাহিকতা ক্ষীরোদপ্রসাদের তথাকথিত ঐতিহাসিক নাটকে স্পষ্টরূপে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে দেশপ্রেমের একটি প্রবল ও যুগোচিত সুর ধ্বনিত হয়েছে, কিন্তু ইতিহাস নিতান্ত সংকুচিত হয়ে পড়েছে। ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনাকে মিশিয়ে যে একজাতীয় ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স নাট্য পরবর্তীকালে নাট্যকারদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে তার পথপ্রদর্শক বলা যেতে পারে।'২১ ক্ষীরোদপ্রসাদের রোমান্টিক মনোভাবের বৈশিষ্ট্যের জন্যে তিনি অনায়াসেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রবর্তিত সেই রোমান্টিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিলেন। রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যানে 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে ন্যাশনাল রোমান্টিসিজমের জোয়ার বইতে থাকে সেই জোয়ারের মধ্যেই আঁকড়ে ধরা হয়েছিল ঐতিহাসিক কাহিনীর আঁধারে ঐতিহাসিক পাত্রপাত্রীদের। তাদের স্বাধীন জীবন-যাপনের ঐকান্তিক কামনা এবং পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ থাকার অসহ্য যন্ত্রণার কথা মূর্ত হয়ে উঠেছিল সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নাটকে। Historical Introspective tendency সূচনা এখান থেকেই। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঠিক পূর্বে জাতীয় ভাবাবেগে অনুপ্রাণিত প্রথম নাট্যকারের সম্মান ক্ষীরোদপ্রসাদের। 'একথা এখানে স্বীকার করিতে হইবে যে এই যে ভিন্নমুখ স্রোত, এই যে প্লাবন, ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রত্যুৎপাদিতে।'২২

দেশের ও জাতীয় ইতিহাস নাট্যকারদের অনুপ্রাণিত করেছিল তাদের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্যের সূত্র ধরে এবং নির্ভীক বীর স্বদেশ প্রেমিকের প্রশস্তির পথ ধরে। এই বীর-পূজার উদ্দীপনায় ও অতীত ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়ের মধ্যে আত্ম-মগ্নতার মাধ্যমে কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক পুস্তক কথাশিল্পী ও নাট্যকারদের কাছে সবিশেষ আদৃত হতে থাকে। গল্প উপন্যাসের পাতায় কিংবা রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল প্রেক্ষাপটে অসংখ্য দর্শকের আগ্রহী দৃষ্টির সম্মুখে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকে। নিখিলনাথ-এর মুর্শিদাবাদ কাহিনী' মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, সত্যচরণ শাস্ত্রীর ছত্রপতি শিবাজী, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, টডের রাজস্থান এবং কালিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থগুলি যুগচৈতন্যের ও প্রেরণার উৎসরূপে পরিগণিত হয়েছিল।

একটি কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ইতিহাস চেতনা মনে দৃঢ়মূল না হওয়া

২১. দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়

২২. রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পর্যন্ত শুধু যুগধর্মের তাগিদেই ঐতিহাসিক নাটক সৃষ্টি সম্ভব নয়। ক্ষীরোদপ্রসাদের ক্ষেত্রে তার ঐতিহাসিক নাটক রচনার পিছনে যুগধর্মের তাগিদ ছাড়াও তার নিজস্ব জাতীয়তাবোধ ও বিংশশতকের প্রথম দশকের দেশপ্রেম, ত্যাগব্রত, কর্তব্যবুদ্ধি আত্মোৎসর্গ এবং মনুষত্ববোধের মন্ত্রে মুখর জাতীয় জীবনের এক গরিমাদৃপ্ত প্রহর। স্বদেশী আন্দোলনের সাহিত্যরূপের ধারাবাহিকতা এই সময় জাতীয় নাট্যরচনা প্রচেষ্টার মাধ্যমে রক্ষিত হয়েছিল। ক্ষীরোদপ্রাসাদের এই কালের ঐতিহাসিক নাটক রচনার পাশাপাশি অন্যান্য প্রখ্যাত নাট্যকারদের সমধর্মী নাট্যসম্ভারের একটি তালিকা তুলে ধরে দেওয়া যেতে পারে।

বঙ্গের প্রতাপাদিত্য	...	ক্ষীরোদপ্রসাদ	(১৯০৩)
প্রতাপ সিংহ	...	দ্বিজেন্দ্রলাল	(১৯০৫)
সিরাজদ্দৌলা	...	গিরিশচন্দ্র	(১৯০৫)
সাবাস বাঙালী	...	অমৃতলাল বসু	(১৯০৫)
বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ	...	অমরেন্দ্র দত্ত	(১৯০৫)
মীরকাশিম	...	ক্ষীরোদপ্রসাদ	(১৯০৬)
পদ্মিনী	..	ক্ষীরোদপ্রসাদ	(১৯০৬)
দুর্গাদাস	...	দ্বিজেন্দ্রলাল	(১৯০৬
পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত	...	ক্ষীরোদপ্রসাদ	(১৯০৭)
ছত্রপতি	...	গিরিশচন্দ্র	(১৯০৭)
চাঁদবিবি	...	ক্ষীরোদপ্রসাদ	(১৯০৭)
নন্দকুমার	...	ক্ষীরোদপ্রসাদ	(১৯০৮)
নুরজাহান	...	দ্বিজেন্দ্রলাল	(১৯০৮)
অশোক	...	ক্ষীরোদপ্রসাদ	(১৯০৮)
মেবার পতন	...	দ্বিজেন্দ্রলাল	(১৯০৮)
সাজাহান	...	দ্বিজেন্দ্রলাল	(১৯০৯)
বাঙ্গলার মসনদ	...	ক্ষীরোদপ্রসাদ	(১৯১১)

বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিংশ শতাব্দীর স্বদেশানুরাগের ভাববন্যায় ক্ষীরোদপ্রসাদ সর্বাধিক সংখ্যক ঐতিহাসিক নাট্যতরণী ভাসিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তার এই দশকে ঐতিহাসিক নাটক রচনার সংখ্যা সাত। পরবর্তী পনেরো বছরে তিনি আর মাত্র ছয় খানি ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন। তবে শেষ ঐতিহাসিক নাটক গোলকুণ্ডা (২০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫) রচিত হয়। প্রতাপাদিত্য নাটকে ঐতিহাসিক উপাদানের যাথার্থ্য সম্বন্ধে একটি মূল্যবান কথা মনে রাখার দরকার। নাটকটি রচনার প্রেরণার কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে জাতীয়তাবোধের জোয়ার সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এই জাতীয়তাবোধের জোয়ারে ঐতিহাসিক তথ্যের চেয়ে একটি

আদর্শ জাতীয়বীর-হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও আবেগ-ময় দেশপ্রেমের স্বতঃ উৎসারিত বাণীই একান্ত কাম্য ছিল। আরও একটা লক্ষ্য করার বিষয় বঙ্গীয় ভৌমিকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতা সমরের ইতিবৃত্ত অবলম্বনে নাট্যরচনা কাল বাংলা ১৩১০ ইং ১৯০৩। বাংলা সাহিত্যে রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য' চরিত্র ছাড়া অন্য কোন প্রচলিত পুস্তক ছিল না। সুতরাং এর অবলম্বন এবং উপাদান-এর সম্ভাব্য উৎসের সন্ধানে কিছু কিছু মত গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা অসঙ্গত হবে না। 'প্রতাপাদিত্য সম্পর্কিত কিংবদন্তীই ইহার অবলম্বন, তাহার সম্পর্কিত তথ্য তখন ও পর্যন্ত সুধী সমাজে অজ্ঞাত ছিল। অতএব ইহার ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষ কিছুই নাই।'২৩ তবে ইতিমধ্যে আর একখানি প্রকাশিত প্রামাণ্য পুস্তকের উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। পুস্তকটির নাম 'মহারাজ প্রতাপাদিত্য'—লেখক সত্যচরণ শাস্ত্রী—রচনাকাল ২০শে আশ্বিন বাংলা ১৩০৩ সাল—অর্থাৎ প্রতাপাদিত্য নাটক রচনার ৭ বৎসর পূর্বে। মহারাজ প্রতাপাদিত্য বঙ্গের গৌরবস্থল! আমরা কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার দোষের ভেতরের কথা ব্যতীত আর কিছুই জানি না। ইহা অপেক্ষা জাতীয় অবনতি আর কি হইতে পারে? প্রতাপাদিত্য যে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি একাকী লোকবল-গ্রথিত করিয়া মোঘল সম্রাটের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন এবং পরিশেষে বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন—ইহা বড় সাধারণ কথা নহে। এরূপ অসাধারণ বাঙ্গালীর জীবনী প্রত্যেকটি বাঙালীর জানা কর্তব্য। —মহারাজ প্রতাপাদিত্য ভূমিকা (১ম সংস্করণ)—সত্যচরণ শাস্ত্রী। উল্লিখিত পুস্তক থেকে কিছু কিছু উপাদান সংগৃহীত হয়ে উপন্যাস ও নাটকে যে স্থান পাচ্ছিল প্রতাপাদিত্য নাটক রচনার পরে প্রকাশিত ঐ বইটির ২য় সংস্করণের ভূমিকায় কিন্তু তার ইঙ্গিত রয়েছে। মহারাজ প্রতাপাদিত্য (সত্যচরণ শাস্ত্রী)-এর ২য় সংস্করণের প্রকাশকাল ২২শে আশ্বিন, ১৩১১—ভূমিকায় লেখা হয়েছে—অনেকদিন হইল, মহারাজ প্রতাপাদিত্য ফুরাইয়া গিয়াছে। নূতন উপাদান সংগ্রহ-জন্য বিলম্ব হওয়াতেই এতদিন ছাপা হয় নাই। এ সংস্করণে অনেক নূতন কথা সংগৃহীত হইয়াছে। আমাদের এই গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়া আর একখানি উপন্যাস ও নাটক রচিত হইয়াছে। কেহ বা ভাব ও ভাষা পর্যন্ত অনুকরণ করিয়াও এই গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিতে লজ্জাবোধ করিয়াছেন। যাহা হউক মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নাম সুপ্রচারিত হইয়া আমাদের উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করিয়াছে।

নাটকটির ঐতিহাসিকতা বিচার প্রসঙ্গে প্রথমেই জেনে রাখা দরকার যে নাটকটির অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা বা চারিত্রিক কার্যকলাপ এমনকি কয়েকটি নামের পর্যন্ত ঐতিহাসিক মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। নাট্যকারের স্বপক্ষে যেটুকু বলার থাকতে পারে—তা হল এর মূলে জাতীয়তাবোধের জোয়ার। এই প্রসঙ্গ

২৩. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

নলিনী ভট্টশালীর মন্তব্য প্রাণিধানযোগ্য। 'নিখিল নাথ রায়ের উদ্যম প্রতাপাদিত্য চরিত্র কিন্তু তার আগেই বাংলাদেশ স্বদেশী আন্দোলন প্রসূত প্রবল দেশাত্মবোধের বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। দক্ষ শিল্পী ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য নাটকে প্রতাপাদিত্য তখন স্বাধীন প্রয়াসের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কল্পনার প্রতাপাদিত্য তখন বাংলাদেশের হৃদয়কে এমনি অধিকার করিয়াছিল তথায় এমনি ভাবের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিল যে ঐতিহাসিক বিচাররূপ ঐরাবতের সাধ্য ছিল না সেঈ স্রোতের সম্মুখীন হয়।'২৪

প্রতাপাদিত্য যে-যুগে স্বাধীন বাংলার প্রেরণার প্রতীক ছিলেন একটি প্রামান্য পুস্তকের উদ্ধৃতি থেকে সহজেই তার প্রমান দেওয়া যায়—বারোভূঁইয়ার মধ্যে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের গৌরব বাংলার আবালবৃদ্ধবণিতার মুখে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। ভারতচন্দ্রের অমরলেখনী তাহাকে চিরউজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। আজ বাংলার প্রতি গৃহ হইতে 'যশোর নগর ধাম প্রতাপা আদিত্য নাম'—এই মহাগীতি তাহার জলভারাবনত বায়ুস্তরকে কম্পিত করিয়া অনন্ত স্পর্শ করিবার জন্য ধাবিত হইতেছে। ......বঙ্গভূমিকে স্বাধীনতা লীলা নিকেতন করিবার জন্য যিনি অদম্য অধ্যবসায় আশ্রয় করিয়াছিলেন, বঙ্গবাসীর কাপুরুষ নাম অপনোদনের জন্য যিনি তাহাদের বাহুতে শক্তি দিয়াছিলেন, বাঙালীর রাজা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যিনি আসমুদ্র বিজয় নিশান উড্ডীন করিয়াছিলেন—তাহার গৌরবগীতি গাহিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?......যতদিন বাঙালী জাতীয়তার জন্য ব্যাকুল হইবে, ততদিনই তাহার কীর্তি তাহাদের স্মৃতিপটে চিরজাগরুক থাকিবে।

যে প্রতাপ বঙ্গবাসীর আদরের বস্তু, দুঃখের বিষয় তাহার প্রকৃত ইতিহাস পাইবার উপায় নাই। প্রবাদ তাহাকে এরূপ সমাচ্ছন্ন করিয়াছে যে তাহাকে ভেদ করিয়া ইতিহাসের ক্ষীণালোক প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না।'২৫

প্রতাপাদিত্য নাটকের ঐতিহাসিকতা বিচার করার সময় আরও যে কথাটি আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন সেটি হল শ্রীযুক্ত রায়ের ভাষায় ঐতিহাসিক প্রতাপের চিত্র যে উজ্জ্বল হইবে সে ভরসা আমাদের নাই। কারণ আমরা বলিয়াছি যে ইতিহাসের ক্ষীণালোক আমাদের সহায়। অনেকের মানসপটে অঙ্কিত প্রতাপের সহিত এ চিত্রের পার্থক্য ঘটিতে পারে তজ্জন্য তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।২৫ক

মধুসূদনের সৃষ্ট মেঘনাদবধ কাব্যে প্রচলিত সংস্কারকে অতিক্রম করে কবি ইন্দ্রজিৎ ও রাবণ চরিত্রের যে নূতন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা কারো মনঃপুত না

২৪. বিচিত্রা ১৩৩৪-৩৫—বঙ্গীয় ভৌমিকগণের স্বাধীনতা সমর—নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য।

২৫. প্রতাপাদিত্য—নিখিল নাথ রায়।

২৫ক. প্রতাপাদিত্য—নিখিলনাথ রায়।

হলেও উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে তা যে অসঙ্গত হয়নি তা প্রমাণিত হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষণের যে ছবি ভারতবাসী বা বাঙালীর মনে দৃঢ়বদ্ধ-মূল হয়ে বিরাজ করছিল তা মুছে দিয়ে নূতন এক ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন কবি। রাম সেখানে নতুন আলোর ব্যাখ্যায় আঁধারে নিক্ষিপ্ত, পররাজ্য লোলুপ, সাগর পেরিয়ে সোনার লঙ্কা সোনার দেশ গ্রাস করতে এসেছেন। লক্ষণ শঠ-প্রতারক কুচক্রী—মীরজাফরের সগোত্র, বিভীষণের সহযোগিতায় নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে স্বদেশ রক্ষায় অক্লান্ত সেনানী মেঘনাদকে হত্যা করতে গিয়েছে চোরের মত। রাবণ, ইন্দ্রজিৎ প্রচলিত সংস্কারের অন্ধকার থেকে রাক্ষসরূপ ত্যাগ করে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে মুক্তি সংগ্রামের সংগ্রামী স্বদেশভক্ত সৈনিক হিসাবে। এ সম্ভব হয়েছে যুগচৈতন্য এর অনিবার্য ফলশ্রুতি রূপে। রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যানে 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়' থেকে পরাধীন জাতির মুক্তি পিপাসার যে প্রচ্ছন্ন প্রয়াস তারই আরো পরিচ্ছন্ন প্রয়াস রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের নব্যমূল্যায়নে। ঠিক একই নিয়মে ইতিহাসের সিরাজ হুবহু নাটকে নেমে এলে দেশাত্মবোধক নাটক হয় না বলেই নাটকে সিরাজ চরিত্রের নব মূল্যায়ন স্বাদেশিকতার পটভূমিকায়। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে প্রতাপাদিত্য চরিত্রের নব মূল্যায়ন তাই ঐতিহাসিকতার চুলচেরা বিচারের বিষয়বস্তু না হয়ে বারোভূঁইয়ার এক শক্তিশালী ভূঁইয়ার স্বাধীনতারক্ষার অক্লান্ত প্রয়াসের ইতিহাস কিংবা কাহিনী বলেই চিহ্নিত হওয়া সঙ্গত মনে করি।

প্রতাপাদিত্য নটেকের ঐতিহাসিকতা বিচার করতে হলে নিখিল নাথ রায়-এর প্রতাপাদিত্য (যার মধ্যে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে রামরাম বসুর সুপ্রাচীন প্রতাপাদিত্য চরিত্রের সবিশেষ উল্লেখ ও উদ্ধৃতি আছে) এবং সত্যচরণ শাস্ত্রীর প্রাচীন প্রতাপাদিত্য পুস্তক দুটির উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই।

নাটকটির ঐতিহাসিকতা বিচারে সাধারণত যে বিষয়গুলি বা প্রসঙ্গগুলির সম্বন্ধে অভিযোগ শোনা যায় সেগুলির সর্বাগ্রে উল্লেখ প্রয়োজন। সেগুলির কিছু কিছু মেনে নিতে বাধা না থাকলেও নাট্যকারের স্বপক্ষে যে একেবারেই কিছু বলার নেই তা নয়।

ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটক প্রতাপাদিত্যের ঐতিহাসিকতা বিচার প্রসঙ্গে যে অভিযোগগুলি সাধারণত তার ইতিহাসের প্রতি নিষ্ঠার অভাব বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে সেগুলি নিম্নরূপ।

কয়েকটি চরিত্র অনেকের মতে অবাঞ্ছিত ভাবে বিকৃত হয়েছে—যথার্থ ঐতিহাসিক চরিত্রের মর্যাদায়মণ্ডিত হয় নি। তাছাড়া প্রধান প্রধান কয়েকটি চরিত্র ইতিহাসের পথ ধরে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠার সুযোগ পায় নি। অভিযোগের শেষাংশ অবশ্য ঐতিহাসিকতা বিচারের পর্যায়ে না পড়ে চরিত্র সৃষ্টির ত্রুটী হিসাবে নাটকের রসবিচারের বস্তুরূপে পরিগণিত হওয়ার অপেক্ষা রাখে।

তখনকার দিনের সদ্যজাত স্বাদেশিকতা এবং সাহিত্যের মাধ্যমে সেই স্বদেশ-প্রীতির প্রকাশও বহুলাংশে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুরূপে সম্মানের অধিকারী। অনুযোগ-সেই আধুনিক স্বাদেশিকতাও নির্মল রূপে নাটকে বিস্তৃত নয়। কাহিনী বিন্যাসে স্বাদেশিকতার সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃউৎসারিত রোমান্টিকতার অনুপ্রবেশ অনেকের মতে ঐতিহাসিক নাটকের কৌলিন্য ক্ষুণ্ণ করেছে। ঐ মতবাদের মূলকথা—প্রত্যাপাদিত্য নাটকে রোমান্সের অবকাশ ছিল। কিন্তু সম্ভাব্যতার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় এবং সঙ্গতির অভাবে সে রোমান্স ইতিহাসের হাত ধরাধরি করে মৈত্রী বন্ধনে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। ইতিহাস ও জনশ্রুতির সঙ্গে রোমান্স নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি, তাই ইতিহাসের সঙ্গে জনশ্রুতির এবং ঐ দুইয়ের সঙ্গে রোমান্সের বিরোধ ঘটেছে।

শঙ্কর, কমল ও সূর্যকান্তর জন্মস্থান প্রভৃতির গরমিল-এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়ে থাকে। শঙ্কর চরিত্রটি আদৌ ঐতিহাসিক কিনা সে বিষয়েও নিখিলনাথ রায়ের পুস্তকে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। উদয়াদিত্যের মায়ের নাম শরৎকুমারীর স্থলে কাত্যায়নী না কি নাট্যকারের ইতিহাসজ্ঞানের অভাব সূচিত করে।

প্রতাপ চরিত্র সৃষ্টিতে, পরিবেশ রচনায় ও চরিত্রটির ক্রমবিকাশের সূত্রে নাট্যকার ঐতিহাসিক সঙ্গতিরক্ষা করতে পারেন নি বলেও অভিযোগ প্রচলিত আছে।

নাটকে কাহিনীর আকস্মিকতা এবং কাহিনীতে সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঐতিহাসিক নাটকে অচল। তাছাড়া চমকপ্রদ কাহিনীর যুক্তিহীনতা ও আকস্মিকতা ঐতিহাসিক নাটকের পক্ষে অশোভন-এ মতামতও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। (তবে নাটকে আকস্মিকতার ছাপ থাকবে না এটা মেনে নেওয়া যায় না কারণ নাটকের একটি অন্যতম সর্ত এই আকস্মিকতা হঠাৎ কিছু অপ্রত্যাশিত চমকপ্রদ ঘটনার আবির্ভাব, তাই সর্বতো বর্জনীয় নয়।)

ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্যে কল্পনার অবাঞ্ছিত প্রবেশ ইতিহাসকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

এই অভিযোগগুলির পাশাপাশি নাটকের ভূমিকায় শ্রীমন্মথমোহন বসুর মন্তব্যের কিয়দংশ উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'শঙ্কর চক্রবর্তীর স্ত্রী কিরূপ ছিলেন তাহা জানি না—ইতিহাস তাহা বলিয়া দেয় নাই। কিন্তু তাহাতে কবির কি আসে যায় ? তিনি স্বচ্ছন্দমনে তেজ মাধুর্যময়ী কল্যানীকে আনিয়া দর্শক-দের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। সাধ্বী ব্রাহ্মণীর দিগন্ত প্রসারিনী প্রভায় তাহার চিত্রখানি কত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিম্বদন্তী বলে মা যশোরেশ্বরীর কৃপাই প্রতাপাদিত্যের সৌভাগ্যের কারণ। ভারতচন্দ্র লিখিলেন, যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী, ব্যাস কবিকে পায় কে ? তিনি মহিমান্বিতা মাতৃরূপিনী কপালিনী বিজয়া-মূর্তি গড়িয়া নিজে ধন্য হইলেন, দর্শকবৃন্দকেও ধন্য করিলেন। চরিত্র সম্বন্ধে

যেরূপ, ঘটনা সম্বন্ধেও সেরূপ। তা হলেও কবি কল্পনা সকল সময় ইতিহাসের সংকীর্ণ প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। কোথাও বা নূতন ঘটনার সৃষ্টি করিয়া; কোথাও বা কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়া আবার কোথাও বা ঐতিহাসিক ঘটনাকে কিঞ্চিৎ নোয়াইয়া বাঁকাইয়া কবি তাহার সাধের চিত্রখানিকে নির্দোষ ও পূর্ণাবয়ব করিতে প্রয়াস পান। সুতরাং প্রতাপাদিত্য নাটকে উল্লিখিত ঘটনা-নিচয়ের সহিত যদি ইতিহাসের সর্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষিত না হয় ত তাহাতে বিচিত্রতা কি? এরূপ অসামঞ্জস্য সত্বেও প্রতাপাদিত্যকে স্বচ্ছন্দে ঐতিহাসিক নাটক বলা যাইতে পারে, কারণ ইহার মূল ভিত্তি ইতিহাস। নাট্যকার কোথাও কোন মুখ্য ঘটনা বা চরিত্রের বিকৃতি করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, বরং তাহার কৌশলময়ী লেখনীর গুণে সেগুলি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শিব শিবই আছেন, বানর বানরই আছে। তবে হয়তো কোন কোন চিত্র রঞ্জিত করিবার সময় কবি (বোধহয় ইচ্ছা করিয়াই) রংটা একটু গাঢ় করিয়া ফেলিয়াছেন।২৬

নাটকে শংকর চরিত্রটির ঐতিহাসিকতা নিয়ে কথা উঠেছে। নিখিলনাথ রায়ের অভিমত—কেহ কেহ শংকর চক্রবর্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণতনয়কে তাহার সহচর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা কোন প্রামাণ্য প্রাচীন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। তবে তাহার সম্বন্ধে কোন কোন প্রবাদ প্রচলিত আছে। 'শংকর চক্রবর্তীকে খেলো বাঘে আর মানুষ কোথায় লাগে'—ইত্যাদি প্রবাদবাক্যে একসময় শংকর বিপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু কিরূপভাবে তিনি বিপন্ন হন এবং প্রতাপের সহিত তাহার কিরূপ নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল তাহা আমরা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না।'২৭ প্রতাপের বাল্যজীবনে তার হৃদয়ে বঙ্গের স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুলতা প্রসঙ্গে শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী শংকর সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত দিয়াছেন তা এইরূপ। 'কেমন করিয়া হিন্দুর প্রাধান্য সংস্থাপিত করা যাইতে পারে, সেই চিন্তা তাহার কোমল মস্তিষ্ককে অলোড়িত করিতে লাগিল। প্রতাপ সেই সুকুমার বয়সে আর একজন ব্রাহ্মণ কুমারের সঙ্গে মিলিত হন। তিনিও কিরূপে বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপিত হয়, সেই দুর্বহ চিন্তায় আক্রান্ত হইতেন। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে পরস্পরবিরোধী বঙ্গীয়গণের মধ্যে একতা সংস্থাপিত হয় —এই সকল বিষয়ে উভয়ে একত্র হইয়া চিন্তা করিতেন। এই অসাধারণ বালকটির নাম শংকর চক্রবর্তী (জীবনী কোষকার ইহাকে শংকর ভট্টাচার্য্য নামে উল্লেখ করিয়াছেন)।'

প্রতাদিত্য নাটকে যে শংকর চক্রবর্তীকে অনৈতিহাসিক চরিত্র বলে নাট্যকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে—নাট্যকার তা এড়িয়ে যেতে পরেন সত্যচরণ

২৬. বঙ্গের প্রতাপাদিত্য—ভূমিকা মন্মথমোহন বসু।

২৭. সত্যচরণ শাস্ত্রী শংকরের বংশধর সুতরাং তিনি এ বিষয়ে বোধহয় প্রমাণ দিতে পারেন—নিখিলনাথ রায়।

শাস্ত্রীর শঙ্কর চরিত্রটির দোহাই দিয়ে। শাস্ত্রী মহাশয় আরো লিখেছেন—'বাল্যকাল হইতে প্রতাপের সহিত শঙ্করের চিত্তবৃত্তি মিলিত হওয়াতে উভয়ে দৃঢ় প্রণয়ে আবদ্ধ হন। তাহাতেই শঙ্কব প্রতাপের মনোরাজ্যের উপর প্রভুত্ব স্থাপনে সমর্থ হন। শঙ্কর সমাগমে প্রতাপের স্বদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি-স্পৃহা চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের ন্যায় উচ্ছসিত হইয়া পড়িত।'২৮ নাটকে অন্য যেসব চরিত্র আছে সেগুলির ঐতিহাসিকতা বিচার করা যাক। সূর্য্যকান্ত গুঁই সম্বন্ধে সত্যচরণ শাস্ত্রীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে—'……এই সময় আর একটি বালক ইহাদিগের সহিত মিলিত হন। তাহার নাম সুর্যকান্ত গুহ। প্রতাপ অধিকাংশ সময় এই সকল বন্ধুর সহিত সুন্দরবনের নিবিড় অরণ্য মধ্যে ভীষণকায় ব্যাঘ্র, গণ্ডার প্রভৃতি বন্যজন্তু সকল মৃগয়া করিয়া বিপুল আনন্দলাভ করিতেন।'২৯ নিখিলনাথ রায়ের গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চরিত্র ও তার সেনানীদের কয়েকজনের নামোল্লেখ আছে। 'প্রতাপের প্রধান সৈন্য সামন্তদের মধ্যে যাহাদের নাম ঘটকারিকায় উল্লিখিত আছে তারা হলেন সূর্য্যকান্ত গুহ প্রধান সেনাপতি, রঘু নামক সেনানী পূর্ব দেশীয় সৈন্যের, সুখা গুপ্ত সৈন্যের, রডা ফিরিঙ্গি সৈন্যের, মদনমাল টালিগণের প্রতাপসিংহ দত্ত রাখিগণের অধিপতি নিযুক্ত হন।'৩০

নাটকে ঐ চরিত্রগুলির মধ্যে সূর্য্যকান্ত গুহ, সুখা (নাটকে সুখময়) রডা, মদন সবাই স্থান পেয়েছে। রামরাম বসু মহাশয় কমল খোজা নামক জনৈক বীর পুরুষকে প্রতাপের বিশ্বস্থ অনুচর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।'৩১ নাটকে কমল (কামাল) কে প্রতাপের দেহরক্ষার ভূমিকায় দেখা গেছে।

এক্ষেত্রে বিক্রমাদিত্য, বসন্ত, প্রতাপ, গোবিন্দ, রাঘব রায়, উদয়াদিত্য, ভবানন্দ, আকবর, মানসিংহ, ইশাখাঁ, শেরখাঁ, আজিম খাঁ, সেলিম (দু একটি অপ্রধান চরিত্র ছাড়া) সব চরিত্রই ঐতিহাসিক এবং সে হিসাবে নাট্যকার ঐতিহাসিক নাটকের প্রাথমিক সর্ত পূরণ করেছেন। সবচেয়ে বিতর্কিত চরিত্র বিজয়া অবশ্য ইতিহাসের অন্তভুক্ত নয়। শঙ্কর চরিত্রটির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ার ব্যাপারে সত্যচরণ শাস্ত্রীর শরণ নিয়ে এবং প্রচলিত প্রবাদের পথ ধরে চরিত্রটিকে ঐতিহাসিক বলে ছাড়পত্র দেওয়া যায়। সেই শঙ্কর চক্রবর্তীর স্ত্রীর নাম কি ছিল, তা নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। চরিত্রটি কতটা নাট্যপ্রয়োজন মিটিয়েছে সেটা আমরা যথাসময়ে বিচার করবো। তাছাড়া কাত্যায়নীর পূর্ব উল্লিখিত নামবিভ্রাটের কথা মনে রেখে কাত্যায়নী, ছোটরানী ও বিন্দুমতী—সব নাট্য চরিত্রগুলিই ইতিহাসের পাতা থেকে নাটকে স্থান করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরাণীর হাটে বিন্দুমতীর নাম বিভা। রামনারায়ণ মল্ল-এর নাম রামমোহন মাল।

---

২৮. ২৯. মহারাজ প্রতাপাদিত্য—সত্যচরণ শাস্ত্রী
৩০. প্রতাপাদিত্য—নিখিল নাথ রায়
৩১. প্রতাপাদিত্য চরিত্র—রামরাম বসু।

নাটকে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির সম্বন্ধে রামরাম বসু, নিখিলনাথ রায় এবং সত্যচরণ শাস্ত্রীর গ্রন্থে কি কি লেখা আছে—নাটকে তার কতটুকু গ্রহণ করা হয়েছে —কতটুকু বর্জন করা হয়েছে সেই গ্রহণ বর্জন বা রূপান্তর মূল ঘটনাকে বিকৃত করেছে কিনা—করলেও তা নাট্যপ্রয়োজনের খাতিরে হয়েছে কিনা আমাদের বিচার্য।

নাটকে অদৃষ্টবাদ এবং প্রতাপের কোষ্ঠিতে পিতৃদ্রোহিতার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট, যদিও গ্রীক নাটকের অদৃষ্টবাদের মত নাটকে তা অনিবার্য ট্রাজেডির বীজ বপন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। উড্ডীয়মান পক্ষীর লক্ষ্যভেদ প্রসঙ্গে প্রতাপের ভবিষ্যৎ-বাণীর সম্বন্ধে বিক্রমাদিত্য নূতন করে সচেতন হন। নাটকে অবশ্য প্রতাপকে পুরো-পুরি অহিংস বৈষ্ণব বানিয়ে তোলার চেষ্টা এবং তার সাফল্যের সংবাদের পর আচমকা ঐ পক্ষীর লক্ষ্যভেদে প্রতাপ যে পুরোপুরি শাক্ত এবং হিংসার পথ অনুসরণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত নয়—সেইরূপ ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। প্রতাপের মৃগয়া প্রসঙ্গে রামরাম বসু লিখেছেন—ক্রমে ক্রমে তাহার বাহুবল ও নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইতে থাকে।······তিনি একদিন উড্ডীয়মান চিলপক্ষীকে বাণবিদ্ধ করিয়া ভূমিতে পতিত করায় বিক্রমাদিত্য তাহার জন্য শঙ্কিত হইয়া পড়েন। রামরাম বসু মহাশয় বলেন, যে প্রতাপাদিত্যের কোষ্ঠিতে পিতৃদ্রোহের যোগ ছিল। বিক্রমাদিত্য তাহা জানিতেন, কিন্তু বসন্ত রায় তাহা বিশ্বাস করিতেন না। উড্ডীয়মান চিলপক্ষী বাণবিদ্ধ করায় বিক্রমাদিত্য প্রতাপাদিত্যের পিতৃদ্রোহ আশঙ্কায় ভীত হইয়া তাহাকে আগ্রা পাঠাইয়া-ছিলেন। বসু মহাশয় আরো বলেন যে বিক্রমাদিত্য প্রতাপাদিত্যকে হনন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু বসন্ত রায় তাহাতে বাধা দেন। তাহার বিশ্বাস ছিল বসন্ত রায় প্রতাপ কর্তৃক নিহত হইবেন।' (২১-২৩ পৃঃ) নাটকে এই ভবিষ্যৎ বাণীকে অদৃষ্টবাদ বলে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে এবং ট্রাজেডি নাটকের ঈপ্সিত পরিণতির দিকে নাটকটিকে ঠেলে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন নাট্যকার। কিন্তু নাট্য বিচারে সে প্রয়াস সার্থক হয়েছে একথা বলার যথেষ্ট কারণ দেখানো সম্ভব নয়।

নাটকে উল্লিখিত ঘটনাগুলিকে নাটকের বিষয়বস্তু বা প্লটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ঘটনাগুলি যেমন রামরাম বসু ও নিখিল নাথ রায়ের পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে তেমনি সত্যচরণ শাস্ত্রীর প্রাচীন পুস্তকেও ঘটনাগুলির উল্লেখ আছে। শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন, তিনি (প্রতাপ) শরচালনা ও অশ্বারোহনে এরূপ দক্ষ হইয়া-ছিলেন যে তৎকালে এ বিষয়ে কেহ তাহার সমকক্ষ ছিল না। নিখিলনাথ রায়ের পুস্তকেও এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে—যুদ্ধবিদ্যায় প্রতাপ বাঙালী নামের কলঙ্ক মোচন করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে নবপ্রচলিত বন্দুক চালনায় তিনি যথেষ্ট শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপ নানা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া প্রতাপ আপনার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন।'

নাটকে প্রতাপের বীরত্বের উল্লেখ প্রসঙ্গে এ সবের সমর্থন আছে। শাস্ত্রী

মহাশয় লিখেছেন প্রতাপ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র গল্প কথিত হইয়া থাকে। 'একসময় শরচালনাকালে কুমার উড্ডীয়মান একটি ক্ষুদ্র পক্ষীকে শরাঘাতে নিহত করেন। নিহত পক্ষী বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে পতিত হয়, শরবিদ্ধ পক্ষী কাহা কর্তৃক নিহত হইয়াছে অনুসন্ধান করিয়া যখন বিক্রমাদিত্য অবগত হইলেন যে, তাহার পুত্র কর্তৃক এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তখন তিনি প্রতাপাদিত্যকে সম্মুখে আনয়ন করিয়া তাহার কুকার্য্যের জন্য বহুবিধ ভর্ৎসনা করিয়া ভবিষ্যতে এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে নিরস্ত থাকিতে আদেশ করেন।'

নাটকে প্রতাপের উড্ডীয়মান পক্ষীর লক্ষ্যভেদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তবে যেভাবে তাহা উপস্থাপিত হয়েছে তাতে নাটকের নাটকীয়তার কিংবা বাস্তবতার সর্ত পূরণ করা হয়েছে কি না হয়েছে সেটি স্বতন্ত্র কথা।

প্রতাপ যে পিতৃদ্রোহী হবে—এই ভবিষ্যৎ বাণীকেও যে নাটকে কাজে লাগানো হয়েছে সে কথার পূর্বে উল্লেখ আছে। নিখিল নাথ রায়ের পুস্তকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। 'প্রতাপের জন্মকালীন গ্রহসংস্থান দেখিয়া বিক্রমাদিত্য প্রভৃতির এরূপ ধারণা হইয়াছিল যে এ পুত্র ভবিষ্যতে পিতৃদ্রোহী হইবে।'......

বালকের বাল্যকাল হইতে এই সকল অদ্ভুত কর্ম পরম্পরা অবলোকন করিয়া তাহাদিগের এ ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে থাকে। প্রতাপকে তিরস্কার করিতে হইলেই প্রতাপের গুরুজনরা তাহাকে পিতৃদ্রোহী বলিয়াই যখন তখন ভর্ৎসনা করিতেন। প্রতাপের সুকুমার হৃদয়ে এইরূপে তাহার গুরুজন কর্তৃক পিতৃদ্রোহ বীজ রোপিত হয় এবং ক্রমশঃ ইহা বিবর্দ্ধিত হইয়া বিষমাকার ধারণ করে।

প্রতাপকে আগ্রাপ্রেরণের ঘটনাটি নিখিলনাথ রায়ের মতে সমর্থিত এবং সে ঘটনাটি প্রতাপের কোষ্ঠির ভয়াবহতার বিভীষিকা থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াস বলে যে ভাবে চিহ্নিত আছে—নাটকেও তাঁর যথার্থ প্রতিচ্ছবি পড়েছে। তিনি পুত্রের এরূপ নিষ্ঠুরতা, অসমসাহসিকতা ও শারীর বলবুদ্ধি ভবিষ্যতের পক্ষে কল্যাণজনক বলিয়া মনে করেন নাই। তখন পুত্রকে কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরিত করিয়া তাহার উদ্দাম প্রকৃতি শান্ত করিবার চেষ্টা করেন এবং তজ্জন্য তাহাকে রাজধানী আগ্রা পাঠাইতে কৃত সংকল্প হন। তাহার বিরাট ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যের মধ্যে অবস্থিতি করিলে প্রতাপ আপনার শক্তির লঘুতা অনুভব করিতে ও সামাজিক হইতে পারিবে বলিয়া বিক্রমাদিত্য মনে করিয়াছিলেন। (নিখিলনাথ রায়—প্রতাপাদিত্য)।

নাটকে প্রতাপের এই আগ্রা গমনকে নিয়ে প্রতাপ ও বসন্তরায়ের সুপ্ত বিদ্বেষকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। এই বিদ্বেষের জাগরণ নিখিলনাথ রায় এবং সত্যচরণ শাস্ত্রীর অনুগামী। 'বসন্ত রায় প্রতাপকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন বলিয়া জ্যেষ্ঠের প্রস্তাবে সম্মতিদান করিতে একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। যাহা হউক উভয়ের পরামর্শে শেষে প্রতাপের আগ্রা গমনই স্থির হয়। এই আগ্রা গমন হইতে বসন্ত

রায় ও প্রতাপের মধ্যে বিদ্বেষের সূচনা হয়।……বিদ্বেষের কারণ এই যে প্রতাপ বুঝিয়াছিলেন যে বসন্ত রায় কৌশলক্রমে তাহাকে যশোর হইতে দূরে পাঠাইয়া আপনি যশোর রাজ্যে একাধিপত্য করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। প্রতাপ মনে করিয়াছিলেন যে পাছে তাহার উপস্থিতিতে বসন্ত রায় যথেচ্ছরূপে কার্য্য করিতে অক্ষম হন তাহাই মনে করিয়া তিনি প্রতাপের আগ্রা গমনের ব্যবস্থা করেন। একটি বিশিষ্ট কারণে ইহা প্রতাপের মনে দৃঢ়বদ্ধমূল হয়। কারণ প্রতাপের আগ্রা গমনের ব্যবস্থা বসন্ত রায়ই করিয়াছিলেন। কিন্তু বিক্রমাদিত্যের আদেশেই যে বসন্ত রায় উহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহা প্রতাপের মনে স্থান পায় নাই।'—(নিখিলনাথ রায়) নাটকে এই কাহিনীকেই বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। শঙ্কর প্রতাপের এই অহেতুক পিতৃব্য বিদ্বেষের জন্যে আতঙ্কিত হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা চিন্তা করে নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।

আগ্রা গমনের পর থেকেই পিতৃব্যের প্রতি এই বিদ্বেষ নাটকে কয়েকটি খণ্ড খণ্ড ঘটনাকে বাহন করে ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়েছে। খণ্ড খণ্ড ঘটনাগুলির মধ্যে প্রতাপের স্বাধীনতা-স্পৃহার ও বলসঞ্চয়ের ঘটনা নাটকে স্থান পেয়েছে। বসন্ত রায় এই বলসঞ্চয় ও স্বাধীনতাস্পৃহাকে প্রতাপের ঔদ্ধত্য এবং শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিষ্ফল উত্থান বলে মনে করতেন। প্রতাপের সাহস, শক্তি ও বল সম্বন্ধে অবশ্য তার উচ্চ ধারণা ছিল। প্রতাপকে তিনি স্নেহ করতেন।… এইরূপ শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইলে যেরূপ বলের ও শিক্ষিত সৈন্যের প্রয়োজন প্রতাপ তাহা পর্যাপ্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তথাপি তিনি স্বাধীনতা আকাঙ্খার কল্যাণে বলীয়ান হইয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হইতে যে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই—ইহা হইতে তাহার অসীম সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়।…… প্রতাপ ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করিয়া পুনর্বার স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট হন। কিন্তু তাহার এরূপ স্বাধীনতা প্রকাশে বসন্ত রায় সন্তুষ্ট হইতেন না। বসন্ত রায় প্রতাপকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এমন কি আপনার পুত্রগণ অপেক্ষা প্রতাপকে প্রিয় জ্ঞান করিতেন। প্রতাপ কিন্তু বিক্রমাদিত্য জীবিত থাকার সময় হইতেই তাহার প্রতি বিদ্বেষ-ভাবপোষণ করিতেন। (নিখিলনাথ রায়)—নাটকে এই ঘটনাগুলিকে নাটকের কাহিনী বিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই বিদ্বেষ-ভাবের চূড়ান্ত পরিণতি যশোর রাজ্যবিভাগ এবং সেই অসম ও ত্রুটীপূর্ণ বিভাগের বিতর্কিত চাকসিরি গ্রাম নিয়ে বিদ্বেষের বিয়োগান্ত মর্মান্তিক ফলশ্রুতি—বসন্ত রায়ের হত্যা।

নাটকে এই রাজ্য-বিভাগের কথা স্পষ্ট এবং কার্যকারণসূত্রেই গ্রথিত হয়েছে। চাকসিরি গ্রামের প্রয়োজন প্রতাপের পক্ষে অপরিহার্য হয়েছিল রাজ্য রক্ষার খাতিরে—নাটকে যেমন তা সোচ্চার, বিভিন্ন প্রমাণ্য গ্রন্থ ও প্রবাদেও তার সরব প্রশ্রয় মেলে। 'প্রতাপের বিদ্বেষভাব বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে বসন্ত রায়ের স্নেহও

শিথিল হইতে আরম্ভ হয়। বিক্রমাদিত্য তাহা বুঝিতে পারিয়া যশোর রাজ্য তাহাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন।·····তিনি প্রতাপ ও বসন্ত রায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া যশোর রাজ্যকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দশ আনা অংশ প্রতাপকে এবং ছয় আনা অংশ বসন্ত রায়কে দিবার ব্যবস্থা করেন। তাহারা উভয়েই সম্মত হইয়াছিলেন। তবে এই সাধারণ বিভাগের এক এক অংশের মধ্যে কোন কোন স্থান অপরের অংশেও পড়িয়াছিল। যেমন প্রতাপের অংশস্থিত অর্থাৎ পূর্ব বিভাগস্থ চাকসিরি বা চাকশ্রী গ্রাম বসন্তের অংশে পড়ে। প্রতাপ এই চাকসিরি গ্রাম লইবার জন্য বসন্ত রায়ের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়ায় মহাক্রুদ্ধ হন। বসন্ত রায় চাকসিরি প্রদান করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি প্রতাপকে সুস্পষ্টরূপে কোন উত্তর না দেওয়ায় প্রতাপকে অনেকবার বসন্ত রায়ের নিকট যাইতে হয়। এইজন্য একটি প্রবাদবাক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রবাদ 'সারারাত থাক ফিরি তবু না পাই চাকসিরি'। সত্যচরণ শাস্ত্রীর পুস্তকে উল্লেখ আছে :- বসন্তরায় চাকসিরি ছাড়িয়া না দেওয়ায় প্রতাপ তাহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। এদিকে আবার তাহার স্বাধীনতা প্রকাশে অসন্তুষ্ট হইয়া বসন্ত রায় তাহাকে বাদশাহের বিদ্রোহী না হওয়ার জন্য বারংবার উপদেশ দেওয়ায় প্রতাপ তাহাকে তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির কণ্টকস্বরূপ মনে করেন এবং সেই কণ্টক উন্মোচনের জন্য সুযোগ অন্বেষণেও প্রবৃত্ত হন। (— নিখিলনাথ রায়) নাটকে এই কণ্টক উন্মোচনের বীজটিকে কাহিনী বিস্তারের কাজে এবং কাহিনীর বিয়োগান্ত পরিণতির সুষ্ঠু রূপায়ণে প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রমাণ্য গ্রন্থাদিতে অবশ্য বসন্তরায় প্রতাপের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও তাকে চাকসিরি দিতে অস্বীকার করেছিলেন কেন তার কোন কারণ দেখানো হয়নি। কোন সুস্পষ্ট উত্তর না দেওয়ায় তাকে বারবার পিতৃব্যের কাছে যেতে হয় শুধু এই কথার উল্লেখ আছে। নাটকে অবশ্য বসন্তরায়ের স্পষ্ট উত্তর মিলেছে শেষ পর্যন্ত এবং প্রতাপের চাকসিরি গ্রহণের বিকল্প প্রস্তাবে বসন্ত রায়ের ক্ষোভ ও কল্পিত অপমানবোধ থেকে একটি নাটকীয় সংঘর্ষেরও ইংগিত মিলেছে নাটকে।

প্রতাপ ঃ—যা নিয়েছি সব দিচ্ছি। আমার দশআনা নিয়ে চাকসিরি আমায় প্রত্যর্পণ করুন।

বসন্ত :—কি প্রতাপ। তুমি আমাকে প্রলোভন দেখাতে চাও। মোঘল জয়ে এত উদ্রিক্ত, এত জ্ঞান শূন্য যে আমাকেও তুমি তুচ্ছজ্ঞান করো। তুমি আমাকে উৎকোচ দানে বশীভূত করতে চাও।······

······আমি চাকসিরি দিতে পারবো না। আমি সে স্থান গোবিন্দদেবের নামে উৎসর্গ করবার ইচ্ছা করেছি।'

নাটকে গোবিন্দদেবের নামে 'চাকসিরি' উৎসর্গ করার ব্যাপারটির অন্য কোন

পুস্তকে উল্লেখ নেই ; নাটকের প্রয়োজনে—নাটকের অঙ্গীভূত হয়েছে। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে যেভাবে বসন্তরায় চরিত্রটি চিত্রিত হয়েছে নাট্য সংলাপে চরিত্রটির পূর্ব সংস্কার সে ভাবে অক্ষুন্ন থাকে নি। নিখিলনাথ রায় লিখেছেন, 'বসন্তরায় যেরূপ উদার চরিত্রের মহাপুরুষ ছিলেন, তাহাতে তিনি জগতে কাহাকেও শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিতেন কিনা সন্দেহ। বিশেষতঃ যে প্রতাপ তাহার অত্যন্ত স্নেহের বস্তু ছিল তিনি তাহাকে কদাচ অবিশ্বাস করিতে পারিতেন না।'

প্রতাপ 'চাকসিরি' তাকে দান করার অনুরোধ করলে বসন্তরায় তার চরিত্রের বিরোধী যে উক্তি করেন তা এইরূপ—'যখন দানের যোগ্য বিবেচনা করবো তখন দান করবো। গুরুজনদের অবমাননাকারী পিতৃদ্রোহী সন্তানকে আমি কিছুতেই দেবভোগ্য স্থান দানের যোগ্য বিবেচনা করি না।'

নাটকে এই সংলাপের প্রতিক্রিয়ায় দুজনের মধ্যে মনান্তর চরমে ওঠে এবং আসন্ন দুর্যোগের পদধ্বনি শোনা যায়—শঙ্করের আশঙ্কিত ও আতঙ্কিত আর্তস্বরে—'আমি দেখতে পাচ্ছি বঙ্গের উপর বিধাতা বিরূপ। নইলে দুজনেই মহাপুরুষ, কেউ কাউকে নিতে পারলে না কেন ? পরস্পরে মিলতে এসে মহালক্ষ্মীর অভিষেকের দিবসে এমন দুর্ঘটনা ঘটল কেন ?'

রাজ্য বিভাগ এবং চাকসিরি নিয়ে বিবাদের ঘটনাগুলির যথাযথ ব্যবহার নাটকে বর্তমান। কাজেই ঐতিহাসিকতার বিচারে নাট্যকার সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন বলে ধরে নেওয়া যায়।

চাকসিরি নিয়ে তিক্ততা সৃষ্টির পর প্রতাপের মনে পিতৃব্য হত্যার কথা জাগরিত হয় এইং সেই গুপ্ত ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত ঘটনাচক্রে সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক তথ্যে বা নাটকের ঘটনাবলীতে ঘটনাটিকে আকস্মিক এবং পরস্পর ভুল বোঝাবুঝির পরিণাম হিসাবেই দেখানো হয়েছে। ঘটনার বিবরণে এবং কার্যকারণ পরম্পরায় কিভাবে এই বিয়োগান্ত পরিণতি সম্ভব হল—সেই বিবরণে নিখিলনাথ রায়, সত্যচরণ শাস্ত্রী এবং নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সহজেই অনুমান করা যায় বসন্ত রায়ের হত্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদকে নাট্যকার নাটকে পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুযায়ী ঘটনার কিঞ্চিৎ রূপান্তর সাধন করে তা নাটকে গ্রহণ করেছেন। বসন্ত রায় হত্যার ঘটনাটির ঐতিহাসিক তথ্য কিরূপ তা জেনে রাখা যাক। প্রকাশ্য যুদ্ধেই হউক বা গোপনে হউক প্রতাপ বসন্ত রায়ের প্রাণসংহার করিবেন—ইহাই স্থির করিয়া বসিলেন। রামরাম বসু মহাশয় বলেন যে রাজা বসন্ত রায়ও সুশিক্ষিত যোদ্ধা ছিলেন। তাহার গঙ্গাজল নামে তরবারি হস্তে থাকিলে পঞ্চাশ জনও তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিত না। সেইজন্য প্রতাপ নিরস্ত্র বসন্ত রায়কে হত্যা করার চেষ্টা করেন। রামরাম বসু মহাশয় বলেন যে বসন্ত রায় পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ দিবসে নিরস্ত্র অবস্থিতি করিতে ছিলেন। সেদিন তাহার প্রাসাদদ্বার অবারিত। প্রতাপ সেই সুযোগ পাইয়া

দ্রুতবেগে পুরীর মধ্যে প্রবেশ করেন। তাহাকে আসিতে দেখিয়া বসন্ত রায়ের জনৈক ভৃত্য তাহাকে সংবাদ দেয়। বসন্ত রায় প্রতাপের এইরূপ পুরী প্রবেশে সন্দিহান হইয়া ভৃত্যকে গঙ্গাজল নামক তরবারি আনিতে আদেশ দেন। কিন্তু ভৃত্য ভুলক্রমে একটি পাত্রে করিয়া গঙ্গাজল আনয়ন করিলে রাজা আপনার মৃত্যু আসন্ন বলিয়া বুঝিতে পারেন। ইতিমধ্যে প্রতাপাদিত্য তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তরবারির আঘাতে বসন্ত রায়ের মুণ্ডু দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন। কি উপায়ে প্রতাপাদিত্য বসন্ত রায়কে হত্যা করেন তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীত না হইলেও প্রতাপাদিত্য কর্তৃক বসন্ত রায়ের হত্যা একটি যে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নাটকে বসন্ত রায়ের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটি একটু অন্যভাবে গ্রথিত হয়েছে। চাকসিরি দিয়ে শত্রু মানসিংহকে প্রবেশ করিয়েছে কুলাঙ্গার গোবিন্দ রায় ও ভবানন্দ, সেটি প্রকাশ হয়ে পড়ায় বসন্ত রায় হঠাৎ ঠিক করে বসেন—চাকসিরি আর রাখব না, বিষয়ও রাখব না। ছোটরানী, তুমি গঙ্গাজল নিয়ে এসো।' বৌঠাকুরানীর হাট ঐতিহাসিক উপন্যাসে বসন্ত রায় হত্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা স্বতন্ত্র। প্রতাপকে স্বদেশবৎসল উৎসর্গীকৃত প্রাণ মহাত্মা বলে অভিহিত করার ঐকান্তিক ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেন নি কোথাও। তাঁর উল্লিখিত উপন্যাসে প্রতাপ কর্তব্যনিষ্ঠ বিচক্ষণ রাজা। রাজকার্যের আওতায় কোন কঠোরতম সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপায়িত করতে তার হৃদয় কাঁপে না—তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হন না।'

মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বসন্ত রায় সম্পর্কে তার ইতিকর্তব্য তিনি খোলাখুলিভাবেই প্রকাশ করেছেন।

'আমি যখন নিজের পিতৃব্যকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন অবশ্য তোমার চেয়ে ঢের বেশী ভাবিয়াছি।'

—বসন্ত রায়কে হত্যার সজ্ঞান প্রচেষ্টার যুক্তিটি এইরূপ :—

'আমার ব্রত এই—এই যে ম্লেচ্ছেরা আমাদের দেশে আসিয়া অনাচার আরম্ভ করিয়াছে—যাহাদের অত্যাচারে আমাদের দেশ হইতে সনাতন আর্যধর্ম লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, ক্ষত্রিয়েরা মোগলদের কন্যা দিতেছে, হিন্দুরা আচার ভ্রষ্ট হইতেছে—এই ম্লেচ্ছদের আমি দূর করিয়া দিব—আমাদের আর্যধর্মকে রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত করিব। এই ব্রত সাধন করিতে অনেক বলের আবশ্যক। আমি চাই সমস্ত বঙ্গদেশের রাজারা আমার অধীনে এক হয়। যাহারা যবনের মিত্র তাহাদের বিনাশ না করিলে ইহা সিদ্ধ হইবে না। পিতৃব্য বসন্ত রায় আমার পূজ্যপাদ। কিন্তু, যথার্থ কথা বলিতে পাপ নাই। তিনি আমাদের বংশের কলঙ্ক। তিনি আপনাকে ম্লেচ্ছের দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এমন লোকের সহিত প্রতাপাদিত্য রায়ের কোন সম্পর্ক নাই। ক্ষত হইলে নিজের

বাহুকে কাটিয়া ফেলা যায়। আমার ইচ্ছা হয় বংশের ক্ষত বঙ্গদেশের ক্ষত ওই বসন্ত রায়কে কাটিয়া ফেলিয়া রায় বংশকে বাঁচাই—বঙ্গদেশকে বাঁচাই।'

'......মন্ত্রী......তুমি মনে করিতেছ নিজের পিতৃব্যকে হনন করা সকল সময়েই পাপ। না বলিয়ো না, ঠিক এই কথাই তোমার মনে জাগিতেছে। ইহার উত্তর আছে। পিতার অনুরোধে ভৃগু নিজের মাতাকে বধ করিয়াছিলেন। ধর্মের অনুরোধে আমি আমার পিতৃব্যকে বধ করিতে পারিব না।''৩২ শংকরকে ইতিপূর্বে প্রতাপকে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন বসন্ত রায়। প্রতাপ প্রবেশ করতে না করতে বসন্ত রায় নেপথ্যে চেঁচিয়ে বলে ওঠেন—'গঙ্গাজল—শীঘ্র গঙ্গাজল, প্রতাপ এসেছে—শীঘ্র গঙ্গাজল।'

পূর্বসংস্কার অনুযায়ী পিতৃব্যের প্রতি সুপ্ত বিদ্বেষ এবং পিতৃব্য কর্তৃক তার প্রাণনাশের আশংকায় আতঙ্কিত প্রতাপ এই মুহূর্তে সঙ্গত কারণেই ঠিক বুঝতে পারেন নি—বসন্ত রায় তাকে ডেকে এনে হত্যার ষড়যন্ত্র করছেন কিনা? কিন্তু নাট্যকার মুখে সংলাপ দিয়েছেন—হ্যাঁ গঙ্গাজল। হত্যার ষড়যন্ত্র। ব্যাঘ্রের বিবরে প্রবেশ করিয়ে শংকর চলে গেল। বৃদ্ধ গঙ্গাজল অস্ত্র হাতে করলে ত, আর কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারবো না।'

গোবিন্দ রায়ের ধারণা পিতা আক্রান্ত, প্রতাপ সুযোগ বুঝে পিতাকে হত্যা করতে উদ্যত- তাই প্রতাপকে লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়েছিল সে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। প্রতাপ সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দকে অস্ত্রাঘাতে নিহত করেছিলেন। নাটকে কাহিনী এইভাবে বর্ণিত হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যে এই অংশের কাহিনীর সামান্য রূপান্তর লক্ষিত হয়। রামরাম বসু মহাশয় বলেন, যে, প্রতাপ বসন্ত রায়কে হত্যা করিতে অগ্রসর হইলে গোবিন্দ রায় ধনুর্বাণ হস্তে প্রতাপাদিত্যের অনুসরণ করেন, কিন্তু তাহার লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ায় প্রতাপ তরবারির আঘাতে গোবিন্দ রায়কে নিপতিত করিয়াছিলেন।

হত্যার নেশায় প্রতাপ তখন উন্মাদপ্রায়, তার ভেতরের সুপ্ত পাশব শক্তি চার্কাসিরির প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধস্পৃহায় বসন্তকে আক্রমণ করবেন এটিকে স্বাভাবিক করার জন্যে এবং তার উত্তেজনাকে জাগিয়ে রাখার জন্যে মঞ্চে সদ্য প্রবিষ্ট বসন্তকে দিয়ে নাট্যকার আর একবার বলিয়ে নিয়েছেন—গঙ্গাজল দে, কে কোথায় আছিস, আমায় গঙ্গাজল দে। গঙ্গাজল—গঙ্গাজল।

একেবারে অন্তিম দৃশ্যে ভবানন্দর মুখে অনেকটা জোর করে একটি অপ্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। কারণ যে যুদ্ধে মোঘলের পক্ষ অবলম্বন করে রাঘব সমর কৌশল ও শৌর্যবীর্যের পরিচয় দেয়—নাটকে তার কোন উল্লেখ নেই, অথচ ভবানন্দ জানিয়েছে—'তুমি রাজা হবে, আর কি হবে। রাঘর—রাঘব—

---

৩২. বউ ঠাকুরাণীর হাট—রবীন্দ্রনাথ

আজ তুমি যশোরজিৎ।' 'কচুরায় এই যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনিই প্রতাপের বাহু ছিন্ন করেন এবং প্রতাপের বন্দী হওয়ার পর তিনিই তাহার সমস্ত সেনাপতিকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। ইহা কতদূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে মানসিংহের অনুরোধে তিনি পরে যে যশোরজিৎ উপাধি পাইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই '—(নিখিলনাথ রায়) এই উপাধির কথা ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে আছে এবং অন্নদা মঙ্গলেও আছে।

কচুরায় পাইল যশোরজিৎ নাম
সেই রাজ্যে রাজা হইল পূর্ণ মনস্কাম।

রামরাম বসুও খেতাব যশোরজিৎ-এর কথা বলিয়াছেন। নিখিলনাথ লিখিত ঐতিহাসিক তথ্যে বলা হয়েছে যে বসন্ত রায়ের হত্যার পর হইতেই তাহার অধঃপতনের সূচনা হয়। নাটকেও বসন্ত রায়ের হত্যার পর মুহূর্তেই কল্যানীর আক্ষেপোক্তির মধ্যে তার উল্লেখ আছে—'ওগো কি হল। মা যশোরেশ্বরী হঠাৎ মুখ ফেরালেন কেন? হ্যাঁ, এ কি। তাই। তাই বুঝি মা চলে গেলেন।' বসন্ত রায়ের হত্যার পরমুহূর্তেই কল্যাণীর আকস্মিক ঘটনাস্থলে আগমন এবং এরূপ একটি দুঃসংবাদ বহন করে আনার জন্য যে প্রয়োজনীয় সময়ের ব্যবধান থাকা উচিত ছিল তা রক্ষিত হয়নি। প্রতাপের প্রতি তার আরাধ্যদেবী (যার কৃপায় তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে নাটকে ঐতিহাসিক তথ্যে, প্রবাদ বাক্যে এবং কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে উল্লেখ আছে) বিরূপ হওয়ার ঘটনাটির উল্লেখ আছে নিখিল নাথ রায়ের পুস্তকে। 'এই যুদ্ধের সময় প্রতাপকে তাহার উপাস্যদেবী যশোরেশ্বরী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। যদিও তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই তথাপি যে ঘটনা উপলক্ষ্যে এই প্রবাদের সৃষ্টি হয় সে ঘটনাকে একেবারে অমূলক বলা চলে না।' তাহার নিষ্ঠুরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় যশোরেশ্বরী তাকে ত্যাগ করেছিলেন বলে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে নাটকে তাই গ্রহণ করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক তথ্য এবং বিভিন্ন মতবাদকে নাটকের প্রয়োজনে নাট্যকার কিভাবে ব্যবহার করেছেন তার দৃষ্টান্ত মিলবে জামাতা রামচন্দ্রকে প্রতাপের হত্যার চেষ্টায় এবং তার পলায়নের ঘটনায়।

রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঘটকারিকায় লিখিত আছে যে প্রতাপাদিত্য বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে একাধিপত্য লাভ ও চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের জন্য বিবাহ রাত্রিতেই আপনার জামাতাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পত্নীর নিকট হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়েন। কিন্তু তাহার সামন্ত রামনারায়ণ মল্ল·····কামানে সজ্জিত ও সৈন্যে পরিবাহিত একখানি নৌকা আনিয়াছেন। রামচন্দ্র তাহাতে আরোহণ করিয়া পলায়ন করেন। তিনি কামানের ধ্বনি দ্বারা স্বীয় গমন সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। (নিখিলনাথ রায়) রামরাম বসু বলেন, বিবাহের পর প্রতাপাদিত্য

রামচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া আবন্ধ করিয়া রাখেন এবং তাহাকে গোপনে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। রামচন্দ্র পত্নীর নিকট তাহা শুনিয়া স্বীয় শ্যালক উদয়াদিত্যের সাহায্যে মশাল-ধারীর বেশে প্রতাপাদিত্যের ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নৌকযোগে বাকলায় প্রস্থান করেন এবং তোপধ্বনি দ্বারা আপনার পলায়ন জ্ঞাপন করেন। বসন্ত রায় তাহার পলায়নের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচার হয়। রবীন্দ্রনাথের বউঠাকুরাণীর হাটেও অনুরূপ ঘটনাটির উল্লেখ আছে। তবে সেখানে বিন্দুমতীর নাম বিভা। আর আমন্ত্রিত রামচন্দ্রের পলায়নে বসন্ত রায়ের পরোক্ষ ভূমিকায় পাশে যুবরাজ উদয়াদিত্যের ভূমিকাটিই ছিল সবচেয়ে সক্রিয়। ফলতঃ প্রতাপ যে রামচন্দ্রকে বধ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। নাটকে রামচন্দ্রের এই বন্দীর আদেশ এবং তার নিশ্চিত হত্যাকে নাট্যকার নাটকের অঙ্গীভূত করতে সক্ষম হয়েছেন। ছোটরাণী তার নিজের সন্তানদের যুদ্ধকালে যথাকর্তব্য না করার জন্য শাস্তি বিধানের প্রশ্নে প্রতাপের নিজ জামাতার সম্বন্ধে অনুরূপ আচরণের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা কিনা তা নিয়ে প্রতাপ চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করতে যখন উদ্যত ঠক সেই মুহূর্তে বিন্দু ও উদয় রামচন্দ্রের প্রাণ বাঁচানোর জন্য বসন্ত রায়কে অনুরোধ করতে এসে সে সংশয় ও অন্যায় সন্দেহ দূর করতে সক্ষম হয়। প্রতাপ চরিত্র সম্বন্ধে ছোটরানীর সম্ভ্রম বাড়ে ও চরিত্রটি কাঠিন্যের কষ্টিপাথরে ইস্পাত-কঠিন হয়ে ওঠে। রামরাম বসুর বর্ণিত কাহিনীর গতিপ্রকৃতির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে নাট্যকার রামচন্দ্রের পলায়নের ব্যাপারে বসন্ত রায়ের পরোক্ষ সহায়তা ও হস্তক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছেন। বেয়ারাদের সঙ্গে মশালচীর বেশে পালকীর সঙ্গে সঙ্গে তার গোপন বাড়ী থেকে বের হওয়ার ঘটনাটিকেও ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটকে স্থান দিয়েছেন।

কমল—মহারাজ। জামাইরাজা পালালেন। কামান ছুঁড়ে জানিয়ে গেলেন।

রামচন্দ্রের কামানের ধ্বনি বা তোপধ্বনির দ্বারা পলায়নের সংবাদ জ্ঞাপন-এর কথা নিখিলনাথ রায় এবং রামরাম বসু উভয়ের পুস্তকেই আছে। সত্যচরণ শাস্ত্রীও এই তথ্যের বিরুদ্ধাচারণ করেন নি।

রামচন্দ্রের পলায়ন সংকেত তোপধ্বনির দ্বারা রবীন্দ্রনাথও জানিয়েছেন তার বউ ঠাকুরানীর হাট উপন্যাসে। 'যখন রামচন্দ্রের নৌকা ভৈরব নদে গিয়া পৌছিল তখন ফর্ণাণ্ডিজ (রামচন্দ্রের সেনাপতি) এক তোপের আওয়াজ করিল। ···সেই তোপের শব্দে (প্রতাপের) ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।'

(কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য কিংবা প্রবাদ এবং নাটকে তার ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনার পর সেই ঐতিহাসিক তথ্যগুলি নাটকে যেভাবে গ্রথিত হয়েছে তা নাটকের সর্ত মেনে নাটকের অঙ্গীভূত হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করা যেতে পারে)। এ সম্পর্কে কিছু কিছু প্রচলিত অভিযোগ আলোচনায় সহায়ক হবে।

প্রত্যপাদিত্য নাটকে যেখানে প্রতাপ চরিত্রের ক্রমবিকাশ ঘটানোই মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সেখানে ডক্টর সাধন কুমার ভট্টাচার্য্যের প্রশ্ন নাটকের সূত্রপাত শংকর চক্রবর্তীকে দিয়ে হয় কেন ? এ অভিযোগ অবশ্য খুব গুরুতর নয় এই জন্যে যে যাকে অবলম্বন করে নাটক তাকে দিয়েই নাটক সূত্রপাত বা আরম্ভ করতে হবে এরকম কোন নিয়ম নির্দিষ্ট করে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে শংকর চরিত্রের অবতারণা যে উদ্দেশ্যে তা কতদূর সিদ্ধ হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বিচার্য। ডঃ সাধন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অভিযোগ 'শংকরের উদ্দেশ্য ছিল প্রসাদপুরের প্রজাদের দুঃখদৈন্য রাজাকে জানানো, লক্ষ্যভেদের আবেগে তিনি তাহা ভুলিয়া গেলেন।' নাট্যকারের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—শংকর চক্রবর্তী শোষিত ও অত্যাচারিত প্রজাদের প্রতিবাদের প্রতিনিধি, বিক্ষুব্ধ জনশক্তির সম্মিলিত প্রতিবাদ শংকরের কণ্ঠে তুলে দিয়েছেন নাট্যকার। কল্যাণীর আক্ষেপ দেশে মাতব্বরের এর বাড়ী থাকতে, পোড়া লোক আমার স্বামীর কাছেই বা আসে কেন ? কল্যাণী শেষপর্যন্ত নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছে। সেই সৌম্য প্রশান্তমূর্তি যোশিরাজ যদি ব্রহ্মাণ্ডনাশিনী ঈশ্বর হন, তখন আমার ঘরের যোশিরাজ হতেই বা শত্রু ধ্বংস হবে না কেন ? তারা (প্রজারা) ঠিক বুঝেছে মূর্খ প্রজা ঈশ্বর পরিচালিত হয়ে তোমার শরণাপন্ন হয়েছে। তুমি তার প্রতিকার কর। ভবিষ্যৎবাণী ললাটলিখনের উল্লেখ করে ভবিষ্যৎবাণীকে মিথ্যে প্রমাণিত করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন বিক্রমাদিত্য—তা কার্যতঃ ব্যর্থ হয়। গোবিন্দ দাসের প্রতাপকে বৈষ্ণব বানিয়ে তোলার চেষ্টায় বাদ সাধে প্রতাপ নিজেই। উড্ডীয়মান পক্ষীর লক্ষ্যভেদ কোষ্ঠির ফলাফলের অনুকূলে নাটকের গতিকে টেনে নিয়ে যায়। অতঃপর শংকর চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রতাপের আকস্মিক মিলন কাহিনীর প্রয়োজন সিদ্ধ করে, নাট্যকলার সর্ত মানে না। এরপর কুমারী কপালিনী বিজয়ার পক্ষীর অনুসন্ধানে মঞ্চে আগমন নাটকীয় বিস্ময় সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট প্রশ্নের মুখোমুখী করে দেয়—নাট্যকার কোন নাটকের কাহিনী-জাল বিস্তার করেছেন—রোমান্স-ধর্মী, কাল্পনিক বা উপকথা সম্বলিত নাটকের না ঐতিহাসিক নাটকের ?

কিম্বদন্তী, প্রবাদ, ঐতিহাসিক তথ্য সব কিছুর অনুসরণ করা হয়েছে একথা মেনে নিয়েও বলা যায়—এ নাটক যেখানে ঐতিহাসিক সেখানে কাহিনীর আকস্মিকতার ও সম্ভাব্যতার একটা সীমা থাকা দরকার—না হলে কবিকল্পনা হিসাবে উৎকৃষ্ট হলেও ঐতিহাসিক নাটক বিচারের তৈল দণ্ডে তা অত্যন্ত লঘু হয়ে যায়।

বিজয়া চরিত্রটিকে আগাগোড়া এক অদ্ভুত অলৌকিকতার জালের মধ্যে রেখে দিয়েছেন নাট্যকার। মাঝে মাঝে তার সংলাপের আন্তরিকতায়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তাকে এক অসাধারণ নারী মনে হলেও তার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ঐতিহাসিক নাটকের ক্যানভাসে বিসদৃশ ও বেমানান বলে মনে হয়েছে। প্রথম- আবির্ভাবেই

তার প্রতি শঙ্কর ও প্রতাপের অভিভূত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে বলে আমরা মনে করি না। দুর্বল-পীড়ন-দর্শনকাতর দীন ব্রাহ্মণের আহ্বানে মা দুর্গতিনাশিনী সাড়া দিয়েছেন বলে শঙ্করের মনে হওয়ার পেছনে যে বিশ্বাস কাজ করছে তা একান্ত ভূঁইফোড় বিশ্বাস বলে পরিগণিত হয়েছে।

বিক্রমাদিত্য চরিত্রটিকে আপাতদৃষ্টিতে ভাঁড় বলে মনে হলেও আসল ভাঁড় চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে ভবানন্দ চরিত্রটি। বিক্রমাদিত্য স্বভাবরসিক, তার কথা বলার একটি বিশেষ ভঙ্গি ছিল একথা স্বীকার করে নিলে চরিত্রটির প্রতি সুবিচার করা যেতে পারে। ভবিষ্যৎবাণীতে বিশ্বাস, ধর্মবোধ, ভ্রাতৃপ্রেম, বাৎসল্য, রাজ্যরক্ষার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা—বিপদের সম্ভাবনার দূরদৃষ্টিপ্রসূত পুত্র ও ভ্রাতার মধ্যে সম্পত্তি ও রাজ্যের ভাগবাঁটোয়ারা করে দেওয়ার সুচিন্তিত ব্যবস্থাপনা—সব মিলিয়ে চরিত্রটিকে সদাব্যস্ত করে রেখেছে। কার্যকলাপের দিক দিয়ে নয়, সংলাপের বিশিষ্ট রীতির দিক দিয়ে চরিত্রটি একটি টাইপ চরিত্রে আংশিকভাবে রূপান্তরিত—একথা বলা যেতে পারে। ভবানন্দ চরিত্রটি নাটকের ভিলেন। কিন্তু যথার্থ ভাঁড় চরিত্র বলে যদি কিছু থাকে তো সে আংশিকভাবে এই ভবানন্দ চরিত্রটিই। বিচক্ষণ শক্তিমান ও প্রজাবৎসল রাজার বিরুদ্ধে এবং শঙ্করের ন্যায় বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান মন্ত্রনাদাতাকে বোকা বানিয়ে ষড়যন্ত্রে সাফল্যলাভ করার মতো বুদ্ধিদৃপ্ত এবং প্রাজ্ঞ চরিত্র হিসাবে ভবানন্দকে উপস্থাপিত করা হয়নি। কুচক্রী কূমতলববাজ দেশদ্রোহী লোভী স্বার্থপর চরিত্র হিসাবে চরিত্রটিকে স্বীকার করে নিতে অসুবিধা না হলেও চরিত্রটির সংলাপ ঈপ্সিত মানে উত্তীর্ণ হতে পারেনি—তাই অনেক ক্ষেত্রে ভবানন্দর কথাবার্তা এবং আচার আচরণ বিসদৃশ ঠেকেছে। অনুরূপভাবে গোবিন্দ রায় চরিত্রটিও ভবানন্দর সমধর্মী চরিত্র হিসাবে ক্রমবিকাশসূত্রে পূর্ণতা লাভ করেনি।

প্রতাপাদিত্য নাটকে নাট্যকারের প্রযুক্ত সংলাপ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে দেশপ্রেমের প্রচ্ছন্ন প্রচার এবং কাব্যগুণ-এর বিকাশ সম্ভব হয়েছে।

আত্মবিস্মৃত জাতিকে জাগিয়ে তোলার সঞ্জীবনী মন্ত্র মিশিয়ে দিয়েছেন নাট্যকার তার জ্বালাময়ী সংলাপে—পিতা পিতামহের সেই রক্ত সেই উষ্ণবীরশোণিত পিতা-পিতামহের দেশেই কি রেখে এসেছো? ধমনীতে প্রবাহিত হবার মত এক-বিন্দুও কি তার অবশিষ্ট নেই?

শঙ্কর নিজেই বুঝতে পারেনি সে কি ইঙ্গিত করতে চলেছে। মুষ্টিমেয় দরিদ্র প্রজা, স্ত্রী-পুত্র মা বাপ নিয়ে সংসার। প্রতিশোধ নিতে যাওয়া বাতুলতা। 'প্রতিকার হীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। এই অংশের সংলাপে উচ্ছ্বাস নেই, অথচ শক্তিহীনের অসহায়তা স্পষ্ট উচ্চারিত। মদনের সংলাপে তার যথার্থ্য বিচার করা যায়।

মদন—"একান্তই যদি দেশ ছাড়তে হয়, তাহলে শালার নায়েবকে জানিয়ে যাব না?" "...সেই বুঝেই তো গায়ের ঝাল মেটাতে পেরে চুপ করে থাকি।"

গায়ের ঝাল মেটাতে না পারলে মানুষে মানুষের ধর্ম আরোপ করা হয় না। নাট্যকার মদন, মামুদ প্রভৃতি সমস্ত চরিত্রকে রক্ত মাংসের মানুষ হিসাবেই নির্মাণ করেছেন।

আত্মপ্রসাদের মধ্যে শঙ্করের দেশপ্রেম উদ্দীপিত হয়েছে। সত্যিই কি তার কিছুই করণীয় নেই? ভীরু পরপদলেহী, পরান্নভোজী সম্পর্ণরূপে পরনির্ভর বাঙালী কি মনুষ্য যোগ্য কোন কাজই করতে পারে না?

বাঙালী চরিত্রের যে নেতৃত্বের শক্তি তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন নাট্যকার শঙ্কর চরিত্রে। শঙ্কর একান্ত প্রিয় আবাল্য সহচরী স্ত্রীর কাছে তার নিজস্ব শক্তি-রহস্যের কথা জানতে চেয়েছে। সংলাপে হৃদয়াবৃত্তির উত্তাপ, প্রাণের স্পর্শ। আদরে পালনে তিরস্কারে অভিমানে আমিই তোমার একমাত্র লক্ষ্যস্থল। এতেও কি বলতে পারো না—আমি প্রতিকার করতে পারি কিনা? যখন গুরুদায়িত্ব বহনের প্রশ্ন রয়েছে সামনে তখনও কিন্তু শঙ্কর স্বাভাবিক, প্রেমে পরিহাসে, প্রাণোচ্ছল সংলাপে।

কিন্তু কনে বউ
কল্যাণী বলো।
অত আদর দেখিও না, ভয় করে।
বিলম্ব করলে কি যেতে পারবো?

সত্যি কথা······রমণীর স্বভাবতঃ দুর্বল হৃদয় আবার কি করতে কি করে বসবো? এই স্নিগ্ধ সুন্দর সংলাপমালার পর শ্রীরামচন্দ্রের প্রজার মনোরঞ্জনের দৃষ্টান্ত এর উল্লেখ কণ্টকল্প। 'সীতাকে ত্যাগ তার তুলনায় অনায়াসলব্ধ, কল্যাণী।' —সমস্যার সহজ সম্মানজনক সমাধানও রয়েছে সংলাপে।

সংলাপে কবিত্ব আরোপ-এর গুণ থেকে এ নাটকের সংলাপও বাদ যায়নি। বিজয়ার আবির্ভাবে প্রতাপের মধ্যে প্রতিক্রিয়া—এ প্রদীপ্ত অনলোচ্ছ্বাস, এ মত্তমাতঙ্গ পদক্ষেপ-এ অপূর্ব (রণোন্মাদন) বেশ আর কখনও দেখিনি মহারাজ।'

গোবিন্দের মর্মবেদনার উত্তরে বিজয়ার সান্ত্বনা—"তোমার ঠাকুর কি শুধু বাঁশীর ঠাকুর, আসির নয়?" এক অপূর্ব উপমা-পুরাণের দৃষ্টান্ত, একুশ দিনের ঠাকুর আমার স্তন্য পানে পুতনা নিধন করেছেন। দুই বৎসরের শিশু মৃণালবাহু বেষ্টনে তৃণাবর্ত সংহার করেছেন। ষষ্ঠবর্ষীয় বালক নৃত্যের ছলকরে প্রতিপদক্ষেপে এক এক করে কালীয়ের ফণা চূর্ণ করেছেন।

শঙ্করের সঙ্গে বিক্রমাদিত্যের কথোপকথন আকর্ষক। পরিহাসচটুল সংলাপে বিক্রমাদিত্য চরিত্রটি নাট্যকারের অপূর্ব সৃষ্টি, যদিও গাম্ভীর্য্য বিচারে চরিত্রটিকে বেশ লঘু করে দেখানো হয়েছে 'নদের লোক হয়ে তুমি কিনা খোঁচাখুঁচি বিদ্যে শিখেছো? ··কলম আর মাথা এই দুই নিয়েই বাঙালীর গৌরব। বাঙালীর ছেলে শুধু মাথা নিয়ে সংসারে এসেছো। খোঁচাখুঁচি ছেড়ে মাথা খেলাও। বাঙালী শক্তি জগতে দুর্লভ। কলম চালাও—এমন কত যশোর তোমার পায়ে গড়াগড়ি যাবে।

বিক্রমাদিত্যের সংলাপে রসবোধ সদাজাগ্রত। 'তাইত বলি বাবাজীর আমার পাগল পাগল ভাব কেন ? (শঙ্করের উদ্দেশ্য) বাবাজী আমার বৌমার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছেন।

বিজয়ার সংলাপ জুড়ে দেশবন্দনা—অত্যাচার, শোষণের প্রতিকার, প্রতাপের বৈষ্ণবধর্মত্যাগের সমর্থন, ভৈরবী কালীমূর্তির বন্দনা, অত্যাচারী মহিষ-মর্দিনীর শত্রুরূপা জগৎ জননীকে আহ্বান—এই অংশে নাটকে দেশপ্রেমের বন্যায় নাট্যসূত্র ও সর্ত ভেসে একাকার।

এছাড়া জাতীয়নেতার ঈপ্সিত ইমেজও মিলবে প্রতাপাদিত্যের সংলাপে—'দুর্বলের সহায় হ'তে, সতীর মর্য্যাদা রাখতে, নিরন্নের অন্নের ব্যবস্থা করতে—এসব কাজের যদি একটাও সম্পন্ন করতে না পারলুম তখন রাজার পুত্র হয়েও আমি করলুম কি ?'

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে অদৃষ্টবাদ ও দৈববাদ এ নাটকের ঐতিহাসিক কাহিনীর অন্তরালে কাহিনীকে অপ্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে। দেশাত্মবোধ ও জাতীয় ঐক্য প্রতাপের সংলাপে বারবার উচ্চারিত। "হিন্দু মুসলমান এক মায়ের দুই সন্তান। এক অন্নে প্রতিপালিত এক স্নেহরসাসিক্ত। বাল্যে ক্রীড়ায় যৌবনে মাতৃসেবাকার্য্যে প্রতিযোগিতায় বার্দ্ধক্যে আত্মীয়তায়, এস ভাই আমরা এক প্রাণে এক মনে মায়ের দুঃখ দূর করি।'

নাটকের বহু জায়গায় বাংলায় প্রবাদ প্রবচনের প্রয়োগ সংলাপকে সাবলীল অর্থপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

মোঘলের অত্যাচারে প্রজাদের প্রাণ অতিষ্ঠ। 'নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের অংশে'।' দরিদ্র ব্রাহ্মণ শঙ্করের কাছে তাদের রক্ষা করার জন্য তাই জানায় আবেদন—'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।'

বিক্রমাদিত্যের সংলাপে এখানে সেখানে ছড়ানো রয়েছে বাংলা প্রবচনের মণিমুক্তো। বসন্তের প্রতি—বন কেটে নগর বসিয়েছ (বন কেটে বসত্) এই পাকা আমটির ওপর অনেক কাঠবেড়ালীর নজর আছে।

ভবানন্দ প্রতাপের ভয়কে লঘু করে দেখার চেষ্টায় বলেছে—'হাতী ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল।' বাঙালী চরিত্রের প্রতি বিরূপ মন্তব্যেও ভবানন্দের মুখে বাংলা প্রবাদপ্রবচনের সার্থক ব্যবহার।

"উরকুনির ব্যাপার খুরকুনি, তার বিটি হীরে, এত ছালন থাকতে রে, অম্ল অম্বলে দ্যালে জিরে। মোঘল গেল, পাঠান গেল, শিখ গেল, রাজপুত গেল, দুর্বল সিংহ ভেতো বাঙালী হল কিনা লড়ায়ে।'

প্রতাপাদিত্য চরিত্রের নবমূল্যায়ন বারো ভূঁইয়ার এক শক্তিশালী ভূঁইয়ারূপে, স্বাধীনতা রক্ষায় অক্লান্ত প্রয়াসীর ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে। সে প্রয়াস ইতিহাস কিংবা কাহিনী বলেই চিহ্নিত হওয়া উচিত।

মূল ঘটনা থেকে বিচ্যুতি, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জন, কিংবা রূপান্তর নাট্য-প্রয়োজনের খাতিরে কিছু কিছু হয়েছে। প্রতাপের কোষ্ঠিতে পিতৃ-দ্রোহিতার উল্লেখ বা ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। গ্রীক নাটকের অদৃষ্টবাদ বা অনিবার্য ট্রাজেডির বীজ বপন না করলেও নাট্য বিন্যাসে তা কাজে লাগানো হয়েছে উড্ডীয়মান পক্ষীর লক্ষ্য ভেদে। এর দ্বারা নাটকটির ঈপ্সিত ট্রাজিক পরিণতি পরিকল্পনায় নাট্যকার সর্বতোভাবে সার্থক হয়েছেন—এ কথা বলার পেছনে যথেষ্ট সঙ্গত যুক্তি দেখানো সত্যিই সম্ভব নয়। উড্ডীয়মান পক্ষীর লক্ষ্যভেদ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের সমর্থন থাকলেও বিজয়ার আবির্ভাব সমেত সমস্ত ঘটনাবলীর উপস্থাপন নাট্য বৃত্ত রচনা বা নাট্যাবর্ত সৃষ্টির কাজে সবিশেষ সহায়ক হয়েছে—একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না।

বসন্তরায়ের প্রতি প্রতাপের বিদ্বেষকে নাট্য-বৃত্তের অন্যতম 'কেন্দ্রবিন্দু' বলে ধরা হয়েছে এবং কাহিনী বিন্যাসে প্রতাপের পিতৃদ্রোহিতার ঘটনার এবং বসন্তরায়ের প্রতি তার সুপ্ত বিদ্বেষ বিষাদময় পরিণতির জন্যে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই বিদ্বেষের ঘনঘটা এবং নাট্য-বৃত্তের চূড়ান্ত পর্যায়—চাকসিরি গ্রামকে কেন্দ্র করে এবং দাবি করে প্রতাপের জিদ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই দাবির যৌক্তিকতায় নাট্যবর্ত সৃষ্টি হয়েছে ও নাট্য-বৃত্ত ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। কারণ এই পর্যায়ে চাকসিরি গ্রাম, প্রতাপের অনিচ্ছা এবং ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ প্রতাপের বিকল্প প্রস্তাবে বসন্তরায়ের ক্ষোভ ও দুঃখবোধ একটি নাটকীয় সংঘাত ও নাট্যাবর্ত সৃষ্টি করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু বসন্তরায়ের প্রতি সন্দেহ এবং বিদ্বেষের ক্রমবিকাশে ঐতিহাসিক তথ্যের অনুসরণ করতে গিয়ে বসন্তরায়ের প্রতি সন্দেহের এবং বিদ্বেষের পর্যাপ্ত কারণ নাট্যসূত্রে যথাযথ গ্রথিত করতে সক্ষম হন নি নাট্যকার।

বসন্তরায় চরিত্রটি সূচনা থেকে যেভাবে চিত্রিত হয়ে ক্রমবিকাশ লাভ করছিল—তাতে প্রতাপের 'চাকসিরি' ভিক্ষায় তার হঠাৎ উত্তেজনার কারণ অনেক সমালোচকের মনঃপূত নয়। কিন্তু নাট্যকার চাকসিরি নিয়ে বিবাদের ব্যাপারে সাধ্যমত নিষ্ঠা এবং কাহিনী বিন্যাসে ও সংলাপে সংযম রক্ষার চেষ্টা করেছেন। কাহিনী বিন্যাসে যেটুকু ত্রুটী তার গুরুত্ব ঐতিহাসিক নিষ্ঠার অজুহাতে লাঘব করে দেওয়া যেতে পারে। প্রতাপের প্রার্থনা ও অন্যদিকে গোবিন্দরায়ের সেই প্রার্থনা পূরণের বিরোধিতা এবং তার অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ যদি স্নেহাস্পদ প্রতাপ এবং পুত্র—উভয়ের স্নেহের দ্বন্দ্বে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পারতো তাহলে কাহিনী বিন্যাস বহুলাংশে স্বাভাবিক হতে পরতো বলে জনৈক সমালোচকের ধারণা। আরও অভিযোগ যুদ্ধ থেকে গোবিন্দরায়ের পলায়ন যে উদ্দেশ্যমূলক তা নাকি

বোঝাবার সুযোগ নাট্যকার আমাদের দেন নি। তাছাড়া গোবিন্দরায় যে ষড়যন্ত্র করছেন প্রতাপ নাকি নাটকে তার আভাষই পাননি। অভিযোগগুলির যৌক্তিকতা অস্বীকার না করেও বলা যায় যে উভয় ক্ষেত্রে গোবিন্দরায়ের আচরণের যে ব্যাখ্যা দাবি করা হয়েছে তা সঙ্গত নয়। তবে চরিত্রচিত্রনের ব্যাপারে গোবিন্দরায় চরিত্রটি যে অসঙ্গত ও অসম্পূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই।

প্রতাপ কর্তৃক বসন্তরায়-হত্যা প্রসঙ্গটি নাট্য-প্রয়োজনে এবং নাটকের বৃত্ত রচনার নির্ভুল পদক্ষেপ হিসাবে ঐতিহাসিক তথ্য ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নাট্যকার নাটকীয় উপাদনের ধাঁচে সাজিয়ে নিয়েছেন।

নাট্যবৃত্তের প্রতি আনুগত্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ এই বসন্ত রায় হত্যা প্রসঙ্গে তার নিজস্ব মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিভিন্ন মতবাদের সাহায্যে বা সমন্বয়ে ঘটনা সংস্থাপন করেছেন।

নাটকে নাট্যকার খুব সাবধানে দৃশ্য পরিকল্পনা এবং সংলাপ সংযমের মাধ্যমে ঐতিহাসিক তথ্যকে মোটামুটি অবিকৃতভাবে উপস্থাপনার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যে যাই থাক্ নাট্যকৃত রূপের বিচারে প্রতাপের এইরূপ আকস্মিক আচরণ এবং নিরস্ত্র পিতৃতুল্য এক ব্যক্তিকে চরম আঘাত হানার জন্য যথেষ্ট কার্যকারণ সম্বন্ধ ও পরিস্থিত সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। যথেষ্ট কার্যকারণ সম্পর্কের অভাবে তাই নাটকে অসঙ্গতি অনিবার্য হয়ে উঠেছে—নাট্যবৃত্ত ও কিঞ্চিৎ বিকৃতির দোষে মসীলিপ্ত হয়েছে। তবে এও স্বীকার্য যে প্রতাপ চরিত্রের যা বাস্তব অসঙ্গতি—ঐতিহাসিক ঘটনার আনুগত্য বজায় রেখে নাটকে তাকে ও সামঞ্জস্যের পর্যায়ে ফেলা খুব সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়।

প্রতাপকে নাট্যকার চিত্রিত করতে চেয়েছেন স্বদেশআত্মার প্রতিমূর্তিরূপে। সে প্রতিমূর্তি জ্বলন্ত বিদ্রোহের প্রতীক। রাজার পাশে দেশভক্ত অগণ্য প্রজার সম্মিলন নাট্যকারের বাঞ্ছিত বিক্ষুব্ধ গণশক্তির বিস্ফোরণরূপে প্রকাশ পেতে চেয়েছে। উপদ্রুত পাঠানসন্তানরা এসে জমায়েত হয়েছে শঙ্কর চক্রবর্তীর চারপাশে। জাতীয় জাগরণের মুহূর্তে হিন্দু মুসলমানের এমন অপূর্ব মিলনের সুযোগ নাট্যকার হারাতে চান নি। তাছাড়া জাতীয় জাগরণ বলতে বিশেষ কোন ব্যক্তির স্বদেশানুরাগের প্রশ্নই বিচার্য নয়,—জনজাগরণ গণদেশপ্রীতি বোঝবার বা জানবার সুযোগ নাট্যকার করে দিয়েছেন প্রথম দিকের দু তিনটি দৃশ্যে।

যশোরেশ্বরীর লোক প্রবাদ প্রচলিত অসীম কৃপা প্রতাপাদিত্য-এর ওপর অজস্র ধারায় বর্ষিত —এই সব কিছুর আয়োজনই সম্পূর্ণ ছিল। নাট্যকার সবগুলির সমন্বয় ঘটিয়ে একটি সার্থক নাটক উপহার দিতে পারতেন—দেওয়ার পূর্ণ সুযোগও নাট্যকার পেয়েছিলেন কিন্তু সবকিছু নাট্যসূত্রে গ্রথিত হয়ে প্রত্যাশিত বৃত্ত রচিত হয়নি।

নাটকে নাট্যসূত্রের দাবী মেটাতে অনেক আকস্মিক ঘটনার সমাবেশ হয়েছে। পক্ষীর অনুসরণে একযোগে বাংলার জনশক্তি, রাজশক্তি ও দেবশক্তির প্রতীক

শংকর, প্রতাপাদিত্য ও বিজয়ার মঞ্চে চমকপ্রদ আবির্ভাব, কমল ও অন্যান্য দস্যুদের সঙ্গে মিলন, শংকরের স্ত্রীকে রাজ মহলের নবাবের চেয়ে পাঠানো ও তজ্জনিত মোঘলের সঙ্গে প্রতাপের সংঘর্ষ ইত্যাদি বহু ঘটনার সঙ্গত কারণ নাটকের কাহিনী বিন্যাসে স্পষ্ট নয়।

কাহিনী বিন্যাসে অসঙ্গতির প্রশ্ন আরও অনেক। শের খাঁর সঙ্গে প্রতাপের যুদ্ধের ঐতিহাসিকতার প্রশ্নে নাট্যকারকে সমর্থন জানিয়েও—সে যুদ্ধের প্রস্তুতির আয়োজন বা প্রস্তুতির কাহিনীগত যৌক্তিকতার প্রশ্ন অবশ্যই বিচার করে দেখা প্রয়োজন। সেদিক দিয়ে নাটকটির অন্যান্য অনেকগুণের তারিফ করা হলেও নাট্য শৈলীর দিক দিয়ে নাটকটির ত্রুটী উল্লেখ্য।

প্রতাপের প্রতি যশোরেশ্বরী লোক প্রসিদ্ধ কৃপালাভের কথা নাটকে উল্লিখিত হয়েছে। বিজয়ার (মারফৎ) মাধ্যমে সেই দেবীর কৃপা বর্ষণ ঘটেছে প্রতাপের শিরে অহেতুকী করুণার মতো। প্রচলিত প্রবাদানুসরণ করতে গিয়ে প্রতাপ চরিত্রটির কর্মময়তা দৈব কৃপার আড়ালে উদ্ভাসিত না হওয়ায় চরিত্রটির সম্যক বিকাশ লাভ ঘটেনি কিংবা চরিত্রটি পরিপূর্ণ স্বদেশপ্রেমিক বীর যোদ্ধার চরিত্র-মাহাত্ম্যে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি। বসন্তরায় হত্যার পর এই দৈব-কৃপা থেকে হঠাৎ সঙ্গত কারণে বঞ্চিত হওয়ার ঘটনা অবশ্য কাহিনীর সঙ্গত বিন্যাস বলেই ধরে নেওয়া যায়।

প্রতাপের চরিত্র সৃষ্টিতে ও তার পরিবেশ রচনায় নাট্যকার সঙ্গতি রক্ষা করতে পরেন নি বলেও অভিযোগ প্রচলিত আছে। স্বদেশপ্রেম যা প্রতাপ চরিত্রের ক্রম-বিকাশের সূত্রে প্রবাদ ও ঐতিহাসিক তথ্যানুসরণে স্বতঃউৎসারিত হতে পারতো তা হয় নি। প্রতাপের দেশপ্রেমমূলক সংলাপই যা সম্বল। যে অদৃষ্টবাদ ও কোষ্ঠির ভবিষ্যৎবাণী দিয়ে নাটকে প্রতাপ চরিত্রের আবির্ভাব, কার্যকিরণ সম্পর্কের বন্ধনে তাতে নিয়তির দুর্লঘ্য দুর্দৈবরূপে বিষাদময় পরিণতিকে টেনে আনা হয় নি। নাটকের সমাপ্তিও নাটকের সঙ্গতি রক্ষা করতে পারে নি। অন্তিম অঙ্কে স্বদেশ ভক্ত শহীদদের মুখ দিয়ে তার প্রিয় যশোর রক্ষা করতে না পারার বেদনা পরাধীন ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতার চিরাকাংখাকে নিঃসন্দেহে জাগিয়ে তোলার কাজে সহায়ক হয়েছে, ঘুমন্ত ভ্রান্তপথে চালিত বাঙালীকেও কশাঘাত হেনেছে।

নাটকে অসঙ্গতির উদাহরণ-বসন্তরায় হত্যার পর অনুতপ্ত প্রতাপ বলেছে (অস্ত্র নিক্ষেপ) 'শংকর, মানসিংহকে ফিরিয়ে আন। সে যশোর গ্রহণ করুক। এ গুরুশোণিত সিক্ত হস্তে বঙ্গের শাসনদন্ড ধারণ আমার শোভা পায় না।' শেষ দৃশ্যে এই প্রতাপই বলেছে 'গুরুহত্যা করলুম, তবু যশোর হারালুম।'

নাটকটির দোষ ত্রুটী সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনার পর এবং বিশ্লেষণ করে কবি কল্পনা হিসাবে ঐতিহাসিক বাঁধাধরা কাহিনী বিন্যাসের মধ্যেও নাট্যকারের স্বভাবসুলভ রোমান্টিক চিন্তাধারা এবং সংলাপের সাহিত্যগুণ ও রসবিচারে নাট্যকারের অনুকূলে যে কিছুই বলা যায় না—একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে।

।। প্রতাপাদিত্য ।।
ও
।। বউঠাকুরাণীর হাট ।।

প্রতাপাদিত্যের চরিত্র ক্ষীরোদপ্রসাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে একেবারে স্বতন্ত্র। বিদেশী বা মোঘলদের কাছে নতি স্বীকার তার কাছে আত্ম-অবমাননার সামিল। রবীন্দ্রনাথের বউঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসে প্রতাপাদিত্য স্বদেশ-বৎসল জাতীয় বীরের প্রতীক নয়, তবে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী স্বাধীন রাজা। রাজকার্য পরিচালনায় তিনি কঠোর। তার বিচার, তার সিদ্ধান্ত অমোঘ। কর্ত্তব্যপরায়ণতার পথে স্নেহ, মায়া, মমতা, স্বজনের আর্ত অনুরোধ—সব কিছুকে প্রতাপ অবলীলাক্রমে ঠেলে এগিয়ে গেছে। সেই রাজকার্য পরিচালনার কঠোরতার বলি হয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তার কন্যা বিভা, জামাতা রামচন্দ্র, পুত্রবধূ সুরমা, পুত্র উদয়াদিত্য এবং নির্মমভাবে তার শুভাকাঙ্খী একান্ত আপনজন খুল্লতাত বসন্তরায়।

নাটকে প্রতাপের চরিত্র সম্পর্কে এই মনোভঙ্গি ক্ষীরোদপ্রসাদ গ্রহণ করেন নি। কোষ্ঠির ফলাফল, ভবিষ্যৎবাণী, রামরাম বসু, নিখিলনাথ রায় বা সত্যচরণ শাস্ত্রীর মনোভাব—রবীন্দ্রনাথ কোন কিছুকেই অনুসরণ করেননি, তাঁর চেতনায় প্রতাপাদিত্য কর্তব্যপরায়ণ এক কঠোর রাজা—যিনি নিজের মতে চলেন—কারও দ্বারা বিন্দুমাত্র পরিচালিত হন না—স্বদেশ স্বরাজ্য এর শাসন যার কাছে শুধুমাত্র আবেগ বা উচ্ছ্বাস নয় পরন্তু কর্তব্যপরায়ণতার কঠিন সুতোয় বাঁধা—। একান্ত করণীয় কার্য বলে বিবেচিত।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে বসন্তরায় এর হত্যাকাণ্ড কিম্বদন্তী বা ইতিহাসে একটি স্বীকৃত তথ্য এবং এর যাবতীয় দায়িত্ব প্রতাপাদিত্যের। তবে সে হত্যাকাণ্ড নাটকে সঙ্গত কারণেই কার্যকারণসূত্রে বাঁধা হয়েছে। নাটকীয় আকস্মিকতার সূত্রে আকস্মিক ভুল সিদ্ধান্ত এর পরিণতি হিসাবে বসন্তরায় এর হত্যাকাণ্ড নাটকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এই হত্যকাণ্ড সুপরিকল্পিত এবং প্রতাপাদিত্যের দ্বিধাহীন চিত্তের স্থির এবং সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি। নাটকে প্রতাপকে আত্মরক্ষার জন্যে প্রথম আক্রমণের সুযোগ নিতে বাধ্য করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথে এই হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত।

মুক্তিয়ার খাঁ বসন্ত রায়কে হত্যার আদেশ পালন করতে এসেছে। যুবরাজ উদয়াদিত্য এই নির্মম আদেশ এর জন্য ব্যাখ্যা চেয়ে সরাসরি প্রতাদিত্যের কাছে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু মুক্তিয়ার খাঁ নিরুপায়। রাজাদেশ অমান্য করতে সে নারাজ।

'যুবরাজের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, তাহার কপালে ঘর্মবিন্দু দেখা দিল।

তিনি সেনাপতির হাত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া বলিলেন—'মুক্তিয়ার খাঁ', বৃদ্ধ নিরপরাধ। পুণ্যাত্মাকে বধ করিলে নরকেও তোমার স্থান হইবে না।

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, মনিবের আদেশ পালন করিতে পাপ নাই।'

প্রতাপের এই নির্মম সিদ্ধান্ত আকস্মিক ও মর্মান্তিক। পরম স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছ থেকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা বসন্ত রায়ের কাছে অবিশ্বাস্য। নাটকে অবশ্য এর কোন প্রতিধ্বনি নেই।—বউঠাকুরাণীর হাটের উদ্ধৃতি:

"মুক্তিয়ার খাঁ এক আদেশ পত্র বাহির করিয়া বসন্ত রায়ের হাতে দিল। বসন্তরায় আলোর কাছে লইয়া পড়িতে লাগিলেন।......পড়া শেষ করিয়া বসন্ত রায় ধীরে ধীরে মুক্তিয়ার খাঁর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কি প্রতাপের লেখা?...... একটু পরে আবার জিজ্ঞাসা—এ কি প্রতাপের স্বহস্তে লেখা?

নাটকের প্রতাপ চরিত্রের যশোরেশ্বরীর কৃপালাভের ঘটনার কোন উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নেই।

"সে যুগের ঐতিহাসিকগণ ও লেখকেরা প্রতাপাদিত্যের ছিটেফোঁটা ঐতিহাসিক কাহিনীতে প্রচুর স্বদেশপ্রেমের কাল্পনিক গৌরব মিশিয়ে ধুমঘাটের ভূস্বামীকে মুঘলের বিরুদ্ধে স্বদেশ প্রেমিকরূপে উপস্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে কথা মানতে পারেন নি।" (ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত)—ক্ষীরোদপ্রসাদ অবশ্য জাতীয় জাগরণের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়ে প্রথম জাতীয় ভাবোদ্দীপক দেশাত্মবোধক নাটক লেখার ইতিহাস রচনা করেছিলেন।

মোঘলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে প্রতাপকে বন্দী হতে হয় এবং বন্দী হিসাবে আগ্রায় নীত হওয়ার পথে তার মৃত্যু ঘটে। এ ঘটনায় তার প্রতি শ্রদ্ধার উপকরণই তাকে জাতীয় বীররূপে কল্পনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তার কিছু কিছু ত্রুটী তার প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাবকে বিরূপ করে তোলে। নাটকে এ মনোভাবকে স্পষ্ট করার গরজ সে যুগের ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত গ্রন্থগুলিতে—রামরাম বসু নিখিলনাথ রায় বা সত্যচরণ শাস্ত্রীর পক্ষ থেকে যেমন পরিলক্ষিত হয়নি, ঠিক তেমনি নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের পক্ষ থেকেও তার সমর্থন মেলে নি। অথচ রবীন্দ্রনাথ তার প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের ত্রুটী বিচ্যুতি, তার রূঢ় আচরণ, স্নেহ মায়া মমতাহীন পাষাণ হৃদয়ের নির্মম অভিব্যক্তির স্পষ্ট উদাহরণ রেখেছেন তাঁর উপন্যাসে। অবশ্য এও স্বীকার্য যে এই সর্বগ্রাসী ইম্পিরিয়ালিসম্ এর নিন্দাও করেছেন তিনি দৃঢ়ভাবে পরবর্তীকালে। প্রতাপাদিত্য ভাবনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এর পরেও তাঁর রচনায় প্রায়শ্চিত্ত ও পরিত্রাণ নাটকদ্বয়ের মাধ্যমে।

॥ পদ্মিনী ॥

ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে যুগপ্রবণতাকে অস্বীকার করতে পারেন নি ক্ষীরোদপ্রসাদ। নাটকে ঐতিহাসিক উপাদান গ্রহণ করেছিলেন তিনি দুটি উদ্দেশ্যে। প্রথমতঃ সুলভ রোমান্স সৃষ্টির পাদপীঠ রোমান্টিক কল্পনার বাহন হিসাবে, দ্বিতীয়তঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর সদ্যজাগ্রত স্বদেশী চেতনার উদ্বোধক ও প্রেরণার অন্যতম উপাদান হিসাবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খাকে মূর্ত করার অবলম্বনরূপে তিনি ইতিহাসের আশ্রয় নিয়েছিলেন। বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সামগ্রী যেমন তাঁকে আকর্ষণ করেছিল তেমনি টডের রাজস্থান অন্যান্য ইতিহাসসচেতন শিক্ষিত বাঙালীর মতো তাকেও আকর্ষণ করেছিল। বীর রাজপুতদের নিজেদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আমরণ সংগ্রাম ইংরাজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ভারতীয়দের সংগ্রামের শক্তি ও প্রেরণা প্রদান করেছিল। শুধু তাই নয় এর দ্বারা ঐতিহাসিক নাটক রচনশীলমন ও নাট্যচেতনাকে উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত হয়েছিল।

টডের রাজস্থান এর উপকরণ সর্বৈব ঐতিহাসিক তথ্যনির্ভর ছিল না। প্রয়োজনবোধে কিম্বদন্তীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে রাজস্থান কাহিনীকে চিত্তাকর্ষক ও চমকপ্রদ করা হয়েছে—সেই মর্মে টডের স্বীকারোক্তি ও পাওয়া যায়। ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকেও কোথাও ঐতিহাসিক তথ্য বা তত্ত্বের আংশিক প্রতিফলনে ঐতিহাসিক চরিত্র বা চরিত্রগুচ্ছের রূপায়ণ ঘটেছে আবার কোথাও বা রাজস্থান কাহিনী ও তার অন্তর্ভুক্ত কিম্বদন্তী কাহিনীগুলি জাঁকিয়ে ছায়া বিস্তার করেছে।

পদ্মিনী নাটকের মূল চরিত্র পদ্মিনী নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক বীরাঙ্গনা। কিন্তু কাহিনীর বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক কিনা বলা কঠিন। এ ব্যাপারে নাট্যকারের ঐতিহাসিক নিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রশ্ন করার আগে প্রচলিত কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করে নেওয়া দরকার।

মেবারের অধিপতি রাওয়ল রতন সিংহের রাণী পদ্মিনী সম্বন্ধে একটি প্রাচীন কাহিনী প্রচলিত আছে। সেই কাহিনীর অনুসরণে কোন কোন ঐতিহাসিকের ধারণা পদ্মিনীর অপরূপ রূপ-লাবণ্যের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিলজি পদ্মিনীকে লাভ করার জন্যে মেবার আক্রমণ করেন। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক পদ্মিনী সংক্রান্ত এই কাহিনীটি বিশ্বাস করেন না। কারণ তাদের মতে কোনও সমসাময়িক লেখক ঠিক এইরূপ কাহিনীর উল্লেখ করেন নি। অবশ্য এর প্রথম উল্লেখ দেখা যায় মালেক মহম্মদ জায়সার লেখা 'পদুমাবৎ' এ—১৬৪০ খৃস্টাব্দে। কিন্তু 'পদুমাবৎ' ঠিক ইতিহাস নয়, প্রচলিত উপাখ্যান মাত্র।

পদ্মিনীর রূপলাবণ্যে অভিভূত সুলতান আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণ এর কথা শুধু রাজপুত চারণগণই নয়, আবুল ফজল, ফেরিশতা নেনসি এবং হাজি উদ্দাবিরের মত পরবর্তী লেখকগণও এই কাহিনীকে সমর্থন করেছিল। এই মতের স্বপক্ষে কোন প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ না থাকলেও সমসাময়িককালের অন্ততঃ একটি লেখার মধ্যে তার প্রমাণ অকাট্য। কবি ও ঐতিহাসিক আমীর খসরু চিতোর অভিযানের সময় আলাউদ্দীনের সঙ্গী ছিলেন। সুতরাং তার রচিত গ্রন্থ খজাইনুউল্ ফতুতে আলাউদ্দীনের সঙ্গে ইথিওপিয়ার রাজা সলোমনের তুলনার উল্লেখ এবং পদ্মিনীর উপাখ্যানেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মহম্মদ নাসানীর বই থেকেও কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে। এই উপাখ্যানের অনুসরণে জানা যায় যে রাজপুতেরা অদম্য বীরত্বে সুলতানের আক্রমণ প্রতিহত করে সাত মাস ধরে। এর পরে যখন দেখা যায় পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, তখন রাজপুত রমণীরা জহরব্রত অবলম্বন করে জ্বলন্ত অগ্নিকাণ্ডে ঝাঁপ দেয় এবং এইভাবে অন্যান্য রাজপুত রমণীদের সঙ্গে পদ্মিনীও আত্মাহুতি দেন এবং আলাউদ্দীন চিতোর অধিকার করে নেন।৩৩

অন্যান্য আর ও দু একটি ঐতিহাসিক নাটকের মত এ নাটকেও দেশপ্রেম স্বতঃ উৎসারিত। জহরব্রত অবলম্বন করে ভারতললনাদের মর্যাদার স্বার্থে বীর স্বামীদের সঙ্গে আত্মবিসর্জন শুধু ইতিহাসের একটি উল্লেখ্য বিষয়বস্তু ছিল না, প্রাচীন প্রচলিত কাহিনীর আকারেই এর অধিকতর বিস্তার। নাট্যকার কাহিনীর পরিণতির কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে সেই উল্লেখ্য ঘটনাকে কাজে লাগিয়েছেন এবং সুলতান এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটনে নাট্য উপসংহারে সে ঘটনা সবিশেষ ভূমিকা গ্রহণ ও গুরুত্ব অর্জন করেছে। রাণার সরলতা ও আতিথ্যবোধ সর্বনাশের মূল কারণরূপে দেখা দিয়েছে। প্রচলিত কাহিনী ও ইতিহাসের পাতায় বর্ণিত কাহিনীর অনুরূপভাবে পদ্মিনীর নিজের রূপলাবণ্য ও তার অদৃষ্টবাদই তার বিষাদময় পরিণতির অন্যতম কারণরূপে পরিগণিত। কিন্তু সবকিছু উপাদান সত্ত্বেও নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতের অভাবে নাটকটিতে নাট্য গভীরতার ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। একমাত্র আলাউদ্দীন চরিত্রটিকেই জীবন্ত বলে মনে হয়েছে। এছাড়া বাস্তবতা ও মানবিক স্পর্শের মধুরতা পাই রুগ্ন রাহুল ও তার স্ত্রীর চরিত্রে।

নাটকটি ঘটনাবহুল এবং তা নাটকের নিজস্ব প্রয়োজনে যত না হোক ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি আনুগত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই তার প্রয়োজন বেশী মনে হয়েছে। কিন্তু একটা কথা—ঐতিহাসিক ঘটনার বা প্রচলিত কাহিনীর উপস্থাপনে

---

৩৩. Annals and Antiquities of Rajasthan Vol-I-Calcutta 1877.
Md Nasini-Briggstr History of the Rise of Mohamedanes in India-Vol. I-Calcutta 1966.
গৌরী শংকর হীরাই—রাজপুতানেকা ইতিহাস—১ম খণ্ড আজমীর ১৯৩১।

ঐতিহাসিক নাটকের মর্যাদা লাভ করতে পারে ন্য। এ নাটকেও কিছু পরিমানে সেই ঘটনা ঘটেছে। কাহিনীর উত্থানপতন চরিত্র সৃষ্টির গভীরতা, ঘাত প্রতিঘাত ইত্যাদি এ নাটকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পেঁছাতে না পারলেও এবং সেই সব উপাদান খুব বেশী না মিললেও একেবারে বিরল নয়। নাটকটির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মন্তব্যটির যাথার্থ্য বোঝা যাবে।

উজীরকন্যা নসীবনকে স্থান ত্যাগ করে মর্যাদা রক্ষা করার কথা বলতে নসীবন যে কথা প্রকাশ করে তাতে নাট্যক্রিয়াকাণ্ডের সূচনা হয়। ঘরের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন বিলিয়ে দিয়েছে নসীবন পিতৃঘাতীকে। এর শাস্তি পেতেই হবে। তাকে উজীর হত্যা করতে যাওয়ার মুহূর্তে আলাউদ্দীনের সৈন্যের প্রবেশ, উজীরকে বন্দীকরণ ও নসীবনকে রক্ষা। কিছুটা মেলোড্রামার প্রবণতা ও দীর্ঘ সংলাপের জড়তা দিয়ে নাট্যকার নাটকের গোড়াপত্তন করেছেন।

লক্ষণ সিংহের মুখে সমসাময়িক যুগধর্মের প্রবণতায় স্বদেশ প্রেমের বাণী—, 'মাতৃভূমি রক্ষাই প্রত্যেক সন্তানের একমাত্র উদ্দেশ্য······এরূপ মহৎ কার্য্যের জন্য কূটনীতি অবলম্বনে দোষ কি ?' কিন্তু চিতোরবাসীর প্রাণে জাতীয়তাবোধ কোথায় ? লক্ষণ সিংহ আশাবাদী। 'সকলের প্রাণে আবার সে জাতীয়ভাব উদ্দীপনের চেষ্টা করলে কি কার্য্য হয় না ?' কিন্তু ভারতবাসীর যে স্বভাব—প্রতাপাদিত্য নাটকে ট্রাজেডির মূল বীজ—'এ পোড়া ভারতের ভাগ্যে এত ষোল আনার বুদ্ধি একত্র হয়েছে যে সমধর্ম তড়িতের পরস্পর বিরোধী শক্তির ন্যায় এরা কেউ কারও কাছে অবস্থিতি করতে পারে না—' ভারতবাসীর এই চরিত্র বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছবি পড়েছে এই নাটকেও।"

চিতোরবাসীর সম্বন্ধে গোরার দার্শনিক বাক্যটিতে স্বদেশ চিন্তার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। স্বদেশচিন্তার বিকার লক্ষে গোরা বেদনাহত। লক্ষণ সিংহও বিমূঢ়। একজনের স্ত্রী হ'য়ে নসীবন কেমন করে অন্য পুরুষের ভালবাসা চায় ? নসীবন একটি ছোট সংলাপে সব সমস্যার সহজ সমাধান করে দিয়েছে। 'কেন, স্ত্রীলোক বিবাহিত হ'লে কি সহোদর প্রেমেও বঞ্চিত হয় ?' নাটকে এই সহজ ও অনায়াস সমাধান কাম্য নয়। হিন্দুস্থানী ভাই এর মুসলমানী ভগিনী : দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার ব্যাপারে ও হিন্দু মুসলিম ঐক্য প্রচারের ব্যাপারে নাটকে রীতিমত উদ্দেশ সিদ্ধ করার চেষ্টা সহজেই ধরা পড়ে। নাটকের সর্তপালনে এই সচেতন চেষ্টা উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেছে। শৈথিল্য প্রদর্শন করলেও কাহিনী গ্রন্থনে এই ভূমিকার প্রয়োজন ছিল। হঠাৎ বাদলের প্রবেশে নাট্যকার যেন সম্বিৎ ফিরে পান। গুপ্তচর প্রবেশ করেছে চিতোরে। অতএব কাহিনীকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজনে তৎপর হতে হয় নাট্যকারকে।

পদ্মিনী বাগানে পুষ্পচয়ন করতে করতে মীরাকে বলেছে, 'ভয় অন্য কাউকে নয়, ভয় আমাকে।' এই ছোট সংলাপই নাট্যকাহিনীর মূলবীজ। পরবর্তী

ঘটনার ইংগিত পাওয়া যায় পদ্মিনীর আত্মভাবনায় এবং এতে নাট্য সমস্যার কিছুটা ইঙ্গিতও মেলে। কাহিনীর পরিণতি যেন পদ্মিনীর ভবিষ্যৎ আশঙ্কার মধ্যে বিবৃত—তার কোষ্ঠীর ভবিষ্যৎবাণীর মধ্যে সোচ্চার—'আমি যে সংসারে প্রবেশ করব, সে সংসারই বিপন্ন হবে। যদি কোন রাজা আমাকে গ্রহণ করে তাহলে তার রাজ্যধ্বংস হবে।'

নাটকে বাদলের আকস্মিক আবির্ভাব ও সদ্য-চিতোর প্রত্যাগত চরকে আক্রমণ ও বাধাদানকারী আলমাসকে হত্যার দ্বারা অদৃষ্টবাদের জয় ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু সবই পুরানো যাত্রাঢঙে। আলমাস ঠিক করেছিল সেদিন রাত্রে আলাউদ্দীনকে গুপ্ত হত্যা করবে। কিন্তু নিয়তির অলঙ্ঘ্য নির্দেশে তার মৃত্যু ঘটার ফলে পরোক্ষে সম্রাটই দীর্ঘজীবী হল।

নসীবনের প্রার্থনা—সম্রাটের সবল ও সুস্থ দেহ। তার অর্থ যুদ্ধ ঘোষণা? কিন্তু পরিণাম? সমস্ত মেবার যে ভূমিকম্পে আন্দোলিত হয়ে উঠবে। মেবারের অনেক প্রিয় সন্তানকে যে মৃত্যুর দ্বারে অতিথি হতে হবে। কাহিনী গ্রন্থনে নসীবনের এই ভূমিকার প্রয়োজন ছিল। এতখানি ঝুঁকির বিনিময়ে যে আতিথ্যের তৎপরতা, তার জন্যে আশ্রয়দাতার মানসিক চাঞ্চল্যের লক্ষণ নেই।

এর পর আসন্ন সংঘাতের সূচনা—আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয়দান অবশ্য চিতোরপতির বংশগত ধর্ম বলে জানানো হয়েছে। "তারও-পর সে রমনীর কাছে আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। অসম্ভব হলেও তা সম্ভব করতে হবে।" দুর্যোগের সূচনায় আর এক বিপদসংকুল ঘোষণা—'পরশু সন্ধ্যায় যেন সমস্ত চিতোরী বীর ভবানীর মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। যে না আসবে সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে। প্রতাপাদিত্য নাটকের অনুরূপ ঘটনা এবং সমস্যা। অরুণ সিংহও যদি বিলম্বে পৌঁছায় তার ও ছাড় নেই। রাজার আইন কি তার প্রজার পক্ষে এক আর তার পুত্রের পক্ষে আর? পরবর্তী ঘটনার ইঙ্গিতের মাধ্যমে নাট্য-সমস্যার সূত্রপাত। কাহিনী-বিস্তারের এই আঙ্গিক বহুলাংশে উপন্যাসের।

গোরার বহুবিধ কার্যকলাপ এর অসম্ভব্যতা ঐতিহাসিক নাটকের পরিবেশকে রূপকথার অপরূপ রাজ্যে উন্নীত করেছে। গোরার যোগ-প্রক্রিয়া চরদের বিস্ময় উৎপাদন তো করেইছে উপরন্তু তা আমাদেও বিশ্বাসের পরিধি ছাড়িয়ে গেছে। অন্যান্য নাটকের মত এ নাটকেও নিষ্ঠুর কৌতুকের প্রয়োগ নাট্যকারের স্বভাবসিদ্ধ প্রবণতার পর্যায়ে পড়ে।

অরুণ সিংহ ও রুক্মা প্রসঙ্গ নাটকের অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে। রুক্মার অনুরাগ বোঝান নাট্যকার তার সহজ স্বীকারোক্তির মাধ্যমে। "তোমায় দেখে আমার দুঃখ হয়। রাজার কি আর সেপাই নেই তাই তোমাকে দিয়ে ফটক পাহারা দেওয়ায়?" অপূর্ব সহজ প্রণয়াসক্তির নিদর্শন। "বলেছ

ধরলে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী হবে। তোমার সুন্দর হাত সুন্দর চক্ষু স্নিগ্ধ বেশ।" রুক্সা অরুণের বল্লম শিকার ব্যাপারে রোমান্স সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার। এই প্রসঙ্গে বিজয়া-নরেন এর মাইক্রোসকোপ নিয়ে পরীক্ষার ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের দত্তা উপন্যাসের কথা মনে পড়বে। রুক্সার দিকে তাকাতে গিয়ে অরুণের শিকার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যায়। 'দুহুঁ করে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।'······যখন তুমি··· · দূরে থাক যন্ত্রণা, যখন তুমি কাছে আস তখন আরও যন্ত্রণা। রবীন্দ্রভাষ্যে-'প্রাণ চক্ষু চায় না চায়'। ······ভয় হয় বুঝি এখনই চোখের অন্তরাল হবে। আর বুঝি তোমাকে দেখতে পাবো না। রুক্সার সামাজিক সচেতনতা লক্ষনীয়। বরাবরের জন্য কি করে ঠাঁই দেওয়া যায় অরুণকে।······আমার ঘরে সমথ্থ মেয়ে। পাড়ার লোক শুনলে জাতে ভাতে ঠেলবে।' এই দৃশ্যে রুক্সার মা অরুণের ভালবাসার কথা যে ভাবে প্রকাশ করেছে—রুক্সার বাবার অজ্ঞতার দেওয়ালে তা উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। অরুণেব আকস্মিক অন্তর্ধানে রুক্সা নির্বাসিতা—'এই যদি ভগবানের ইচ্ছা হয় তাহলেও এ অবস্থা আমার মন্দ কি? আমার ঘরবার দুই সমান।' শেষ পর্যন্ত অবশ্য নাটকে রুক্সা-অরুণের নাগাল পেয়েছে লক্ষণ সিংহের নাটকীয় উপস্থিতিতে। 'রাজা তুমিই বিচার কর। শুধু মন্ত্র পড়া বাকি।·····বাপ আমার আত্মীয় কুটুম্বদের নেমন্তন্য করে এসেছে। রাত্রে বিয়ে হবার কথা।'

রুক্সা শেষ পর্যন্ত নিজের শক্তিতে শক্তিময়ী হয়ে দাঁড়িয়ে বলে (অরুণকে) 'কে নিয়ে যেতে পারে নিয়ে যাক্' (বল্লম তুলিয়া দাঁড়াইল)। '—এ কি অপূর্ব স্মৃতি সহসা আমার চোখের ওপর প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল।' তার মুখের পুরাণ উদ্ধৃতিটিও আলোচ্য। 'তুমি জান রাজা, সতীর মনে কষ্ট দিলে কি হয়? পুরাণে কি শোন নি সতীর শাপে দক্ষ রাজার কি হয়েছিল?' পদ্মিনীও এসে যায়—'অভিসম্পাত দিও না মা—অভিসম্পাত দিও না। রক্ষা করো—ক্রোধ কোরো না'। ঐতিহাসিক নাটকের পক্ষে এইসব ক্রিয়াকলাপ অযৌক্তিক। আলাউদ্দীনের মুখে পুরাণের উদ্ধৃতির মাধ্যমে নাট্যকার যেন পুরাণের দ্বারে এসে পৌঁচেছেন।

কাফুর নাট্যকাহিনী নিয়ন্ত্রণে মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভীমসিংহের বিনিময়ে পদ্মিনীকে লাভ করতে চায় আলাউদ্দীন। এতে কাফুরের আপত্তি। পদ্মিনীর ইচ্ছা স্বামীর সঙ্গে চির-বিচ্ছেদের আগে একবার দেখা করবে। পালকিতে পদ্মিনীর বদলে গোরা। কিছুটা লঘু কৌতুক পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস—নাটকে লঘুরস সঞ্চার করেছে।

গোরার বিদায় "আমার বাঁচার কাজ শেষ হয়ে গেছে—তুমি বেঁচে থাক। চিতোরের সেবা কর। অর্জুন ভীষ্মের শরশয্যা করে দিয়েছিলেন তুমি আমার শরশয্যা করে দাও।' বাদলের ওপর দুখিনী বোন নসীবনের ভার দিয়ে গোরার বীরের মৃত্যুতে কারুণ্য যত না এসেছে, দেশপ্রেমের একটা পরিমণ্ডল সৃষ্টির কাজ হয়েছে তার চেয়ে বেশী।

নাটকের শেষের দিকে নাটকের গতিবেগ দ্রুততালে ধাবিত হয়েছে। বৈশিষ্ট্য অবশ্য ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যান্য নাটকের অনুরূপ। লক্ষণ সিংহের সমস্যা-'বাদশার দিল্লী ফেরবার পথ রোধ করতে গিয়ে নিজ গৃহের পথ রোধ করেছি'।...'চিতোর উদ্ধারের শেষ চেষ্টায় আত্মনিয়োগের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ স্বতঃউৎসারিত। বাদল বৃদ্ধ রাজাকে রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে বলেছে—'অনল শিখা ক্ষুধার্ত হয়ে চিতোরকে রসনায় বেষ্টিত করেছে। নসীবন নিজের কৃতকার্যের জন্য অনুতাপে দগ্ধ। লক্ষণ সিংহের 'মা' সম্বোধনও তাই তার কাছে দুঃসহ—'আত্মসন্তানঘাতিনী নাগিনীকে যদি আপনি ঐ পবিত্র আখ্যার অধিকারিণী মনে করেন তা হলে আমি মা।'

কাফুর শেষের দিকে চিতোরীদের বীরত্বে বুঝতে পেরেছে জয়ের আশা সুদূর পরাহত। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল কাফুরের যে ভূমিকা প্রথমে দেখেছি সে ভূমিকার বিপরীতে দেখে তার চরিত্রের বাস্তবতা সম্বন্ধে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে। শত্রু নির্মূল করার ব্যাপারে অরুণ সিংহের সাহায্য প্রত্যাখ্যাত হতে নাট্যসংঘাত জমে ওঠে। রুক্সা এসে চিন্তাগ্রস্ত স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছে ছোট্ট সংলাপে—'মাথায় হাত দিয়ে বসলে যে'। —নাটকে অনেকক্ষণ পরে মানবিক স্পর্শ। অরুণ সিংহের আক্ষেপ—বৃথাই আমি বাপ্পা রাওয়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলুম।' সে যে অস্পৃশ্য—আত্মীয় বন্ধুর ঘৃণার পাত্র। রুক্সার অনুরোধেও তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারেনি অরুণ সিংহ।

নাটকের শেষ দিকে পদ্মিনী নিজের অদৃষ্টবাদের কথা স্মরণ করেছে। 'যা বলেছিলুম তাই হল। ধ্বংসরূপিনী চিতোরে এসে এমন সোনার চিতোর ধ্বংস করলুম।' চিতোর রক্ষায় রাণা সম্ভবত শেষ শয্যা গ্রহণ করতে চলেছেন। ভীমসিংহ জানালেন সেই মর্মান্তিক সংবাদ—নাটকের মুড্ নিয়ন্ত্রিত হল ট্রাজেডির দিকে। জহরব্রত অবলম্বনের জন্য সকলে প্রস্তুত—লক্ষণসিংহ সর্বনাশ ও ধ্বংশের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছেন। আবার সেই 'দেববাদ'—'ময় ভুখা হু'—চিতোর রক্ষিনী মাতৃকার ভিক্ষা—জন্মভূমি যদি রাখতে চাস ত শ্রেষ্ঠ পুষ্প পূজা দে—রাজপ্রাণ বলি দে।'—রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের কথা স্বভাবতই মনে আসবে এই প্রসঙ্গে। টডের রাজস্থানএও অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। —বাদল অরুণ ও রুক্সার মধ্যে কথোপকথন—কেল্লা দখলে রাখার প্রতিযোগিতা। কাহিনীকে অনাবশ্যক দীর্ঘায়িত করা। কেল্লা দখলের প্রতিযোগিতায় 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি কাড়াকাড়ি।'

বাদল ও অরুণ দুজনেরই মৃত্যু যদিও পরিবেশানুগ, তবুও অতিনাটকীয় ঘটনার পর্যায়ে পড়ে। এ মৃত্যু সাজানো কাহিনীর ছাঁচে ঢালা এবং এ্যাকসানু নির্ভর কাহিনীর স্বাভাবিক বৃন্তচ্যুত ঘটনার সামিল হয়েছে। সংলাপ ও চরিত্র সৃষ্টির আলোচনায় প্রথমেই উল্লেখ্য উজীর ও মোজাফরের সংলাপ। এই সংলাপের মাধ্যমে আলাউদ্দীনের কূটনীতির নবপরিচয়। সম্রাটকে হত্যা করেই ক্ষান্ত

দেওয়ার অর্থ নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা। সিংহাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হলে অগ্রে রক্ত দিয়ে তলদেশের মৃত্তিকা সুদৃঢ় করতে হয়। আলাউদ্দীনের রাজনীতির কিছু দার্শনিক গুণমণ্ডিত সংলাপ রয়েছে। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তারই চারদিকে অভ্রভেদী তরুর গায়ে মর্মভেদী নখচিহ্ন। মোজাফরের প্রতি নির্দেশ বাক্য চাই না—বুদ্ধি চাই না, শুধু কথা শোনার জন্য মাঝে মাঝে তোমার কান চাই—আর আমার যশঃগৌরব আঘ্রাণের জন্য মাঝে মাছে তোমার নাক চাই। এ সংলাপ অপূর্ব, অনবদ্য।

মীররে সঙ্গে পদ্মিনী যখন কথোপকথনে রত তখন সেই পূজাপ্রাঙ্গণে মুসলমান সৈন্যরা এসে হিন্দু দেবী কালিকা সম্বন্ধে অনেক কৌতুককর উক্তি করে—কতকটা বঙ্গে রাঠোর নাটকের অনুরূপ। পদ্মিনীর সংলাপে কিছু প্রকৃতি বর্ণনা—বিশেষ করে সন্ধ্যার প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্ণনায় নাট্যকারের কবি প্রকৃতি প্রীতির প্রকাশ ঘটেছে। ক্ষীরোদ নাট্যে মাঝে মাঝে এই প্রকৃতি বর্ণনার বিশেষত্ব চোখে পড়ে।

আলাউদ্দীনের সৃজনীমূলক সংলাপের নমুনা—'বল দেখি কুমারী বিয়ে করা ভাল না বিধবা বিয়ে করা ভাল। লোকে যা করে ঠিক তার উল্টো - না হলে কিসের আলাউদ্দীন। সুতরাং আমার বিধবা বিয়ে করা উচিত।' আলাউদ্দীন খামখেয়ালী রাজা—নাট্যকার সে কথা ভোলেন নি তা জানিয়ে দিয়েছেন মাঝে মাঝে। বাদলকে বশ মানাবার ব্যর্থ চেষ্টায় সম্রাটের সংলাপ উপভোগ্য ও নাটকীয়।

সমর আয়োজন প্রসঙ্গে দেশপ্রেমমূলক সংলাপের কিছু কিছু অংশ উল্লেখ্য। যুদ্ধ জয়ের কৌশল-কথা বাদশার সংলাপে। এখানে শঠতায় আলাউদ্দীন প্রায় আলমগীরের সগোত্র। 'শশক ছোটে তার প্রাণের জন্য। কুকুর ছোটে তার মনিবের মনতুষ্টির জন্যে। এই দুই ছোটাতে কত প্রভেদ। কুকুর শশকের সঙ্গে ছুটতে পারবে কেন? রাজ্য জয় করতে হলে বিশ্বাসঘাতক হওয়া চাই। ঈশ্বরের নিজের হাতে রচিত দুনিয়াতেই শয়তানের বাস'। একদিকে যেমন গোরা বাদলের মত দেশহিতৈষী, ঠিক তেমনি তার পাশেই স্বদেশদ্রোহী নীচাশয় পাঠানপতি, রাণার সৌভাগ্যে ঈর্ষাকাতর। আলাউদ্দীনের কূটনীতির প্রয়োগের মাধ্যমে ঐতিহাসিক সব রকম উপাদান সংগৃহীত।

পাঠানপতির অসাক্ষাতে তার বিশ্বাসঘাতকতাকে কি সুন্দর ধিক্কার দিয়েছে আলাউদ্দীন—' দিল্লীর চিড়িয়াখানায় যতদিন না তোমায় পুরতে পারছি ততদিন আমার আমোদ হচ্ছে না। তোমার মতন ভাঁড় রাজা চিড়িয়াখানায় বাস করারই যোগ্য।"

উজীরের আক্ষেপ—তার কন্যা অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে এক প্রাণহীনকে বরণ করেছে—একটা সোনার দেশকে ছারখার করতে চলেছে। নসীবন আলাউদ্দীনকে আজ পর্যন্ত চিনতে পারল না—আসলে সে কি! বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সে কখনও দেবতা, কখনও শয়তান, কখনও মানুষ।' সে যে কি এখনও আমি বুঝতে পারছি না।

আলাউদ্দীন অশেষগুণের অধিকারী—সে শক্তিমান। উজীর কর্তৃক আলাউদ্দীন ও রাণার চরিত্র বিশ্লেষণ অল্প কথায় অপূর্ব।

পাঠানপতিকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গোরার ধারালো সংলাপ উপভোগ্য-'তুমি যতকাল পারো বেঁচে থাকো, তোমার জন্যে যে নরক তৈরি হবে তার কারিগর এখনও দেবলোকে সৃষ্টি হয়নি।

কমলা প্রসঙ্গে নসীবন ও সম্রাটের মধ্যে সংলাপ নাটকীয় সৌন্দর্য্যে সুষমা-মণ্ডিত।

আলাঃ—ও ফুলটি বাদশার বাগানেই শোভা পায়—

নসীবন : - ও কীটদ্রষ্ট ফুলের মুখে আগুন দিলে বাগানের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

আলাউদ্দীনের কিছু কিছু হৃদয়াবেগের কথাও সংলাপের মাধ্যমে ধরে রাখতে চেয়েছেন নাট্যকার। 'নসীবন, তুমি কাঁদছো? মুখ ফেরালে যে!··· ও······ আমার মুখ দেখবে না? সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা নিয়ে আমাকে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে দুদণ্ড নিশ্চিন্ত হয়ে কাঁদবারও অবকাশ পাই না। কাঁদলে মানুষের হৃদয় প্রশস্ত হয়। কাঁদতে পারি না তাই প্রশস্ত হৃদয় সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে।'

নসীবনের কথার উত্তরে আলাউদ্দীন চমৎকার দর্শনের কথা শুনিয়েছে। 'শয়তান না থাকলে এতদিন স্বর্গের খুঁটি আলগা হয়ে যেত।' দুনিয়াটা একটা বিরাট রহস্য গোল বটে, সম্পূর্ণ গোল নয়। তার ভেতর সর্বাপেক্ষা বিচিত্র রহস্য তুমি ও আমি। বাগান সাজাতে হলে ও রূপ দু দশটা না হলে চলবে কেন? একটি এনেছি আর একটি আজ আনছি। দ্বিতীয় কুসুমলতা চিতোরের রাণী পদ্মিনী।'

নাটকে হৃদয়বৃত্তির উত্তাপ যে মাঝে মাঝে অনুভূত হয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় রুক্সার সংলাপে—'আমার জন্যেই তোমাকে এই অপমান সহ্য করতে হল। আমি হতভাগ্য, তোমাকে সেদিন যদি সঙ্গে করে না আনতুম।' রুক্সার পিতা রাহুলের সংলাপে উদ্দীপনার বাণী নাটকে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার প্রচেষ্টায় সার্থকতা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। 'সাহায্য নেয় নি, তাতে কি—তাতে অভিমান কি? জন্মভূমি ত রাজার একার নয়। জন্মভূমি রক্ষা করা রাজা প্রজার সমান অধিকার। যুদ্ধের প্রয়োজন হয় আমার ত আত্মীয় স্বজন আছে। তাদের আমি ডেকে দি। দেশের জন্যে প্রাণ দিলে যদি তোমার অপমানের প্রতিশোধ হয়, এসো আমরা সবাই মিলে তোমার জন্যে প্রাণ দিই।'

আলাউদ্দীনের মুখে এমন অনেক সংলাপ আছে যা সহজেই দর্শকদের উদ্দীপিত করে- ভাগ্যে আমি নিষ্ঠুর হয়েছিলুম। ভাগ্যে শক্তিমান জেদী ক্রুর হয়েছিলুম, তাহাতে জগৎ অপূর্ব দৃশ্য কল্পনায় চক্ষুকে সার্থক চরিতার্থ করল। আমার দেহের ধ্বংস হবে- "আমার খিলজী বংশের বিলোপ হবে, কিন্তু এই জাতিটাকে চিরদিনের জন্য জীবিত রেখে গেলুম তাতে আমার অনুতাপ করার কি আছে:"

॥ চাঁদবিবি ॥

চাঁদবিবি নাটকের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র চাঁদবিবি ইতিহাসের পাতায় চাঁদ-সুলতানা নামে সুপরিচিতা। নাটকে শত্রুসেনার সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে বীরাঙ্গনার মত আত্মবিসর্জন দানের কাহিনীই মূল উপজীব্য। আহমদনগরের বিলাসী সুলতান ইব্রাহিম্‌ এর নিষ্ক্রিয়তার ও ভোগ-উম্মত্ততার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল সুচতুর ও কূটনৈতিক ওমরাহগণ। এরা সবাই মিলে সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ষড়যন্ত্রের অনিবার্য পরিণতি অন্তর্বিরোধ এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের আবাহন। এই ষড়যন্ত্র এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের ব্যাপারে আমরা ওমরাহ স্থানীয় তিনটি চরিত্রের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছি। এর মধ্যে মিয়ানমঞ্জু, ইব্রাহিম শার উজীর সবার মধ্যমণি। তাকে ঘিরে আরো দুটি চরিত্র হাবসি সর্দারদ্বয় এখলাস খাঁ ও নেহাত খাঁ। মোঘলের আক্রমণ, চাঁদ সুলতানার আত্ম-বিসর্জন, সুলতান ইব্রাহিমের বিলাসিতা ও ভোগ-উম্মত্ততার সুযোগে ওমরাহ ও সর্দারের অন্তর্বিরোধ ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার ঘটনা সব কিছুই ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যেই নাটকে সুবিন্যস্ত না হলেও মোটামুটি স্বকীয়তায় আত্মপ্রতিষ্ঠিত। চাঁদ-সুলতানার বীরত্ব মহিমার কথাও ইতিহাসে স্বীকৃত।

মূলকাহিনীর নাট্যরূপে নাটকের কাহিনী বিস্তারের সঙ্গতি ও পারম্পর্য রক্ষার অনুকূলে কাহিনীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন স্বাভাবিক কিন্তু সে পরিবর্তন সর্বদা ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলের মধ্যে ঘটাই বাঞ্ছনীয়। কয়েকক্ষেত্রে তা না ঘটার জন্য ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও নাটকটি ঐতিহাসিক কি না মনে প্রশ্ন জাগে।

এরূপ হওয়ার প্রধান কারণ ঐতিহাসিক কাঠামোর মধ্যেও নাট্যকারের স্বভাব-সুলভ রোমান্টিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রয়াস। দ্বিতীয় কারণ যুগধর্মের দুর্নিবার প্রভাব—স্বদেশপ্রীতির আবেগ প্রসূত সচেতন দেশাত্মবোধ—যার ফলে ঐতিহাসিক নাটকে আধুনিক যুগচেতনা—নাটকের ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল থেকে বিচ্যুতি। নাটকটির বিভিন্ন অঙ্কের বিভিন্ন দৃশ্য—পরিক্রমায় দেখা যাবে কয়েকটি হিন্দু মোসলেম চরিত্রকে স্বদেশপ্রাণ করে তোলা হয়েছে এবং তারা বিদেশী শাসনের ও শোষণের প্রতিবাদে অনৈতিহাসিকভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

নাটকের দুটি প্রধান চরিত্র চাঁদবিবি ও যশোদার প্রধান্য এই হিসাবে নাটকটির কাহিনী বিস্তারে এবং নিয়ন্ত্রণে বহুলাংশে নিজেদের জড়িত করেছে। শুধু জড়িত হওয়া নয়—দর্শক কিংবা পাঠক পাঠিকার শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিস্ময় আকর্ষণ করার ব্যাপারেও চরিত্র দুটি তাদের চরিত্র মাহাত্ম্যের গুণে সার্থকতা লাভ করেছে। অবশ্য চাঁদবিবি চরিত্রটি তুলনামূলক বিচারে অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছে সঙ্গত কারণেই।

এই দুটি চরিত্র চিত্রণে প্রথমেই বিচার্য নাট্যকার কতখানি ঐতিহাসিক নিষ্ঠার নিদর্শন রাখতে পেরেছেন বা রাখার চেষ্টা করেছেন।

এ সম্পর্কে নাট্যকারের বিরুদ্ধে একটি স্বীকৃত অভিযোগ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রচলিত মতে দুটি প্রধান চরিত্রচিত্রণে নাট্যকার ঐতিহাসিক সত্যকে উপেক্ষা করেছেন এবং উৎকটভাবে কল্পনা বিলাসিতার পরিচয় দিয়েছেন।'

"বিবাদমান উজীর ওমরাহের কলহ মিটাইতে চাঁদসুলতানার আকস্মিক আবির্ভাব পরীরাণীর মতো। বিজাপুর ও আহমদ নগরের রাজধানী দুই রাজ্যের সীমারেখার এপার ওপারে অবস্থিত নয়। সুতরাং আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না যে অপরাহ্ণে মৃগয়ার ছলে অশ্বারোহণ করিয়া চাঁদসুলতানা কি করিয়া পিতৃরাজ্যে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং তাহা আসিলেনও সবার অজ্ঞাতে। দুই বিবদমান ওমরাহের ঠিক বিবাদ মুহূর্তে আকাশ হইতে হঠাৎ খসিয়া পড়া চাঁদের মতো গৃহ-মধ্যে তাহার আকস্মিক আবির্ভাবের মন্ত্রশক্তিতে মুগ্ধ ওমরাহ ইন্দ্রজালাভিভূতের ন্যায় এক নিমিষে নিজেদের দ্বন্দ্বাভিমান বিসর্জন দিল। আবার চাঁদসুলতানা স্বামীর রাজ্যে প্রস্থান করিলেন, রাত্রি প্রভাত হইবার অবকাশ পাইল না। আমরা পবননন্দন হনুমানের গন্ধমাদন আনয়নকে বিশ্বাস করিতে পারি, পরীরাণীর পক্ষীরাজ ঘোড়াকেও মানিয়া লইতে আপত্তি করি না; কিন্তু ঐতিহাসিক চাঁদ-সুলতানার এই কার্যকে মানিয়া লইবার যুক্তি খুঁজিয়া পাই না।"৩৪

এই যুক্তি মেনে নিয়েও নাট্যকারের স্বপক্ষে বলার এই যে এর দ্বারা মূল ঘটনার হেরফের হয় নি। নাট্য প্রয়োজনে চমকসৃষ্টি ও প্রাচীন যাত্রার প্রবাহমানতার প্রভাবে চাঁদবিবি নাটকে উল্লিখিত অবাস্তবতা ও আকস্মিকতার ঘটনা ঘটেছে। সুতরাং সেইভাবেই নাট্যবিচার করা হলে নাট্যকারের প্রতি সুবিচার করা হবে। তবে ঐতিহাসিক চরিত্রটির কার্যকলাপের পারম্পর্য রক্ষিত না হবার অভিযোগ অবশ্যই অসঙ্গত নয়।

যোশীবাঈ ওরফে যশোদা চরিত্রের আচার আচরণ ও ঐতিহাসিক নাটকের মোড়কে বহুলাংশে বেমানান বলে কিছু কিছু অভিযোগ রয়েছে। কৌশল, শক্তি, বুদ্ধি, কর্তব্যপরায়ণতা, ও ত্যাগে চরিত্রটি সবার সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

এক কৃষক বালিকা নিজের অসমসাহসিকতার গুণে রাজপত্নী হওয়ার সৌভাগ্য-মণ্ডিত হয়েছিল। চলন্ত অশ্বের আরোহীকে কৌশলে ভূতলশায়ী করা কিংবা বন্যবরাহকে হত্যা করা এবং তাকে শিকারে আগত রাজপুত্রের সামনে টেনে আনা—নিঃসন্দেহে তার অসমসাহসিকতার নিদর্শন। অনুসরণকারী বিপক্ষ সৈন্যের চুলের মুঠি ধরে ঝুলিয়ে বহুপথ টেনে আনা তার মত মারাঠি বীর মহিলার পক্ষে অসঙ্গত কিংবা অসম্ভব নয়। অসম্ভব যা তা হল যশোদার মত হিন্দু রমণীর পক্ষে অতর্কিত-ভাবে মুসলমান আমীরদের সামনে হাজির হওয়া এবং তাদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে

---

৩৪. বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা— ডঃ বৈদ্যনাথ শীল।

অবতীর্ণ হওয়া। মনে রাখতে হবে যোশীবাঈ (যশোদা) মধ্যযুগের পুরনারী, যদিও বীরাঙ্গনা তবুও মধ্যযুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যোশীবাঈ এর আচরণ কষ্টকল্পনার পর্যায়ে পড়ে এবং তা ঐতিহাসিক নাটকে রোমান্সের লঘু হাওয়া সঞ্চারিত করেছে। নগরে প্রান্তরে কাননে উপবনে রণক্ষেত্রে অন্তপুরে যশোদার যথেচ্ছ বিচরণ চরিত্রটিকে বহুলাংশে রোমান্টিক আবেষ্টনীর পরিমণ্ডলে অবাস্তব ও সঙ্গতিহীন একটি চরিত্রে রূপান্তরিত করেছে।

……নাটকটির বিভিন্ন দৃশ্যের বিশ্লেষণে কয়েকটি চরিত্রের সঙ্গতির প্রশ্ন বিচার করে দেখা গেছে সর্বত্র তা রক্ষিত হয়নি বা হওয়ার পথে অন্তরায় রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস, আকস্মিকতার শর্তপালন এবং কাহিনী বিস্তারের বা বিন্যাসের ত্রুটী কিংবা ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে কল্পনার সমন্বয়ের ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

হঠাৎ চাঁদসুলতানা কোথায় অন্তর্হিত হলেন তা জানার কৌতুহল এবং তাকে খুঁজে বার করার উদ্যম আদিলশাহের পক্ষে স্বাভাবিক—এবং তার প্রতিবিধানের প্রতিজ্ঞা—হয় তার চিরদিনের জন্য রাজ্যত্যাগ, না হয় চাঁদবিবির চিরতরে এ রাজ্যে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ—এতেও রাজকীয় সম্মান, সম্ভ্রম ও মর্যাদাবোধ সঙ্গতভাবেই সোচ্চার। চোরের মত রাজ-অন্তপুরে ভগিনী মরিয়মের সঙ্গে সাক্ষাৎকার—অনাটকীয় এবং ঐতিহাসিক নাটকের পক্ষে অত্যন্ত একটি লঘু ঘটনা বলে যে অভিযোগ তা যথার্থ নয়। ২য় অংকের ৫ম দৃশ্যে নিয়ে আলোচনার সময় তার উল্লেখ করা হবে। ছদ্মবেশে ধরা পড়ে এবং শেষে আত্ম-পরিচয় দিয়ে ভগিনী রাণী মরিয়মের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ইচ্ছায় রাজকীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে। বিজাপুরের সুলতানার এই ভুল, কাহিনী বিন্যাসে অবশ্য নাট্যকারের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বলে মনে হয়েছিল। কারণ বিজাপুরের সুলতানার এই ভুলই বিজাপুর ও আহমদ নগরের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনার ইন্ধনরূপে প্রতিভাত হয়েছে এবং এই যুদ্ধের ঘটনার প্রবাহে মোঘলের সঙ্গে ঐতিহাসিক সংঘর্ষের অনিবার্য প্রতিশ্রুতি রূপে দেখা দিয়েছে ও আহমদ নগরের পতন ইতিহাসের পাতা থেকে নাটকে পুনর্বাসন ঘটিয়ে নিয়েছে।

এই নাটকে মোটামুটিভাবে যে দুটি অভিযোগ প্রচলিত এবং স্বীকৃত তা হল অন্যান্য কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটকের মত এটিতে ইতিহাসের রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে রোমান্সের অনুপ্রবেশ ও কয়েকস্থানে কল্পনার আতিশয্যে ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতি। প্রথম অভিযোগটিকে নাট্যকারের নাট্যরীতি ও প্রবণতার পর্যায়ে ফেললে সহজেই তার ব্যাখ্যা করা চলে। দ্বিতীয়টি আংশিক সত্য হলেও ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতির চেয়ে কল্পনার মেঘে ঐতিহাসিক তথ্য বহুস্থানে আচ্ছন্ন, স্পষ্ট উদ্ভাসিত নয়—এইটেই ক্ষীরোদপ্রসাদের চাঁদবিবির মত আরো কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক সম্বন্ধে বোধ হয় সবচেয়ে সঙ্গত ও শোভন মন্তব্য।

মল্লজী, উজীর ও হাবসি সর্দারের মধ্যেকার বিবাদ ও অন্তর্দ্বন্দ্বকে ভয়ের চক্ষে দেখেছেন এই জন্যে যে মদ্যপ রাজা ইব্রাহির নির্বিকার। নাটকের সূচনায় মল্লজীর এই দেশাত্মবোধ নাট্যকারের সচেতন প্রয়াসের ফলশ্রুতি।

'হাতে হাতিয়ার-বনের দিকে আসতে আসতে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। অজ্ঞাত-কুলশীল স্ত্রীলোকের সন্ধানে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে ছুটলে রঘুজী।' এখানে নাটকীয় আকস্মিকতা ও সাসপেন্স সৃষ্টির প্রয়াস, বীরাঙ্গনা যশোদার আত্মপ্রকাশের ইঙ্গিত। দার্শনিক সংলাপের অজস্রতায় নাট্যাবর্ত সৃষ্টির প্রয়াসও নাটকে লক্ষণীয়। রঘুজী যশোদার হাতে বন্দী হয়ে মল্লজীর গোলামী করতে চেয়েছেন। সংলাপ এখানে সুষমামণ্ডিত কিন্তু কাঁচের পেয়ালা একবার ভাঙ্গলে আর জোড়া লাগে না যে। রঘুজীর ভাষায় 'গলিয়ে নিলে তো আবার নতুন পেয়ালা হয়।'

চাঁদবিবির আকস্মিক আবির্ভাবে দুই বিবদমান সর্দারের চৈতন্যোদয় হয়েছে। 'তোমাদের বাড়ীর দোরে শত্রু আর তোমরা আপনা আপনির ভেতর বিবাদ করে বৃথা সময় নষ্ট করছো।' কাহিনী গ্রন্থনের সূত্র ধরে এই ঘটনাটিকে বাস্তবতার মর্যাদা দেওয়া কষ্টকর হয়ে ওঠে। চাঁদবিবির ভাষায় তিনি ভিখারিনী। প্রীতিভিক্ষা করতে এসেছিলেন, পেলেনও।' বিপদের খবর না দেওয়ায় চাঁদবিবির অনুযোগে যশোদার উত্তর লক্ষণীয় 'বিপদ যেমন জেগেছিল, বিপদবারিণী অমনি ছুটে এসেছে।' এখানে চাঁদবিবি চরিত্রে দেবত্ব আরোপ-আধ্যাত্মিকতার সুস্পষ্ট স্পর্শ-ঐতিহাসিক চরিত্রের যথার্থ বিকাশে বাধার সৃষ্টি করেছে। চরিত্রটিতে আধ্যাত্মিকতার প্রলেপ আরো আছে-ফটকে ঢুকে নেহাঙকে শুনতে হয় সে নাকি বন্দী। নেহাঙের পাল্টা সংলাপ-শৃগাল বন্দী হতে পারে, সিংহ জীবন থাকতে কারো কাছে বন্দী হয় না। রঘুজীর সময়োচিত রসাত্মক মূল্যবান উক্তি মনে রাখার মত। সিংহ কি জালে পড়ে না। বিশেষতঃ সিংহবাহিনী যখন পিঠে শ্রীচরণের চাপ দেন, তখন সিংহ মিয়ার লেজ নাড়া ভিন্ন আর গতি থাকে না।' কিছুক্ষণের মধ্যেই কল্পিত সিংহবাহিনী চাঁদবিবির উপস্থিতিতে নেহাঙ খাঁ বিস্মিত। চাঁদবিবির উপস্থিতি আগাগোড়া যেন আচমকা কুহকের সৃষ্টি ক'রে একে একে এখলাস মিয়ানমঞ্জু এবং নেহাঙ খাঁ-সবাইকে আকৃষ্ট করেছে। এখলাসের সার্থক মন্তব্য আমরা এক কারাগারে একই উপায়ে সবাই বন্দী-একই শৃংখলে বন্দী।

'বিরুদ্ধ শক্তি স্ববশে এসে দেশের কাজে নিযুক্ত হ'ল।' এ দৃশ্যে ইতিহাসের ব্যক্তিত্বময়ী চাঁদসুলতানা স্বমহিমায় অধিষ্ঠিতা—যদিও একটি ঐতিহাসিক চরিত্রের পক্ষে উল্লিখিত অলৌকিক পর্যায়ের কার্যকলাপ প্রশ্নাতীত নয়।

আদিলশার সঙ্গত অনুমান মা (চাঁদবিবি) মরিয়মের সঙ্গে দেখা না করে কখনই আসতে পারবেন না। সুতরাং রাত্রেই ফেরার প্রশ্ন অবান্তর। আদিলশার ক্ষোভ বিজাপুর রাজ্যের গর্বিত মস্তক আজ অবনত হ'ল। অনাহূতা ভিখারিনীর ন্যায়

আমেদনগরের রাজগৃহে বীর আদিল—আকবরশার পত্নী মাতৃস্বরূপিণী চাঁদসুলতানা। 'ঐ শোন আমেদনগরের হাটে বাজারে আবার বংশের কলঙ্কবাহী কলরব।' কিন্তু আদিলশার এই উক্তিটির পূর্বে তার আর একটি উক্তি লক্ষ্য করলেই আদিলশার সংলাপ, তার চরিত্র প্রভৃতির অসঙ্গতি ধরা পড়বে।······কাজ করতে করতে এক এক সময় মরিয়মের জন্যে আকুল হয়ে উঠি। তখন মনে হয় মান অভিমান বিসর্জন দিয়ে ভিখারীর বেশ ধরেও যদি ভগিনীর আবার দেখা পাই তাহলে ভিখারী সেজেও তাকে একবার দেখে আসি। আদিলশার পরস্পর—বিরোধী সংলাপ তাই তার আপাত আত্মমর্যাদাজ্ঞানকে হাস্যকর করে তুলছে। শেষ পর্যন্ত আদিলশার এই গোপন বাসনা, সহোদরার প্রতি আত্যন্তিক প্রীতি, তাকে চোখে দেখার অদম্য কৌতুহলই বিয়োগান্ত নাটকীয় বিষাদময় পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। আমেদনগরের পথে ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার সময় আদিলশা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে গেল-' মাকে বিজাপুরে ফিরতে নিষেধ করে আসবো। 'রাণী ফেরেন তো আমি ফিরবো না, আমি ফিরিতো রাণী ফিরবেন না।' এই দৃশ্যে আদিলশার সংলাপ (পূর্বোদ্ধৃত) পরবর্তী ঘটনার পূর্বাভাষ বলা যেতে পারে এবং এতে নাটকের শর্ত পালিত হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে। খতিজা ও মল্লুর ছোট ছোট সংলাপ বহুলাংশে আধুনিক। চরিত্রানুযায়ী কথাগুলি সহজ, সরল এবং অনাড়ম্বর। খতিজা মল্লুর কথোপকথনে আদিলশা আমেদনগর রওনা হয়েছে এ সংবাদ গোপন রাখার চেষ্টায় হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে। খতিজা চরিত্রের উপস্থিত বুদ্ধি মরজিনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বস্তুতঃ মরজিনার সংলাপ এর প্রভাব খতিজার সংলাপ শুনলেই বোঝা যায়।

মরিয়মের কথা স্মরণ করে 'চাঁদবিবি' অভিভূতা হয়ে যান। তার সংলাপ শুনে মনে হয় যেন গদ্যকাব্য শুনছি। মরিয়মের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে আসার বেদনা তাকে অন্তর্দাহে পীড়িত করে। এরপর অতীত ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে চাঁদবিবির দীর্ঘ সংলাপে চাঁদবিবির ব্যক্তিত্ব, দায়িত্ববোধ প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

তৃতীয় দৃশ্যে আদিলশার ছদ্মবেশের সুবাদে নাট্যকার একটি রোমাণ্টিক পরিবেশ সৃষ্টির সুযোগ করে নিয়েছেন। এই পর্যায়ে ছদ্মবেশী আদিলশাহের সঙ্গে রমণীদের কথোপকথন বেশ উপভোগ্য। শেষ পর্যন্ত আদিলশাকে আত্মপ্রকাশ করতেই হল। দীন ছদ্মবেশে ভগিনী মরিয়মকে দেখার অভিলাষ ত্যাগ করতে হয়েছে। নাটকের পরবর্তী সমস্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে মরিয়ম এর প্রত্যাখ্যান এবং আদিলশার প্রতিজ্ঞার সংঘাতে। আদিল বাহাদুরের উদ্দেশ্যে—তোমার মাকে জানিয়ে রেখো, এর পরে যদি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন তোমার মাতা আমার বন্দিনী, তোমার পিতা আমার বন্দী।

নাট্যলক্ষণ অনুযায়ী এই উক্তিই নাটকীয় ট্রাজিক পরিণতির পূর্বাভাষ। মরিয়ম

নিজেও তাই অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত "যোশী, যোশী, তুই দয়া করে বল, আমি কি করলুম ?" কিন্তু এ প্রত্যাখ্যান একদিকে যেমন পরবর্তী ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তেমনি অন্যদিকে মরিয়মের আচরণ তার চরিত্রটিকে মহিমমণ্ডিত করেছে। নাটকের এই দৃশ্যের আদিলশার শেষ সংলাপ এবং মরিয়মের আগাগোড়া সংলাপ রাজকীয় মর্যাদা ও গাম্ভীর্যে মণ্ডিত। চরিত্র-চিত্রণ এখানে সার্থক।

পরে দেখা গেছে মিয়ামঞ্জু আবার ষড়যন্ত্রে সক্রিয়। কাহিনী বিন্যাসের গুণে ছদ্মবেশী আদিল সম্বন্ধে তার ধারণা নিশ্চয়ই বিজাপুরের সঙ্গে মিলিত হয়ে মল্লজী তাদের উৎখাতের চেষ্টা করছে। দীর্ঘ স্বগোতোক্তির মধ্যে তার আত্মধিক্কার সুন্দরভাবে প্রকাশিত, তবে সংলাপের দৈর্ঘ্য কম হলে ভালো হত।

এখলাস সরল অথচ নির্বোধ। পরের কথায় সহজে উত্তেজিত হয়, একের পর ভুল করে যায়। কিন্তু তার দেশাত্মবোধ অবিসংবাদিত।—'সে মীমাংসা পরে, আগে বিজাপুরের আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করুন। ভোঁসলে সাহেবের বিচারের প্রয়োজন হয় পরে করবেন।'—শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছুক মিয়ানমঞ্জুর ভাষায়—এতো দেখছি ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে মল্লোজীরই বল বৃদ্ধি করে দিলুম। মিয়ানমঞ্জুর অন্তর্দ্বন্দ্বও লক্ষণীয়। ক্ষীরোদনাট্যে এরূপ অন্তর্দ্বন্দ্বের পূর্বাভাষও উল্লেখযোগ্য। অন্যের দ্বারা বহু আলোচিত চরিত্র অন্যতম নায়ক ইব্রাহিমকে দেখা যায়—মদ্যপ, মোসাহেব পরিবেষ্টিত, আমোদে আত্মহারা উদাসীন রাজারূপে। মোসাহেবদের ছোট ছোট সংলাপ উপভোগ্য। উক্তিগুলি মোসাহেবোচিত সার্থক উক্তি এবং তাদের চরিত্র তাদের সংলাপ দ্বারা সুষ্ঠুভাবে বিকশিত। কয়েকজনার চরিত্রে দেশাত্মবোধ সুস্পষ্ট। ফয়জানের দেশাত্মবোধক শাণিত সংলাপ শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসু হয়েছে—দেশের দুর্দিনে রাজার ঘুম ভেঙ্গেছে। ঘুম ভাঙ্গার পর ইব্রাহিমের সংলাপে গভীর জীবনবোধ এবং সদ্য আহৃত অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মল্লজী যখন বলল, 'আপনার গৃহরক্ষার ভার নিয়ে আপনার পরম সুহৃৎ বিজাপুর রাজের সঙ্গে তো বিরোধ বাঁধিয়ে বসেছি। এখন কি করবো আদেশ করুন।' ইব্রাহিম চরিত্রের সার্থক প্রকাশ ঘটেছে তার সংক্ষিপ্ত সংলাপে—'যদি মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করো, যুদ্ধ দাও, যদি মমতার দিকে লক্ষ্য করো মিটিয়ে ফেল।' এ উক্তি ঘুমন্ত মদ্যপ রাজার নয়, গভীর জীবন-দর্শনাভিজ্ঞ সচেতন বুদ্ধিমান কোন ব্যক্তির কথা। চরিত্রশতদলের এক একটি পাপড়ি যেন বিকশিত হতে চলেছে। পরবর্তী সংলাপ একটি নির্দেশ—তাতে নায়কোচিত দৃঢ়তা—'আজি রাত্রি প্রভাতে আমি ভীমা নদীর এপারে সমস্ত আমেদনগরী সৈন্যকে সুসজ্জিত দেখতে চাই।' যশোদার অনুরোধে মরিয়মের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। এ বিপদের মধ্যেও রাজার রসবোধ জাগ্রত। 'এস সহচর, যশোদা সুন্দরী। সেই নীরব বিচারকের এজলাসে এই উদ্ধত অপরাধীকে পেয়াদা স্বরূপ হয়ে একবার

হাজির করবে এস।'—এ সংলাপে স্নিগ্ধ প্রশান্তি ও পরিমিতিবোধের চিহ্ন কেউ দেখতে না পেলে, কিছু বলার নেই।

তীর্থযাত্রীর বেশে আগত ইব্রাহিমকে দেখে অচেনা ব্যক্তি বলে চিৎকার করে উঠেছে মরিয়ম, অথচ স্বর শুনেছে সে এক মনে, প্রতিবাদ করেনি। মনে হয়েছিল যেন সে স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু চোখ মেলে দেখেছে যেন এক অচেনা লোক। এখানে নাট্য নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়—প্রয়োগরীতি এবং পরিবেশরচনা ও উল্লেখযোগ্য মানে পৌঁচেছে।

যশোদা সত্যিই নর্ম ও মর্মসহচরী। মরিয়ম যখন দীর্ঘ অদর্শনের পর ইব্রাহিমকে পেয়ে বিহ্বল হয়ে গেছে যশোদা তখন তাকে সজাগ করে দেয়—সংযত হতে বলে। 'মর্ম পীড়িতা বিরহিনী : তোমার প্রাণে কি একটুও অভিমান জাগল না রাণী : রমণীর হৃদয় কি এতই সুলভ ?' অবশ্য যশোদার এ ধরনের সংলাপে ঔচিত্য অনৌচিত্যের প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে। ইব্রাহিম সব অবগত। মরিয়মকে আর বলতে হয় না। 'নিজামশাহীর কুলবধূ। তুমি আজ শ্বশুর বংশের মর্যাদা রাখতে ভ্রাতৃস্নেহ বলি দিয়েছ।'—এই অংশে ইব্রাহিম চরিত্র আবেগপ্লুত দীর্ঘ সংলাপের দ্বারা তরলায়িত। মরিয়মও নিজ হাতে স্বামীকে সাজিয়ে দিতে চেয়েছে। এ আচরণ চরিত্রানুগ, সঙ্গত।

চতুর্থ অংকে : ।।। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নাটের গুরু মিয়ানমঞ্জুর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে আবার জড়িয়ে পড়েছে এখলাস খাঁ। কিন্তু এখলাস চরিত্রের ইচ্ছা অনিচ্ছার দ্বন্দ্ব আদৌ প্রতিভাত হয়নি—ক্ষীণ দ্বিধাই শুধু বর্তমান থেকেছে।

চাঁদসুলতানার কাছে আদিল শা আত্মসমর্পণ করেছে। আদিলের ভাবসম্পদশালী সংলাপে দীনবন্ধু মিত্রের নবীনমাধব ও অন্যান্যদের সংলাপরীতির স্পর্শ আছে। 'তোমাকে তিরস্কার। ভাষা কোথায় পাবো মা। ভাষা কোথায় পাবো মা! প্রশংসা ও তিরস্কার পরস্পর শব্দ বৈচিত্র্যে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে দণ্ডায়মান। মধ্যে বিস্ময়বিপন্ন জ্ঞান-শূণ্য আমি। আদিলশাহী বংশের মর্যাদা রাখার জন্যে, মমতাময়ী, তুমি হৃদয় থেকে মমতাকমল ছিঁড়ে ভূমিতে নিক্ষেপ করেছ।······মধুময়ী মধুযামিনীর সর্বসন্তাপহারিণী কৌমুদী কি করে নিদাঘের রবিরশ্মিতে পরিণত হল ?······

···চাঁদবিবির পরবর্তী সংলাপ নাটকটিকে কারুকার্যমণ্ডিত করেছে। 'প্রেম চিরদিনই প্রেম। নবকাদম্বিনীর সলিলাঞ্জলি মৃত্তিকায় পড়ে পঙ্কিল হয়। প্রেমের নিন্দা কোরো না রাজা, অদৃষ্টের নিন্দা কর।'

পরবর্তী দৃশ্যে যশোদার উক্তির মধ্যে পুরাণকাহিনীর প্রভাব আছে। ইব্রাহিম শার কাছে বীর রমণীর মত নিজের স্বামীর জীবন উৎসর্গ করতে যশোদা কুণ্ঠিতা নন। 'গ্রহণ করুন, আমার স্বামীর জীবন আপনার মঙ্গলার্থে অঞ্জলি

প্রদান করি। কিন্তু এতবড় ত্যাগের দৃশ্যে আদর্শবাদের কাছে প্রেম মায়া প্রভৃতির আকর্ষণজনিত অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। এইদিক দিয়ে যশোদা দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ মহীয়সী রমণী বলে আদৃতা হলেও এ চরিত্রে আধুনিকতা কম। কিন্তু এ উক্তিও বোধহয় সঙ্গত হল না। ইব্রাহিমের একটি সংলাপ উল্লেখ্য—'প্রেমময়ী অথচ কঠোর কর্তব্যপরায়ণা সহধর্মিণী ক্ষত্রিয় অন্তঃপুরের ভূষণ।' এরপর মালোজীর বিদায় সম্ভাষণ। যশোদার চোখে জল, তাই চোখে আঁচল দিয়ে সে জল লুকোবার চেষ্টা। বিয়োগান্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস বহুলাংশে সার্থক। তবে সংলাপমালা আর একটু সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত ছিল।

বিজাপুরসেনাপতি হামিদের সৈনিক জীবনের নির্মম কর্তব্য-পরায়ণতা সুন্দর-ভাবে ফুটে উঠেছে তার সংলাপের মাধ্যমে। আদিলশার অনুরোধে মালোজীকে সে রক্ষা করতে পারে না। কারণ এ সংগ্রামে 'বন্ধুত্বকে বলি দেওয়া। অপমানের শোধ নিতে এসেছি। সৈনিকের কঠোর কার্য—আত্মীয়-স্বজন এমন কি পুত্র সম্মুখীন হলেও সৈনিকের তরবারি নিরস্ত্র হয় না।' ইতিহাসে যাই বলুক আদিলশাও ইব্রাহিম এর মধ্যে যুদ্ধের কারণ যথেষ্ট নয়—ঘটনা পারম্পর্যে গ্রথিত অনিবার্য পরিণতিরূপেও পরিগণিত নয়। আদিলের অন্তর্দ্বন্দ্বও কিছুটা প্রকাশিত, তবে তা দীর্ঘ স্বগতোক্তির মূল্যে। অবশ্য তার ব্যাকুল বেদনার সার্থক অভিব্যক্তি ঃ —'জয়ে যন্ত্রণা, পরাজয়ে বিজাপুরের সমস্ত গৌরব অন্ধকারে ডুবে যাবে।'

হঠাৎ মালোজীকে রক্ষা করার জন্য সবার তৎপরতার ব্যাখ্যা মেলে না। এ ব্যাপারে বিজাপুররাজ এর আচরণ কতদূর রাজোচিত চিন্তার কথা। তার সংকল্প তার প্রতিজ্ঞা সব কিছু ভেসে গেল বন্ধুপ্রীতির দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে। চাঁদবিবিও হঠাৎ অভিভূতা ঃ তিনি নিজেই মালোজীকে উদ্ধার করতে চললেন। ঘটনার আকস্মিকতা নাট্য উপাদান যোগান দিয়েছে সত্য, কিন্তু নাটকে অসঙ্গতিরও কারণ ঘটিয়েছে। এখানে নাটকের ঘটনায় মোড় ঘুরেছে চারিত্রিক আবেগের প্রভাবে।

যুদ্ধে যাবার পূর্বে মরিয়মের সঙ্গে কথোপকথনে ইব্রাহিম যেন কবি দার্শনিক। তার সংলাপ রচনায় ক্ষীরোদপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়াতে পারেন নি।

রণক্ষেত্রে ইব্রাহিমের সঙ্গী হল কিশোর পুত্র বাহাদুর। রাজপুত রমণীর বীরত্বের কথা—আত্মাহুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় মরিয়মের উক্তি। 'প্রতীক্ষার শেষ আবর্ষণ ছিঁড়তে এসেছি। আপনি আপনার এই পুত্রকে সমরক্ষেত্রে সঙ্গী করুন।'

এই অংকের ষষ্ঠ দৃশ্যে—রঘুজীর সংক্ষিপ্ত সংলাপ রবীন্দ্রনাট্যের কিছু কিছু সংলাপের প্রতিধ্বনি তোলে। 'প্রাণ আমার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ শত্রু দিয়ে শত্রু তাড়াব।'……মিয়ানমঞ্জু দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। মল্লজীকে আর বোধহয় বাঁচাতে পারল না রঘুজী। তার সংলাপে নাটকীয় উদ্বেগ ফুটেছে চমৎকার।

নাট্যরস বিস্তারের ক্ষেত্রে এই উদ্বেগ সহৃদয় পাঠক দর্শক এর কানেও সঞ্চারিত হয়। (চাঁদবিবির উদ্দেশ্যে)—অভয়দায়িণী কি করলি মা? আসতে পারলি না। নৈরাশ্যের মধ্যেও আশার আলো, আশা-হতাশার দ্বন্দ্ব: প্রতীক্ষার বলিষ্ঠ উচ্চারণ —'সহজে প্রভুর ঘরে ঘাতক ঢুকতে দেবো না। যতক্ষণ প্রাণ, ততক্ষণ বাধা দেব।'

রঘুজী স্বাদেশিকতার যজ্ঞে পবিত্র আত্মাহুতি। তবুও মিয়ানমঞ্জুর সন্দেহ যায় না। 'একটা ফিবরু লোক মারতে একশো লোক জাহান্নামে গেলি: শুধু মরাই তোরা মারতে জানিস—তোদের আবার মুরদ কি?'

এরপর যেন রবীন্দ্রনাথের সংলাপ শুনতে পাচ্ছি। সৈনিক বলছে:—'সে এসেছিল দেশের জন্যে ম'তে, আমরা এসেছি মারতে। যে মরতে জানে তাকে মারে কে?'

নিজের মূর্খামিতে আদিল অনুতপ্ত। সুশিক্ষিত মাওয়ালী সৈন্য ধ্বংস করে খাল কেটে কুমীর আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'নিজের চরণ কেটে আমি দূরে বসে প্রতিবেশীর গৃহদাহ নিরীক্ষণ করছি।'

অকস্মাৎ তাজের আগমন এবং তার ছোট ছোট সংলাপ নাট্যরসকে দানা বাঁধতে সাহায্য করেছে। নাটকের গতিবেগকে সাবলীল করেছে। ছোট ছোট সংলাপ-গুলির সাহিত্যিক মূল্যও কম নয়। কিন্তু তাজের এই মুহূর্তে আগমন বাস্তবতা-সম্মত কিনা তা প্রশ্নাতীত নয়।

আদিল: গভীর সমরতরঙ্গে আমি ঝাঁপ দিতে চলেছি।

তাজ: বাঁদীও তো একটু আধটু সাঁতার জানে জাঁহাপনা।

আদিল: ……আমি মরণকে আলিঙ্গন করতে চলেছি।

তাজ: অবশ্য মরণ কিছু ছলনাময়ী উপনায়িকা নয় যে, বিজাপুর-রাজ গোপন পথে তার পত্নীর অলক্ষ্যে তাকে আলিঙ্গন করতে চলে যাবেন।

……এরপর পুনরায় নাটকীয় আকস্মিকতা—ঘটনার পটপরিবর্তনে নাট্যকারের স্বস্তি। অনাবশ্যক সংলাপের সমারোহ, নাটককে দীর্ঘ করার সচেতন প্রচেষ্টায় কাহিনী-জালের বিস্তার।

পঞ্চম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে একে একে বিয়োগান্ত নাটকের দৃশ্যসজ্জা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা এখানে মনে হওয়াই স্বাভাবিক! ইব্রাহিম মৃত্যুশয্যায়। দেশপ্রেম তার অন্তরে নতুনভাবে জাগ্রত। 'মাতৃভূমি ভক্তের শোণিত অঞ্জলি চায়—দিতে পার, দাও!' মুমূর্ষু ইব্রাহিমের সংলাপের ভাষা, বাক্য সব স্থানে সম্পূর্ণ নয়—এবং সেই কারণেই বাস্তবানুগ।

এদিকে মরিয়মও প্রায় নিশ্চিত—ইব্রাহিম বীরের শয্যা গ্রহণ করতে চলেছে। 'ফটক খুলে দে—পালঙ্কে শয়ন করে ফুল্লকুসুমে সজ্জিত হয়ে আমার হৃদয়রাজা পুরদ্বারে অতিথি:'……এখলাস খাঁও শেষ পর্যন্ত আত্মতৃপ্ত। 'এতক্ষণে পাপের

প্রায়শ্চিত্ত!······মোঘলের আক্রমণ ব্যর্থ করেছি······রাজার দেহ ঘরে এনেছি। লোককে মুখ দেখাতে এখন আমার লজ্জা কি?' মৃত্যু পথযাত্রী বীর যোদ্ধার স্বদেশ-প্রীতির আবেগাপ্লুত সকাতর প্রার্থনা—'জন্মভূমিঃ দাও মা, তোমার চরণপ্রান্তে অধম অপরাধী পুত্রকে একটু স্থান দাও।''

বিয়োগান্ত নাটকে সমগ্র ঘটনাস্রোতের জন্যে যে দায়ী তার অনুতাপ অনুশোচনা সহানুভূতি আকর্ষণ করে। 'যেন প্রতি বায়ুতরঙ্গ আমাকে তিরস্কার করে বলেছে, এই দাম্ভিক আদিল তার ভগিনীর সর্বনাশ করেছে। সে ভগিনীপতির জীবনহন্তা-স্বজনের ধ্বংসকারী।

নির্বাণোন্মুখ জীবনবহ্নির শেষ শিখা বালকবৃন্দই শেষ ভরসা। বালকদের রণগীতি সাহিত্যিক মূল্য-সমৃদ্ধ। নজরুলের চল্ চল্ চল্ গানের বাণীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

নাটকের অন্তিম লগ্নে মির্জা খাঁ ও মোরাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়েছে। বীজাপুরীর আক্রমণে বিপর্যস্ত মুরাদের খেদোক্তি, বীর শ্রেষ্ঠ আকবরের পুত্র ব'লে নিজেকে কি করে সে আর পরিচিত করবে। নাটকের সমাপ্তি পর্বে মুরাদের আত্মসমর্পণ ও আদিলের সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণ অনাটকীয়। ঘটনা সংস্থাপনের ধারাবাহিকতায় এ মিলন কিছুটা প্রত্যাশিত, অস্বাভাবিক এবং বহুলাংশে আরোপিত। মোঘল বহিঃশত্রু, তাকে প্রতিহত করাই স্বদেশভক্ত বীরের কর্তব্য। তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতেও কোন আপত্তি নেই, কিন্তু সে অভ্যর্থনা আলিঙ্গনে নয় নিশ্চয়ই।

মিয়ানমঞ্জুকে বিশ্বাসঘাতকের অপবাদ নিয়েই জীবনভার বইতে হবে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের নৈরাশ্য একদিকে দিয়ে জীবন-সত্য ও বটে। তাদের প্রতিষ্ঠা অর্জনের চেষ্টা চোরাবালির ওপরে।

শূন্য সিংহাসনের একটি উত্তরাধিকার প্রতীক্ষায় চাঁদবিবি তখনও জীবিত এবং জীবনভারে অবসন্না। সুতরাং মিয়ানমঞ্জুর তাকে আক্রমণের কোন প্রয়োজন ছিল না। মরিয়মের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে এল যশোদা।···কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনের শূন্যতা। তবু চাঁদবিবির ক্ষীণ আশা—শূন্য সিংহাসনে ভূপতি দর্শন। নেহাঙ খাঁ তার বিশ্বাসঘাতকতার ঋণশোধ করেছে রাজকুমার বাহাদুরকে জীবন্ত উদ্ধার করার পর মল্লজীর হাতে অর্পণ করে। এত বীর-শোণিতপাত, আবালবৃদ্ধ বণিতার উদ্যম······এই উজ্জ্বল আমেদনগরে···যদি সমস্ত বিফল হয় তাহলে সংসার দৈত্যের সৃষ্টি—ঈশ্বরের নয়। জয় রাজ্যেশ্বরের জয়।'—বীরের এ রক্ত স্রোত······ মাতার এ অশ্রুজল—রবীন্দ্রনাথ তুলনীয়।

নাটক শেষ করেছেন—নাট্যকার তাঁর স্বাভাবিক দুর্বলতার প্রলেপে সামঞ্জস্য ও মিলন প্রচেষ্টা চালিয়ে। বিয়োগান্ত নাটকে সান্ত্বনার বারিসিঞ্চনের মধ্য দিয়ে প্রীতির মিলনে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করার প্রস্তাব। বালক বাহাদুরকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার শপথ গ্রহন করলে মুরাদ। এইভাবে মৈত্রী ও প্রেমের বাণী প্রচারের কাজ সমাধা করলেন নাট্যকার।

॥ নন্দকুমার ॥

নাট্যকার-এর মূল অবলম্বন নন্দকুমার সম্বন্ধে কতিপয় কিংবদন্তী। নাটকটির কাহিনী বিন্যাসে এই কিংবদন্তী অনিবার্য বলে নাট্যকারের মনে হলেও নাটকটির মূল ঘটনা ইতিহাসাশ্রয়ী। নন্দকুমারের নির্ভিকতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা, বুদ্ধিমত্তা, তার নেতৃত্ব এবং প্রচ্ছন্ন দেশপ্রেম যা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ-নাটকে তা অনুপস্থিত নয়। নামকরণের সার্থক বিচারে ঐতিহাসিক চরিত্র নন্দকুমারই নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার সম্বন্ধে যে সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য সহজলভ্য তাতে তিনি যে একজন বিশিষ্ট ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ সম্পর্কে অন্ততঃ একটি উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। মুতাফরীনের অনুবাদক হাজী মুস্তাফা বলেন, ' নন্দকুমার এ সময় কখনও বা ক্লাইভের পক্ষ হইয়া রামনারায়ণকে বাঁচাইবার জন্য নবাবের কাছে গমন করেন আবার কখনও বা এই তিনজনের মধ্যে যাহাতে গাঢ় প্রণয় সংস্থাপিত হয় সেজন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছিলেন।"৩৫ ······'নন্দকুমার এই সম্মিলন ব্যাপারে বিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহাতে নবাব, কর্ণেল ক্লাইভ, ও রামনারায়ণ প্রমুখ প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ সকলেই তাহার অনুরাগী হন। এই সময় জনসাধারণের কাছে বিশেষতঃ ইংরাজ মহলে নন্দকুমারের প্রতিপত্তি বিশেষরূপে প্রসারিত হইয়াছিল। ক্লাইভ গোরাদিগের ভিতরে যেরূপ কর্ণেল ক্লাইভ বলিয়া অভিহিত হইতেন, ইউরোপীয় জনসাধারণের কাছে নন্দকুমার সেইরূপ কৃষ্ণকর্ণেল বলিয়া অভিহিত হইতেন।"৩৬ সেই হিসাবে নন্দকুমারকে মূলচরিত্র-রূপে দাঁড় করিয়ে সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও চরিত্রগুলির সঙ্গে তাকে যুক্ত করে নাট্যকার ঐতিহাসিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

নাটকে নন্দকুমারের বিয়োগান্ত পরিণতিতে হেস্টিংসের প্রধান ভূমিকা ঐতিহাসিক তথ্যের পথ ধরেই যথাযথভাবে উপস্থাপিত। নন্দকুমারের প্রভাব প্রতিপত্তিতে তার প্রতি ঈর্ষা ও নিজের দুষ্কৃতিতে আতংকিত হয়ে নন্দকুমারের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য নন্দকুমারের বিরুদ্ধে হেস্টিংসকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে বাধ্য হতে হয়।

নাটকটি স্টার থিয়েটারে অভিনীত হওয়ার পর এটির অভিনয় এবং পুস্তকটির প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। নাটকটি নিষিদ্ধ হওয়ার সম্ভাব্য কারণ—পরাধীনতার দুঃসহ জ্বালায় জর্জরিত দেশবাসীর মধ্যে এ নাটক উত্তেজনা ছড়াতে সাহায্য করবে। ইংরেজের কুকীর্তির স্মারক হেস্টিংসের আচরণ ইতিমধ্যেই ইংলণ্ডের মহাসভায়

৩৫. Seikh Muta Kherin Voll II

৩৬. Barwell's letter to his sister.

ধিকৃত হয়েছে। "গভর্নর হেস্টিংস নন্দকুমারের ফাঁসি চেৎসিংহের উচ্ছেদ, অযোধ্যার বেগমদিগের দুর্দশা প্রভৃতি অসংখ্য পাপলীলা সম্পন্ন করিয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে, বার্ক, সেরিডন প্রমুখ বাগ্মিগণ তাহার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের মহা সভায় গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত করিবার আয়োজন করেন।...হেস্টিংসের পাপ বোঝা পূর্ণ হইয়াছে, অতি দীর্ঘকাল অনুষ্ঠিত পাপকার্য্যের তখন বিচার হইতে আরম্ভ হইল।"৩৭ 'এসব অন্যায় ও পাপচরণের দৃষ্টান্ত নূতন করে দেশ প্রেমিকদের উস্কানি দিক এটা কোন বুদ্ধিমান কূটনীতিজ্ঞ সরকারই চান না—ইংরাজরাও চান নি—তাই গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কয়েকটি নাটকের সঙ্গে ক্ষীরোদ প্রসাদের নন্দকুমার, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত নাটক এবং দাদা ও দিদি প্রহসনটিকে নির্বাসন দেওয়ার সঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিল।'

যে নাটকে নাট্যকারের কল্পনার অবাধ বিচরণ, ইতিহাস যেথানে মোড়ক বা আবরণ মাত্র, এ নাটক সে নাটকের পর্যায়ে পড়ে না বলেই কিছুটা ঐতিহাসিক নক্সার আকারে বিধৃত। অবশ্য এ ব্যাপারে কিংবদন্তীগুলি নাট্যকারের স্বাভাবিক নাট্যকর্মের সহায়করূপে তার স্বাভাবিক সংলাপ এবং কাহিনী বিন্যাসের স্ফুরণ ঘটিয়েছে।

বপুদেব শাস্ত্রীর বাড়িতে আত্মগোপন, মীর-কাসিমের সঙ্গে সংঘর্ষ ও বিরোধের কারণ বর্ণনা দিয়ে নাটক শুরু। এই অংশে রাধাচরণের সঙ্গে কথোপকথন এর মাধ্যমে কাহিনী বিস্তারের প্রচেষ্টা অনাটকীয়। তবে রহস্যময়ী বপুদেব কন্যার আকস্মিক আগমনে চমক ও রোমাণ্টিকতা সৃষ্টির প্রয়াস প্রশংসনীয়।

প্রথম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে বাহারের আচম্বিত কণ্ঠস্বরে খিড়কির দোর দিয়ে একা প্রমোদার অন্তর্ধানরহস্য-নাটকের পর্যায়ে পড়ে। দুটি সিপাই এর আকস্মিক প্রবেশ ও প্রস্থান ও যেন নাট্য—ক্রিয়ার যাদুবিদ্যা প্রদর্শনীর সামিল। চৈতন্যচরণ তার কৃত্রিম অজ্ঞতার কাল্পনিক পরিমণ্ডলে কিছুটা হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে। কাহিনীগ্রন্থন ছাড়া এখানে আর কিছু বক্তব্য নেই। দ্বিতীয় দৃশ্যের সূচনায় বিধবা কন্যা প্রমোদার প্রতি বপুদেবের উপদেশ পাঠ্য-পুস্তকের প্রবন্ধের অংশ বিশেষ বলে ভুল হতে পারে। নন্দকুমার এর বিষয় উল্লেখ অবশ্য কাহিনী গ্রন্থনের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। শেষের দিকে বপুদেবের ভক্তি-রসাশ্রিত সংলাপ-'মা মা মা সর্বশক্তি-ধারিণী-চণ্ডিকে...এই যে এই যে কোথায় চলেছ শ্যামা'—ইত্যাদি উচ্ছ্বাসের আতিশয্যই প্রকাশ করেছে। পরন্তু ঐতিহাসিক নাটকের পরিবেশ নষ্ট করেছে। পরবর্তী দৃশ্যে রাজদ্রোহী বলে মীরকাসিম-পুত্র বাহার এর গ্রেপ্তারের জন্য নাটকীয় আয়োজন উপলক্ষে প্রমোদার উদ্বেগের মধ্যেও অন্য নাটকের মত ধর্মীয় ভাবনার প্রতি শ্রদ্ধা সোচ্চার।

প্রমোদা চরিত্রে দুঃসাহসিকতার নিদর্শন : বাহার প্রসঙ্গে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সে

---

৩৭. মহারাজ নন্দকুমার—সত্যচরণ শাস্ত্রী।

বলেছে—আপনার আশীর্বাদে যখন তীর্থ পেয়েছি তীর্থ ধরেই মরবো। প্রাণ থাকতে একে আর আমি ঘরে বসে হাতছাড়া করছি না। বাহারের প্রতি বাৎসল্য এখানে যেন স্বতঃ উৎসারিত। দ্বিতীয় অংক প্রথম দৃশ্যে-আমিয়েট সাহেবের অপমৃত্যু, অবিবেচনা-প্রসূত গোলমাল সৃষ্টি ও নবাবী সৈন্যের হাতে মৃত্যু প্রসঙ্গে হেস্টিংসের সঙ্গে মোহনপ্রসাদের আধা ইংরাজী আধা বাংলার উপভোগ্য সংলাপ-হাস্যরস সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। নবাবপক্ষের গোয়েন্দাগিরি অথচ নবাবেরই গুপ্তকথা প্রকাশ মোহনপ্রসাদ চরিত্রে চরিত্রসৃষ্টির বৈচিত্র্য প্রকাশে কিছুটা প্রাণবন্ত। মোহনপ্রসাদের সংলাপ—নবাবের সঙ্গে নন্দকুমারের এমন বিচ্ছেদ করে দিয়েছি যে এ জন্মে আর তাদের মিল হচ্ছে না, চরিত্রানুগ।

হেস্টিংসের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে মীরকাশিমের পুত্রের মনে ইংরাজ বিদ্বেষ-এর উল্লেখ জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির প্রয়াস বলে চিহ্নিত হবে।—'আপনি না পারে ছেলেকে দিয়ে আমাদিগকে দেশত্যাগ করাবে। তাহার প্রাণে এমনি ইংরাজ বিদ্বেষ প্রবেশ করাইয়াছে যে সে আমিয়েটটাকে জুতো লইয়া আক্রমণ করিয়াছিল।'

মীরকাশিমের সঙ্গে লড়াই এর দুঃখজনক পরিণামের কথা শোনার জন্যে বিশ্বাসঘাতক মোহনপ্রসাদ ও উদগ্রীব। তার মোসাহেবী ধরণের কথাবার্তা ও ও চিরাচরিত রীতির সংলাপ গতানুগতিকতার বিরক্তি উৎপাদন করে।

বুলাকি দাস ও মোহনপ্রসাদের সংলাপে তাদের গোপন উদ্দেশ্য চমৎকার উঁকি মেরেছে। নাটকের এই অংশ অনৈতিহাসিক, কারণ বুলাকিদাস পরলোক গমন করার পর নন্দকুমারের বিরুদ্ধে মামলাটি সাজানোর ব্যবস্থা হয়। কাজেই এ ধরনের সংলাপ ঐতিহাসিক নাটকের এই অংশে সর্ত পালনে সক্ষম হয়নি। নন্দকুমারের কাছে এ ঘটনা চাপা থাকলেও নাটকের পাঠক বা দর্শক তা উপভোগ করতে পেরে একটা কিছু ভয়ানক ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। গুরুকন্যার জন্য উৎকগীকৃত বহুমূল্য গহনাদি যা বুলাকির কাছে গচ্ছিত ছিল—চুরি গেছে বলে নাটকে বুলাকি মিথ্যা রটনা করেছে। ইতিহাস এই রটনাকে ঠিক মিথ্যা বলে না, বরং বলে—গহনাগুলি যথার্থই লুণ্ঠিত হয়েছিল। 'মুর্শিদাবাদে বুলাকি দাস নামে একজন শেঠ বাস করিতেন। নবাব মীরকাশীমের শ্রীবৃদ্ধির সহিত তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। এই বুলাকিদাসের কাছে নন্দকুমার (১৭৫৮ জুন) একছড়া মুক্তার মালা, একখানা কল্কা, একটি শির পেঁচ ও দুইটি হীরার এবং দুইটি মানিকের আংটী বিক্রয়ের জন্য প্রদান করেন। এই সকল দ্রব্যের মূল্য ৪৮০২১ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। মীরকাশিমের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে নবাবের পক্ষীয় বলিয়া বুলাকি দাসের কুঠী সকল লুঠ হইয়া যায়। এই সময় মহারাজ নন্দকুমারের গচ্ছিত সম্পত্তি ও নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল ঘটনার পর কলিকাতায় মহারাজের সহিত বুলাকিদাসের সাক্ষাৎ হইলে তাহার মূল্য

দিতে না পারায় শেঠজী মহারাজকে একখানি অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দেন। এই অঙ্গীকার পত্রই জাল বলিয়া অবশেষে এত কাণ্ড হইয়াছিল।'৩৮

নন্দকুমারের মুখে অদৃষ্টের অশুভ ইঙ্গিত প্রকাশ-গুরুর দেখা হ'ল কিন্তু গুরু কন্যাকে দেখতে হল তার বৈধব্য-বেশে। গুরু কন্যার জন্যে আনা সম্পত্তি লুট হয়ে যাওয়া এবং নবাবজাদার বন্দী হওয়ার সংবাদ ও এই অশুভ ইঙ্গিতের পর্যায়ে পড়ে। এর সঙ্গে আরও একটি অশুভ ইঙ্গিত বা ভবিষ্যৎ তার কাছে গোপন রয়ে গেল। নন্দকুমারের সঠিক অবস্থিতির খবর চলে যায় শত্রু পক্ষ হেস্টিংসের কাছে। নির্মম নিয়তির প্রভাব অলক্ষ্যে এইভাবে নাটকে কারুণ্যের ছায়া বিস্তার করেছে। এখানে নাট্য সৌন্দর্য্য লক্ষণীয়।

কিম্বদন্তীকে উপজীব্য করে নন্দকুমারের ইংরাজ বিদ্বেষ ও অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে তার প্রতিরোধকে নাটকের অঙ্গীভূত করার কাজে সাহায্য করেছে নন্দকুমারের গুরু বপুদেব। ত্রিবেণীতে স্নানের সুযোগ পাচ্ছে না হিন্দু। বপুদেব নিজেও বঞ্চিত। তাই নন্দকুমারের ওপর আদেশ-ইংরাজদের বাধ্য করতে হবে সে অবরোধ তুলে নেবার জন্যে! নতুন ঘটনার ইঙ্গিত ছাড়া এদৃশ্যে (২য় অংক, ৩য় দৃশ্য) নাটকীয়তা নেই। পরের দৃশ্যে রাধিকার মুখে কঠিন ভবিষ্যৎবাণী 'ইংরাজ আর বণিক থাকবে না। কালা আদমি জলে নামলেই জল ময়লা হবে।' গোরারা সেই জল খেলে ওলাওঠা হয় যদি। রাধিকার প্রতিকারের প্রতিজ্ঞার স্ফুলিঙ্গ ছাড়া এদৃশ্যেও উল্লেখ্য কিছু নেই। (২য় অংক, ৪র্থ দৃশ্য)।

বপুদেবের দেশাত্মবোধক সংলাপ দীর্ঘ-একঘেয়ে, অবশ্য তার সংলাপে কোন কোন স্থানে ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশিত—'ইংরাজ মুর্শিদাবাদ দখল করেছে। নবাবের সৈন্য কাটোয়ায় হেরে গেছে।'

৪র্থ অংকের ২য় দৃশ্যে—মীরজাফরের মৃত্যু-শয্যার পাশে বসে বপুদেবের নবাবী ভিক্ষা চাওয়া কতটা ঐতিহাসিক তা সহজেই অনুমেয়। তবে বপুদেব চরিত্রের মাধ্যমে ব্রাহ্মণদের একটি ভাবমূর্তি নাট্যকার গড়ার চেষ্টা করেছেন। এই ভাবমূর্তিটিই শেষপর্যন্ত ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের বিষাদময় জীবনাবসানের মধ্যে যথার্থ পরিণতি লাভ করেছে। হিন্দুপালিত মুসলমান মীরকাশিম-পুত্রকে নবাবী দেওয়ার প্রস্তাবে ইতস্ততঃ মণিবেগমকে শেষ পর্যন্ত রাজী করিয়েছে রাধিকা। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। বপুদেব-এর সঙ্গত দার্শনিক মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হয়নি।—'বুঝেছি কর্মরোধ করা যায় না।' শেষ দৃশ্যে বপুদেবের সংলাপ ভাবগম্ভীর। তবে সংলাপে ব্রাহ্মণ্য শক্তির প্রচার এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের স্বপ্ন প্রকট। জাতীয়তাবোধের বিস্তারে ধর্মের এই সংকীর্ণতায় নন্দকুমার চরিত্রটি ছোট হয়ে গেছে। নন্দকুমার বাঙালী, ভারতবাসী - এই পরিচয়ই

---

৩৮. মহারাজ নন্দকুমার—সত্যচরণ শাস্ত্রী।

ইতিহাসের পরিচয়-শ্বাশত পরিচয়। তা না হয়ে বপ্দেবের মারফৎ নাটকে ব্রাহ্মণ্য শক্তির প্রচারে নাট্যকারকে নামতে দেখা গেছে।

উদয়নালায় মীরকাশিম হেরে পালিয়েছে। কিন্তু নন্দকুমারকে গ্রেপ্তার করার উপায় কি। গভর্ণরের সম্মতিসূচক স্বাক্ষর চাই যে। মোহনপ্রসাদ এসে যোগ দেয় গভর্ণরের সই সে যোগাড় করবে—নন্দকুমারকে গ্রেপ্তার করে আনবে। হেস্টিংসের সঙ্গে ইতিমধ্যে ষড়যন্ত্রের আসরে রাজা রামচাঁদ ও রেজা খাঁও অবতীর্ণ। মীরজাফরের অনুশোচনার আর্তনাদ নাটকে পলাশীর দুস্মৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মীরজাফরকে মুঙ্গেরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে হেস্টিংস-এর প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার ব্যাপারে মীরজাফরের হেস্টিংসের প্রতি ব্যঙ্গবাণী নাট্যক্রিয়া লাভ করেছে। মীরজাফরের সংলাপে সাজাহানের সংলাপের প্রভাব আছে। আছে হাহাকার, যন্ত্রণার দংশন। মণিবেগম নূরজাহানকে স্মরণ করতে করতে বলে—'সে নিজেই বারওয়েল সাহেবের সঙ্গে মোকাবিলা করবে।' এই অংশে সংলাপের দৃঢ়তা লক্ষণীয়—এবং মণিবেগমের সংলাপে নূরজাহানের সংলাপ-সচেতনতাও দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার নয়।

তৃতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে রাধিকার আকস্মিক আবির্ভাব নিঃসন্দেহে নাটকীয় কিন্তু ইতিহাসের প্রতি আনুগত্যের অভাব বলে চিহ্নিত। অবশ্য রাধিকার সংলাপে কিছু হাস্যরসের উপহার উপভোগ্য।

নন্দকুমারের চোখে সোনার বাংলার স্বপ্ন আত্মতুষ্টি—নবাব তার ওপরে সব ভার ন্যস্ত করেছেন—'বাংলার ঐশ্বর্যে পৃথিবীর অভাব মোচন হবে।' কিন্তু রাণীর আশংকা নাট্যরূপ পেয়েছে।—যেন অনিবার্যতার আবাহন রাণীর ভবিষ্যৎ দর্শণের ভয় ও আতঙ্কে। নন্দকুমার কর্তৃক রাধিকার প্রত্যাখ্যান-আশংকা দীর্ঘতর। হেস্টিংসের আকস্মিক আগমনে তারাই সূচনা।

রেজা খাঁর মুক্তি নিয়ে নাটকে হেস্টিংস ও নন্দকুমারের মধ্যে নাটকীয় সংলাপের অবতারণা। অবশ্য ঐতিহাসিক তথ্যে এ ব্যাপারটি ঠিক সমর্থিত নয়। বরং ইতিহাস বলে রেজা খাঁকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে হেস্টিংস জব্দ করার জন্য নন্দকুমারের সাহায্য প্রার্থনা করেন। নন্দকুমারের সাহায্য প্রত্যাশায় একবার জেল থেকে বন্দী রাজাকে হেস্টিংস ছাড়িয়েও এনেছিলেন। নাটকে কাহিনীটিকে নাটকীয় ঘটনা সূত্রে গাঁথার জন্যে হেস্টিংসের মুখ দিয়ে সতর্কবাণী (স্বগতঃ) শোনাতে ভুল করেন নি নাট্যকার। (নন্দকুমারের উদ্দেশ্যে) ···You are the only person awake in Bengal. There is no room for two of us here.

নবাবের মৃত্যুতে নন্দকুমারের বাংলার স্বাধীনতা অর্জনের শেষ চেষ্টার সমাধি ঘটে। নবাব মীরজাফর সত্যি মারা গেছে কিনা তা জানার অদম্য কৌতূহল নাটকে যথাযথভাবে রূপায়িত। হেস্টিংস অকপটে স্বীকার করেছে ঃ—(মীরজাফরের

উদ্দেশ্যে) Had you lived a year longer Bengal would have been a very hard nut to crack.

—অথচ নন্দকুমারের দীর্ঘশ্বাস ঃ···কূলে এসে তরী ডুবে গেল। সোনার বংলার মুখে সোনার হাসির ক্ষীণ আভাষটুকু মাত্র দেখা দিয়েছিল।' রাধিকার ভাষায় 'সমগ্র বাংলা আজ প্রবল প্রভঞ্জনে ওলটপালট খাচ্ছে।' মীরকাশিম পুত্র বাহারকে নিয়ে বাংলার স্বাধীনতা অর্জনের যখন স্বপ্ন দেখছে রাধাচরণ ঠিক সেই সময়ে নাটকের ঘটনা সূত্রে এসে গেছে ইংরাজের চর। বাহার মন্দিরে প্রবেশ করলে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচতো তা সে করল না—সে মুসলমান হয়ে হিন্দুর মন্দির অপবিত্র করবে! বাহারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ আশার প্রদীপটিও নিভে যেতে দেখেছেন নাট্যকার।

হেস্টিংসের কূটবুদ্ধির পরিচায়ক কিছু সংলাপ উল্লেখ্য। এই সংলাপ অবশ্য রেজা খাঁর সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্যের মধ্যে বিধৃত—'Let him be cast off as wornout boots'' রামচাঁদের মোসাহেবী ভাবপ্রবণতাও সংলাপে সুচারূপে প্রকাশিত।—
—'আমি পা থেকে মাথা পর্যন্ত আপনার লেফাফায়। আমাকে পুরে ছাপ মেরে শীলমোহর করে রেখে দিন। আমি আপনার মোকাদমায় নথি হয়ে পড়ে থাকি।

ফ্রানসিস ও হেস্টিংসের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই ইতিহাসসমর্থিত। পূর্বদৃশ্যে হেস্টিংস ইঙ্গিত দিয়েছে ফ্রানসিস নন্দকুমারের সাহায্যপ্রার্থী ও হেস্টিংসের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধেও প্রমানপ্রার্থী। মূল সংঘাত—নাটকে যেভাবে উপস্থাপিত, নাট্য পরিণতির জন্য তা অত্যাবশ্যকীয় বলে বিবেচিত হতে পারে।

মোহনপ্রসাদের মুখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী উপভোগ্য। কিন্তু এই চরিত্রের সংলাপকে আকর্ষনীয় করতে গিয়ে নাট্যকার পরে অসঙ্গতির দোষ এড়াতে পারেন নি। কারণ এই মোহনপ্রসাদের মুখে বিশুদ্ধ ইংরাজী শুনিয়েছেন নাট্যকার কিছু পরেই।

কাউনসিলু গৃহে ফ্রানসিস যখন হেণ্টিংসের বিচার করছে—হেণ্টিংস নন্দকুমারকে গাল দিচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে কাউনসিলু-গৃহে মোহনপ্রসাদের আকস্মিক আগমন কিছুটা বেমানান এবং অনৈতিহাসিক। কিন্তু তা হলেও এই আকস্মিক আবির্ভাব নিঃসন্দেহে নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছে।

বুলাকিদাসের খত জাল করায় নন্দকুমারকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এদিকে রাজা অন্নজল ত্যাগ করেছেন। রামচাঁদের আফশোষ, একি হ'ল। নন্দকুমরের এ পরিণাম তো তারা কেউই চায় নি। প্রাণে কি তোমার যথার্থই কষ্ট হচ্ছে রামচাঁদ ?·· রামচাঁদের আকস্মিক পরিবর্তনের যথার্থ ধারাবাহিকতা নাটকে স্পষ্ট প্রতীয়মান নয়। পরিবর্তন কি শুধু সংস্কারকেন্দ্রিক—জেলে ব্রহ্মহত্যা ঘটার ভয়ে ?—ঘটনাটির প্রতিক্রিয়া রামচাঁদ-এর মার মধ্যেও দেখা গেছে —ব্রহ্মহত্যার কথা যেন শুনতে না হয়। রাজপথে জনতার মধ্যেও এর নির্ভুল

প্রতিক্রিয়াকে নাটকে স্থান দিতে ভোলেন নি নাট্যকার। ফাঁসির কথা ঘোষণায় সকলেই বিমর্ষ—সবার অন্তরে হাহাকার—উদ্বেগের ছায়া মানসপটে। জনতার মধ্যেকার আলোচনা সজীব প্রাণবন্ত ও প্রাণস্পর্শী।

জেলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত নন্দকুমারের জন্য স্বতন্ত্র ঘরের ব্যবস্থা হয়েছিল, এ না হলে রাজা আমরণ অনশন ভঙ্গ করতেন না। নাটকে অনুতপ্ত রামচাঁদই এই স্বতন্ত্র ঘরের ব্যবস্থা করেছে—যদিও ঐতিহাসিক নথিপত্রে এর জন্যে নন্দকুমারের নিজস্ব আবেদনের উল্লেখ আছে। রামচাঁদ অনুতপ্ত—সেই শেষ পর্যন্ত ধর্মরক্ষা করেছে।

ম্যাক্রেবীর সঙ্গে প্রাণদণ্ডের পূর্বেকার সংলাপ হৃদয়স্পর্শী। সেই সময়কার সেরিফ্ ম্যাক্রেবী সাহেবের লিখিত বিবরণে নাটকের ম্যাক্রেবীর সংলাপ এর সঙ্গে সাদৃশ্যে লক্ষণীয়। এখানে নাট্যকারের ঐতিহাসিক নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। "মহারাজ, আমি দুঃখিত। আপনার মুখ চাহিয়া আমি কথা কহিতে পারিতেছি না। লজ্জায় আমার মস্তক নত হইয়া যাইতেছে। —পুত্র গুরুদাসকে দেখতে বলার স্বাভাবিক অনুরোধ সঙ্গত এবং ঐতিহাসিক তথ্য সমর্থিত। নন্দকুমার নির্ভীক—যেন তার কাছে জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। ম্যাক্রেবীর বিবরণে আছে—···মনের ভিতর যে একটা উদ্বেগ ভাব দেখা গেল না।···অবশিষ্ট সময় হরিনাম জপ করিত লাগিলেন।...ফাঁসী কাঠ দেখিয়া মহারাজের মনে কোন উদ্বেগের ভাব দেখিতে পাইলাম না।' মৃত্যুর পূর্বে নন্দকুমারের মুখে কোন বিকারের লক্ষণ না দেখতে পেয়ে ম্যাক্রেবীর বিস্ময়, ভাবপ্রবণতা ও আবেগ নাটকের অঙ্গীভূত হয়েছে। 'এই বাঙালীকে আমরা ভীরু বলিয়া থাকি। আজ আপনাকে দেখে বুঝিলাম, কেন আপনাদের দেশে ব্রাহ্মণকে দেবতা বলে।'

নন্দকুমার একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইউরোপীয়দের চোখে তিনি 'কৃষ্ণ কর্ণেল' রূপে পরিচিত। নাটকের প্রতিপাদ্য পরিণতি নন্দকুমারের ফাঁসি এবং সে ফাঁসির যে মর্মান্তিক পরিণাম তার জন্যে যথোপযুক্ত ঘটনাবলীর সংযোজন তা ঐতিহাসিক বা অনৈতিহাসিক যাই হোক না কেন—নাট্যসূত্রে গ্রথিত কি না সেটাই বিচার্য। চরিত্রগুলির সেই মর্মান্তিক পরিণতির জন্য কে কতটা দায়ী—নাট্যবৃত্ত রচনায় কার কতটা অবদান—সেটাও বিচার করে দেখতে হবে।

পরম পরোপকারী প্রবল প্রভাব প্রতিপত্তিশালী নন্দকুমারের জীবনের বিষাদময় পরিণতি ঘটানোর জন্য বিরুদ্ধ শক্তির প্রয়োজন ছিল। হয় বিরুদ্ধ দৈবশক্তি, না হয় ঈর্ষা, অবিশ্বাস বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধশক্তি। না হলে নাটকে মহৎ চরিত্রের পতন বা বিষাদময় পরিণতি স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে না—জোর করে অনাটকীয়ভাবে নাট্যকারকে তা ঘটাতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে নাটকে নন্দকুমারের বিয়োগান্ত পরিণতিতে হেস্টিংসের প্রধান ভূমিকা ঐতিহাসিক তথ্যের পথ ধরেই যথাযথভাবে উপস্থাপিত। নন্দকুমারের প্রভাব-

প্রতিপত্তিতে তার প্রতি ঈর্ষা ও নিজের দুষ্কৃতিতে আতঙ্কিত হয়ে নন্দকুমারের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য নন্দকুমারের বিরুদ্ধে হেস্টিসকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'তে বাধ্য হতে হয়।

নাটকে হেস্টিংসের ভূমিকা শুধু ঐতিহাসিক নিষ্ঠার প্রয়োজন সিদ্ধ করেনি, নাট্য প্রয়োজনে নন্দকুমারের জীবনের করুণ পরিণতির নিয়ন্ত্রীর ভূমিকায় যথাসাধ্য অপ্রিয় ধিক্কারজনক কর্তব্যপালনে সচেষ্ট হয়েছে। হেস্টিংসের সঙ্গে যারা নন্দকুমারকে অবাধ পাপাচরণের পথে কণ্টকস্বরূপ বলে মনে করতেন, তারা হেস্টিংসের শুভানুধ্যায়ী—নন্দকুমারের বিচার প্রহসনে সরকার পক্ষের সাজানো সাক্ষী। মোহনপ্রসাদ, কমল, নবকৃষ্ণ, জগশ্চন্দ্র তাদের প্রায় সকলেই নাটকে উপস্থিত।

এইভাবে নন্দকুমারের বিপক্ষে শক্তিশালী বিরুদ্ধ শক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে নাটকে যে প্রত্যাশিত দ্বন্দ্ব সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন নাট্যকার প্রকৃতপক্ষে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি।

রাজদ্রোহী বলে আখ্যাত মীরকাশিম পুত্র বাহারের গ্রেপ্তার নিয়ে নন্দকুমারের সঙ্গে ইংরাজদের একদফা সংঘর্ষ—বিরুদ্ধ শক্তির সমাবেশের একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত। ইংরাজদের সঙ্গে সংঘর্ষের এই সূচনাকে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বাহারকে তার আকস্মিক আগমনসূত্রে রক্ষা করতে যাওয়ার প্রসঙ্গে যারা বালককে গ্রেপ্তার করতে যাওয়ার বীরত্ব প্রদর্শন করতে এসেছিল তারা নাটকীয়ভাবেই নন্দকুমার কর্তৃক ধিকৃত হয়েছে। এ দৃশ্যে এই আকস্মিকতার সূত্রে নন্দকুমার ও প্রমোদার মধ্যে বাঞ্ছিত সাক্ষাৎকার ঘটিয়ে প্রমোদার বৈধব্য আবিষ্কারে নন্দকুমারের বিস্ময় ও বেদনার উদ্রেক ঘটেছে। নাটকে দৈবলীলার যে প্রচ্ছন্ন বিরুদ্ধাচরণের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তারই জের স্বরূপ ভাগ্যবিপর্যয়ে রিক্তা ভাগ্য-বিড়ম্বিতা প্রমোদার সঙ্গে নন্দকুমারের বাঞ্ছিত সাক্ষাৎকার এর সুযোগ নাট্যকারকে সঙ্গত কারণেই নিতে হয়েছে।

নবাবের সঙ্গে নন্দকুমারের বিরোধ বা বিচ্ছেদ না ঘটলে ইংরাজ শক্তি নন্দকুমারের পতন ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে না। ঐতিহাসিক তথ্যের বাস্তবতার সূত্র ধরেই নাটকের বাস্তব ও সঙ্গত প্রয়োজনেই মোহনপ্রসাদের মুখ দিয়ে নাট্যকার তার পরবর্তী কাহিনী বিন্যাসের ইঙ্গিত দিয়েছেন। (পুনরুক্তি হলেও এখানে তা উল্লেখ্য)—"নবাবের সঙ্গে নন্দকুমারের এমন বিচ্ছেদ করে দিয়েছি যে এ জন্মে আর তাদের মিল হচ্ছে না।"

বুলাকিদাসের কাছে গচ্ছিত নন্দকুমারের গুরুকন্যার জন্য উৎসর্গীকৃত মহামূল্য গহনাদি নাটকে Key point এর কাজ করেছে, যদিও এই গহনাদি নষ্ট হওয়া, লুণ্ঠিত হওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে নাট্যপ্রয়োজনে ঐতিহাসিক ঘটনার হেরফের ঘটানো হয়েছে। গচ্ছিত গহনাদি ফেরৎ দিতে না পারায় নাটকে কলিকাতার নন্দকুমারকে বুলাকিদাস যে অঙ্গীকার পত্র দেয়—সেই পত্রই অভিশপ্তরূপে প্রমাণিত

হয়ে নন্দকুমারের পতনকে অনিবার্য করে তোলে। নাট্য কাহিনী গ্রন্থনায় ঐতিহাসিক ঘটনার নাট্যপ্রয়োজনমাফিক রূপান্তর সাধনের ফলে 'অঙ্গীকারপত্রটি জাল,—এই ঘটনাকে আশ্রয় করে নন্দকুমারকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করার মূল ঘটনাকে নাট্যধারার অনুকূল স্রোতে মিলিয়ে দিয়ে নাট্যকার নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

নাটকে বুলাকিদাসের এই ঘটনাটিকে 'প্রতারণা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং নাটকটির নায়ক চরিত্রের শোচনীয় পরিণতির যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াসে এই ঘটনাকে অবলম্বন করে নাট্যকাহিনীর বিস্তার ঘটেছে—পার্শ্বচরিত্রগুলিও বিকাশলাভের সুযোগ পেয়েছে। শত্রুপক্ষের 'সব গেছে' এই প্রতারণায় সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে নন্দকুমার নিজের গুপ্ত কথা বলে দিয়েছে অকুণ্ঠিত চিত্তে।—তার সঙ্গে দেখা হবে ভদ্রপুরে অমাবশ্যার আগেই। 'পরে কোথায় থাকবো,—বলতে পারি না'—কাহিনীগ্রন্থনে এ সংলাপ বা কথোপকথন কার্যকরী হয়েছে। পরবর্তী ঘটনার চাকা স্বাভাবিকভাবেই ঘুরতে শুরু করেছে। নন্দকুমারের সরল বিশ্বাস—"দেখো মোহনপ্রসাদ হেস্টিংস ভালো লোক নয়—কুপরামর্শ দিতে পারে।" · অথচ যাকে বললেন—সেই মোহনপ্রসাদই শয়তান, হেস্টিংসের লোক। মোহনপ্রসাদ এই বিশ্বাসকে একস্‌প্লয়েট করেছে –ব্যঙ্গ করেছে।…"বাঁচিয়ে রাখো বাবা ইষ্টদেব। মহারাজকে বাঁচিয়ে রাখো।"—ভণ্ডামি এখানে নাটকীয় উপাদানে মণ্ডিত হয়েছে।

নন্দকুমারের ট্রাজেডি একদিকে যেমন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অনুবর্তনে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারের বিভিন্ন চরিত্রের কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে, ঠিক তেমনি অন্যদিকে ভাগ্য বিড়ম্বনার ক্রীড়ানক হওয়ার দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির কবলে পড়ার জন্যেও। ভাগ্য-লাঞ্ছিত এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম তেজ, দেশাত্মবোধ ও আত্মমর্যাদার দুর্বার প্রেরণায় বিরূপ ভাগ্যলক্ষ্মীর কাছে প্রাণভিক্ষা বা মর্যাদা ভিক্ষার কোন প্রশ্নই ওঠে না নাটকটিতে। আর সে ভুলের ফাঁদে নাট্যকারও ধরা দেন নি।

নাটকে ঠিক যে অর্থে দৈবনিগৃহীত নায়ক বলা চলে নন্দকুমার অবশ্য সে অর্থে দৈবনিগৃহীত নয়। তবে তার বিয়োগান্ত পরিণতির কারুণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি বা তার তীব্রতার ঘণীভবনের জন্য নাটকে দৈবের প্রভাব সংযোজন নাট্যপ্রয়োজন সিদ্ধ করেছে একথা বলা যায়।

নাটকে দৈবশক্তির ভূমিকা প্রসঙ্গে নন্দকুমারের গুরুদেব বপুদেব শাস্ত্রীর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। নন্দকুমারের করুণ পরিণামের মূলে দৈবের প্রভাব রয়েছে এবং সে দৈবের নির্দেশ অমান্য করার স্পর্ধার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবেই তাকে চরম ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। বপুদেব কন্যা প্রমোদার উক্তির মধ্যে তার ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয়। পঞ্চম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে অবগুণ্ঠনবতী কংকালময়ী গুরু-কন্যা প্রমোদার সংলাপে নন্দকুমারকে সব কিছুর জন্যে দায়ী করার মধ্যে তা প্রকাশিত।

তাছাড়া নাট্যকার স্বয়ং শক্তির উপাসক। অন্য দু একটি ঐতিহাসিক নাটকেও বপুদেবের মত দৈবশক্তি লাভের প্রার্থনা নাট্যকারের দৈব্যনির্ভরতার বৈশিষ্ট্য বলে বর্ণিত হতে পারে।

নাটকে গানের ভূমিকা নগণ্য। নাট্যপ্রয়োজনে গানগুলির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য বলে বিবেচিত হবে না। তাছাড়া গানের দ্বারা কাহিনী বিন্যাসের কোন সুযোগও ছিল না নাটকে।

॥ দাদা ও দিদি ॥

দাদা ও দিদির রচনাকাল ১৯০৮। প্রতাপাদিত্য নাটক রচনার পর বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। সেই সময়েরসূত্রে গাঁথা হয়েছে আরও কয়েকটি স্বাদেশিকতা-সিক্ত নাটক-বিভিন্ন নাট্যকারের স্বতঃ উৎসারিত স্বদেশ প্রীতির সুতোয় গাঁথা আন্তরিক প্রেরণার ফসল। স্বদেশী আন্দোলন ও স্বাদেশিকতার তপ্ত হাওয়ায় ঐতিহাসিক বীরগাথা অবলম্বন করে বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক, আধা ঐতিহাসিক, ঐতিহাসাশ্রয়ী নাটক স্বদেশী রচনার অঙ্গনে উপস্থিত। অবশ্য পরিবেশ এই ধরনের নাটকের অনুকূলেই ছিল। 'দাদা ও দিদি' নাটক লেখার পূর্বেই নন্দকুমার, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত নাটক লেখা হয়েছে। গিরিশ ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রলালও ইতিমধ্যে নাটকের পসরা নিয়ে আসরে অবতীর্ণ এবং সগৌরবে বিরাজমান।

পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে 'দাদা ও দিদি' নাটকের রূপকের অন্তরালে আত্মপ্রকাশের আত্মিক তাগিদের যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। নাট্যকারের উদ্দেশ্য স্বাজাত্যবোধের উদ্দীপনা সৃষ্টি, প্রচার ও বনিক ইংরাজদের শোষণের স্বরূপ প্রকাশের প্রয়াস। ইংলণ্ডের বিলাস দ্রব্যের প্রসারের আয়োজন ও প্রকট হয়ে উঠেছিল। নাটকের সচেতন প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভারতবাসীকে প্রদমিত করার প্রচণ্ড বাসনা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। নাট্যকার ইংরাজ বেনেদের বিলাসদ্রব্যের প্রচার ও প্রসারের প্রচেষ্টাকে নির্মমভাবে আক্রমণ করতে দ্বিধা করেন নি। নাটকে পরানুকরণ প্রবৃত্তি ও মোহপ্রমত্ততাও সমভাবে ধিকৃত।

এই নাটকের পটভূমি ইংরাজ শাসনে ভারতে অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের পটভূমি— ইংরাজ শোষণের ইতিবৃত্তে পরিবেশ তখন জর্জর। নাটকে অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনার অবকাশ কম। নাটকের পরিধি, বিস্তৃতি ও উদ্দেশ্য কোনটাই সে পর্যালোচনার অনুকূল ছিল না। অবশ্য পর্যালোচনা প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষে তা সম্ভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন নাট্যকার। তাই রূপকের আশ্রয় এর যুক্তি মেনে নিতে কণ্ট হয় না। এই রূপকের আশ্রয় না নিয়েও নাট্যকারের গত্যন্তর ছিল না। কারণ এই নাটক রচনার কিছু পরেই বৃটিশ শাসকদের দৃষ্টি

পড়ে নাটকটির ওপর। নাট্যকারের দূরদৃষ্টির প্রশংসা করতে হয়। রূপকের আশ্রয় নিতে না পারলে নাটকটির প্রচার আদৌ সম্ভব হতে কিনা সন্দেহ। তৎকালীন অমৃতবাজার পত্রিকার একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। ৩৯

রাজনারায়ণ বসুর সেকাল ও একাল এ এই পটভূমি বিস্তৃত আলোচনায় সবিশেষ উল্লিখিত। পরমুখাপেক্ষী হওয়ার বাধ্যবাধকতায় ভারতবাসীর অসহায় অবস্থার কথা মনোমোহনের সঙ্গীতে (মনোমোহন বসু) এবং ডি এল রায়ের ব্যঙ্গ কবিতায় যথাযথ ভাবে প্রকাশিত। "আমরা বিলাতি ধরনে হাঁচি এবং বিলাতি হৃদয়ে কাসি ··।৪০ ইংরাজ বনিকদের শোষণ নীতিও সমর্থিত হয়েছে নাটকে। "Administration and exploitation go hand to hand ৪১। দাদা ও দিদির মতো একটি রচনার অনুকূল পরিবেশ ও ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল আরও অনেকভাবে। বিদেশী খানা বনাম স্বদেশী খানার দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথও বিচলিত। তাঁর উপন্যাস ঘরে বাইরের মধ্যে এর দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। কাব্যগ্রন্থ কল্পনা 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' ইত্যাদির মাধ্যমেও কবি রাজনৈতিক সচেনতাবোধের পরিচয় দিতে পেরেছেন।

এই সময় চারণকবি মুকুন্দ দাসও নীরব ছিলেন না। তার গানে অর্থনৈতিক চেতনাবোধ সুলভ, শোভন এবং সোচ্চার। গিরিশ ঘোষ, ডি এল রায়ও একই ভাবকে কেন্দ্র করে নাটক রচনা শুরু করে দিয়েছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের রেশ তখনও মিলিয়ে যায়নি সম্পূর্ণভাবে। বরং স্বদেশী-য়ানার স্রোতে ভাসছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের উদ্দাম যৌবন। জ্বলন্ত দেশপ্রেমের বহ্নিতে ঘৃতাহুতির মত অর্পিত হল 'দাদা ও দিদি' নাটক। এ নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার পরানুকরণ ও মোহমত্ততার বিরুদ্ধে জানালেন বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। ঔপনিবেশিক শোষণের মুখোস খুলে দিলেন তিনি। নিঃসংকোচে ধিক্কার জানালেন শোষণের বিরুদ্ধে।

---

৩৯. The Commissioners of Police has just prohibited Gramophone Companies from reproducing 'Amar Desh', Bandemataram, and such other songs and ordered all such records to be destroyed. Conductors of Theaters too are said to have been ordered to remove such songs from all pieces staged by them···Moreover pieces like Sirajudaulea, Mirkasimm, Chatrapati, Durgadas, Dada o Didi, Nanda kumar, Jiban Sondhya are about to be re-examined by the Police and objectionable passages from them, taken out (issue – 11th December, 1908).

৪০. হাসির কবিতা—ডি. এল. রায়।

৪১. লর্ডকার্জনের উক্তি।

ক্ষুদ্রায়তন এই নাটকটিতে নাট্যকারের স্বদেশপ্রেম স্বতঃউৎসারিত। নাটকে নাট্যকার দেশনেতৃত্বের, দেশপ্রেমিকের দায়িত্ব পালন করেছেন সুষ্ঠুভাবে। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুরবস্থার যথাযথ চিত্র প্রদর্শনের দিক দিয়েও নাট্যকার নাটকটির বৈশিষ্ট্যবজায় রাখতে পেরেছেন। নাট্যকারের রঙ্গপ্রিয়তা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আদর্শে তীব্র তীক্ষ্ম সমালোচনার হাত ধরে এগিয়ে চলেছে।

ভারতবাসীকে জোর করে যেভাবে অবক্ষয়ের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এ নাটকে তার পরিচিতি দুর্লভ নয়। এ নাটকে প্রতিকটি চরিত্রের প্রতীকীরূপ জীবন্ত ও বর্ণাঢ্য রূপে চিত্রিত। ইংরাজ ও ইংরাজরমনীর প্রতীক তক্ষক ও শঙ্খনী চরিত্র। শোষিত ভারতবাসীর প্রতিনিধি চন্দ্রবিন্দু ও চিত্রলেখা। চন্দ্রদ্বীপ ও হট্টমালা যে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ-এর চিত্ররূপ সেটা বুঝতে নিশ্চয়ই কারুরই অসুবিধা হবে না।

দাদা ও দিদি রচনাকালীন পরিবেশ এক অস্বস্তিকর অবস্থায় এসে পৌঁচেছিল। অর্থনীতির দৈন্য তখন প্রকট। শোষণের চাপে পিষ্ট ভারতবাসীর প্রাণও ওষ্ঠাগত। মুকুন্দরামের যাত্রাগানে অর্থনীতির দৈন্য পরিস্ফুট। শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাতি দ্রব্য অনুপ্রবেশের ঘটনার কথা ব্যক্ত করেছেন নাট্যকার ক্ষীরোদ-প্রসাদ। চন্দ্রবিন্দু ও চিত্রলেখার মধ্যে তক্ষক ও শঙ্খণী বিলাতি দ্রব্যের মাহাত্ম্য প্রচারের যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তাতে নাট্যকারের বক্তব্য প্রচারের মাধ্যম হয়েও নাট্যরস সৃষ্টিতে সে প্রচার যথাযথ সংলাপের মর্যাদায় মণ্ডিত হয়েছে।

তক্ষক ও শঙ্খণী যেমন চন্দ্রদ্বীপের চাঁই (দাদা) ও চাঁইনী (দিদি)—চন্দ্রবিন্দু ও চিত্রলেখাও তেমনি হট্টমালার বড়ঠাকুরাণী।

তক্ষক :—এই দেখুন, আপনার হাতের দুঃখ ছড়ি নেই।

শঙ্খনী :—এই দেখুন, আপনার (চন্দ্রবিন্দুর হস্তে ছড়ি দান)
বুকে দুঃখ - ঘড়ি নেই। (চিত্রলেখাকে ঘড়িদান)

তক্ষক :—এই দেখুন আপনার পায়ের দুঃখু, মোজা নেই।

শঙ্খণী :—এই দেখুন আপনার নাকের দুঃখু চশমা নেই।
(নানাভাবে চন্দ্রবিন্দু ও চিত্রলেখাকে সজ্জিতকরণ)

চিত্রলেখা :—তাই তো প্রাণেশ্বর, এসব তো আমাদের ছিল্ল না।

চন্দ্রবিন্দু :—তাই তো প্রাণেশ্বরী, এতদিন বড় দুঃখেই দিনযাপন করেছি।

তক্ষক :—এখনও হয়েছে কি। আপনাদের অনন্ত দুঃখ। ঘরে চলুন, আপনাদের একটি একটি করে দেখিয়ে দিই গে।

গ্রামীনজীবনে সর্বনাশা বিলাস সজ্জার উপকরণ কিভাবে উগ্রমাদকতার সৃষ্টি করছিল নাট্যকারের কৌতুক লেখনী তা লিপিবদ্ধ করতে ভুল করে নি। বিলাসিনী রমনী কৌশনী গ্রাম্য স্ত্রীলোকের চোখে তাই এক অপূর্ব বিস্ময়। কি ভাবে গ্রাম্য সরলতাকে (প্রাচীন ঐতিহ্যের আবরণে যা স্বমহিমায় প্রকাশিত তাকে) একসপ্লয়েট

'শোষণ' করে বিদেশী বিলাসিতা পরানুকরণ ও মোহমত্ততার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে চলেছে নাটকে তা কৌতুক সংলাপের মাধ্যমে বিধৃত। শুধু তাই নয় কর্মবিমুখীনতাই বিলাসিতার অন্যতম সহায়ক—কেশিনীর ব্যঙ্গোক্তির মাধ্যমে তার সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটিয়েছেন নাট্যকার। উগ্রপানীয়ের প্রতি নেশা ধরিয়ে জাতিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার অপচেষ্টাও নাট্যকার ব্যঙ্গবানে বিদ্ধ করতে ভোলেন নি। বিদেশী ভোগ্যপণ্যের প্রতি আসক্তি ও দেশীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি আচার অনুষ্ঠানের প্রতি অনীহা নাটকটিতে স্থান পেয়েছে। ইংরাজীয়ানার কুফল তখনকার দিনে কত সুদূরপ্রসারী ছিল রাজনৈতিক পরিবেশ সচেতন নাট্যকার সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জাতীয়তাবাদী নাট্যকারের ভূমিকা গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত বহু ব্যক্তি নিজ দেশে পরবাসী হয়ে থাকার সৌখিন কল্পনায় মেতেছিলেন। নিজ দেশকে পরদেশ মনে করে তারা ইংলণ্ডকেই বানিয়ে তুলেছিলেন নিজের দেশ। মোহগ্রস্ত বাঙালীর কল্পনার খোঁয়ার ক্ষীরোদ-প্রসাদের নাটকে মূর্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। কিছু উদ্ধৃতি এর স্বপক্ষে অত্যাবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় উদ্ধৃতির অবতারণা—

চন্দ্রবিন্দু—আসল কথা হট্যমালাটা তোমার আর ভালো লাগছে না।

চিত্রলেখা—কেমন করে লাগবে। হট্যমালার সব ভালো কেবল বারমাস চাঁদের আলো নেই।

চন্দ্রবিন্দু—ঠিক বলেছে, এতকাল একথাটা আমার মনেই হয়নি। আমাদের এই যে একটা প্রকাণ্ড অভাব তা তো আমরা জানতুম না। হট্যমালায় দেখছি নানান দোষ।

চিত্রলেখা—চাঁদে বোধহয় বারোমাসই আলো।

চন্দ্রবিন্দু—কোনরকমে একবার চাঁদে যাওয়া যায়।

অতিরিক্ত মদ্যপান নিয়ে সমাজে তখন রীতিমত হৈ চৈ। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে এই মদ্যপানের প্রবণতাকে, মদ্যপানের ব্যাপারে উৎসাহদানকে গভীর রাজনৈতিকউদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে চিহ্নিত করলে ভুল হবে না। সোম-প্রকাশ পত্রিকায় বা 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কি উপায়' প্রভৃতি পুস্তকাদিতে মদ্যপানাসক্তির কথা লেখা আছে। এই মদ্যপানের কি মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়া সাধারণ নরনারীর জীবনে প্রকট হয়ে ওঠে এবং তার ফলশ্রুতি কিভাবে সততা, সত্যবাদিতা সরলতা প্রভৃতি মানবিক গুণগুলিকে গ্রাস করে—তার পরিচয় নাট্যসংলাপের মধ্যে সুচারুরূপে বিধৃত।

তক্ষক—ঝগড়া কেন, ঝগড়া কেন, কি হয়েছে ?

ভেলু—এই লোকটি এক তাল সোনা কুড়িয়ে পেয়েছে। পেয়ে বলে কিনা এ আমার সোনা।

তক্ষক—বটে বটে। ও কুড়িয়ে পেয়েছে—পেয়ে তোমায় দিতে চাইছে?

ভেলু—হ্যা, দেখ দেখি কি অন্যায়।

ফেলু—দাদা সেই সঙ্গে আমার কথাটিও শোন। সোনা আমি কুড়িয়ে পেয়েছি সত্য, কিন্তু ঐ ব্যক্তির জমি থেকে পেয়েছি।

তক্ষক—বেশ আমি বিচার করে দিচ্ছি। আর বিচার আমিই বা করবো কেন, বিচার একটু বাদে তোমরাই করতে পারবে। এই নাও দেখি—এই জিনিষটা দুজনে একটু একটু করে চুক চুক করে খেয়ে ফেল দেখি।

মদ্যপানের পর দুই গ্রাম্যলোকের সরলতা ও সততা অতর্কিতে অন্তর্হিত হওয়ার রূপকটি নাটকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। চরিত্র দুটির রূপান্তরে স্বাভাবিকতা আরোপ করার জন্যে নেশার ঘোরে তাদের সংলাপকে স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত করে তুলতে নাট্যকার যত্নের ত্রুটী করেন নি।

তক্ষক—ঠেকছে কেমন, ঠেকছে কেমন?

ফেলু—ঠেকেছে ঠেকেছে······এ যে প্রাণে একেবারে ফ্যাল পাড়ছে। তেরে রে রে—

ভেলু—গিজিঘিনি গিজিঘিনি ঝাঁ ঃ দে ভাই এইবারে আমার সোনা দে।

ফেলু—বল কি প্রাণসখা?

ভেলু—এই যে আমাকে দিতে আসছিলি?

ফেলু—যে দিতে আসছিল সে শালা চলে গেছে। তেরে রে রে—

ভেলু—বটে, আমার জমির সোনা—

নাট্যকার ব্যঙ্গোক্তির মাধ্যমে সরস সংলাপের চাহিদা ঠিক ঠিক মেটাতে কার্পণ্য করেন নি। এই অংশের সংলাপ প্রয়োজনানুগ এবং নাটকের অঙ্গীভূত।

এর পরের সংলাপ তক্ষকের। তার বিচারের রায় অপূর্ব। কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কই। ইংরাজ সরকারের মধ্যস্থতা বা সালিসীর স্বরূপ তক্ষকের পরবর্তী সংলাপে চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মূঢ় ভারতীয়দের বঞ্চনার ইতিবৃত্ত এইভাবেই সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের সামগ্রীরূপে পরিগণিত হয়েছিল। তক্ষকের সংলাপে নাট্যকাহিনী গ্রন্থনের মুন্সিয়ানায় তার নিখুঁত পরিচয়।

তক্ষক—হা হা কর কি! কর কি। আমি পাইয়ে দিচ্ছি। দেখি, (সোনা লইয়া)। এ তোমার ও নয় ওর ও নয়। আমি মেহনৎ করে বিচার করে দিলুম। এ আমার। এইবারে যাও যথাস্থানে যাও।

(ফেলু ও ভেলুকে বহিষ্করণ ঃ পৃ. ৪১-৪৩)

মাদক দ্রব্যের সম্মোহন শক্তি কি ভাবে গ্রাম্যমহিলাদের সরলতাকে গ্রাস করে তাদের গৃহিণীর আসন থেকে বিচ্যুত করেছিল, উগ্র ইংরাজীয়ানা সমাজের প্রতিটি

রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করে বিলাসিতার বিষে জর্জর করে দিয়েছিল—তার জীবন্ত রূপ কেশিনী ও গ্রাম্যমহিলাদের কথোপকথনে ব্যক্ত হয়েছে।

ইংরাজদের প্রভুত্ব বিস্তারের প্রয়াস নাট্যকারের লেখনীকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। যারা ধনীসম্প্রদায় গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি, সাধারণ প্রজাদের দুর্গতির সঙ্গে তাদেরও নিপীড়ন ইংরাজ প্রভুত্ব বিস্তারের প্রচেষ্টায় সামিল হয়েছিল। চিত্রলেখা, শঙ্খিণী ও তক্ষক এর সংলাপের উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ্য।

তক্ষক—আপনাদের ঘরেই তাদের (আমাদের সব ভাই ভগিনীদের) নিশাভোজের আয়োজন করেছি।

চিত্রলেখা : আমাদের শয়ন ঘরটায় ভোজের ব্যবস্থা না করলে কি হত না ?

শঙ্খিণী : আপনি দেখছি ভালরকম আদর জানেন না। সেখানে সব মহিলারা আছেন। আপনারা অসন্তুষ্ট জানলে তারা আর থাকেন না। আপনাদের এই কুৎসিৎপূর্ণ দেহ দেখলে তারা আর থাকেন না।······আপনাদের এই কুৎসিৎ দেহ দেখলেই তারা ভিরমি খাবেন।

চিত্রলেখা : তাহলে আমরা কি করবো ?

শঙ্খিণী : হা হা আস্তে আস্তে কথা কন। আপনার কর্কশ বাক্যে তাদের কানে তালা লাগবে।

চিত্রলেখা : আপনার ঘরে অতিথি, আর আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবো ?

তক্ষক : ইনি দেখছি কিছুতেই মীমাংসার মধ্যে আসতে চাইছেন না। কেউ আছে। (সিপাই-এর প্রবেশ)। এই, এদের দুজনকে ধরে বাগানবাড়ীতে পুরে রেখে এস।

শঙ্খিনী : হা হা সেখানে জায়গা নেই। সেখানে আমার প্রিয় খান-সামান্না অবস্থান করছে।

তক্ষক : তাহলে গোয়াল বাড়ী।

শঙ্খিণী : কিন্তু······সেখানে প্রিয় ছাগ, মেষ আর কুক্কুট, গরু বিরাজ করছেন।

চন্দ্রবিন্দুর শেষ মন্তব্য শ্লেষাত্মক—শোষকদের প্রতি অন্তর্জ্বালাদগ্ধ বাক্যবাণ। এখানে সংলাপ ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁচেছে, নাট্যরসধারার গতিও অব্যাহত।

চন্দ্রবিন্দু : তাহলে এক কাজ করুন না কেন, আমাদের দুটিকে একটু মসলা-সিক্ত করে একটা সঘৃত উত্তপ্ত কটাহে বার দুই উল্টে পাল্টে নিয়ে উদরের একপাশে রেখে দিন না।

নাট্যকারের পরিহাসপ্রিয়তার আর এক অপূর্ব নিদর্শন শঙ্খিণীর সংলাপ—'হয়েছে ওই দূরে বট গাছের তলায় ওই যে সুদৃশ্য সুহাস্য চিত্রপটতুল্য বট ওর

তলায়, প্রিয় ভগিনী আপনাকে আমরা প্রচণ্ড ভালবাসি—' এই একটি কথাতেই বুঝে নিন। আপনাদের সুখী করতে আমরা সজলচক্ষে আপনাদের প্রকৃতির বক্ষে নিক্ষেপ করলুম। (অষ্টম দৃশ্য পৃঃ ৪৮—৫১)।

শাসনের নামে ইংরাজ শোষণের ইতিবৃত্ত নাট্যকারের লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে পরবর্তী সংলাপের কিছু কিছু উদ্ধৃত অংশে (চন্দ্রবিন্দুর উদ্দেশ্যে) 'যম মন্দিরে আপনাকে শীঘ্রই যেতে হবে। চিকিৎসক বলেছেন আপনার সেখানে চলে যেতে বড় কষ্ট হবে। তাই আমি আপনাকে সে পথের খানিকটা এগিয়ে দিতে এসেছি। আপনি আমাদের যে এতকাল পরে বন্ধু বলে চিনতে পেরেছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি ভাবিত হবেন না। মনে করছেন যে আপনি একলা এখানে এসেছেন, তা নয়। আপনি আমাদের বন্ধু। পাছে লোকজনের অভাবে কষ্ট পান তাই আপনার আত্মীয়স্বজনকে আগেই শ্মশানে পাঠিয়েছি। তারা আপনার অভ্যর্থনার জন্য ব্যগ্র হয়ে অপেক্ষা করছে। আরও বহুলোক আপনার পিছন পিছন আসছে :'

শোষণের কি মর্মান্তিক পরিণতি। এমনি করেই পরাধীন ভারতের অসহায় নাগরিকরা শোষিত নির্যাতিত হয়ে একের পর এক পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছে।

স্বাদেশিকতার যুগে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্য ভাবনা মূলতঃ শক্তিতত্ত্ব প্রচার নিয়ে। নন্দকুমার নাটকে বপুদেব এবং প্রতাপাদিত্য নাটকে বিজয়া চরিত্রের মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট। পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত নাটকেও নাট্যকারের সে প্রয়াস অব্যাহত। শক্তি উপাসনার ধারাবাহিক প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত নাটকেও প্রতীয়মান। দাদা ও দিদি নাটকের কর্মানন্দের ভূমিকা নাট্যরসকে ক্ষুণ্ণ করেছে। উদ্দেশ্য-মুখীনতার নগ্নতাকে নাট্যকার ঠিকমত ঢাকা দিতে পারেন নি।

পরদেশ প্রমত্ততার বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করতে কর্মানন্দের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন —'কর্মানন্দ, জান না মূর্খ। এ অসন্তোষের পরিণাম? এমন ফল জল শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা, এমন কুসুম বাহিনী স্রোতস্বিনী, এমন মরিচীমালীর সপ্তবর্ণ, রঙ্গময়ী শিখরিণী—এতেও তোমাদের মন উঠল না। এমন ওষধিপূর্ণ উপত্যকা সুবর্ণ-রাশিপূর্ণ শৈলমালা, মুক্ত পূর্ণ জলনিধি, এ পেয়েও তোমাদের তৃপ্তি হল না। তাই যার বহিরাবরণ শুধু সুন্দর নির্মম কঠোর,অভ্যন্তর এক পার্শ্বে তরলতা শূন্য, জীবশূন্য, চিরঅনাবৃত, চির অন্ধকার কবলিত তুষার প্রান্তর, উত্তাপহীন, প্রাণহীন চন্দ্রলোকে যেতে তোমাদের সাধ হল। তবে যাও, ভগবান কারুর ঐকান্তিক কামনা অপূর্ণ রাখেন না। প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে ঘূর্ণাবর্তে কাদম্বিনী তোমাদের অদৃষ্ট আকাশ আচ্ছন্ন করতে আসছে।'

ক্ষীরোদপ্রসাদের ব্যক্তিজীবনের জীবনদর্শনের বাণী অন্য দু একটি নাটকের মত এ নাটকেও প্রতিধ্বনিত। শ্রীমার শিষ্য বেদান্তধর্মের অনুরাগী নাট্যকার মাতৃনামের মাহাত্ম্য ও আবশ্যকতার কথা শুনিয়েছেন কর্মানদের মাধ্যমে। চন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে তার সংলাপে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মাতৃমন্ত্রগীতির উচ্চারণ উল্লেখ্য। চন্দ্রবিন্দু—শুনেছি তিনি শ্মশানেই বাস করেন। তাহলে শ্মশানেশ্বরী আমাকে ফিরিয়ে দাও। মাতৃভূমি এখনও যে তুমি আছ মা। তুমি নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়ে রেখেছ। ক্ষুধা পেলেও এখনও আহার দিচ্ছ। তৃষ্ণায় মাতৃস্তন্যের ন্যায় শীতল নীরধারা নির্ঝর স্রোতের সঙ্গে বর্ষণ করছ। তুমি যখন আছো আমার নেই কে ?

কর্মানন্দ : তবু ফিরলে হবে না। যখন শ্মশানে এসেছ, এখনই পুণ্যাগ্নি ভূমির সেবা কর। এখানে সকল স্বার্থ বলি দাও। আলস্য, ঔদাস্য, মান অভিমান সমস্তই পুণ্যানলে আহুতি প্রদান কর। দিয়ে ফেরো, আর পশ্চাতে চেয়ো না। আর শ্মশানকে সম্মুখ কোরো না।

দেশমাতৃকার বন্দনা আর স্বাদেশিকতার আদর্শ প্রচারই যদি নাটকটির মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে সে উদ্দেশ্য বহুলাংশে সিদ্ধ—এ কথা বলা চলে। তবে নাট্য প্রয়োজনের দিক দিয়ে এসব অংশ বাহুল্য এবং গুরুত্বহীন বলেই বিবেচিত হবে এবং এর ফলে নাট্যাবর্ত সৃষ্টির সম্ভাবনারও সলিল-সমাধি ঘটেছে।

'দাদা ও দিদি' নাটকের মূল সুর দেশমাতৃকা কমলা চরিত্রের মধ্যে পূর্ণরূপে প্রতিধ্বনিত। আর এই প্রতিধ্বনি কমলার সঙ্গীতরূপ খেদোক্তিতে। কমলার মাধ্যমে অন্ধমোহগ্রস্তদের প্রমত্ততা, পরানুকরণপ্রবৃত্তি ও পরনির্ভরতা ও অন্যদিকে ফিরিঙ্গিদের বেপরোয়া লুণ্ঠন ও অবাধ শোষণের ভয়াবহ পরিণতির সজীবচিত্র ক্ষীরোদ-প্রসাদের 'দাদা ও দিদি' নাটকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।

বাংলার অর্থনীতি সংক্রান্ত ঘটনা এর পূর্বে একমাত্র নীলদর্পণ নাটকেই সন্নিবেশিত হয়েছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে নাটকে এই বিষয়বস্তুটি যথাযোগ্য প্রাধান্য পায়নি। নীলদর্পণে নীলচাষীদের অর্থনৈতিক দুঃখদুর্দশা ও মুনাফাখোর নীলকর সাহেবদের স্বার্থসিদ্ধি পরম পরিণতিরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। ইংরাজ শাসনে দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মর্মান্তিক রূপটি নাট্যকারের পরিহাসচটুল লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। এই দিক দিয়ে নাটকটির বৈশিষ্ট্য অবিসংবাদিত। তবে প্রকৃত নাট্যসংজ্ঞার আধারে নাটকীয় ক্রিয়াকান্ড ক্লাইমেকস্ ও সিচুয়েসন সৃষ্টির দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় নাট্যমুহূর্তের জন্মদানের ব্যাপারে নাট্যকার নাট্যকৃতিত্বের দাবী করতে পারেন না।

দাদা ও দিদি নাটকের গল্পরস অকিঞ্চিৎকর, রূপক কাহিনী বিন্যাসের সুযোগও

ছিল কম। নাট্যবৃত্ত রচনার দিকে মনোনিবেশের চেয়ে নাট্যকার তার বক্তব্যকে রূপকের আড়ালে সোচ্চার করার ব্যাপারেই সবিশেষ যত্নশীল ছিলেন। তাই কেতাবী সংজ্ঞায় 'দাদা ও দিদি'কে একদিকে যেমন ঐতিহাসিক নাটকের পর্যায়ভুক্ত করার ব্যাপারে সবাই একমত হবেন না তেমনি অন্যদিকে প্রকৃত নাটক আখ্যায় ভূষিত করতেও অনেকে একমত হবেন না। তবে তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পটভূমিকায় রচিত একটি ব্যঙ্গাত্মক রূপক নাটক বা নাটিকা বলে দাদা ও দিদিকে চিহ্নিত করে নিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

'দাদা ও দিদি' নাট্যরচনার পিছনে নাট্যকারের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় প্রায় স্পষ্ট এবং সহজঅনুধাবনযোগ্য। ইংরাজদের বিলাসদ্রব্যের প্রচার ও প্রসার এর বিরুদ্ধে সোচ্চার নাট্যকারের দৃপ্ত আক্রমণাত্মক ভূমিকাও এ নাটকে উল্লেখ্য।

নাটকীয় ক্রিয়াকাণ্ড এবং নাটকের শৈল্পিক দিকটি 'দাদা ও দিদি' নাটকে সবিশেষভাবে উপস্থাপিত না করা হলেও নাটকের জোরালো বক্তব্য এবং রূপকের আড়ালে শোষিত ও শোষক ভারতবাসী (বঙ্গবাসী) ও ইংলণ্ডবাসীদের চরিত্রচিত্রনে বাস্তবতা ও মানবিক আবেদন নাটকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নাটকটি নাট্যসংজ্ঞার অক্ষরিক অর্থে নাটক না হলেও চিন্তাশীল নাট্যামোদীদের কাছে সমাদরলাভ করেছিল।

।। অশোক ।।

ইতিহাসে অশোক চরিত্র ব্যক্তিত্ব মণ্ডিত। ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক প্রতিভার দ্বারা তিনি ইতিহাসের গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। অশোকের মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পরে লিখিত সিংহল দেশের ইতিবৃত্ত অনুসারে রাজা বিন্দুসারের শতাধিক পুত্রের অন্যতম অশোক তাহার পিতার মৃত্যুর পূর্বে তক্ষশীলায় এবং উজ্জয়িনীতে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। বিন্দুসারের মৃত্যুর পরে পুত্রদের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হয় এবং তা শেষ পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরিণত হয়। নাটকে অবশ্য ঠিক কলহ নয়, অশোকের বিরুদ্ধে তার এক ভাই বীতশোক এর ষড়যন্ত্রের কথা কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতিহাস আরও বলে মন্ত্রী রাধাগুপ্তের সহায়তায় ভ্রাতাদের পরাজিত ও নিহত করে অশোক মগধের রাজ্য দখল করেন এবং বিন্দুসারের মৃত্যুর চার বৎসর পর অশোকের অভিষেক হয়।

নাটকটি মূলতঃ অশোকের পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করে তার পিতা বিন্দুসারের রূপকথার ধাঁচের দুই রানী ধারিণী ও চিত্রার পাটরানীর মর্যাদার দ্বন্দ্ব নিয়ে-প্রাধান্য নিয়ে। নাটকের সূত্রপাত কোন ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর আলোকপাতের মাধ্যমে নয়—দুই রাণীর প্রতি ভালবাসার পক্ষপাতিত্ব নিয়ে বিন্দুসারের অসহায় [illegible] প্রকাশের মাধ্যমে। কিন্তু ইতিহাসে সম্রাট অশোকের পারিবারিক জীবনের

কথা নেই। ভ্রাতৃবিরোধ প্রসঙ্গ, বীতশোকের সিংহাসন প্রাপ্তির আকাঙ্খা, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি নাটকের কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অশোকের পারিবারিক ইতিবৃত্ত বিশেষতঃ ভ্রাতৃবিরোধএর ইঙ্গিত মাত্র অশোকের রাজত্বকালে তার নিজের আদেশে পর্বত গাত্রে, শিলাস্তম্ভে ও গিরিগুহায় উৎকীর্ণ প্রায় চল্লিশখানি ধর্মলিপির কোনটিতেও নেই। পরন্তু তার পঞ্চম মুখ্য শিলালিপি থেকে জানতে পারা যায় যে সম্রাট অশোক তার অভিষেক-এর পরে ত্রয়োদশ বর্ষেও তার ভ্রাতা ও ভগিনীদের পরিবারবর্গের মঙ্গলের জন্য উদ্বিগ্ন ৪১ পারিবারিক ব্যাপারে গোলযোগ-এর উল্লেখ জনসাধারণের কাছে প্রকাশ্যে আত্মমর্যাদা ও সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে পারে শিলালিপিতে তাই ভ্রাতৃবিরোধের উল্লেখ অবাঞ্ছিত বলেই হয়তো এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

ধর্মলিপিগুলিতে অশোককে 'দেবতাদের প্রিয়' এবং 'প্রিয়দর্শী', এই দুই নামে অভিহিত করা হয়েছে। নাটকেও অশোককে 'প্রিয়দর্শী', বলা হয়েছে।' আমি শুধু মগধের রাণী নই, আমি প্রিয়দর্শী অশোকের জননী'।—(ধারিণী)।

নাটকে অশোকের এক স্ত্রী অনীতার কথা আছে। অশোকের শিলালিপিতে কিন্তু অনীতা ছাড়া অন্যান্য স্ত্রীর উল্লেখ আছে। শিলালিপিতে একমাত্র তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী কারুবাকী বা চারুবাকীর নাম আছে। অবশ্য পরবর্তী বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে অশোকের প্রাধানা মহিষী হিসাবে অসন্ধিমিত্রার নাম পাওয়া যায়। এছাড়াও আরও চার মহিষীর নামেরও সেখানে উল্লেখ পাওয়া যায়—এরা হলেন কারুবাকী বা চারুবাকী, দেবী, পদ্মাবতী এবং তিষারক্ষিতা। তার চার পুত্রের নামও সেই সূত্রে ইতিহাসের বিষয়বস্তুরূপে নথিভুক্ত হয়েছে। এই চারিপুত্র হলেন মহেন্দ্র, তিবর, কুণাল এবং জলৌক। শিলালিপিতে দ্বিতীয়া মহিষীর গর্ভজাত পুত্ররূপে একমাত্র তিবরের নামই পাওয়া যায়। সিংহল দেশের ইতিবৃত্তে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক হিসাবে অশোকের পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রার কথা জানা যায়। আগেই বলা হয়েছে অশোকের শিলালিপিতে এদের উল্লেখ নেই। এমনকি নাটকে যে পুত্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা—সেই কুণালের নামও শিলালিপিতে নেই। নাটকে অবশ্য মহেন্দ্রর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটেছে। নাটকের কুশীলবদের মধ্যে অশোকের স্ত্রী অনীতার নাম পরবর্তীকালে লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় নি। নাট্যকার কোথা থেকে পেলেন তা আমাদের জানা নেই। অপর চার মহিষীর মধ্যে কোন একজনকে বোঝাবার জন্যে নামটি নাট্যকার ব্যবহার করে থাকলে অন্য কথা। অবশ্য সম্রাট অশোকের পারিবারিক জীবনের কথা অল্পই জানা যায়।

রাধাগুপ্ত চরিত্রটি ঐতিহাসিক। রাধাগুপ্তের সহায়তায় অশোকের সিংহাসন লাভ ইতিহাসসম্মত। ইতিহাসে আছে 'মন্ত্রী রাধাগুপ্তের সহায়তায় অশোক তাহার ভ্রাতাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া মগধের সাম্রাজ্য হস্তগত

করেন। এই ভ্রাতৃবিরোধের কারণে বিন্দুসারের মৃত্যুর চারি বৎসর পরে অশোকের অভিষেক হয়।...

'ইতিহাস অর্থাৎ অশোকের শিলালিপি বলে অশোকের ধর্মলিপিতে যে ধর্মের কথা লেখা আছে তাতে দার্শনিক তত্ত্ব কিছু নেই এমন কি দেবদেবীর পূজার কথাও নেই। পিতামাতার আজ্ঞা পালন, দাস ও ভৃত্যদের প্রতি সদয় আচরণ, ব্রাহ্মণ, শ্রমন, বন্ধুবান্ধব, জ্ঞাতি-প্রতিবেশী ও অন্যান্য পরিচিতজনকে ধন দান, অহিংসা, চিত্তশুদ্ধি, আত্মসংযম, সর্বপ্রকার ব্যসন পরিহার, জীবে দয়া প্রভৃতি যে সমুদয় নীতি পালন করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্তব্য অশোক কেবলমাত্র তাহাই ধর্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। গৃহস্থের পক্ষে ভগবান বুদ্ধ যে ধর্ম নির্দেশ করিয়াছিলেন অশোকের ধর্ম যে তাহারই পুনরুক্তি মাত্র ইহাই বহুজনগ্রাহ্য মত।'৪১ নাটকেও শেষাংশে অশোকের সংলাপে এই ইতিহাসিক তত্ত্বটির প্রতিধ্বনি পাওয়া গেছে। শেষাংশের সংলাপে অশোক চরিত্রে দেবতার ওপর আস্থার অভাবের কথাও বলা হয়েছে।

নাটকের শেষদিকে অধ্যাত্মিকতার প্রবল বন্যায় 'চণ্ডাশোক' ধর্মাশোকে রূপান্তরিত হতে চলেছে। ইতিহাস কিন্তু বলে কলিঙ্গজয়ের পর অজস্র লোকক্ষয় ও রক্তবন্যায় অশোকের চিত্তচাঞ্চল্যের সূচনা এবং যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি দেখে তার প্রতিজ্ঞা—'আর নয়, এবার ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করবেন তিনি প্রেমের মূল্যে ও প্রীতিপ্রচারের মাধ্যমে। কলিঙ্গ রক্ত স্রোতে ভাসিয়া গেল। সম্রাট অশোক জয়লাভ করিয়া কলিঙ্গ প্রদেশ তাহার সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে এক লক্ষ লোক নিহত, দেড় লক্ষ লোক দেশান্তরিত এবং উহার বহুগুণ লোক যুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যুদ্ধের এই সর্বনাশা রূপ ও ফল দেখিয়া বিজয়ী সম্রাট অশোকের মন গভীর শোক, দুঃখ ও অনুশোচনায় পূর্ণ হয় এবং অল্পকাল পরেই সম্ভবতঃ উপগুপ্ত নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। এই ধর্মের প্রভাবে তাহার জীবনধারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়।......তিনি আর কখনও যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন এবং কলিঙ্গ বিজয়ের পরবর্তী তাহার দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে তিনি আর কোনও যুদ্ধ করেন নাই। ৪২

৪১। অশোকের ৫ম শিলালিপির উদ্ধৃতি (বাংলা ভাষায় অনূদিত) অবলম্বনে

42. E Hultzsch Cerpus Inscription Indicarum, Vol I. Oxford, 1925. D. R. Bhandarkar Asika, Calcutta 1925. V. A. Smith, Asoka—The Buddhist Emperor of India, Oxford 1919: Benimadhab Barua, Asoka and his Inscription, Calcutta 1945 অবলম্বনে

নাটকে অবশ্য কুণালের অগ্নিদহন ও অশোক কর্তৃক সন্ন্যাসী শাঙ্গধরের প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞার নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেয়েছে। এরপর বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কৃপানন্দের আবির্ভাব এবং অলৌকিকভাবে দেব-মহাত্ম্যের জোরে কুণালের অগ্নির মধ্য থেকে অক্ষত দেহে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি ঘটনার পরই চণ্ডাশোকের ধর্মাশোকে রূপান্তর। ভ্রাতৃবিরোধের পর এবং কলিঙ্গ বিজয়ের পূর্বেই চণ্ডাশোকের ধর্মাশোকে পরিবর্তিত হওয়ার ব্যাপারটি ইতিহাস সমর্থন করে না। তবে নাট্যকারের স্বপক্ষে একটু বলবার আছে এই যে এতে ঐতিহাসিক ঘটনার অনুবর্তন এবং একটি ঐতিহাসিক সত্যকে কাহিনী বিন্যাসের ধারায় অশোকের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কলিঙ্গ যুদ্ধের নিষ্ঠুরতার প্রতিচ্ছবি কুণাল ও শাঙ্গধর-এর নিষ্ঠুর হত্যাজ্ঞার মধ্যে প্রতিফলিত। কৃপানন্দকে ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তর প্রতীকরূপে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

চিত্রার আক্ষেপ, বিন্দুসারের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি চিত্রাকেই তিনি ভালবাসেন। কি করবেন চাণক্য পণ্ডিতের আনা বড় রাণী। তাছাড়া সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি অনুযায়ী বড় রাণীরই বসন্তোৎসবে রাজার পাশে সিংহাসনে বসার অধিকার। কৌতুক দৃশ্য হিসাবে ঘটনাটি উপভোগ্য।

বীতশোকের ছেলেমানুষী কাণ্ড, প্রশাসনিক কাগজপত্র ছিঁড়ে দেওয়ার বালকসুলভ আচরণ প্রসঙ্গ রঙ্গরস উপস্থাপনে কিছুটা ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু যা কিছুই উপভোগ্য হোক না কেন, গুরুগম্ভীর বিষয়বস্তু নিয়ে এ দৃশ্যে সকলেই লঘু দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে। বিন্দুসার কিছুটা ক্ষুব্ধ, চিত্রার টিপ্পনি দৃশ্যটির সৌন্দর্য :—একটা আধটা আসবাব ভাঙ্গলে তো মাথা খুঁড়তেন দেখছি। এ কে রাম তায় আবার সুগ্রীব সহায়। বীতশোকের বন্ধু ধুন্ধুর আগমন কাহিনীবিন্যাসের দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় এবং পরবর্তী ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে এনেছে।

বিন্দুসার চরিত্রের যুক্তিবাদ লক্ষণীয়, তবে চরিত্রটিকে ঠিক মানবিকরূপে অভিষিক্ত করা হয় নি। একদিকে চিত্রার কাছে প্রতিশ্রুতি, অন্যদিকে পুত্রস্নেহ, কর্তব্যবোধ—দুয়ের সংঘাত স্পষ্ট নয়। অশোকের ব্যাধি সে সংঘাতের ধারণাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

ধারিণী ও অনীতার কথোপকথনে ভাগ্যকে মেনে নেওয়ার অসহায় অবস্থা সার্থকরূপে প্রকাশিত। নিদারুণ বেদনার অনুভূতি মূর্ত হয়ে এক হতাশার চিত্রও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ধারিণী চরিত্রে প্রথমে যে নির্লিপ্ততার ভাব ছিল ক্রমে ক্রমে সে ভাব অন্তর্হিত হয়েছে (তিনি নিজেই অশোকের আচরণের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন,' ত্যাগে অভ্যস্থ যোগী আর কর্মহীন অপদার্থ এরা ভিন্ন অন্য কেহ ভবিষ্যতের পার্থিব লোভের আশা ত্যাগ করে না।') চিত্রার বৈষয়িক বুদ্ধিও তারিফ করার মত। অশোকের পুত্র কুণালকে যদি প্রজারা রাজা হতে বলে? চিত্রা

বসন্তোৎসবে যোগ দিতে চলেছে। বেশভূষার আয়োজন প্রস্তুত। কিন্তু মন্ত্রী রাধাগুপ্ত প্রতিবন্ধক। প্রথা নিয়ে কথা। পাটরাণীর সম্মান বড়রাণীর প্রাপ্য। অসহিষ্ণু চিত্রা যখন বুঝতে পারল শক্তিমান মন্ত্রী থাকতে তার আশাপূরণ হওয়ার আশা কম তখন তার মূর্চ্ছা যাওয়া যেন মেলোড্রামা সিচুয়েসনের স্যামিল। পুত্রকে যদি ত্যাগ করতে রাজী থাকেন রাণী ? এ প্রশ্নে বিন্দুসারও চঞ্চল কিন্তু ধারিণীর নাটকীয় প্রবেশ এবং পুত্রকে ত্যাগ না করার সংকল্প যেন সব সমস্যার মীমাংসা করে দিয়েছে। মায়ের প্রাণ সমস্ত দেবতার দ্বারে ভিক্ষালব্ধ আশীর্বাদ বহন করে নির্বাসিত পুত্রের সঙ্গে বনে গেছে। ধর্মরাজত্ব প্রতিষ্ঠার বাস্তব রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে ধারিণী রাধাগুপ্তের আচরণ দেখে। মহাভারতের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা সম্ভবতঃ নাট্যকারের স্মরণে এসে থাকবে। নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্র-রৈবতক-প্রভাসের ভাবধারার দ্বারা ও নাট্যকার অনুপ্রাণিত হতে পারেন।

অনীতা গৃহত্যাগ করতে চলেছে—স্বামীর অনুগামিনী হবে বলে। কিন্তু অশোক ক্ষুব্ধ, তাকে সঙ্গে রাখতে নারাজ। অনীতার আশামত হৃদয়ের অন্তিম প্রার্থনা প্রতিজ্ঞার সুরে ভবিতব্যের ছদ্মবেশে উচ্চারিত। আপনার মূর্তিকে পূজা করে এসেছি, যদি আমি সতী হই তাহলে এই নির্বাসিত স্বামীর সাহায্য নিয়েই আপনাকে সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে। কাহিনীর পরিণতি সেই কথাই প্রমাণ করেছে।

দৃশ্য পরিকল্পনা, পরিবেশ রচনা, প্রভৃতি সবদিক দিয়ে দ্বিতীয় অংকের ২য় দৃশ্যটির অভিনবত্ব অনস্বীকার্য। দৃশ্যটির মধ্যে পরবর্তী ঘটনার বীজ নিহিত, নাটকের পরিণতির ইঙ্গিতও দৃশ্যটিতে রয়ে গেছে। বন্ধুর অনধিকার চর্চার অবাঞ্ছিত মন্তব্যে বিরত না থাকার এবং বাচালতার বিরুদ্ধে বলিষ্ট প্রতিবাদ এখানে সোচ্চার। গুরুগম্ভীর পরিবেশের পাশে নাট্যকারের অনাবিল হাস্যরসসৃষ্টির প্রচেষ্টাও অব্যাহত। অনুপ্রাসের একটু নমুনা :—

ধুন্ধুমার—বরাতটা জানার ওপর জানা
বীতশোক—তাতে কি মানা ?
সকলে —কিছু না

হঠাৎ এই লঘুপরিবেশ সৃষ্টির যৌক্তিকতা নিয়ে অবশ্যই মতভেদ থাকতে পারে।

রাজজ্যোতিষী শার্ঙ্গধর ব্যাধিগ্রস্ত অশোককে ভূম্যাসনে বসতে দেখে পরম তৃপ্তি লাভ করেছেন। পুত্রভাগ্যের জন্য বিন্দুসারকে অভিনন্দিতও করেছেন। মূর্খ রাজা বিন্দুসার জ্যোতিষীর ভাগ্যগণনার সাংকেতিক ভাষা বুঝতে পারেনি। মূর্খ বীতশোক ও তদীয় অপগণ্ড বন্ধু ধুন্ধুমার তো আনন্দে আটখানা। পুত্রভাগ্যের কথা বলতে বীতশোকের মত পুত্রের জন্যই তো এই দুর্লভ ভাগ্যের কথা বলা। রবীন্দ্রনাথের 'রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি, মূর্তিভাবে আমি দেব, হাসে-

অন্তর্যামী।' বিন্দুসার অশোকের প্রতি বিরূপ হতে বাধ্য হয়েছিলেন কিন্তু নিখিল পিতৃহৃদয়ের লুকানো স্নেহ শেষ পর্যন্ত লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি, নিজের দোষে কষ্ট ভোগ করবে তাতে আমি কি করবো ?

শার্ঙ্গধরের জন্য ভাগ্য গণনার রীতিও উল্লেখযোগ্য এবং এক গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক। মহারাজ,মন্ত্রীবর্গ সভাসদবর্গ আপনারা নিবিষ্টচিত্তে আমার অদৃষ্ট পরীক্ষা করুন। এ মানব-বিদ্যা মনোযোগ দিয়ে না শুনলে এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। এরপরের সংলাপ অবনীন্দ্রনাথের 'ভাগ্যবিচার' গল্পকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই দুই রাজকুমারের মধ্যে যার শ্রেষ্ঠ আসন, শ্রেষ্ঠ আহার তিনিই এই শক্তিমান নরপতির উত্তরাধিকারী। পাশ্চাত্ত্য নাটকে অদৃষ্টলিখনের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা—এ নাটকে কাহিনী বিন্যাসের গুণে এই ভবিষ্যৎবাণী বুদ্ধিমান অশোককে অনুপ্রাণিত করেছে। আবার নির্বোধ রাজা, চিত্রা, রাজপুত্র বীতশোক এর কদর্থ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে নিজেদের সর্বনাশের বীজ বপন করেছে।

তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে চিত্রার প্রতিহিংসার এবং রাজ্য নিষ্কণ্টক করার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে মহেন্দ্র কুণালকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে পথে। কুণাল বুঝতে পারে না এ আত্মগোপন কিসের জন্য। কিশোর কুণালের অভিজ্ঞতাও কম। কিন্তু নাটকে কুণাল যেন দূরদর্শী—বয়স্ক দার্শনিক। সংসারের একমুখ আলো, কিন্তু সেটা সংসারের ছলনা, আসল মুখ অন্ধকার। মহেন্দ্র বারবার বলেছে কুণালকে ছেড়ে কোন প্রাণে সে একা যাবে। কিন্তু বিপদের সময়ে ঠিক এর বিপরীত। শেষ পর্যন্ত প্রাণরক্ষার তাগিদে সে বলেছে 'তাহলে আমি যাই ?' এটা কি অসঙ্গতি ? ঠিক তা নয়, এটাই রূঢ় বাস্তব। তাছাড়া মহেন্দ্রর প্রাণরক্ষার একটা নিজস্ব 'লজিক' রয়েছে। 'রাজার পুত্র হয়ে হীনঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে পারলুম না।' এরপর নিদারুণ বিপদে কুণালের কণ্ঠে গান নাটকীয় বাস্তবতার শর্ত মানে নি। শুধু কি গান, সংলাপও ভারসাম্য রাখতে পারে নি। এর ফলে কুণাল চরিত্রটি মোটেই জীবন্ত হতে পারেনি। এটির মারফৎ আদর্শ প্রচারে-দার্শনিক মতবাদ প্রচারে নাট্যকার কিছুটা সুবিধা, পেয়েছেন। এরপর একই দৃশ্যে ক্ষুধার্ত অশোকের মহেন্দ্রর কাছ থেকে খাদ্য কেড়ে খাওয়া যেন এক রূঢ় বাস্তব চিত্র—এখানে ক্ষণিক অবকাশে অশোক চরিত্রের বাস্তবরূপের ঝিলিক দেখা যায়। হতবাক্ মহেন্দ্রের সংলাপ সংক্ষিপ্ত হলে ভাল হত, তবুও খণ্ডাংশ উল্লেখ্য—'স্নেহময় পিতাকে আমায় ফিরিয়ে দাও।'

কণিষ্ক মগধের সব খবরই রাখে। জাতে না ওঠার কারণ বলছিল সে ক্ষত্রিয় হতে হলে মগধ রাজাকে কন্যাদান করতে হবে। অনীতার মন্তব্য 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষেত্রির আচরণ দেখে তারা ছেলেকে বিনা দোষে ঘর থেকে দূর করে নিঃসম্বল করে ছেড়ে দেয় আর তুই পথের কাঙালিনীকে কুড়িয়ে এনে যথাসর্বস্ব তাকে ধরে দিলি।

তারা হল কিনা তোর চেয়ে উঁচু।' কাহিনীর মধ্যে এই বৈপরীত্যের সমাবেশ লক্ষ্য করার মত। অনীতা অপমানের প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেয়ে যায় মুঠোর মধ্যে 'মগধের রাজা আমায় বড় অপমান করেছে। তোর অপমান সে তো আমারই অপমান মা'। কিন্তু কণিষ্ক একটা মূল্যবান কথা বলতেও ভুলল না। 'দেখ, মগধের রাজা তোকে অপমান করেছিল বলেই তোকে আমি পেয়েছি। না হলে তোকে কোথায় দেখতে পেতুম মা? এর পর কাহিনীর চমৎকারিত্ব, মিলনান্ত নাটকের স্বাভাবিক পরিণতির দিকে নাটকের গতিবিধি।

দৈববাণীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ অশোকের মনে সাময়িক নৈরাশ্য ও হতাশার দীর্ঘশ্বাস তার পূর্ব দৃশ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রাচীরে কেমন যেন বেমানান এবং অশোকের চরিত্রের সঙ্গতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে নি, তবে মানুষের মনে আশা নিরাশা আনন্দবেদনার তরঙ্গোচ্ছ্বাস অহরহ ঘটছে, সেই দিক দিয়ে বিচার করলে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যায়। এ দৃশ্যে অশোকের দীর্ঘ সংলাপ কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট। বিষধর সর্প দর্শনে আত্মাহুতি দেবার সংকল্প, বিষপান এবং তার পর অলৌকিক ঘটনা সমাবেশ ঐতিহাসিক নাটকের পরিমণ্ডল থেকে নাটকটির বিচ্যুতি ঘটিয়েছে। কাহিনী বিন্যাসের দিক দিয়ে এর অবশ্য প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া এটি একটি কিম্বদন্তীরও অন্তর্গত। অশোক বিষপানের পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। বিষে বিষে বিষক্ষয়—মহাভারত কাহিনীর অনুরূপ।

রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টিতে নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অনীতা যে ইতিমধ্যে বন্য রাজার বেটিতে রূপান্তরিত হয়েছে সে খবর অশোকের জানা নেই। তাই মগধ রাজ্য-প্রাপ্তির বিনিময়ে তার কাছে এক কঠিন সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। নাটকের ঘাতপ্রতিঘাত হিসাবে দৃশ্যটি মূল্যবান। কণিষ্ক দেখছে মগধ রাজার পুত্রকে বেটি দিলে জাতে উঠতে পারে। কিন্তু অশোক বিয়ে করবে চোখ বেঁধে। যতদিন না সিংহাসনে বসবো, ততদিন কন্যার মুখ দেখবো না। চমৎকার শর্ত। 'তাহলে বল, আমার বেটিকে পাটরানী করবো।' নাটকের climex। বিয়ে করা এক জিনিষ পাটরানী করার সমস্যা তার পিতার বর্তমান সমস্যা। বড়রানী থাকতে কেমন করে পাটরানী করি নববিবাহিতা কন্যাকে? সংঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্বের একটু নমুনা—'মাতার অপমান আমার প্রাণে যত কষ্ট দিচ্ছে, আমার নির্বাসনে আমার সে কষ্ট হচ্ছে না। আমিও আবার তাই করবো? 'অগত্যা মগধ রাজ্যলাভের প্রত্যাশায় অশোককে বিবাহে সম্মতি দিতে হয়। কিন্তু পুরোহিত ব্রাহ্মণ চাই যে। বিনায়কের নাটকীয় প্রবেশ সুপরিকল্পিত, সাজানো অথচ চমকপ্রদ। ঘটনা বিন্যাসের গুণে নাটকে কৌতূহল সদাজাগ্রত, মিষ্টি রোমান্টিক হাওয়ায় নাটকে বেশ একটা প্রত্যাশার স্নিগ্ধতা বিরাজমান। অদৃষ্টের নিপুণ পরিচালনার কথা স্মরণ করে তাই বিনায়ককে বলতে শুনি, এক পেতে দুই পেলুম।······এ কি লীলা করছিস মা?'

চিত্রাচরিত্র ধীরে ধীরে নিষ্ঠুরতার প্রান্তসীমানার দিকে এগিয়ে চলেছিল, সেখানে

বিন্দুসারের অসহায়ত্ব চোখে পড়ে। 'তোমার পিতার নয়ন চঞ্চল হচ্ছে, তিনি সেই হেতু বালক দুটিকে হত্যা করতে ইতস্ততঃ করছেন।'

নাটকে বীভৎস রসের অবতারণা করা হয়েছে কুণালের জীবন্ত অবস্থায় চক্ষু উৎপাটনের মাধ্যমে। এ সম্পর্কে ইতিহাস কি বলে তা স্পষ্ট নয়। যে বিন্দুসারের বিরুদ্ধে চিত্রার অভিযোগ ছিল তিনি রাজোচিত দৃঢ়তা দেখাতে পারছিলেন না—সেই বিন্দুসারই নৃশংসতার চরমে উঠেছেন। এতে চারিত্রিক অসঙ্গতি চোখে পড়ে। যে চিত্রা কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত রাজ্য নিষ্কণ্টক করার জন্যে দুটি কিশোরকে হত্যা করতে ব্যাগ্র হয়েছিল—সেই চিত্রার ভূমিকা এ বারে বিপরীত। 'দোহাই মহারাজ রক্ষা করুন। এ উন্মাদ বালক, দোহাই মহারাজ বালককে ক্ষমা করুন।'

বসন্তোৎসবের জন্য উৎগ্রীব হয়েছিল চিত্রা। নৃশংসয়তার পটভূমিকার অনেক রক্তের নদী পার হয়ে বসন্তোৎসবে যোগ দেওয়া এখন নির্মম পরিহাস। এসো, আমার সঙ্গে, উৎসব করবে এসো। কিন্তু ট্র্যাজেডি হল—এই উৎসবই কি করতে চেয়েছিল চিত্রা!

ঈপ্সিত সম্মান এখন চিত্রার মুঠোর মধ্যে। বিন্দুসার মরীয়া। বসন্তোৎসবে চিত্রা বসবে রাজার সিংহাসনের পাশে। যে দৃশ্য দেখিয়ে প্রতিশোধ নেবে রাজা বন্দি রাধাগুপ্ত ও বিনায়কের ওপর।······আসন্ন ঝড়ের সংকেতময় পরিবেশ, একটু একটু করে মেঘ জমছে। এর সঙ্গে সংস্কারও আছে। নির্বোধ পুত্র, সিংহাসনে ওঠবার সময় পিছু ডাকা কেন?

বিন্দুসারের চরিত্র শেষাংশে পুরুষকার ও দৃঢ়তার প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত। 'রাণী, চলে এস, হতভাগ্য দাঁড়িয়ে দেখুক মৌর্যবংশীয় রাজা বিধাতার ন্যায় স্বেচ্ছায় বিধি গঠন করে থাকে।' অদৃষ্টবাদ বনাম পুরুষকারের সংঘাতের দৃষ্টান্ত।

রাজ্যপ্রাপ্তির শর্ত হিসাবে কণিষ্কের কাছে প্রতিশ্রুতি পালনের কথা। অনীতা তখনও অনার্য কন্যা অশোকের কাছে। 'সকলে চক্ষু নিমীলিত কর আমি আমার হৃদয় ছিঁড়ে দূরে নিক্ষেপ করছি। এস অনার্যনন্দিনী, এস যে স্থান মগধেশ্বরী পাটরাণীর অধিকৃত, তুমি আজ সেই স্থান অধিকার করা।' এরপর দৃশ্য-পরিকল্পনার কৃতিত্বে কমেডি নাটকের শোভা বর্ধিত হয়েছে সংলাপে, ঘটনা সংস্থাপনে। এদিকে উপেক্ষিতা অনীতার প্রতিজ্ঞা পূরণ হয়েছে—ভবিষ্যৎ বাণীও সফল হয়েছে।

এ কি অনীতা? তেজস্বিনী তুমি?

"তোমার সাহায্যেই মহারাজ অশোক সিংহাসনে উপবেশন করলেন। জয় সতীর জয়।" এর পরের অংশ অভিনয় বর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে মূল-কাহিনীর কোন যোগ নেই।

অন্যান্য নাটকের মত এ নাটকও সংলাপসমৃদ্ধ। নাট্যকারের স্বভাবসুলভ হাস্যরসাত্মক সংলাপ নাটকের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

প্রথম অংক। প্রথম দৃশ্য ঃ—চিত্রা সিংহাসনে বসতে পারবে কিনা প্রশ্ন করেছে। তার উত্তরে বিন্দুসার—'তুমি আমার প্রাণে বস, বক্ষে বস, স্কন্ধে বস।' আরও কৌতুককর প্রত্যুত্তর, চিত্রা বলেছে—ঘাড়ে বসেও আমার ভারী লাভ, আপনি ঘাড় নাড়া দিন আমি অমনি টুপ করে পড়ে মরি। মেয়েদের স্বাভাবিক দৈনন্দিন সংলাপও বিরল নয়। যদি বসতে (সিংহাসনে) না পাই তাহলে বাপের বাড়ী চলে যাবো।'

অন্যান্য নাটকের মত এ নাটকেও সংলাপ কয়েক দৃশ্যে প্রত্যাশিত মানে পেঁচেছে। সংলাপ যে কত জীবন্ত ধুন্ধুর মারফৎ তার নমুনা দেওয়া যেতে পারে। 'ও আপনাদের জড় পর্যায়েও রাখবেন না। ও ঢাকীশুদ্ধ বিসর্জন করুন।' তারাশঙ্করের দুই পুরুষে এই ধরনের সংলাপের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ধুন্ধুর আস্ফালন প্রকাশের ভঙ্গিটিও চমৎকার। 'রাধাগুপ্ত মন্ত্রীগিরির কি জানে? বোনাই যখন শিষ্যকে উপদেশ দিত রাধাগুপ্ত আট চালার একপাশে বসে গাঁজা টিপতো। ও আবার লেখাপড়া শিখল কবে তা মন্ত্রীগিরি করবে?'

২য় অঙ্ক। ১ম দৃশ্য ঃ—বিনায়ক বাকচাতুর্যে বিদূষক, ভাঁড় নয়। তার সংলাপ মাঝে মাঝে দার্শনিক গুণসম্পন্ন। শাঙ্গধর রাজবাড়ির নিশানা জানতে চাইলে বিনায়ক বলেছে—যে পথ ধরে যাবে সেই পথের শেষে রাজবাড়ি। তবে তোমরা সন্ন্যাসী ফকির মানুষ, তোমাদের চোখে রাজা প্রজা দুই সমান।

৩য় অঙ্ক। ৪র্থ দৃশ্য ঃ—তক্ষশীলার রাজা কণিষ্ক-এর সংলাপে নূতনত্বের স্বাদ আছে। অনার্যরাজার ভাষাও ঠিক অনার্যসম্মত নয়। সংস্কৃত নাটকের রীতি এখানে লক্ষণীয়—'কোথায় আছিস আবাগী আয় না, বুড়ো রাজা তোর জন্যে হেদিয়ে মল।'

কুণাল চরিত্র মারফৎ দার্শনিক মতবাদ ও আদর্শ প্রচারে নাট্যকার সচেতন। 'ভাই আমি দেহ কারাগারে তাসের ঘরে বন্দি। বন্দির যে কোন সুখ নেই ভাই। যদি মুক্ত করার পথ জানিস দেখিয়ে দে।' এ যেন রবীন্দ্রনাথের নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর সংলাপ।

৪র্থ অঙ্ক। ৩য় দৃশ্য ঃ—হবুচন্দ্র রাজা বীতশোকের গবুচন্দ্র মন্ত্রী ধুন্ধুর সংলাপও চরিত্রানুগ, আস্ফালন উপভোগ্য। আপনি চোখ বুজে থাকবেন, আমি খরখর করে চালিয়ে দেবো। আমি চাণক্য পণ্ডিত সম্বন্ধী, বোনাই কানে কানে কত কথা আমাকে বলে গেছে, তা কি রাধাগুপ্ত জানে। সে বুড়ো মন্তর পাবে কোথায়? রামপ্রসাদী প্রবাদ সম্বলিত সংলাপও আছে। বীতশোক ও ধুন্ধু পরস্পরের সম্পর্ক বোঝাবার জন্যে সংলাপের সার্থক প্রয়োগ-বীতশোক ঃ—আমি রাজা, তুমি মন্ত্রী—আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী।······অশোকের দুই পুত্র পালিয়ে গেল তারাই রাজ্যের প্রবলতম প্রতিবন্ধক সে কথা বুঝতে না পারার জন্যে চিত্রার তিরস্কার—'এই

বুদ্ধি নিয়ে তুমি ভবিষ্যতের মন্ত্রিত্ব প্রত্যাশা কর ?' শূন্য আস্ফালনের পটভূমিকায় চিত্রার এই মন্তব্য সত্যি চমৎকার। মরাকে মেরেছে, জীবিতকে হত্যা করতে পার নি।

বিদূষক বিনায়কের বুদ্ধিদৃপ্ত সংলাপ দেখে তাকে বুদ্ধিজীবী বিংশশতাব্দীর মানুষ বলেই মনে হয়। নাশ করাই আমার স্বভাব। তোমার কাছে খেয়ে পেট মোটা করে এতদিন কেবল আত্মনাশ করেছি—এখন তোমার হাত এড়িয়ে না খেয়ে শীর্ণ হয়ে সর্বনাশ করছি। বিনায়কের বক্রোক্তি মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।' তার বিচার ফিচার কেন রাণী। অমনি অমনি মশানে পাঠিয়ে দাও। বিচার করতে গেলে তোমার পরিশ্রম হবে।'

এরপর কুণালের উক্তি ত্রিকালদর্শীর সংলাপ যেন চিত্রাকে দেখে—এক কুৎসিৎ কীট তোমার তরল হৃদয়ের ভিতরে কি এক বীভৎস লীলা করছে। দেখতে পারছো না ?...তোমার ভিতরে কি এক অপূর্ব মধুর লীলা। বিন্দুসারের কথার প্রত্যুত্তরে— 'আপনি দেখিয়েছেন তাই দেখছি ক্ষণিক আলোক। পাশে বিপুল অন্ধকার।'

৫ম দৃশ্য :—কণিষ্ক ও মধার মধ্যে কথোপকথনে সংলাপে বাস্তবতা ও বৈচিত্র্যের সন্ধান মিলবে।

রাজা কন্দুর এল, খবর লে। ভাল, জামাই রাজার মাকে কেন দেখছিল, কেন রে ?

তাকে কি মেরে ফেলা হয়েছে ? (এর উত্তরে মধা—এখনও তো মারেকলি। এরপর মারবেক্। এই মোছবটা গেলেই মারবেক।)

মোরা শালারা আইচি আর মারেক কেরে ? সংলাপে মাধুর্য—শ্রুতিমধুর অথচ হাস্যরসাশ্রয়ী। এটা কোথাকে এলুম রে ? পায়ে কি ঠেকে রে ? আরে দেখ শালা, পায়ে কি ঠেকে দেখ।...আরে শালা মশানে আনলি কেন রে ?...পায়ে হাড় বাজজে। কত শালা গরীবের জান গেছেরে। ওরে শালা চল চল।

উচ্চ দার্শনিকভাব-সমৃদ্ধ সংলাপের নমুনাও পাওয়া যাবে কুণালের উক্তি থেকে—আঁখি আঁখি তুমি গেলে, কিন্তু কই আমার দৃষ্টি তো গেল না।...মানুষ সব দেখে, কিন্তু দর্পণ না হলে নিজের দর্শন পায় না। বন্ধু, তুমি আমার দর্পণ, তুমি আমার প্রাণ।

পরিবর্তিত ধুন্ধুর কিছু কিছু সংলাপে রহস্যময়তার ছাপ আছে। 'কি উজ্জ্বল, হরিণ দাঁড়ালো কাক পালাল।'

॥ বাংলার মসনদ ॥

বাংলার মসনদ নাটকটিতে নাট্যকাহিনী গ্রন্থনে ঐতিহাসিক নিষ্ঠা ও আনুগত্য যতই থাক না কেন তাতে নাট্যবৃত্ত রচিত না হওয়ায় নাটকের নাটকত্ব বা ধর্ম বজায় থাকে নি। সমসাময়িক ঐতিহাসিক নাটকের উপাদান হিসাবে নাটকে দেশাত্মবোধক ভাবধারার স্রোতে এক অলস বিলাসপ্রিয় কর্তব্যচ্যুত নবাবকে কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে কল্পনা করে তাকে অবিশ্বাস, শঠতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতো মানসিকতার সম্পদে নাট্যকার সমৃদ্ধ করতে পারেন নি। তার স্বভাবসিদ্ধ মায়া মমতা, ভদ্রব্যবহার, সদিচ্ছা ও সৌহার্দ্য স্থাপনের স্বাভাবিক প্রচেষ্টায় তিনি নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছেন। নাটকের বৃত্ত রচনায় সরফরাজের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নাট্যকার কিছুটা কাজে লাগিয়েছেন। নবাব মহিষী রাবেয়ার গৃহত্যাগ ও নির্বাসন এবং শেষপর্যন্ত তাকে আশ্রয়দানের ঘটনা প্রসঙ্গে নাটকে আবর্তসৃষ্টির সামান্য অবকাশটুকুও নাট্যবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টায় নাট্যকারের আংশিক সাফল্য লাভের কথা অস্বীকার করা যায় না।

কেন্দ্রীয় চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের বিন্দুকে কেন্দ্র করেই নাট্যবৃত্ত রচনার কাজে নাট্যকার মনোনিবেশ করেছিলেন এবং এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনিবার্য ফলশ্রুতি স্বরূপ ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে সরফরাজের বিয়োগান্ত পরিণতিকে নাট্যকার নাট্য উপাদানের সামিল করতে পেরেছেন। কেন্দ্রীয় চরিত্রের পতন পূর্ণ নাটকীয় মর্যাদায় মণ্ডিত হওয়ার যোগ্যতা না রাখলেও সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী দর্শকদের সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হবে নাট্যকারের সে সম্পর্কে সচেতন প্রয়াস বহুলাংশে সফল হয়েছে।

নাটকের মুখবন্ধে নাট্যকারের নিবেদন—'মদীয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত কালিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় প্রণীত ইতিহাস হইতে এই নাটক রচনার সাহায্য লইয়াছি। এই জন্য উক্ত বন্ধুদ্বয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।'

ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু এইরূপ - "১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তার পুত্র সরফরাজ বাংলার নবাব হন। তিনি অপদার্থ ও দুর্বল চরিত্রের ছিলেন। নবাবের এই অকর্মন্যতার এবং বিলাসিতার সুযোগে বিহারের নবাব সুবেদার আলিবর্দি এবং তার ভ্রাতা নবাবের উজীর আহম্মদ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেন। নবাবের উৎশৃংখলতায় ও দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে রাজার প্রধান ব্যক্তিদের অনেকেই আলিবর্দিকে বাংলার উপযুক্ত নবাব বিবেচনা করে তার স্বপক্ষে তার মসনদ লাভ করার জন্যে সাহায্য করলেন। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে

মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে গিরিয়ার প্রান্তরে সরফরাজের সঙ্গে আলিবর্দির যে যুদ্ধ হয় তাতে নবাব ও তার সহায়ক প্রধান সৈন্য সামন্ত সকলেই নিহত হয়। আলিবর্দির পক্ষে মসনদ অধিকার করার আর কোন বাধা থাকে না।"

নাটকে মূল ঘটনার কোন বিকৃতি নেই। তবে দেশাত্মবোধের প্রেরণায় সিরাজউদ্দৌলা যেভাবে নাটকে দেশপ্রেমিক যোদ্ধারূপে সহানুভূতি আকর্ষণ করেছিলেন সরফরাজও সেইরূপ দেশাত্মবোধের জোয়ারে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছিলেন এবং নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে স্বভাবতই নাট্যকারের সহানুভূতিলাভে সক্ষম হয়েছেন।

নাটকেও বাংলার নবাব সরফরাজ আপাতদৃষ্টিতে অলস বুদ্ধিহীন অকর্মণ্য ও অপদার্থ নবাব, সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে ধীরে ধীরে তার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হতে দেখা গেছে কয়েকজন নির্ভরযোগ্য উজীর, সুবেদার ও ওমরাহকে। ইতিহাসের অনুসরণে এদের চক্রান্তের উদ্দেশ্য—পাটনার নায়েব সুবেদার আলিবর্দিকে বাংলার মসনদে বসানো। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রধান সহায়ক আলিবর্দির ভ্রাতা উজীর আহম্মদ খাঁ। কাহিনীর এই এক-মুখীনতা নাটকে গতি সঞ্চার করেছে। বিন্যাসের ছন্দ, তাল, লয় এর দোলায় দুলতে দুলতে কাহিনী স্বচ্ছন্দগতিতে এগিয়ে গেছে।

এই ঐতিহাসিক তথ্যের অনুসরণে আলিবর্দি ও আহম্মদের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের ব্যাপারটি নাট্যকারের স্মরণে ছিল। তাই তিনি এই ষড়যন্ত্রের জালে নবাবের নির্ভরযোগ্য বিশ্বসভাজন সেনাপতিও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও জড়িয়ে নিয়েছেন। আহম্মদকে প্রতিজ্ঞা করতে শোনা গেছে—"সামান্য মুহুরীগিরি থেকে উজীরী পেয়েছি। মসনদ অধিকার না করে ছাড়বো না—নিশ্চিন্ত থাক।" এই ষড়যন্ত্রের জাল নাটকে পরোক্ষভাবে ঊর্ণলাভের জালের মত নাট্যবৃত্তের জালে পরিণত। বাংলার আসন্ন দুর্যোগ সম্বন্ধে নাটকে সরফরাজকে পূর্ণ সচেতন দেখা গেছে। স্বগতোক্তিতে নিজের চরিত্র বর্ণনায় সে দুর্যোগের ইঙ্গিত এবং নবাবের অকর্মন্যতা ও ঔদাসীন্যের প্রবাদ সমর্থিত। নবাব প্রথম দরবার ডাকার পূর্বেই দুই ভাই সর্বতোভাবে (আলিবর্দি ও আহম্মদ) নবাবের উচ্ছেদের ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছে। দেওয়ান চিন্তামণির সার্থক কূটবুদ্ধিতে নবাবের বিরুদ্ধে আলিবর্দির ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারও সমাপ্তপ্রায়। প্রথম দরবার ডাকা প্রসঙ্গে নবাবের স্বগতোক্তি :—"জেনানা মহল থেকে একটি সুসজ্জিত স্বর্ণক্ষুর গর্দভ বেরুবে তারা তাই দেখবার প্রত্যাশায় সারাদিন ধরে গলা বাড়িয়ে বসে আছে।" নবাবের বাংলার মসনদ রক্ষা করার সদিচ্ছা—তার মা জিন্নেত্‌উন্নাসার সুপরামর্শ—"উজীর আহম্মদকে বরখাস্ত কর"—এবং সময়োচিত অন্যান্য সাবধানবাণী সবই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। নাটকের বিয়োগান্ত পরিণতির বীজ এইভাবে নাট্যকার সুস্পষ্টভাবে বুনে দিয়েছেন নাট্যারম্ভের সূচনাতেই।

॥ বাংলার মসনদ ॥

বাংলার মসনদ নাটকটিতে নাট্যকাহিনী গ্রন্থনে ঐতিহাসিক নিষ্ঠা ও আনুগত্য যতই থাক না কেন তাতে নাট্যবৃত্ত রচিত না হওয়ায় নাটকের নাটকত্ব বা ধর্ম বজায় থাকে নি। সমসাময়িক ঐতিহাসিক নাটকের উপাদান হিসাবে নাটকে দেশাত্মবোধক ভাবধারার স্রোতে এক অলস বিলাসপ্রিয় কর্তব্যচ্যুত নবাবকে কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে কল্পনা করে তাকে অবিশ্বাস, শঠতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতো মানসিকতার সম্পদে নাট্যকার সমৃদ্ধ করতে পারেন নি। তার স্বভাবসিদ্ধ মায়া মমতা, ভদ্রব্যবহার, সদিচ্ছা ও সৌহার্দ্য স্থাপনের স্বাভাবিক প্রচেষ্টায় তিনি নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছেন। নাটকের বৃত্ত রচনায় সরফরাজের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নাট্যকার কিছুটা কাজে লাগিয়েছেন। নবাব মহিষী রাবেয়ার গৃহত্যাগ ও নির্বাসন এবং শেষপর্যন্ত তাকে আশ্রয়দানের ঘটনা প্রসঙ্গে নাটকে আবর্তসৃষ্টির সামান্য অবকাশটুকুও নাট্যবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টায় নাট্যকারের আংশিক সাফল্য লাভের কথা অস্বীকার করা যায় না।

কেন্দ্রীয় চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের বিন্দুকে কেন্দ্র করেই নাট্যবৃত্ত রচনার কাজে নাট্যকার মনোনিবেশ করেছিলেন এবং এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনিবার্য ফলশ্রুতি স্বরূপ ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে সরফরাজের বিয়োগান্ত পরিণতিকে নাট্যকার নাট্য উপাদানের সামিল করতে পেরেছেন। কেন্দ্রীয় চরিত্রের পতন পূর্ণ নাটকীয় মর্যাদায় মণ্ডিত হওয়ার যোগ্যতা না রাখলেও সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী দর্শকদের সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হবে নাট্যকারের সে সম্পর্কে সচেতন প্রয়াস বহুলাংশে সফল হয়েছে।

নাটকের মুখবন্ধে নাট্যকারের নিবেদন—'মদীয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত কালিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় প্রণীত ইতিহাস হইতে এই নাটক রচনার সাহায্য লইয়াছি। এই জন্য উক্ত বন্ধুদ্বয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।'

ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু এইরূপ -- "১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তার পুত্র সরফরাজ বাংলার নবাব হন। তিনি অপদার্থ ও দুর্বল চরিত্রের ছিলেন। নবাবের এই অকর্মন্যতার এবং বিলাসিতার সুযোগে বিহারের নবাব সুবেদার আলিবর্দি এবং তার ভ্রাতা নবাবের উজীর আহম্মদ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেন। নবাবের উৎশৃংখলতায় ও দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে রাজার প্রধান ব্যক্তিদের অনেকেই আলিবর্দিকে বাংলার উপযুক্ত নবাব বিবেচনা করে তার স্বপক্ষে তার মসনদ লাভ করার জন্যে সাহায্য করলেন। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে

মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে গিরিয়ার প্রান্তরে সরফরাজের সঙ্গে আলিবর্দির যে যুদ্ধ হয় তাতে নবাব ও তার সহায়ক প্রধান সৈন্য সামন্ত সকলেই নিহত হয়। আলিবর্দির পক্ষে মসনদ অধিকার করার আর কোন বাধা থাকে না।"

নাটকে মূল ঘটনার কোন বিকৃতি নেই। তবে দেশাত্মবোধের প্রেরণায় সিরাজউদ্দৌলা যেভাবে নাটকে দেশপ্রেমিক যোদ্ধারূপে সহানুভূতি আকর্ষণ করেছিলেন সরফরাজও সেইরূপ দেশাত্মবোধের জোয়ারে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছিলেন এবং নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে স্বভাবতই নাট্যকারের সহানুভূতিলাভে সক্ষম হয়েছেন।

নাটকেও বাংলার নবাব সরফরাজ আপাতদৃষ্টিতে অলস বুদ্ধিহীন অকর্মণ্য ও অপদার্থ নবাব, সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে ধীরে ধীরে তার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হতে দেখা গেছে কয়েকজন নির্ভরযোগ্য উজীর, সুবেদার ও ওমরাহকে। ইতিহাসের অনুসরণে এদের চক্রান্তের উদ্দেশ্য—পাটনার নায়েব সুবেদার আলিবর্দিকে বাংলার মসনদে বসানো। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রধান সহায়ক আলিবর্দির ভ্রাতা উজীর আহম্মদ খাঁ। কাহিনীর এই এক-মুখীনতা নাটকে গতি সঞ্চার করেছে। বিন্যাসের ছন্দ, তাল, লয় এর দোলায় দুলতে দুলতে কাহিনী স্বচ্ছন্দগতিতে এগিয়ে গেছে।

এই ঐতিহাসিক তথ্যের অনুসরণে আলিবর্দি ও আহম্মদের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের ব্যাপারটি নাট্যকারের স্মরণে ছিল। তাই তিনি এই ষড়যন্ত্রের জালে নবাবের নির্ভরযোগ্য বিশ্বসভাজন সেনাপতিও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও জড়িয়ে নিয়েছেন। আহম্মদকে প্রতিজ্ঞা করতে শোনা গেছে—"সামান্য মুহুরীগিরি থেকে উজীরী পেয়েছি। মসনদ অধিকার না করে ছাড়বো না—নিশ্চিন্ত থাক।" এই ষড়যন্ত্রের জাল নাটকে পরোক্ষভাবে ঊর্ণলাভের জালের মত নাট্যবৃত্তের জালে পরিণত। বাংলার আসন্ন দুর্যোগ সম্বন্ধে নাটকে সরফরাজকে পূর্ণ সচেতন দেখা গেছে। স্বগতোক্তিতে নিজের চরিত্র বর্ণনায় সে দুর্যোগের ইঙ্গিত এবং নবাবের অকর্মন্যতা ও ঔদাসীন্যের প্রবাদ সমর্থিত। নবাব প্রথম দরবার ডাকার পূর্বেই দুই ভাই সর্বতোভাবে (আলিবর্দি ও আহম্মদ) নবাবের উচ্ছেদের ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছে। দেওয়ান চিন্তামণির সার্থক কূটবুদ্ধিতে নবাবের বিরুদ্ধে আলিবর্দির ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারও সমাপ্তপ্রায়। প্রথম দরবার ডাকা প্রসঙ্গে নবাবের স্বগতোক্তি :—"জেনানা মহল থেকে একটি সুসজ্জিত স্বর্ণক্ষুর গর্দভ বেরুবে তারা তাই দেখবার প্রত্যাশায় সারাদিন ধরে গলা বাড়িয়ে বসে আছে।" নবাবের বাংলার মসনদ রক্ষা করার সদিচ্ছা—তার মা জিন্নেৎউন্নাসার সুপরামর্শ—"উজীর আহম্মদকে বরখাস্ত কর"—এবং সময়োচিত অন্যান্য সাবধানবাণী সবই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। নাটকের বিয়োগান্ত পরিণতির বীজ এইভাবে নাট্যকার সুস্পষ্টভাবে বুনে দিয়েছেন নাট্যারম্ভের সূচনাতেই।

নাটকে ফররাবাগে ফূর্তি ইয়ার্কির তোড় চালানোর ব্যাপারটিকে নাটকীয় উপাদানে রূপান্তরিত করার কৃতিত্ব নাট্যকারকে দিতে হবে। সরফরাজের প্রতি তার পিতার পরামর্শ—"প্রতি সন্ধ্যায় ফররাবাগে ইয়ার্কির তোড় চালাতে হবে আর উজীরকে সেই ইয়ার্কির খোরাক যোগানোর কাজে নিযুক্ত রাখতে হবে। তাকে শুধু রাজকার্যে নিযুক্ত রাখলে অল্পদিনের ভেতরই তোমাকে রাজ্যচ্যুত করার পন্থা বের করে ফেলবে।"—এখন প্রশ্ন হ'ল এত কূটনীতিজ্ঞ রাজার এত সহজ পতন ঘটল কোন স্বাভাবিক নিয়মে? দেখা দরকার নাট্যকার সর্বনাশ সচেতন রাজার পতনকে কতখানি বিশ্বাসযোগ্য নাটকীয় উপাদানে রূপান্তরিত করতে পেরেছেন?

আলিবর্দির দেওয়ান চিন্তামণিও অত্যন্ত ধূর্ত। তার সুপরিকল্পনা ও শয়তানী বুদ্ধি নাট্যকাহিনীর ধারা অনুযায়ী সর্বনাশ সচেতন নবাবের সংচেষ্টাকে ব্যর্থ করার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে হওয়ার কোন অসুবিধা দেখা দেয়নি। নাট্যকাহিনী অনুযায়ী নিজের সর্বনাশের জন্য নবাবই বহুলাংশে দায়ী। মর্ত্তজীর ভাষায়——"এক এক করে রাজ্যের সমস্ত উচ্চপদ থেকে বিশ্বাসঘাতক আহম্মদের লোক সরিয়ে দিলুম—বিশ্বাসী লোকদের দান করলুম। নবাব সেই সব পদ আবার তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। সব জেনেও আহম্মদের মিথ্যার আশ্বাসে বিশ্বাস করলে নবাব। 'বাখর অবাক। লুৎফুন্নেসা বিস্মিতা" "ওর কথা বরফের ওপর লেখা—দেখতে দেখতে গলে যাবে। বৃদ্ধের মাথা জামিন রাখুন।" কিন্তু এরপরেও নবাব নিরুত্তাপ, নির্বিকার, এই ক্ষমাশীলতার মধ্যেই তার আসন্ন সর্বনাশের বীজ নিহিত ছিল।

আলমচাঁদের কিছুটা ভুল ধারণা ছিল নবাব সম্বন্ধে। নবাবপত্নী রাবেয়ার সম্ভ্রম রক্ষার পুরস্কার ঘোষণা করার পর নবাব সম্বন্ধে তার ভুল ধারণা ভাঙ্গে। বাখর আলমের কথার সূত্র ধরে বলেছে—"সরফরাজকে সবাই ভুল বুঝেছে। যে ওর প্রকৃত মূর্তি না দেখতে পেয়ে হুজুরালির অনিষ্ট করতে অগ্রসর হবে তার মত দুর্ভাগা দুনিয়ায় আর কেউ নেই।"—এ সহানুভূতি আকর্ষণ নাট্যকারের নিজস্ব একটি চরিত্র সৃষ্টির অনুকূলে। সরফরাজ চরিত্রটিকে নাট্যকার একটি রক্ত মাংসের মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। কারণ একথাও ঠিক—একটি দুর্বল চরিত্রের নবাবকে মূল চরিত্র হিসাবে খাড়া করে ঐতিহাসিক নাটক লিখতে যাওয়া ধৃষ্টতা ছাড়া আর কি হতে পারে। তা ছাড়া ইতিহাস সাহিত্য নয় তাই ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে সবফরাজের অকর্মণ্যতা, নিরাসক্তি ও নিষ্ক্রিয়তা প্রভৃতির ঘটনা যতই থাক না কেন, নাটকে বা সাহিত্যে সেই চরিত্রটির আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার মানবিক গুণগুলিও কিছু না থাকলেও আরোপিত গুণগুলিও নাট্য উপকরণের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হবে—এতে সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয়। তাই নাটকেও বোধকরি সবচেয়ে উল্লেখ্য জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত মননের প্রতিচ্ছবি—

নবাব চরিত্রের রূপান্তর। সরফরাজের আকস্মিক উত্থানকে নাটকে সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের বস্তুরূপে উপস্থাপিত করেছেন নাট্যকার। এই উত্থানকে, সরফরাজের বৈপ্লবিক জাগরণকে প্রশ্ন করেছে আলিবর্দি—সরফরাজ শক্তিমান? চিরদিন তাকে নিষ্ক্রিয়, অলস, অকর্মণ্য, মতিহীন এবং ধর্মহীন বলে জানি যে কখনও সাহসকরে একটি দিনও বেগম মহলের সীমা অতিক্রম করল না—সে কেমন করে লোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে শক্তিমান হ'ল।"

নবাব পত্নী রাবেয়া প্রসঙ্গটি নাটকের কিছুটা অংশ জুড়ে রয়েছে। রাবেয়ার গৃহত্যাগ বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাসের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'ক্ষুদ্র প্রাণে স্বামীকে অবিশ্বাস করেছি। নিজের মৃত্যু নিজে ডেকে এনেছি। এখন ভয় পেলে চলবে কেন?'

রাবেয়ার গৃহত্যাগ ঘসেটি জানে, ওমরাহরাও জানে। নবাব কর্তৃক রাবেয়ার নির্বাসন দৃঢ়চেতা নবাবের যোগ্য কার্যধারার পরিণতি। কিন্তু এই অবস্থায় নাটকে প্রত্যাশিত নবাব-হৃদয়ের দ্বন্দ্বের আভাস কই?—নাটকে এ যেন যান্ত্রিক দণ্ডাদেশ।—শুধু যেন একটা ঘটনা। পরে অবশ্য পরিত্যক্তা স্ত্রী রাবেয়াকে আশ্রয় দেওয়া নিয়ে আলমচাঁদের সঙ্গে ও মা জিন্নেতউন্নেশার সঙ্গে কথোপকথনে সরফরাজের ক্ষীণ অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাস লক্ষ্যণীয়। এই কথোপকথন সংলাপ হিসাবে বুদ্ধিদৃপ্ত এবং উপভোগ্য।

নাটকটির অন্যান্য সংলাপ কয়েক জায়গায় দীর্ঘ; যাত্রার ঢঙে বিস্তারিত। সংলাপ বহুক্ষেত্রেই পীড়াদায়ক। হায়দারি, সরফরাজ প্রভৃতি কয়েকজনের উক্তি জোরালো, বুদ্ধিদৃপ্ত, সংক্ষিপ্ত, যথাযথ এবং ভাবানুগ। আবার তাদের অন্য কয়েকটি সংলাপ সাহিত্যরসসমৃদ্ধ, ব্যঞ্জনাময় এবং সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া সরফরাজ ও মালেকার কয়েকটি সংলাপ সাহিত্যগুণমণ্ডিত—কবিকল্পনার সৌন্দর্যে শোভিত। অবশ্য স্থানে স্থানে ভাবাবেগে অসংযত উচ্ছ্বাসময়। নাটকটিতে যেটুকু হিন্দি সংলাপ আছে তা উপভোগ্য ও হাস্যরসাশ্রয়ী।

হায়দারির সঙ্গে মালেকার কথোপকথনে হায়দারির দার্শনিক সংলাপ আধুনিক বুদ্ধিদৃপ্ত সামাজিক নাটকের কোন এক বিশেষ চরিত্রের সংলাপ বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। 'কথা এক, শুধু তার মারপ্যাচেই এ দুনিয়াটা চলছে।' পীর খাঁর মজাদার কথা নাটকে রসসৃষ্টি করেছে। খুব বিপদজনক প্রতিকূল মুহূর্তেও তার রসাল সংলাপ—(গাউসের হাতে ধরা পড়ার পর) উল্লেখযোগ্য—'পরীক্ষা করে দেখো বাবা—সে শালার—সে শালার গাল তো এত ফুলো নয়। সে শালা কেমন করে আমার চেহারার নকল করেছে।' আহম্মদের স্বগতোক্তি কবিত্বময় হলেও অনাবশ্যক দীর্ঘ। "মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ করে এনেছি। এখন যে আর অনুশোচনা করতেও সাহস করি না। পদ্মপলাশ মনে করে নাগিনীর ফণায় হাত দিয়েছি।"

নন্দলাল ও বিজয় এর সঙ্গে আলিবর্দি'র কথোপকথনে বিজয় কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করেছে। সে তথ্য বাংলায় হিন্দুর আধিপত্য বিস্তার এবং মুর্শিদকুলি খাঁ সম্বন্ধে। কিন্তু এসব তথ্য পরিবেশন বিকৃতি মাত্র।—নাটকীয় সংলাপের মর্যাদায় মণ্ডিত হয়নি।

ফকিরের ছদ্মবেশে জালিমের বিজয়কে উদ্ধার প্রসঙ্গে সরফরাজকে দিয়ে নাটকে চমক সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে আর একই সঙ্গে সরফরাজ চরিত্রের মাহাত্ম্যও প্রচার করা হয়েছে।

নাটকে রহস্যময় দৃঢ়চেতা সরফরাজের চরিত্র বিশ্লেষণ বহুলাংশে সফল। মালেকা চরিত্রটিও অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ। নবাবজননী জিন্নতউন্নেসা সংলাপের মাধ্যমে তার নীতি নিষ্ঠার জন্য মনে ছাপ রাখে। ঘসেটি চরিত্রটির পূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা ছিল। সার্থক চরিত্র-চিত্রণের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও চরিত্রটি অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাবে দোষেগুণে রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। আলিবর্দি বা আহম্মদ কোন চরিত্রেরই স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ ছিল কম। উভয়ের বিশ্বাসঘাতকতা শুধুমাত্র ঐতিহাসিক তথ্যরূপেই নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনার ছায়াপাত কিংবা বিবৃতির ওপরই নাট্যকারকে বেশী নির্ভর করতে দেখা গেছে। যথাযথ সংলাপ সৃষ্টির মাধ্যমে সেগুলি নাটকে বৃত্ত রচনার সামিল হয়ে উঠতে পারে নি—কিংবা স্বাভাবিকতার পথ ধরে মূর্ত হয়ে উঠতে পরে নি।

একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একদা অপদার্থ অকর্মণ্য এবং অনাবিষ্কৃত ব্যক্তিও যে রুখে দাঁড়াবার বাঞ্ছিত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে চমক সৃষ্টি করতে পারে—নাটকে এই বক্তব্য স্পষ্টভাবে উচ্চারিত। জাতীয় সংহতির অভাবে দেশ যে বিপদের সম্মুখীন হয় - স্বাধীনতা যে বিপদাপন্ন হয় - নাটক সেই বক্তব্যের ধ্বনিতে কোথাও কোথাও মুখর হয়ে উঠেছে। নাট্যকারের এই বক্তব্য নাটকের সঙ্গে আত্মিক মিলনের সূত্রে ঐতিহাসিক নাটকটিতে দেশাত্মবোধের হাওয়া বইয়ে দিয়েছে।

॥ আলমগীর ॥

নাটকে বহু চরিত্রের সমাবেশ। মূল ঘটনা বিস্তারের জন্য হয়তো অনেকগুলি চরিত্রের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সব চরিত্রই আলমগীরের মূল চরিত্র বিশ্লেষণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় নি। মূল কাহিনীর বিস্তার বা ব্যাপ্তির প্রাথমিক দায়িত্বভার বহন করেছে উদীপুরী বেগম চরিত্র। ঈর্ষা, কামনা, বাসনা, আত্মমর্যাদা, অহংকার, বুদ্ধি—সবকিছুর অপূর্ব সমাবেশে ক্ষীরোদনাট্য চরিত্রের মধ্যে অন্যতম প্রাণবন্ত জীবন্ত চরিত্র উদীপুরী। উদীপুরীর সঙ্গে যেখানেই আলমগীর একত্রিত হয়েছে নাটকের নাট্যশর্তের সমস্ত তার যেন একসুরে বেজে উঠেছে। উদীপুরী যেন ক্যানভাসের পটভূমি। ঔরঙ্গজেব তার ওপরে জাজ্বল্যমান জীবন্ত ঐতিহাসিক আলমগীর। বাকচাতুর্যের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পেয়েছে আলমগীর উদীপুরীর মধ্যে।

আলমগীর রাজসিংহের অপমানের শোধ নিতে চেয়েছে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। রূপকুমারীর রূপের খ্যাতি তাকে প্ররোচিত করেছে উদীপুরীর রূপের গর্ব চূর্ণ করতে। ধরাও পড়ে গেছে তা উদীপুরীর কাছে এবং সংলাপের মাধ্যমে তা চমৎকার ফুটে উঠেছে। ভারতবিজয়ী আলমগীর সচেতন ও সজাগ—তিনি স্ত্রী পরাজিত নন, কিন্তু ঘটনাচক্রে উদীপুরীর বুদ্ধি, বাকচাতুর্য তার সজ্ঞান প্রয়াসকেও ব্যর্থ করে দিয়েছে।

ঘটনাসংস্থাপনের দিক দিয়ে আলমগীর একটি রসঘন নাটক, তবে মূল ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রণে এত অধিক চরিত্র প্রয়োজন ছিল না। রাজসিংহ, ভীমসিংহ, জয়সিংহ, বীরাবাঈ প্রভৃতি চরিত্র নিয়ে তাদের পারিবারিক সমস্যা, সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে মানঅভিমানের পালা, স্বেচ্ছায় নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ, আত্মদানের প্রচেষ্টা অবিশ্বাস্য নাটকীয় উপায়ে বীরাবাঈ কর্তৃক ভীমসিংহের প্রাণদান-সমান্তরালভাবে একটি উপকাহিনীর মতো এগিয়ে চলেছে। আলমগীর উদীপুরী কাহিনীর সঙ্গে এর উপকাহিনীর যোগসূত্র রচনার ভার নিয়েছে রূপনগরের রূপকুমারী। আলমগীর-উদীপুরীর উপভোগ্য সংলাপের মাধ্যমে দুটি চরিত্রের অপূর্ব বিশ্লেষণ ঘটেছে। দুজনে যেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের বাক্‌যুদ্ধের বিদ্যুৎ চমকে দুটি জীবন্ত রক্তমাংসের মানুষ মঞ্চে দেখা দেয় চোখের সামনে। আশা, নিরাশা আনন্দ বেদনা, প্রণয়বিচ্ছেদ মান অভিমান—সবকিছু মেঘরৌদ্রের লুকোচুরির মত ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয় নাটকের আকাশে। এর ওপর আছে উদীপুরীর সন্তান কামবকসের চরিত্র পরিকল্পনার মাধুর্য। সে কারো মত নয়—না মায়ের মত—না বাপের মত। দারার কবি প্রকৃতি পেয়েছে সে বংশপরম্পরায়। তাই সে রূপ-

কুমারীকে আনতে গিয়ে তার সঙ্গে ভগিনীর সম্পর্ক পাতিয়ে আসে। তার আচরণ অদ্ভুত লাগলেও তাকে অসঙ্গত বলার বিপক্ষে উদীপুরীর সংলাপ তুলে ধরা যেতে পারে। 'সে কারো মত হল না, সে বিপদে পড়বে। বরং সম্রাটের হাতে বন্দি হলে তার অকাল মৃত্যু রোধ হতে পারে।' কামবকস্ চরিত্রটি বহুলাংশে কবি প্রকৃতি একটি আদর্শবাদী বাঙালী যুবকের চরিত্ররূপে সৃষ্টি করা হয়েছে।

উদীপুরীর রূপের অহংকার 'আমি মাথা হেঁট করে হারেমে প্রবেশ করিনি'— ইত্যাদি সম্রাট আলমগীরের মানসলোকে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল রূপকুমারীকে মোঘল হারেমে প্রবেশ করিয়ে সে রূপের অহংকার চূর্ণ করার এক অপূর্ব সুযোগ এসে গিয়েছিল। তাই সৈন্য প্রেরণ করে সে গোপন ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করেছিলেন সম্রাট। উদীপুরীর সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে জানা যায় সম্রাটের সে গোপন ইচ্ছা বুদ্ধিমতী উদীপুরীর কাছে অজ্ঞাত থাকে নি। এখানে প্রকৃতপক্ষে আলমগীর স্ত্রী পরাজিত।

নাটকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দৃশ্য বিজয় উৎসব দৃশ্য। দৃশ্যপরিকল্পনায়, চরিত্র চিত্রনে, নাটকীয়তায়, আকস্মিক ঘটনা উপস্থাপনের বুদ্ধিমত্তায় এ দৃশ্যে উদিপুরী ও সম্রাট আলমগীর দুজনেই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। আলমগীর চরিত্রের জীবনের স্পন্দন নিজের চরিত্র বিকাশের মধ্য দিয়ে ততটা বিকশিত নয় যতটা প্রকাশিত উদীপুরীর সংলাপের সংঘাতে। রূপকুমারীকে আনবার ষড়যন্ত্র যখন ব্যর্থ হল সে সময় ক্রোধান্ধ সম্রাট উদীপুরী বেগমকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দি করে রাখার নির্দেশ দেন। নিদ্রার কোলে আচ্ছন্ন সম্রাট কত অসহায় এবং সে অবস্থায় উদীপুরীর অনুপস্থিতিতে তার পরিণাম কি ভয়াবহ হতে পারে তার বর্ণনা, সম্রাটের দুর্বলতার দুঃসহ পরিণতির রহস্য উদ্ঘাটনকাহিনী বিবৃতির আকারে প্রকাশ পায় নি, চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশের পথ ধরেই প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং তা সংলাপের স্বতঃস্ফূর্ত ধারার অনুকূলে বিধৃত, আকর্ষণীয় ও নাটকে সঙ্গতি-সূচক।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দভাব জাগরণের সচেতন প্রয়াস নাটকে স্পষ্ট। সম্রাট পুত্র ও রাণা পুত্রের একত্র সম্মিলন এক অভাবনীয় ব্যাপার। নাটকে যুক্তি-পরম্পরায় নাট্য ঘটনার আবর্তনে সে দৃশ্যের অবতারণা নিঃসন্দেহে নাট্য কুশলতার পরিচায়ক। অসুস্থ আলমগীর ও যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত রাজসিংহের অপূর্ব সাক্ষাৎকার ঐতিহাসিক সম্মিলনরূপে অভিহিত হয়েছে। দুজনেই যেন দুজনের মুখোমুখী হওয়ার দুর্লভ সুযোগের প্রতীক্ষায় উন্মুখ ছিলেন। তাই সম্রাটপুত্র রাণা পুত্র নয়, শেষ দৃশ্যে স্বয়ং সম্রাট আলমগীর আর বীর রাজসিংহ দুজনে মুখোমুখী হতে পেরেছেন। দুজনেরই খেদোক্তি এই মিলন যদি আগে ঘটতো। এখানে নাট্যকার কি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন স্পষ্ট বোঝা যায় না। তবে প্রবল

দেশাত্মবোধ তাকে এই অপূর্ব সম্মিলনদৃশ্যের অবতারণায় প্রলুব্ধ করেছিল—একথা অবিশ্বাস করার হেতু নেই। নাটকের সমাপ্তি অনাটকীয়, বেসুরো। কাফের বিরোধী আলমগীরের মুখে মিলনের বাণী অনৈতিহাসিক, অনাটকীয়। প্রেমের বানী প্রচারে নাট্যকার ঐতিহাসিক আলমগীরকে ঠেলে সরিয়ে নিজে আত্মপ্রকাশ করেছেন আধুনিক স্বদেশভক্ত নাট্যকাররূপে।

বার্ধক্য জরা কিংবা তার শক্তি সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রূপকুমারীকে পত্নীরূপে বরণ করে এবং জিজিয়া করের অন্যায় প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে শৌর্য-বীর্যের পরিচয় প্রদান, ভীমসিংহের মোঘলের কবল থেকে রূপকুমারীকে উদ্ধার করার মরণ-পণ সংগ্রাম-বীরত্ব গাথার এ এক অপূর্ব কাহিনী, তবে এর কতটা ইতিহাস সম্মত সেটাই বিচার্য। সকলের জ্ঞাত ছিল জয়সিংহ জেষ্ঠ। সুতরাং সিংহাসন তার প্রাপ্য। বীরাবাঈ এর মুখে সে কথা প্রকাশ হতে রাজসিংহের কাছে দুই ভাই সমবেত হয়। মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে দুই ভাই-এর জন্ম। ভীমসিংহ জেষ্ঠ—একথা জানার পর অভিমানী ভীমসিংহ সমস্ত কিছু ত্যাগ করে রাজ্য ছেড়ে চলে যায়। প্রতিজ্ঞা দোবারির এপারের জলস্পর্শ করবে না। নিদারুন তৃষ্ণায় কাতর ভীমসিংহের প্রাণরক্ষা করে পুত্রের সন্ধানে ব্যাপৃতা বীরাবাঈ দোবারির এপারের জলে নয়—মাতৃস্তন্য দুগ্ধে। এরপর রূপকুমারীকে মোঘলের কবল থেকে উদ্ধার করে আনতে ভীমসিংহের মরণপণ সবাইকে বিস্মিত করেছে।

ভীমসিংহের স্বেচ্ছানির্বাসন আদর্শবাদের দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গঠন রাজপুত বীরগাথার প্রতি অনুগত্য প্রদর্শন, অন্যদিকে কাহিনী বিন্যাসের প্রয়োজন সাধন করেছে।

নাটকের গতিপ্রকৃতির লক্ষ্য আলমগীরের চরিত্র বিশ্লেষণ, উদীপুরীর আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা, রাজসিংহের রাজধর্ম পালনের নিষ্ঠা ও অভিমানী ভীমসিংহের আত্মাহুতির কাহিনী প্রকাশ।

কাহিনীর সমাপ্তি ভীমসিংহের আত্মদান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তৃষ্ণার্ত আলমগীরের তৃষ্ণা নিবারণ হল ভীমসিংহের জীবন রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট জলে। হিন্দু মোসলেম ঐক্যের এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস লক্ষ্যণীয়।

ঐতিহাসিক নাটকে নাট্যকারের স্বাভাবিক দুর্বলতার সূত্র ধরে তার রোমান্স প্রীতি ও অসম্ভব্যতার অবতারণা নাটকে সুযোগমত অনুপ্রবেশের ছাড়পত্র পেয়েছে।

নাটকে সচেতন প্রচারবাদের প্রথম কথা—পাশ্চাত্য নাট্যকলা গড়ে উঠেছে সে দেশের ধর্মাশ্রয়ী কাহিনী পরিবেশনের ধারা থেকে। আলমগীর নাটকটি ঠিক ধর্মাশ্রয়ী কাহিনী না হলেও ঐতিহাসিক চরিত্র আলমগীরের ধর্মান্ধতা এ নাটকে সোচ্চার।

নাটকে অসঙ্গতির দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। নাটকটিতে বীররসের প্রাধান্য বেশী। মধুর রসের সম্ভাবনা আদর্শবাদের ঝড়ে উধাও। কামবকৃস্ চরিত্রের মধ্যে তার

সূচনা এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিসমাপ্তিও তারই মধ্যে। সে যে সম্পর্ক পাতিয়ে এল রূপকুমারীর সঙ্গে তাতে নাকি আলমগীর কেন, কোন শাজাদার পক্ষেও তাকে মোঘল হারেমে আনার সমস্ত পথ রুদ্ধ। আলমগীরের এ ধরনের সংলাপে কিছুটা অসঙ্গতি থেকে গেছে। মুসলমানদের মধ্যে ভগিনীকে বিবাহ করার রীতি প্রচলিত। সুতরাং অন্য শাজাদার পক্ষে রূপকুমারীকে বিবাহ করার চিন্তা ত্যাগ করতে হল আলমগীরকে—এটা সম্রাটের পক্ষে গৌরবজনক নয়।

নাটকের সূচনায় দিল্লিপ্রাসাদের রঙমহলে উদীপুরী বেগম ও শ্যামসিংহের আলাপ সম্পর্কে স্থানকালপাত্রের ঔচিত্যের প্রশ্ন অবান্তর নয়। বাদশার অন্তপুরে তার বেগমের সঙ্গে একজন হিন্দু রাজপুত সামন্তর নিভৃত আলাপে অবশ্যই অসঙ্গতির প্রশ্ন ওঠে। তবে সে অসঙ্গতি নাট্য প্রয়োজনে স্বীকার করে নিতে হয় এইজন্যে যে এই আলাপ এর দ্বারা গোটা নাটকখানির ভূমিকার কাজ সারা হয়েছে। নাটকের সূচনায় একটি বিরোধের আভাস। মূল বিরোধ অবশ্য সম্রাটের উদীপুরীর রূপের গর্ব চূর্ণ করার অভিলাষ থেকে উদ্ভূত। সম্রাট মনে মনে রূপনগরের রূপকুমারীকে মোঘল হারেমে প্রবেশ করিয়ে উদীপুরীর প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে তাকে রাজপ্রাসাদে সসম্মানে স্থান দেবেন—এই তার গোপন ইচ্ছা। ইতিমধ্যে জিজিয়াকর স্থাপনের প্রতিবাদের সূত্র ধরে রাজসিংহের সঙ্গে তার সংঘাত আসন্ন হয়ে ওঠে। রূপকুমারীকে রাজসিংহের আশ্রয়দানের ঘটনা সে সংঘাতকে অনিবার্য করে তোলে।

উদীপুরী আলমগীরকে বুদ্ধির কৌশলে পরাজিত করার জন্যে সম্রাটের মনোরাজ্যের গোপন ইচ্ছার কথা ঠিকমত জেনে জয়সিংহের ওপর ভার দেন পুত্র কামবক্সকে রূপনগরে নিয়ে গিয়ে রূপকুমারীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে। কামবক্স রূপকুমারীকে দেখার পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলে ভালই হত, সম্রাট কিছু করতে যাওয়ার আগেই দেখতেন উদীপুরীর চক্রান্তে তার পুত্র তার সমস্ত কৌশল বানচাল করে দিয়েছে। কিন্তু কামবক্স শেষ পর্যন্ত রামসিংহের সাহায্যে গোপনে রূপনগরে গিয়ে রূপকুমারীর রূপকে অভিনন্দন জানিয়ে এল—তার সঙ্গে ভগিনীর সম্পর্ক পাতিয়ে এল। সম্রাট আলমগীর বুদ্ধির কৌশলে উদীপুরীরর চক্রান্তকে ব্যর্থ করে কামবক্সকে বন্দি করবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করলেন রূপনগরে। রূপকুমাররী সম্মান ও রাজপুত জাতির মর্যদা রক্ষার জন্য এস্ত কুমারীর পাশে এসে দাঁড়াল বীরাবাঈ-রাজসিংহ মহিষী। ভীমসিংহের সঙ্গে স্বেচ্ছায় নির্বাসিতা তিনি। বীর রাজসিংহকে পতিরূপে বরণ করে নিতে উপদেশ দিয়েছে বীরাবাঈ। একখানিপত্রও দিতে বলেছে সেই মর্মে রাজসিংহকে। ইতিহাসে এর সমর্থন আছে। ইতিহাস বলে আওরঙ্গজেবের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্যে রূপকুমারী রাজসিংহের নিকট পত্র প্রেরণ করেন এবং রাণা পত্র পেয়ে পথিমধ্যে মোঘল সৈন্যের নিকট থেকে তাকে উদ্ধার করেন। উদিপুরী বেগম প্রসঙ্গ অবশ্য সেখানে নেই।

আলমগীরর সুষ্ঠু আত্মপ্রকাশ উদীপুরীর সংলাপের মাধ্যমে। আলমগীর যেখানে নিজের কথা ও আচরণের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে চেষ্টা করেছে সেখানে অনেকক্ষেত্রে অসঙ্গতি ফুটে উঠেছে। জিজিয়া কর স্থাপনের প্রস্তাবে তার আত্মদোষ-স্খালনের চেষ্টা অসঙ্গতির দৃষ্টান্ত বলে অনেকে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছেন—যদিও চরিত্র চিত্রনে আলমগীরের ভণ্ডামি প্রকাশের জন্য তা প্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়। মোঘল অন্তঃপুরের প্রাচীর ফুঁড়ে ভীমসিংহ কী করে বাহির হন আর সম্রাটই বা কি করে নিজের বাদশাহী মুকুট তার মাথায় পরিয়ে দেন এবং হঠাৎ কী কারণে তার কোন ব্যাখ্যা নেই। চমক সৃষ্টির প্রচেষ্টা সমস্ত পরিস্থিতির সঙ্গে ঠিকমত খাপ খাওয়াতে না পেরে আলমগীরের মর্যাদা নষ্ট করেছে।

কাহিনী বিশ্লেষণে ছোটখাট অসঙ্গতির দৃষ্টান্ত নাটকে ইতস্ততঃ অনেক জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

আলমগীর উদীপুরী এবং রাজসিংহ, ভীমসিংহ, জয়সিংহ এই দুই কাহিনীর যোগসূত্র রূপনগরের রূপকুমারী। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে রূপকুমারীকে নিয়ে রোমান্সের সম্ভাবনা ছিল, তা কার্যকরী হয় নি। নাটকে রূপকুমারী উপেক্ষিতা, চরিত্রটি অস্ফুট এবং স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পারে নি। অবশ্য নাটকের মূল বক্তব্য ছিল আলমগীর উদীপুরী প্রসঙ্গ—তা হলেও রাজপুত বীর-গাথার অসংখ্য কাহিনীর পথ অনুসরণ করে রূপকুমারীর মত অনিন্দ-সুন্দর তেজদৃপ্তা নারীর বংশ মর্যাদা ও ধর্মরক্ষার জন্য বৃদ্ধ রাজসিংহকে পতিত্বে বরণ করার ঘটনা নিঃসন্দেহে চরিত্রটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই হিসাবে এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বময়ীর চরিত্রচিত্রনে যে স্বাভাবিক যত্ন, মনোযোগ ও প্রয়াসের প্রয়োজন ছিল নাট্যকারের পক্ষ থেকে সে প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয়নি। চরিত্রটি তাই অসম্পূর্ণতার ও অসঙ্গতির কলঙ্ক বহন করতে বাধ্য হয়েছে। বীরাবাঈ-এর গৃহত্যাগ স্বেচ্ছা নির্বাসন কণ্টকম্পিত বলে মনে হয়—কিন্তু তা মেনে নিলেও বৃদ্ধ-শিশু ভীমসিংহকে স্তন্যপান করানোর ব্যাপারটা উপকথার পর্যায়ভুক্ত—কারণ জৈবিক—বীরাবাঈ সদ্য প্রসূতা এমন কথা বলা হয় নি বা বলা সম্ভবপর ছিল না। বীরাবাঈএর কার্যকলাপ আগাগোড়া ঐতিহাসিক নাটকের ফ্রেমে বেমানান—রূপনগরের দিকে আকস্মিকভাবে পুত্রকে নিয়ে ছুটে চলা, রূপকুমারীর সঙ্গে তার পরিচয় এবং রাজসিংহের উদ্দেশ্যে তাঁকে নিবেদিতা করে তোলা—সব কিছুই ইতিহাসের এলাকাভুক্ত নয়—বরং ইতিহাসের আবহাওয়ার পরিপন্থী। মোঘল শিবিরে রূপকুমারীর আকস্মিক আগমন অবাস্তবতা ও অসম্ভব্যতার পর্যায়ে পড়ে—এ সবই এক কথায় অনৈতিহাসিক। 'রূপকুমারী প্রসঙ্গ নিতান্ত আকস্মিক, অযাচিত এবং অনাটকীয় ভাবে রাণার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তার ওপর আছে রাণা রাজসিংহের পারিবারিক দ্বন্দ্ব। ইহা নাটকের অনেকখানি অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে। ঐতিহাসিক নাটকে তীব্র রোমাণ্টিকতার প্রবেশ যদি কোথাও হইয়া থাকে তবে তাহা

এখানে। অবশ্য রাজপুত জাতির ইতিহাসে এই রোমাণ্টিকতার অবকাশ যথেষ্টই রহিয়াছে। কথায় কথায় অস্ত্রের ব্যবহার, কথায় কথায় প্রাণঘাতী প্রতিজ্ঞা এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া যাওয়া রাজপুত্র জাতির বৈশিষ্ট্য। রাজপুত প্রাণ দেয়, সম্মান বিসর্জন দেয় না। রাজসিংহের শ্রেষ্ঠত্ব ভীমসিংহের জেষ্ঠত্বের অভিমান এবং তাহা হইতে উদ্ভূত ভ্রাতৃকলহ সেই কলহের সূত্র ধরিয়া ভীমসিংহের চিরদিনের জন্য মেবার ত্যাগ সকলই সম্ভব হইতে পারে। এই ঘটনা যদি পুংখানুপুংখভাবে ইতিহাসে নাও ঘটিতে পারে, তবুও ইহা রাজপুত ইতিহাসের ঐতিহ্যের ধারায় সত্য ঘটনা। অর্থাৎ রাজপুত চরিত্রে উহা এভাবে ঘটিতে পারিত।'

নাটকে আলমগীরের দ্বৈত সত্তার উল্লেখ স্পষ্ট। লেডি ম্যাকবেথের মত আলমগীরের স্বপ্নদর্শন, সাক্ষী একমাত্র বিনিদ্র উদীপুরী। কখনও হাসছেন, কখনও কাঁদছেন। পৃথিবীতে এমন কোন কোন প্রবল জীব নেই যে জাগ্রত আপনাকে ভয় দেখাতে পারে। কিন্তু এমন কোন দুর্বল জীবও নেই যে নিদ্রিত আপনাকে ভয় দেখতে পারে না। উদীপুরী বেগম কর্তৃক আলমগীরের এই মনস্তত্ব বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ সার্থক। আলমগীর স্ত্রী পরাজিত এই সত্যটিকে উজ্জ্বল করার জন্য নাট্যকারের সচেতনতা বহুলাংশে প্রকট। উদীপুরীর সংলাপ মারফৎ নিজের পরিচয় পেয়ে আলমগীর বিস্মিত ও অসহায়—তাই তার প্রশ্ন—তুমি কে ?

আপনার ভিতর দুটি মানুষ আছে। একটা নকল আলমগীর একটা আসল। নকলটা যখন ঘুমায় তখন আসলটা গভীর নিদ্রায় ডুবে যায়। বাইরে তার অস্তিত্বের কিছু চিহ্ন থাকে না।

'আলমগীরের এই দ্বৈতসত্তা ইতিহাস স্বীকার করে। ইতিহাসে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান আছেন ঔরঙ্গজেব তাদের অন্যতম। সুরা নারী ব্যসনের তখন এক কদর্য প্রবাহ ছিল মোঘল পরিবারে। সে গড্ডালিকা প্রবাহে আলমগীর গা ভাসিয়ে দেন নি। ধর্মভীরুতা ও সংযম দিয়ে তিনি সেই সর্বনাশের আহ্বানকে ঠেকাতে পেরেছিলেন। ঔরঙ্গজেব চরিত্র নিয়ে যত সমালোচনাই হোক না কেন, তাকে 'চরিত্রহীন' বলে চিহ্নিত করার মত যুক্তি কেউ খুঁজে পাবে না। কিন্তু এই সৎচরিত্রবান ব্যক্তি-সত্তার পাশাপাশি ইতিহাসের পাতায় আর এক নিষ্ঠুর ধূর্ত, অন্য ধর্মমতকে সহ্য করতে না পরার মত গোঁড়া, মানব জাতির ওপর অবিশ্বাসী অমানুষকেও পাশাপাশি দেখতে পাই। মুখে বন্ধুর হাসি, হাতে অদৃশ্য ছুরি— হত্যা করেন তিনি অবলীলাক্রমে ভালবাসার অভিনয়ে, যেখানে আত্মীয় অনাত্মীয়ের বাদ বিচার নেই—হিন্দুর প্রতি নির্যাতনকে ব্যাখ্যা করেন ইসলাম ধর্মের জিগির তুলে, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে, সিংহাসনের কণ্টক উন্মোচনের জন্যে নিজের প্রিয় ভ্রাতৃহত্যাকে ঢাকা দিতে চান কুটকৌশলী আচরণ ও বাক্যবিন্যাসের আবরণে।

নিজের অপকর্মকে ঢাকবার জন্যে ভাই দারার ছিন্ন মুণ্ডের ওপর কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করতেও তার লজ্জা নেই। এ সবই ইতিহাসের এলাকাভুক্ত। নাটকেও এর প্রতিফলন অবাস্তবতার স্পর্শমুক্ত। সুতরাং নাট্যকারের চরিত্র চিত্রন ইতিহাসকে উপেক্ষা করে নি—আলমগীরের দ্বৈতসত্তা ঐতিহাসিক।'*

শেষদৃশ্যে রাজসিংহের সঙ্গে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিলন সংঘটিত হলেও নাটকের ধারা ও গতি প্রকৃতি অনুযায়ী নাটকটিকে বিয়োগান্ত নাটকের পর্যায়ে ফেলা চলে। বিরাট ব্যক্তিত্বময় একটি ঐতিহাসিক চরিত্র তার ঐতিহাসিক অকল্পনীয় দুঃসাহসিক কার্যকলাপ সমেত আমাদের সামনে যেভাবে মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে দর্শক বা পাঠকদের সমস্ত দৃষ্টি তার দিকেই স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী উদীপুরী বেগমের কাছে তার অবচেতন মনের হাহাকার, অনুশোচনা ও মনোবিকারের সংবাদ পেয়ে বিরাট ব্যক্তিত্বের অসহায় শিশুর মতো আচরণ করুণ পরিবেশ সৃষ্টি করে। তিনি মুখে যতই বারবার উচ্চারণ করুন না কেন আমি সম্রাট আলমগীর আমি কিনা শেষকালে স্ত্রী পরাজিত—শেষ পর্যন্ত সত্যিই তাকে উদীপুরী বেগমকে সেলাম জানা'তে হয়েছে। নিষ্ঠুর নিয়তিরও কিছু অদৃশ্য হস্তক্ষেপ আলমগীরের উন্নত মস্তক উদীপুরীর কাছে নত করতে বাধ্য করেছে। বারে বারে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে সম্রাট ব্যর্থ হয়েছেন তাঁর বার্ধক্য, জরা ও স্নায়ুর দুর্বলতার জন্য। উদীপুরীর ভালবাসা প্রেমের প্রতিদানের জন্যে নয়, দুঃস্থের প্রতি, যন্ত্রনাতুরের প্রতি করুণায়-দুর্বলের প্রতি সহানুভূতিতে। নিদ্রার কোলে আচ্ছন্ন সম্রাট শিশুর মতো অসহায়, অবচেতন মনের অপরাধের স্মৃতির আক্রমণে আক্রান্ত, আর্ত কম্পমান, আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত। উদীপুরীর ভালবাসা অতন্দ্র প্রহরীর মত, দেবীজনোচিত, উৎকণ্ঠিতা মাতার অনুকম্পায় অভিষিক্ত। জাগ্রত আলমগীরের উপেক্ষার প্রাচীরে প্রতিহত হয়েও তা চূর্ণবিচূর্ণ নয়—উদ্ভাসিত, বৈপরীত্যের দৃষ্টান্তে প্রজ্জ্বল। মহান ব্যক্তিত্বের শোচনীয় পরিণাম প্রদর্শনে আলমগীর চরিত্রটি বহুলাংশে ট্রাজিক চরিত্রের লক্ষণাত্মক। অন্যদিকে উদীপুরী বিজয়িনী হয়েও কুণ্ঠিতা অশ্রুসিক্তা—যৌবনের এক শক্তিধরের জীর্ণ কংকাল কোলে নিয়ে সমবেদনায় অবনতা, সমব্যথায় ব্যথিতা। জয়ের আনন্দ স্বামীর পরাজয়ের বিষাদে নিমগ্ন—ট্রাজিক চরিত্র আলমগীরের বিষাদময় পরিণতিকে গভীর থেকে গভীরতর করে তোলে। মানুষী ও দৈবী শক্তি দুয়ের প্রতিকূল প্রভাবে পযুর্দস্ত সম্রাট শেষ পর্যন্ত সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে ত্রুটি। বিচ্যুতি সত্বেও তাই চরিত্রটি ট্রাজেডি নাটকের কয়েকটি লক্ষণ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

নাটকটির অন্যতম সম্পদ এর সংলাপ। কয়েকটি সংলাপ রীতিমত সাহিত্যের সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন ধরা যাক ধর্মাশ্রয়ী সম্রাটের যশোবন্ত সিংহের প্রতি

---

* বাংলা সাহিত্যের নাটকের ধারা—ডঃ বৈদ্যনাথ শীল।

ক্রোধ প্রকাশের ভাষা। সে ভাষা যথাযথভাবে মর্মস্পর্শী—তাতে সুজা ও তার স্ত্রী পিয়ারীবানুর শোচনীয় মৃত্যুর বর্ণনা আছে। সে ভাষার গুণে হৃদয়বান মহানুভব সম্রাটের রূপ প্রকাশিত। যশোবন্ত সিংহের বিশ্বাসঘাতকতা মোঘল বংশের গরিমা ক্ষুণ্ণ করেছে—ইতিহাস সে ব্যাখ্যা যথাযথ স্বীকার করে কিনা বিচার করতে বসা অযৌক্তিক—সংলাপ হিসাবে সে জায়গাটি অনবদ্য।

বিভিন্ন দৃশ্য পরিক্রমায় আমরা কিছু কিছু সংলাপের যৌক্তিকতা-কাব্যগুণ, প্রয়োগ, ভাষা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করবো।

১ম অঙ্ক ৩য় দৃশ্য ঃ—ভীমসিংহ আদর্শবীর, তার সংলাপ চরিত্রানুগ। 'মুখের বাচালতা উপেক্ষা করা যায়, অসির বাচালতা কেমন করে উপেক্ষা করি?' উপেক্ষিত ভীমসিংহের সংলাপ চমৎকারিত্বে উজ্জ্বল। 'ভবিষ্যৎ ঐ পদরেণুতে মিশিয়ে দিয়েছি। এ রাত্রিতেই আমি এ রাজ্য পরিত্যাগ করবো।'

'বৎস অভিমান কর না।' রাজসিংহের এ সংলাপের উত্তরে ভীমসিংহ যা বলল তা যেমন দীর্ঘ তেমনি কৃত্রিম।······রাজসিংহের সংলাপ মাঝে মাঝে কাব্যিক। 'মাস দিয়ে বছর দিয়ে যুগ দিয়ে সে প্রভাতের দূরত্ব মাপতে যাচ্ছি কি'? সে কি এত কাছে। সে প্রভাতে অভ্যুদিত সূর্য্য এমন করে কি রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে?' এর পরের বর্ণনা দীর্ঘ সংলাপের পর্যায়ে পড়ে। ভীমসিংহের কঠিন প্রতিজ্ঞায় রাজসিংহ চিন্তান্বিত, বিচলিত। কাব্যিক সংলাপের মাধ্যমে তার উৎকণ্ঠার সার্থক প্রকাশ :—'কি শুষ্ক, কি কঠোর, কি উত্তপ্ত শিলা প্রান্তর। আকাশ সেখানে কখনও মেঘের অবগুণ্ঠন মুখে দেয় না। পাহাড় কাঁদতে জানে না। বায়ু সেখানে অগ্নিকনায় নিজের তৃষ্ণা নিবারণ করে।' দৃশ্যটিতে নাটকীয় মুহূর্ত নেই—শুধু সুজাতা গরীবদাস এর দাম্পত্য বোঝাপড়ার একটি স্নিগ্ধ মাধুর্যের ছায়া পড়ছে এ দৃশ্যে।

ঔরঙ্গজেব জিজিয়া করের ইস্তাহার জারি করতে চান রাণার প্রাসাদদ্বারে। তিনি নিজেকে নিজেই বুঝতে পারেন না। 'এই জিজিয়া-কর এটা আমার এক বিচিত্র রকমের খেয়াল। এ খেয়াল কেন যে এল আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। হিন্দুরা আমাকে গাল দেবে, আমি শুনে হাসবো। মুসলমান আমার জয় ঘোষণা করবে, আমি শুনে কাঁদবো। বুঝি এই কান্নাহাসির মাঝখান দিয়ে পথ প্রস্তুত করে তার ওপর দিয়ে চলবার আমার ইচ্ছে হয়েছে।' এ দৃশ্যে ধর্মের গোঁড়ামির পূর্ণ বিশ্লেষণ রয়েছে, সে টা নাটকের গতিকে স্তব্ধ করেছে। আলমগীর-উদীপুরী সংলাপ স্বাভাবিক বুদ্ধিদৃপ্ত ও কৌতুকময়। এসে বুঝলুম কাশ্মিরী বেগম শুধু রূপময়। উদিপুরীঃ—কাশ্মীরী বেগম হলে রূপই হত। আপনার ক্ষীণ দৃষ্টিতে আপনি যে ভুল দেখেছেন জাঁহাপনা। আমি যে উদিপুরী। আমাতে সে রহস্যময় জাতির রূপও আছে, গুণও আছে।

আলমগীরের চরিত্র বিশ্লেষণ উদীপুরীর সংলাপে সোচ্চার। আজম্মের কপটতা এক মুহূর্তে কি ত্যাগ করতে পারবেন সম্রাট!

উদীপুরীর স্পষ্ট ভাষণ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবাদবচনের ক্ষীরোদ ভাষ্য হয়ে উঠেছে।

আমার রূপ আমার চক্ষে তো সুন্দর ঠেকে। (ঔরঙ্গজেব)

উদীপুরীর উত্তর :—ঈশ্বরের আশীর্বাদ বানর নিজের রূপকে কখনও কুৎসিত দেখে না। গর্দভ নিজের স্বরকে কর্কশ মনে করে না, তা যদি করতো তা হলে তার নিজের চিৎকার শুনে সে মূর্চ্ছিত হত। ঔরঙ্গজেব মুখে স্বীকার করতে চান নি, বারবার এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন স্ত্রী পরাজিত হওয়ার কলঙ্ক। কিন্তু তার গোড়ায় গলদ। তার চরিত্রের অসঙ্গতি নিজের সংলাপের মধ্যেই নিহিত। প্রধানা বেগমের দম্ভ চূর্ণ করবার জন্যে তোমাকেও তার মত মর্যাদা দিয়েছি। কিন্তু দিয়েই মনে হয়েছে আমি ঠকেছি। তোমাকে বিবাহ করে দেখলুম তুমি তার চেয়ে দাম্ভিকা। এর পরেই উদীপুরীর অর্ধ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘসংলাপ, (পৃঃ ২২) Action এর অংশ কম। দৃশ্যনাট্য না হয়ে বহুলাংশে আধুনিক সংলাপ—সর্বস্ব নাটকের লক্ষণাক্রান্ত, নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হয়েছে। যেটুকু নাট্যরস সৃষ্টি হয়েছিল এ দীর্ঘ সংলাপ তার আমেজ নষ্ট করে দিয়েছে।

উদীপুরী রূপকুমারী সম্বন্ধে আলমগীরের মনোভাব জানতে চায়। আইন-জীবীর মত বুদ্ধিদৃপ্ত তার সংলাপ। 'আগে বলুন রামসিংহের মুখে তার রূপের কথা শুনে আপনি তাকে বিবাহ করতে অভিলাষ করেছেন কিনা?'

দিলীর, আমার মুখে স্বীকারের ভাষা ভেসে উঠেছে কি? প্রয়োগনৈপুণ্যে চরিত্র সৃষ্টিতে আলমগীরের এ সংলাপ অনুপম। এ ধরনের সংক্ষিপ্ত ভাষণের লাবণ্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে। তৃষ্ণার্ত ভীমসিংহের আত্মসমালোচনা, জীবনেতিহাসের বিবরণ, দীর্ঘ সংলাপের বিরক্তি উৎপাদন করে, নাট্যরস বিস্তারেরও পরিপন্থী।

ভীমসিংহ রাজ্য হারাল, কিন্তু মা পেল। ভাগ্যে মেবারের তুচ্ছ সিংহাসনের লোভ ত্যাগ করে দিলুম তাই এই পথের মাঝে আমার মাকে কুড়িয়ে পেলুম। আর জয়সিংহ মা হারাল এই কথাটির সুন্দর প্রকাশ ভীমসিংহের সংলাপে —'চল মা, যে কোন পর্ণ কুটিরে, মাতাপুত্র সেখানে একসঙ্গে বসে জয়সিংহের মাতৃবিয়োগে অশ্রুবিসর্জন করি'। চলিত শব্দের প্রয়োগে রামসিংহ ও কামবক্স-এর সংলাপ জীবন্ত। রূপ দেখা ও রূপ বেঁধার সূক্ষ্ম তফাৎটা ক্ষীরোদভাষ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। হাস্যরসসৃষ্টির ব্যাপারে রামসিংহের মুখে 'ধৈর্য্য' শব্দটির বারবার প্রয়োগ সার্থক হয়েছে।

আকবর ও মোসাহেবদের সংলাপ কৌতুককর। কবি-প্রধান-বাংলা-দেশ সম্বন্ধে

সব চমৎকার মন্তব্য। সেই কবিতা শুনতে হবে। যদি বলে অসুখ করেছে, শুনবে না—বলবে দেহ থাকবে দুদিন, কিন্তু কবিতা থাকবে অনন্তকাল।·····সেই কবিতা নিয়ে আবার দুটো দল হয়। একদল বলে, এ শোক রৌদ্র, বীভৎস হাস্য। একদল বলে, 'বাহবা। তার একদল বলে 'ছ্যা, ছ্যা।' শেষে ওই বাহবা আর ছ্যা ছ্যায় লড়াই হবে। 'মোসাহেবদের মাতলামির ফাঁকে ফাঁকে নাট্যকৌতুহল জাগিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে। এ অংশে কোন নাটকীয় ঘটনা কিংবা climex নেই। মোসাহেবদের কৌতুক উক্তিই এ দৃশ্যের প্রধান উপকরণ। রূপকুমারী আসবে কি না তা নিয়ে কথোপকথন-এর সংলাপ উদ্দীপনাময়। সংলাপে কখনও উদীপুরী কখনও ঔরঙ্গজেব আধিপত্য বিস্তার করেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে দুইপক্ষের বাক্‌যুদ্ধ উপভোগ্য।

উদীপুরী—তা হলে দাসীকে একান্তই বন্দী করবেন ?

ঔরঙ্গজেব—আবার দাসী বলে সুর নরম করো কেন ?

এই না বললে, তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। তোমাকে এখনি বন্দিনী করে দুর্গে প্রেরণ করবো।

উদীপুরী—তয়বর খাঁকে ডাকো সম্রাট ?

তয়বর খাঁ ক্লান্ত, তাড়াতাড়ি করে বক্তব্য শেষ করতে চায় কিন্তু ঔরঙ্গজেব তার জীবনের রহস্য জানতে চায় বেগমের কাছ থেকে। তয়বরের তাড়া, ঔরঙ্গজেবের সে তাড়াকে তাড়া চমৎকার সংলাপে বিধৃত। Graphic expression, সংলাপের গতিপ্রকৃতি লক্ষণীয়।

৪র্থ দৃশ্য : As you like it এর নির্বাসিত ডিউক এর কথা মনে করিয়ে দেয় বীরাবাঈ-এর নির্বাসিত সপত্নীপুত্র ভীমসিংহের সঙ্গে স্বেচ্ছায় নির্বাসন। 'রাজধানী এখন রাণীর চরণরেনুর সঙ্গে সঙ্গে অনুগত ভৃত্যের মত বিচরণ করছে।'

৫ম অংকের ১ম দৃশ্যটি নাটকের সবচেয়ে সার্থক দৃশ্য—উদীপুরীর বিজয় উৎসব দৃশ্য। উদীপুরী নিজেই বিস্মিতা। আমি বিষাদকে হাসাতে সরাব খাচ্ছি, উল্লাসকে কাঁদাতে। অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষণীয়, তবে স্বগতোক্তি দীর্ঘ, একঘেয়ে। সংলাপে দার্শনিকতা—'এ পরীর রাজ্যে প্রবেশ করলুম, আত্মহারা চোখের জল ফেললুম, কিন্তু এখনও অন্ধত্ব ঘুচল না আমার (তয়বর খাঁ)'

ঘুচেছে সেনাপতি, জীবনে প্রথম দেখার চোখ পলকের অনেকদূরে লুকিয়ে থাকে, আবরণ করতে পারে না। অশ্রু তাকে উজ্জ্বল করে। (উদীপুরী)

দেশপ্রেমের কিছু উদ্দীপনাময় সংলাপও মিলবে নাটকে। সেই রাণাপ্রতাপ আর এই রাণা রাজসিংহ 'এই তৃণাসনে দরবার মেবারীয় স্মৃতিতে মাত্র যা লেখা

ছিল আজ আবার পরিণত হল বাস্তবে।' নাটকে কিছু কিছু দেশাত্মবোধের পরিচয়ও আছে। মেবারের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে—এই দৃঢ়পণ সবার চোখের দৃষ্টিতে। দেশরক্ষার জন্য সমস্ত মেবারীর ডাক পড়ছে। নাটক সমাপ্তির পথে দ্রুত ধাবমান। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই শেষাংশের দৃশ্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ ছাড়া শেষাংশের দৃশ্যগুলির বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই।

নাটকের শেষের দিকে কৌতূহলের সঙ্গে পরিবেশ সচেতনতা, সংলাপে নাটকীয়তার উজ্জ্বলতা, সম্রাটের সংলাপে দার্শনিকতা, অসুস্থ মানুষের আত্ম-সমালোচনা খুবই স্বাভাবিক। বুঝি আত্মা চেয়েছিল সত্যের ঝরণা থেকে ভরা জল। কেউ দিতে পারলে না—হিন্দু মুসলমান ইহুদি, ফার্সী, ক্রিশ্চান। প্রায় অন্তিম দৃশ্যে—রূপকুমারীর কাছে আগমন আকস্মিক, অনৈতিহাসিক এবং মনে হয় সম্পূর্ণ সাজানো। তবুও এর মধ্যে কিছু সংলাপমাধুর্যের পরিচয় আছে, বাঙালী হৃদয়ের স্বাভাবিক স্পন্দন এ থেকে অনুরণিত। 'দেখতে, এসেছি, আমার সে কেমন মা, যে তোমার মত ভাইকে গর্ভে ধারণ করেছে।' এইভাবে শেষাংশের সংলাপ চমৎকারিত্বে উজ্জ্বল। অগ্নি দিয়ে অগ্নির নির্বাণ। এ আগুনের স্ফুলিঙ্গ কোথায় প্রথমে বেরিয়েছিল জান কি কামবকস্ ?

এরপর নাটকে ভক্তিরসের প্রাবল্য—অসম্ভবের সম্ভব—এ দেবতার লীলা। এই ভক্তিবাদ ইতিহাসের বেড়া মানে নি। 'সম্মিলনের এমন শুভ সুযোগ আর আসবে না।' (রাজসিংহ)

শেষ দৃশ্যে আলমগীরের সম্রাটোচিত সংলাপ উদ্দীপনাময়। 'দাঁড়াও মৃত্যু দূরে, আমি আলমগীর। পরাজিত অবস্থায় আলমগীর কখনও মরতে পারে না। আমি দুনিয়া জয় করেছি।······আমি কাফেরের জলপান করবো না—জলাভাবেও মরবো না।······

এরপর একতার বন্ধন—দেশপ্রেমের মন্ত্র উচ্চারণ। রাজসিংহ আলমগীরের মিলন প্রসঙ্গে সংলাপ আবেগ আপ্লুত, অনৈতিহাসিক, নাটকের ধারার সঙ্গে বেমানান। হিন্দু মোসেলেম ঐক্য প্রচারের ভূমিকায় নাট্যকারের সচেতন প্রয়াস এখানে প্রত্যক্ষ। 'এ মিলনের অভিলাষ। হে কবি, বছর যাক, যুগ যাক্—বহু শতাব্দীর পারে—একদিন তোমার তুলিকামুখে আলমগীরের মিলন অভিলাষ—হিন্দু মুসলমানের এ মিলন অভিলাষ মুখর হোক্। হিন্দু মুসলমানে একবার আলিঙ্গন করি।'

॥ গোলকুণ্ডা ॥

গোলকুণ্ডা নামটি ঐতিহাসিক। গোলকুণ্ডা সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য এইরূপ।—

"অন্ধ্র প্রদেশের কৃষ্ণা নদীর উপনদী মুসীনদীর উত্তরতীরে অবস্থিত প্রাচীন দুর্গ ও শহর গোলকুণ্ডা। বাহমনী রাজবংশের পতনের পর গোলকুণ্ডা কুতুবশাহী রাজার অধীনে আসে। শাহীবংশ দুইশত বৎসর রাজত্ব করেন। শেষ সুলতান আবুল হাসানের রাজত্ব কালে ঔরঙ্গজেব ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে গোলকুণ্ডা অবরোধ করেন ও আটমাস অবরোধের পর দুর্গ অধিকার করিয়া লন। শাহী আমলে গোলকুণ্ডা ছিল হীরকশহর। এখানে হীরক কাটা ও পালিশ করা হইত। ভুবন বিখ্যাত কোহিনুর হীরা সম্ভবতঃ এখানেই পাওয়া যায়।"

গোলকুণ্ডা নাটকে মূল কাহিনী ঔরঙ্গজেবের কর্তৃক গোলকুণ্ডা অবরোধ ও অবরোধের পর দুর্গ অধিকার। কাহিনী বিস্তারের জন্য বেশ কয়েকটি চরিত্র তাদের ইতিহাসের পাতায় উল্লেখ না থাকলেও নাট্যকার সংযোজন করেছেন। নাটকে ঔরঙ্গজেব মূল চরিত্র তো নয়ই, উপরন্তু প্রাধান্যও পায়নি। গোলকুণ্ডা অধিকারের জন্যে তার কূটনীতির প্রয়োগের সূত্রে পুত্র মহম্মদকে সেখানে পাঠানোর ঘটনা দিয়ে নাটকটির সূত্রপাত। নাটকে ঐতিহাসিক কূটনীতিজ্ঞ ঔরঙ্গজেবের সাক্ষাৎ মিলবে মাত্র দু'এক জায়গায়। ইতিহাসে উল্লিখিত শাহীবংশের শেষ সুলতান আবুল হাসানের উল্লেখ নাটকে আছে তবে সে চরিত্র অবিকৃত, অবিকল নয়। প্রথমে অন্য পরিচয়ে প্রচ্ছন্ন, সত্যনিষ্ঠ ফকীর সহচরের বেশে—পরবর্তী পর্যায়ে রোমাণ্টিক নায়কোপম সদ্‌গুণ বিশিষ্ট পরম কাম্য পুরুষরূপে চরিত্রটিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

ঔরঙ্গজেব যখন গোলকুণ্ডা অবরোধ করেন এবং গোলকুণ্ডার সঙ্গে তার সংঘর্ষ যখন ঘটমান তখনও নাটকে হাসানের সুলতানরূপে আত্মপ্রকাশ ঘটে নি। হাসান তখনও পর্যন্ত অপরিচিত সাধু ফকীর—ব্যক্তিত্ব মণ্ডিত সাহসী যুবক মাত্র। নাটকের শেষে অবশ্য তার সুলতানপদে বৃত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। কারণ ইতিমধ্যে কুতুবশা রাজ্য ছেড়ে চলে এসেছেন। নাটকে মূলত বিরোধ ঔরঙ্গজেব ও স্বাধীনতা রক্ষায় প্রয়াসী কুতুবশার মধ্যে। যদিও ইতিহাসের আবছা ইঙ্গিতে এই বিরোধে আবুল হাসানের মুখ্য ভূমিকার উল্লেখ রয়েছে নাটকে। অবশ্য হাসানের ভূমিকা উল্লেখ্য—তবে সে হাসান শেষ সুলতান হাসান হিসাবে নয়। নাটকে ঐতিহাসিক উপাদান নাট্য কাহিনী গ্রন্থনের পক্ষে যথেষ্ট নয়—তাই ইতিহাসের

পাতলা মোড়কে নাট্যকারকে কিছু ঐতিহাসিক চরিত্র, কিছু কাল্পনিক চরিত্র নিয়ে নাট্যকাহিনী রচনা করতে হয়েছে।

সম্রাটপুত্র মহম্মদ এবং অপরিচিত ফকীর সহচর হাসান এর মধ্যে আরজবন্দের ছবি নিয়ে বাদানুবাদ এবং অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে মহম্মদের উত্তেজনা এবং হাসানের ক্ষমা প্রার্থনা প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড ঘটনাবলী নাটকে উদ্দেশ্য-মূলকভাবে ব্যবহার করা হলেও সেগুলি নাটকের নাটকীয়তা বা উৎকর্ষ সাধনের সহায়ক হয়ে ওঠে নি। তাছাড়া ঘটনাগুলি লঘু, ভাবগম্ভীর ঐতিহাসিক নাটকের পক্ষে উপযুক্ত পোষাকের কাজ করে নি।

তৃতীয় অংকে মীরজুমলার সামনে ঔরঙ্গজেবের আকস্মিক আবির্ভাব ঐতিহাসিক নাটকে বেমানান—যুক্তিগ্রাহ্যও নয়। তার সঙ্গে নাটকীয় ভঙ্গিতে মীরজুমলার প্রথম পরিচয় সংঘটিত হয়েছে কাব্যিক সংলাপ এর সৌরভ বিলানোর সূত্রে—ঐতিহাসিক নিষ্ঠার নিদর্শনের সুবাদে নয়। গোলকুণ্ডার ঐতিহাসিক স্থান মাহাত্ম্য—মহামূল্য সম্পদরাশি নাটকীয় উপকরণের কিছু অংশমাত্র—সামগ্রিক সম্ভার নয়।

আরজবন্দ—হাসান প্রসঙ্গে নাটকের শেষাংশে যে রোমান্সের হাওয়া বইয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে নাটকত্ব বজায় থাকলেও ঐতিহাসিক পরিবেশ বা পরিমণ্ডলীর সৃষ্টি হয় নি।

ঔরঙ্গজেবের গোলকুণ্ডা অবরোধ বা আক্রমণের মূল ঘটনাটি ঐতিহাসিক নিষ্ঠার সঙ্গে নাট্যকার নাটকে সংযোজিত করেছেন।

ঐতিহাসিক নাটকে অনৈতিহাসিক ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে অনেক ক্ষেত্রে। প্রকাশ্য দরবারে হাসানকে ওমরাহরা হত্যা করতে উদ্যত হলে প্রাচীনরীতির যাত্রার অনুরূপ দৃশ্যের অবতারণা—মহম্মদের আকস্মিক অকল্পিত প্রবেশ ও বাধা দান ঐতিহাসিক ঘটনার আনুগত্যের সূত্রে নয়।

অন্যান্য কয়েকটি নাটকের মত এ নাটকেও কিছু কিছু সংলাপ-ঐশ্বর্য এর সন্ধান মিলবে। ঔরঙ্গজেব পিতার অভিপ্রায় বুঝে নিয়েছে তার পত্রের মাধ্যমে। পত্রের মর্মোদ্ধার করার ব্যাপারে নাট্যকার যে সংলাপ রচনা করেছেন তা এক কথায় সংযত অথচ উপযুক্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ। ঔরঙ্গজেবই যে ভবিষ্যৎ ভারতেশ্বর একথা মহম্মদ বুঝতে পারে নি চিঠি থেকে। "ধর্মের জন্য রাজ্য না রাজ্যের জন্য ধর্ম? মূর্খ, এখনো হাঁ করে মুখের পানে চেয়ে? বলি খাওয়ার জন্য বাঁচা না বাঁচার জন্যে খাওয়া? সে সৌভাগ্যের দিন (ভারতেশ্বর হওয়ার) জানতে যদি পিতৃ-দ্রোহিতারও প্রয়োজন হয় সে নিষ্ঠুর কর্তব্যও করতে হয় মহম্মদ।"

নাটকে মহম্মদ-হাসানের আপাত-সংঘাত-প্রসঙ্গটিকে অনাবশ্যক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সেই সূত্রে অনেকটা অংশ জুড়ে অনাবশ্যক সংলাপের প্রাধান্য। হাসানের সঙ্গে নসরৎ খাঁর কিছু তাত্ত্বিক সংলাপ নাটকের গতি ব্যাহত করেছে।

মীরজুমলার অতীত স্মৃতিমন্থনকে নাটকে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক সংলাপ অবশ্য নাটকের সংলাপে বৈচিত্র্য এনেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গতি-বেগও ব্যাহত করেছে।

ঔরঙ্গজেব ও মীরজুমলার মধ্যেকার সংলাপে কাব্যিক সৌন্দর্যের স্পর্শ পাওয়া যায়। ঔরঙ্গজেব (মীরজুমলার প্রতি)—"আমিও ঐ মাটির দিকে চেয়ে পদচারণ করি, কিন্তু আমি তখন মাটি দেখি না—দেখি দুনিয়া—একটা বিরাট প্রদেশ। তাতে কত নদী, কত হ্রদ, কত উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ……" ইত্যাদি।—মীরজুমলা ঔরঙ্গজেবকে চিনতে পেরেছে। সে চেনা নাটকে স্মরণীয় করে রাখার মত সুন্দর সংলাপের অবতারণা—মাথা নীচু করে আমি মাটি দেখছিলুম। মাথা তুলে দেখতে পেলুম দুনিয়া। বোধ হয় আমার দেখার ভুল হয়নি শাজাদা ঔরঙ্গজেব?

শেষ দৃশ্যে হারানো পুত্রের অপ্রত্যাশিত আকস্মিক প্রাপ্তিতে আহিরিনের আবেগ নাটকীয় মহিমায় মর্যাদামণ্ডিত, সংলাপ অনবদ্য।—ফিরিয়ে দে নিয়তি ফিরিয়ে দে আমার সেই দারিদ্র্য। ঐ পর্বের আবর্জনা থেকে মাতৃত্বকে মুক্ত করে আবার আমি সেই পঞ্চ দিবসের শিশুর মুখ নিরীক্ষণ করি। নসরৎ খাঁর-মীরজুমলা পুত্রের বিক্রয়মূল্য পঞ্চমুদ্রা ফেরৎ চাওয়ার ছোট সংলাপটি উল্লেখ্য।

সূচনায় আরজবন্দ-মণিজা—মহম্মদ ও আমীনকে নিয়ে যে চাওয়া পাওয়ার আলোআঁধারের সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার শেষ পর্যন্ত হাসানকে আসল পরিচয়ের আলোয় এনে একটি সুখকর রস পরিণতির দিকে নাটকটিকে এগিয়ে নিতে যেতে পেরেছেন। মূল ঐতিহাসিক ঘটনার অন্তরালে হাসানের নেপথ্য বাল্যজীবন, তার দুঃখকর ঘটনাবলীর ইতিবৃত্ত নাটকীয় উপকরণের আকারে নাটকে উপস্থিত করে রসানুভূতিকে গাঢ় করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মীরজুমলার আহিরিনের স্মৃতিচারণ এবং অতীতের লজ্জাকর কার্যকলাপের স্মৃতি-দংশন নাটকে রসনাভূতির নতুন দিগন্ত মেলে দিয়েছে।

কাহিনীবিন্যাস ও ঔরঙ্গজেবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সুবাদে এবং ঐতিহাসিক তথ্য ও মূল ঘটনার আনুগত্যের পথে—নাট্যকারের প্রচ্ছন্ন প্রয়াস—সমস্ত হিন্দুস্থান ঔরঙ্গজেবের পদানত হচ্ছে—এটা দেখানো। এই প্রয়াস—কাহিনীর প্রত্যাশিত পরিণতির প্রতিশ্রুতির বাহক সুন্দর কাব্যিক সংলাপে—'একখাপের ভেতর দুই তরোয়াল থাকতে পারে না।' ঐতিহাসিক ঘটনার মূল সুরের সঙ্গে তাল রেখে প্রথম দৃশ্যেই গোলকুণ্ডার ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের চমৎকার ফন্দির কথা প্রকাশ করেছেন ঔরঙ্গজেব। পুত্র মহম্মদকে উৎসাহিত করেছেন তিনি গোলকুণ্ডার রাজ-কন্যার পাণি গ্রহণের জন্য।…"এতে সলজ্জ হবার কিছু নেই বৎস, এ রাজনীতি। প্রেমের মূল্যহীন লীলায় আমি তোমাকে নিক্ষেপ করতে চাচ্ছি না—আমি চাচ্ছি মোঘল হারেমে প্রবেশ করাতে একটি পুত্রবধূ, যে সুন্দরী হোক বা না হোক—

অনিবার্য ফল—জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নরাজিতে ভর্তি হবে মোঘল রাজকোষ।' কাহিনীর এই পরিকল্পিত একমুখীনতা—বিভিন্ন অনৈতিহাসিক চরিত্রের ভিড়ে এবং অনাবশ্যক ঘটনার ঘনঘটায় বারবার স্তব্ধ হয়েছে—বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

কাহিনীর এই উদ্দেশ্যমুখীনতা আরও স্পষ্ট হয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে কাহিনীর গতিবেগ বেড়েছে পুত্র মহম্মদের প্রতি তার নির্দেশের কঠোরতায়—যেমন করে পারো গোলকুণ্ডায় প্রবেশ করো। উদ্দেশ্যের এই একমুখীনতা কাহিনীর সুষ্ঠু বিন্যাসের পক্ষে সহায়ক হলেও ঘটনা গ্রন্থনের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত বিশেষ কার্যকরী হয় নি।

নাটকের কাহিনীতে মহম্মদের মূল ভূমিকার কথা মনে রেখেও নাট্যকার তার প্রার্থিত কুতুবশা কন্যার পাণিগ্রহণের পথে স্বাভাবিকভাবেই নাট্য জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। নাটকের সূচনায় দেখা গেছে কুতুবশার কন্যা দুটি—জেষ্ঠা মণিজা, কনিষ্ঠা আরজবন্দ। পাণিপ্রার্থীর তালিকাতেও দুজনের নাম—সম্রাট পুত্র মহম্মদ ও উজীরপুত্র আমীন। মহম্মদ কার পাণিপ্রার্থী হবে সেট্যা স্বয়ং সম্রাটও বলে নি বা তার পক্ষ থেকে অনুমান করাও সম্ভব ছিল না—দুটি কন্যার কে বেশী সুন্দরী। তাছাড়া সম্রাটের লক্ষ্য ছিল মোঘল হারেমে একটি কন্যাকে প্রবেশ করাতে পারলে গোলকুণ্ডার শ্রেষ্ঠ মণি-মুক্তা বা রত্নরাজি তার করায়ত্ত হবে। নাটকে এই সহজ ঘটনাটি ঘটতে দিলে নাট্যবৃত্ত রচনা হবে না—নাট্যাবর্তেরও সৃষ্টি করা যাবে না—বিচক্ষণ নাট্যকার সে বিষয়ে সম্যক সচেতন ছিলেন বলেই পরে নাটকের মূল নায়ক অনৈতিহাসিক ঘটনার মোড়কে একটি ঐতিহাসিক চরিত্র হাসানকে নাট্যবৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। কাহিনীর সূচনায় অন্ততঃ মহম্মদের সঙ্গে কোন কন্যাটির প্রত্যাশিত মিলন ঘটবে বা ঘটতে পারে সে সম্পর্কে নাট্যকার চলমান ঘটনাবলীর উপরই দর্শকদের নির্ভর করালে ভালো হত। কিন্তু তা করেন নি। কাহিনী গ্রন্থনে জটিলতার সৃষ্টি হতে না হতেই তা তরল করে দিয়েছেন নাট্যকার কুতুবশার সংলাপের মাধ্যমে। "জালঘাট বিজয়ী উজীর পুত্রকে সর্বাগ্রে পুরস্কৃত করা আমার কর্তব্য। কুতুবের ইচ্ছা তার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হোক আরজ, আমীনকে বিবাহ করুক। আর মণিজা যৌতুক নিয়ে চলে যুক মোঘল হারেমে।"

পূর্বপ্রতিশ্রুতিমত উজীরপুত্রের সঙ্গে আরজবন্দের দিদির বিয়ে হচ্ছে না—হচ্ছে সম্রাটপুত্র মহম্মদের সঙ্গে, কুতুবশার কাছে নাটকীয়ভাবে এই সংবাদ জানার পর তার এই নড়বড়ে সিদ্ধান্তকে ধিক্কার জানিয়েছে আরজবন্দ—"আপনার কন্যা দুটিকে আপনি······পণ্য দ্রব্যের মত একজন অপরিচিতের কাছে তুলে ধরলেন। কাল আপনি এক কন্যা একজনকে দেবার অঙ্গীকার করলেন আজ তাকে দিতে চলেছেন আর একজনকে ···"

এইটাই নাটকের চাবিকাঠি (key point)। নাটকে কে কার পাণিগ্রহণ করবে—মণিজা ও আরজবন্দ—কুতুবশার দুই কন্যাকে ঘিরে গোলাকুণ্ডার মধ্যে—তারি জন্যে

.একের পর ঘটনার আয়োজন। নাট্যাবর্ত সৃষ্টি হয় ঐ দুই কন্যাকে কেন্দ্র করে সম্রাটপুত্র মহম্মদ, উজীরপুত্র আমীন এবং প্রথমে প্রচ্ছন্নভাবে পরে প্রকাশ্যে হাসান— এই তিনজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে। নাট্যকৌতূহল—যতক্ষণ হাসান অপরিচিত, সাহসী, সত্যনিষ্ঠ যুবকের পরিচিতর আড়ালে ছিল ততক্ষণ ছিল দুই নায়ক— মহম্মদ ও আমীন এবং দুই নায়িকা মণিজা ও আরজবন্দকে ঘিরে। পরে ফকীরের সঙ্গী বৈরাগী হাসান যখন মীরজুমলা—আহিরিনের হারিয়ে যাওয়া পুত্র পরিচয়ের উদ্ভাসিত আলোকে আত্মপ্রকাশ করে তখনই নাট্যবৃত্তে দুই প্রার্থীর স্থলে প্রকাশ্যে তিন প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।

প্রথমে নাটকে দৃশ্যতঃ দুই নায়ক এর মধ্যে কে কাকে কামনা করে কিংবা প্রত্যাশা করে তা অস্পষ্ট রেখে নাট্যকার ব্যাপারটিকে কৌতূহলের উপকরণরূপে কাজে লাগিয়েছেন।

যখন গোলকুণ্ডার ছোটরাজকুমারী আরজবন্দ কুতুবশার কাছে নাটকীয়ভাবে জানতে পারে যে তার দিদি মণিজার বিয়ে পূর্বকথামত উজীরপুত্র আমীনের সঙ্গে হচ্ছে না—হতে চলেছে সম্রাট পুত্র মহম্মদের সঙ্গে তখন সে এক অসম্পূর্ণ রুমাল তুলে দেয় নসীর খাঁর হাতে। তারপর ব্যক্তিত্বপূর্ণ সংলাপে স্নেহেরবাণী করে দিল্লীর ওস্তাদ দিয়েই ওটাকে সম্পূর্ণ করে নিতে বলেছে সম্রাটপুত্রকে। যার সঙ্গে আরজবন্দের দিদির বিয়ে হবে তার জন্যেই তৈরি কারুকার্যমণ্ডিত রুমাল। এই অসম্পূর্ণ রুমাল ব্যাপারে নসীরের উৎসাহে এবং তার ধারণার অনুগামী হয়ে মহম্মদ ভেবে বসে—রুমাল দিদির জবানীতে তাকে দিয়েছে আরজবন্দ নিজেই। এইভাবে আরজবন্দকে মনে মনে মনোনীত করে নাট্য সমস্যা সৃষ্টিতে এবং কাহিনী গ্রন্থনের ব্যাপারে মহম্মদ নিজস্ব ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসে। এদিকে বেগম মহলেও এই প্রসঙ্গ তুলে নাট্যকার নাট্যবৃত্তের আয়তন বাড়িয়ে তুলেছেন। আসলে মূল কাহিনী গ্রন্থনে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে—স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে বেগম মহলে জেবিনা ও জেষ্ঠ কন্যা মণিজার সংলাপে।

মণিজার কি মত ? মোঘল হারেম না গোলকুণ্ডায় উজীরপুত্র এক আমীনকে বরণ করে সেখানেই ঘর বাঁধা ? কাকে গ্রহণ করবে সে ? কুতুবশার সরাসরি এই প্রশ্নের উত্তরে মণিজার সিদ্ধান্ত—সে সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করবে—শুধু যৌতুক নিয়েই সে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাবে। কিন্তু আমীনের প্রতি এই কি মণিজার পূর্বরাগের পরিণতি ? আমীন তার কাছে কি তা হলে খেলার পুতুল ? জেবিনার এ ব্যাপারে সায় থাকলেও আরজবন্দ ধিক্কার দিয়েছে মণিজার আকস্মিক এই পাত্র বদলের সিদ্ধান্তে সায় দেওয়ার ব্যাপারটাকে।

নাট্যবৃত্তের বক্ররেখার বক্রগতিতে নাট্যকার দর্শককে ভাববার অবকাশ দিয়েছেন। আরজবন্দ আসলে কি চায় ? দিদির জন্যে মনোনীত পাত্র অর্থাৎ সম্রাট পুত্র

মহম্মদকেই কি সে পছন্দ করে বেশী? নাট্যকার আরজবন্দের পছন্দকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে তার ঘটনার মালা গেঁথেছেন নাটকটিতে।

নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শেষ পর্যন্ত জমে উঠেছে আরজবন্দের মনোনয়ন নিয়ে মহম্মদ ও আমীনের শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা। নাটকে অসিযুদ্ধে দুই প্রেমিককে অবতীর্ণ হতে হয়েছে রোমাণ্টিক নায়কের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্রে।

আমীন ও মহম্মদের মধ্যে অনিবার্য দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলছে ঠিক সেই সময় নাট্য প্রয়োজনের নিয়মে আকস্মিক চমক সৃষ্টি—খানজাদীর খবর—যার জন্যে এত যুদ্ধ তকে কে এক পথিক লুঠ করে নিয়ে উধাও। নাটকের এই অংশটিকে ক্লাইমেক্সও বলা চলে। কারণ ভবিষ্যতে কে কাকে লাভ করবে সেই অনিশ্চয়তাকে সম্বল বা সম্পদ করে নাট্যকার এতক্ষণ এগিয়ে গেছেন।

হাসানের আসল পরিচয় জানার পর নাটকে স্পষ্ট পরিণতির লক্ষণ ফুটে উঠেছে। আরজবন্দের জন্যে অযোগ্য পাত্র যে নির্বাচিত হয় নি হাসানের পরিচয়ের রহস্য উদ্ঘাটনে তা প্রমাণিত হয়েছে।

মীরজুমলা ও আহিরিনের হারানো পুত্র—'ক্ষুধার্তের বিক্রয়' পুত্রের জন্য প্রতীক্ষায় তাদের উদ্বেল হৃদয়ের আর্তি নাটকটিকে মানবিক আবেদনে সিক্ত করেছে। স্মৃতিচারণ চক্ষের পলকে যাদুকরের যাদু দৃষ্টিতে তার বক্ষের দুর্গ ভেঙ্গে দিয়ে গেছে হাসান। হাসানকে দেখার পর থেকে মীরজুমলার Unbalanced আলুথালু ভাবটি নাটকে সুপরিস্ফুট।

আহিরিনেরও সেই মর্ম বেদনা। কোথায় যেন লুকিয়ে রাখা দন্তে দন্তে পেষণ করা মর্মবেদনা। কে যেন হারানো মায়ের স্বপ্ন দেখছে পাঁচিশ বছর ধরে। মীরজুমলার সঙ্গেও তার সেই পুরানো স্মৃতি প্রসঙ্গে কথোপকথন, আলাপন। ঠিক আমীনের মতই এক ভিখারীকে দেখে অর্থাৎ হাসানকে দেখে আহিরিন বিচলিত। এখানে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সঙ্গতির সীমানায় বাঁধা। কাহিনী বিন্যাসে এখানে নাট্যাবর্ত সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়।

একটি মিলনান্ত দৃশ্যের মধ্যে কাহিনীর পরিসমাপ্তি—যা অধিকাংশ ক্ষীরোদ-নাট্যের বৈশিষ্ট্য।

আরজবন্দ সম্রাটপুত্র মহম্মদকে অভিনন্দন জানিয়েছে প্রদত্ত অসম্পূর্ণ রত্নমালাটি সম্পূর্ণ করার জন্যে। তার ঘোষিত শর্ত অনুযায়ী মহম্মদই তার দিদি মণিজার আকাংখিত স্বামী।

এরপর পাঁচিশ বছরের স্মৃতি যা মূর্তি নিয়ে সকলেরই সামনে দাঁড়িয়ে আছে—তাকে চেনার পালা। তাই আহিরিনের কাছে মীরজুমলার আবেগময় প্রশ্ন—"চিনতে পারছো—চিনতে পারছো?" শেষ দৃশ্যে আহিরিনের আবেগ নাটকীয়

মহিমায় মহিমান্বিত। অন্য নাটকের মত পটপরিবর্তনের মাধ্যমে নাটকটির মিলনান্ত পরিণতি দেখানো হয় নি। এটি অবশ্য রীতির দিক দিয়ে নতুন, সুতরাং ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্য নাটকের ব্যতিক্রম এবং নিঃসন্দেহে শিল্প-সুষমা মণ্ডিত।

নাটকে অহিংসার জয়গান গাওয়ারও একটি সুযোগ নাট্যকার করে নিয়েছেন—বৈরাগ্য সাধারণতঃ হাসান মারফৎ। প্রকাশ্য দরবারে হাসান ওমরাহদের বিরুদ্ধে সাদা কথা বলে দেয় যে সে রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী। প্রতিক্রিয়ায় যে অনিবার্য সংঘাত দেখা দেয় তাতে হাসান জানায় যে সত্যাশ্রয়ী সে কখনও অস্ত্র ধরে না। নাটকে এছাড়াও উল্লেখ আছে যে অহিংসা মন্ত্রের জয়গান নিরীহ নিরস্ত্র দুনিয়ার বক্ষে এক নূতন সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে। নসরৎ এর অলৌকিক স্বপ্নবর্ণনার মধ্যেও তারই স্বীকৃতি রয়েছে।

ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে ঔরঙ্গজেব চরিত্রটি সম্বন্ধে প্রচলিত সংস্কার—তাঁর কূট বুদ্ধি ছিল না। রাজ্য বিস্তারের দুর্জয় বাসনা, গোঁড়ামি, নিষ্ঠুরতা সব কিছুই তুলির আঁচড়ে নাটকে ঐতিহাসিক চরিত্রের আভিজাত্য এবং প্রসিদ্ধি অটুট রেখেই। মহম্মদ চরিত্রটি অনেকটা দম দেওয়া পুতুলের মত নাটকের কাহিনী বিন্যাসে ইতস্ততঃ তার নিজস্ব ভূমিকা পালন করেছে যথাযথ-ভাবে। শেষাংশে প্রবল পরাক্রমশালী পিতার বিরুদ্ধাচারণের প্রতিজ্ঞায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মহম্মদ চরিত্রটি। ঔরঙ্গজেব গোলাকুণ্ডা আক্রমণের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে রেখেছেন। মহম্মদ শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী হয়েছে। ব্যর্থতার বিপদ জেনেও সে ঔরঙ্গজেবের গোলকুণ্ডা অবরোধের হীন চক্রান্তকে ব্যর্থ করবেই। তাই তার দৃপ্ত ঘোষণা সে হীন চরের কাজ করবে না—কুতুবশার অনুগ্রহও ভিক্ষা করবে না।

রাজকন্যা আরজবন্দ চরিত্রটি ভগিনী মণিজার চেয়ে অধিকতর প্রাণবন্ত। রোমান্টিক নায়িকার মত তার আচরণে যুগপৎ বিস্ময় ও রম্যবোধ দুই জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছে। আমীনের সঙ্গে তার অনুরাগ আরোপিত, পিতৃদত্ত প্রতিশ্রুতির অনুবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়। মহম্মদের প্রতি তার অনুরাগ স্পষ্ট নয়—আছে কি নেই বোঝা যায় না—এবং মহম্মদও এ ব্যাপারে নিঃসংশয় নয়। তবে মহম্মদের সঙ্গে তার সংলাপে আরজবন্দ সপ্রতিভ, প্রাণবন্ত। বৈরাগ্য সাধনরতঃ নৈরাশ্যবাদী হাসান এর সঙ্গে আরজবন্দের প্রেম প্রসঙ্গে প্রথমে প্রচ্ছন্ন, পরে প্রকাশ্য—জ্যামিতিক নিয়মসিদ্ধ সহানুভূতির সরল রেখা ধরে।

নাট্যকারের মূল লক্ষ্য ছিল হাসান চরিত্রটির বিকাশ। কারণ এই চরিত্রটিই শেষ পর্যন্ত নাটকে স্ব মহিমায় আত্মপ্রকাশ করে বিস্ময় ও চমকের সৃষ্টি করেছে। নায়ক কিংবা নায়কোপম যে তিনটি চরিত্র রয়েছে নাটকে—মহম্মদ, আমীন এবং হাসান-এদের মধ্যে হাসান চরিত্রটিই নাটকের সর্বাধিক প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। হাসান ও আরজবন্দ এর পূর্বরাগ প্রসঙ্গ কিংবা প্রথম পরিচয়ের রোমান্টিকতা

নাটকে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে স্থান পেয়েছে। হাসানের সঙ্গে আরজবন্দের কি করে প্রথম পরিচয় হল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে পরিবেশ বর্ণনায় অপূর্ব কাব্যিক রোমান্টিকতা আরোপ করার ব্যাপারে নাট্যকার ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

নাটকের শেষাংশে মীরজুমলার ও আহিরিনের রুদ্ধ বেদনার—পুত্র হারানোর মর্মব্যথার প্রকাশে দুটি চরিত্রের মানবিক আবেদন মূর্ত হয়ে উঠেছে। মীরজুমলার অতীত স্মৃতি মন্থন তার বাৎসল্যের দিকটিকে উজ্জ্বল করে ধরেছে। আহিরিনেরও সেই মর্মবেদনা—কোথায় যেন দন্তে দন্তে পেষণ করা মর্মযন্ত্রণা বা অনুভূতি—কে যেন হারানো মায়ের স্বপ্ন দেখছে পঁচিশ বছর ধরে।

দার্শনিক ফকীর চরিত্রে নসরৎ খাঁর মাঝে মাঝে আবির্ভাব নাটকীয় ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ না করলেও তাত্ত্বিক রসসমৃদ্ধ সংলাপ মুখরতার সৌন্দর্যে চরিত্রটি আকর্ষক।

॥ খাঁজাহান ॥

স্বীকার করে নেওয়া ভাল নাটকটি যথার্থ ঐতিহাসিক নাটকের পর্যায়ভুক্ত নয়, ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলের মধ্যে কিছু কিছু ঐতিহাসিক চরিত্রের সমন্বয়ে-ঐতিহাসিক উপাদান আশ্রয়ী রোমান্সধর্মী নাটক রূপেই এটি বিবেচ্য হওয়া উচিত।

খাঁজাহান পত্নী গুলনারা, পুত্র আজিমত, কন্যা রিজিয়া এবং সৈন্যাধ্যক্ষ—নাট্যবৃত্তে সকলের জীবনের ঘটনাই চক্রাকারে আবর্তিত। মূল সংঘাত স্বাধীনতা রক্ষায় প্রয়াসী লোদী খাঁজাহানের সঙ্গে, সম্রাটের সংঘাত মহাবৎ খাঁর সঙ্গেও।

খাঁজাহানের মানসম্ভ্রমের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার স্বপক্ষের সকলেরই মর্যাদা যা নাট্য কাহিনীর অন্যতম মূল বীজরূপে নাটকে প্রতিভাত হয়েছে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দৃশ্যের মাধ্যমে।

সোফিয়ার রূপ গর্ব নারায়ণের ঔদাসীন্যের দেওয়ালে প্রতিহত ও আহত হয়ে ছটফট করেছে। নাট্যবৃত্তে এই ঘটনাটিকে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে।

লোদী খাঁজাহান এবং সম্রাট সাজাহানের মধ্যেকার সংঘর্ষে অদৃষ্টবাদের ভূমিকা খাঁজাহানকে মহনীয় করে তুলছে। দুরন্ত প্রাকৃতিক বাধাকে অতিক্রম করতে পারে নি খাঁজাহান, পারলে নাটকের ঘটনা পরিবর্তিত হয়ে যেত। নাটকে অদৃষ্ট বনাম পুরুষকার এর দ্বন্দ্ব একদিকে যেমন কাহিনীর গতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি নাট্যবৃত্তের পরিধিকে দীর্ঘবৃত্তের পরিধিতে দীর্ঘায়িতও করেছে। খাঁজাহান এবং তার সঙ্গে নারায়ণের সমস্ত প্রচেষ্টার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে মহাবৎ খাঁ, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মহাবৎ খাঁর প্রাধান্যের তীব্রতার প্রচ্ছদপটে খাঁজাহানের

বিয়োগান্ত পরিণতি নাটকটিকে কারুণ্যমণ্ডিত করেছে। নাটকীয় কাহিনীর সাবলীল গতি নাটকটিকে সহজ পরিণতি ও স্বাভাবিক পরিণামের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

কাহিনী বহুলাংশে সংলাপশ্রয়ী। কাহিনীর পরিণতি মূলতঃ খাঁজাহান, তদীয় পত্নী গুলনারা, পুত্র আজিমত, কন্যা রিজিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ ইত্যাদির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

নাটকটির সূচনা আকর্ষণীয়। তোপধ্বনির আওয়াজে শুরু থেকেই সচকিত হয়ে উঠবে দর্শকবৃন্দ। আগ্রা স্বাগত জানাচ্ছে বীরশ্রেষ্ঠ মালবের সুবেদার খাঁজাহানকে। সেই সঙ্গে নাটকের নায়কের শুভাগমনও যেন অভিনন্দিত হল।

যাকে কেন্দ্র করে নাটক তার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের পূর্বেই তার প্রাক্তন পরম বন্ধু অধুনা শত্রু মহাবৎ খাঁর মুখে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথাশুনে নায়ক সম্বন্ধে কৌতূহল স্বভাবতই প্রবলতর আকার ধারণ করবে। নবাব দারুণ অভিমানী, সংগ্রামে দারুণ অকুতোভয়, অতুলনীয় ধীর, কেবল এক অভিমানই তার উন্নতির পক্ষে অন্তরায়। দুরন্ত আত্মাভিমান, দুর্দম স্বাধীনতাপ্রিয়তা, নিবিড় দেশপ্রেম নিষ্কলঙ্ক সাধুতাই খাঁজাহানের নিদারুণ পরিণতির জন্যে দায়ী।

শেষ দৃশ্যের কাহিনী বিন্যাসে অসঙ্গতি সহজেই চোখ পড়ে। শেষ দৃশ্যটি দাদাজীর ভাষায় 'মহামায়ার অঙ্গুলি সঞ্চালনে দুনিয়ার বিভিন্নমুখী প্রচণ্ড অভিযান সব আজ একস্থানে জড় হয়েছে।' সম্রাটের অঙ্গে অস্ত্র স্পর্শ করে খাঁজাহানের মৃত্যুর মধ্যে তার প্রতিশোধ চরিতার্থ করার তাৎপর্য অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু এ যেন দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো, সম্রাট সাজাহানকে বন্দি করার অনুকূল পরিবেশ পেয়ে নারায়ণের মনোবাঞ্ছা পূরণের চেষ্টাও ব্যর্থ করে দিয়েছে মহাবৎ খাঁ। কিন্তু সবকিছু ব্যাপারই স্থানকালপাত্রের সীমা বা সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে গেছে। নারায়ণের মনোবাঞ্ছা পূরণের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত মহাবৎ খাঁ ব্যর্থ করে দিলেও কিন্তু সম্রাটকে শেষ পর্যন্ত নৈতিক পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে খাঁজাহানের কাছে। কাহিনীর এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটলে নাট্যশিল্পের দিক দিয়ে কিছুটা শোভন হত। এরপর নারায়ণ ও সোফিয়া প্রসঙ্গ অবান্তর! দাদাজীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যাও নাটকের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, অনাবশ্যক। বরং কাহিনী বিন্যাসের দিক দিয়ে এ প্রসঙ্গে সামান্য ইঙ্গিত দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল বেশী।

নাটকটির সংলাপ, নাটকীয় ঘটনা এবং সাহিত্য-গুণ ইত্যাদি সম্পর্কে আরও কিছুটা বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন।

নারায়ণের সংলাপের মাধ্যমে সমগ্র কাহিনীর সারাংশবিন্যাস নাটকীয় রসসৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। দর্শক কিংবা নাটকটির পাঠকবর্গকে পূর্ব ঘটনা সম্বন্ধে সজাগ করিয়ে দেবার প্রচেষ্টা নাটকের অন্যতম শর্তের মধ্যে পড়ে। ক্ষীরোদ-নাট্যে এই শর্তের প্রতি আনুগত্য লক্ষণীয়। নবাব আগ্রায় নিমন্ত্রিত হয়ে নিষ্ঠুর বাদশা

কর্তৃক অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি সিংহ-বিক্রমে সকল দরবারীকে পরাস্ত করে আগ্রা ত্যাগ করেছিলেন।······নসীব তাকে দেশে পৌঁছাতে দিলে না। তার স্ত্রী মরেছে। কন্যা মরেছে, সমস্ত বাঁদী মরেছে, পুত্র যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। তিনশত বাছা সৈন্য কতক স্থলে শুয়েছে কতক জলে ডুবেছে। সম্রাটের বিশ্বাস-ঘাতকায় প্রতারিত নবাব শেষে আক্ষেপ করেছেন সাধুতার পুরস্কার পেয়ে। তার জীবনবেদ—জীবন দর্শনের ভিত্ উঠেছে কেঁপে। 'এত প্রেম এত বুদ্ধি প্রজা-হিতৈষণা সমস্ত থাকিতে আমি জীবন ভিখারী।'—এ আক্ষেপের উত্তর আত্মসমীক্ষার অনুশোচনায়। 'বিস্মৃতির অতল গহ্বরে যদ্যপি বাবার বংশে দিতাম ডুবায়ে, কার শক্তি করিত উদ্ধার? শুধু সাধুতায় সর্বস্ব হারানু।' এ যেন আধুনিক যুগ যন্ত্রণার হাহাকার। সাধুতার পরিণাম সংশয়ে গভীর নৈরাশ্য।

নাটকের সংলাপ কোন কোন জায়গায় ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক। উত্তর প্রত্যুত্তর, ঘটনা সন্নিবেশ, নাটকীয় গতিবেগ এ্যাক্সান প্রভৃতির দিকে প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যটি অবশ্যই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই একটি মাত্র দৃশ্যে প্রায় প্রত্যেক চরিত্রই আপন আপন বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে। সম্রাটের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে নারায়ণ একদিকে যেমন সম্মানিত, সে সম্মানের চেয়েও তার কাছে বড় পিতার প্রভুর মর্যাদারক্ষা। সে আসন ত্যাগ করে খাঁজাহানকে সম্মানিত করেছে—সম্রাটের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র পণ্ড করতে চেয়েছে। কূটনৈতিক সম্রাট তাতেও দমেন নি। আজিমত্‌কে অপদস্ত করার পথ বেছে নিয়েছেন। 'যতদিন না তোমার আচরণের প্রতিশোধ নিতে পারছি ততদিন সহস্র ময়ূর সিংহাসনেও আমার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হবে না। যেমন করে হোক তোমার গর্ব ক্ষুণ্ণ করবো।' সম্রাটের এই প্রতিজ্ঞা আর প্রতিজ্ঞামাফিক কার্যধারা নাটকের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহকে দ্রুততর করেছে। গর্ব খর্ব করার দুরন্ত প্রতিহিংসা বনাম আত্মমর্যাদা রক্ষার জীবনপণ সংগ্রাম—দুই বিপরীত-মুখী বাসনার সংঘর্ষে উল্লিখিত দৃশ্যটি অপূর্ব নাট্যরস মাধুর্যে উপভোগ্য ও রমনীয় হয়ে উঠেছে।

'নসীব তাকে দেশে পৌঁছাতে দিল না।' দুরন্ত চম্বল যেন খাঁজাহানের স্বাধীনতা হরণের জন্যে হঠাৎ সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করে বসল। আজফ্ নিজেই বলেছে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সবার জীবনের বিনিময়ে খাঁজাহান রক্ষা করতে চলেছেন তার নিষ্কলঙ্ক মাতৃভূমির স্বাধীনতা। দেশে গিয়ে তিনি শক্তি সঞ্চয় করবেন, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবেন। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস। গ্রীক্ ট্র্যাজিডির অদৃষ্টবাদ এই অংশে নাট্যকারের স্মরণে এসে থাকবে। গ্রীক ট্রাজিডি অনুকৃত ট্রাজিডি পরিকল্পনায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে নাটকের কাজে লাগিয়েছেন নাট্যকার। দেশের দিকে খাঁজাহানের তীব্রবেগে ধাবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের গতিবেগও হয়েছে দ্রুততর, চম্বলের তীর-প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অসহায়

খাঁজাহানের মত নাটকীয় গতিবেগেরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তার গতিবেগের স্তব্ধতার সঙ্গে সঙ্গে নাটকটির নাটকীয়ত্বেরও সমাপ্তি ঘটে গেছে।

এরপর থেকে খাঁজাহান যেন প্রকৃতির হাতে ক্রীড়ানক। তবু তার মধ্যেও তার সংলাপে শক্তি আরাধনার আকুল আর্তি লক্ষ্য করার মত। ক্রমশঃ ক্ষয়িষ্ণু জীবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে খাঁজাহান চরিত্রের রূপান্তর ঘটেছে। নাটকের বাহ্যিক ঘটনা থেকে আমাদের মনোযোগ সরিয়ে নাট্যকার জীবনের গভীরে নিয়ে গেছেন। নাটকের শেষাংশে নাটকীয় বিধিবন্ধ নিয়মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হলেও শেষাংশ বহুলাংশে সাহিত্য-গুণ মণ্ডিত।

নাটকে অদৃষ্টবাদ আরো একবার নাটকের করুণরস সৃষ্টির প্রয়াসী হয়েছে। খোদাদাদ খাঁজাহানের জন্যে প্রকাণ্ড শালকাঠ সংগ্রহ করে চম্বলের ওপারে মালবে যাবার ব্যবস্থা করল। শেষ উপায়। তাও অদৃষ্টে সইল না। সন্ধান করতে হবে গুলনারার, রিজিয়ার আর তাদের সঙ্গিনীদের। তারা নবাবের মর্যাদারক্ষায় আত্মাহুতি দিয়েছে-শেষ শয্যা রচনা করেছে অরণ্যের মৃত্তিকায়। তাদের সন্ধান করে মৃতদেহের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করার আহবান এল। অদৃষ্টবাদের নাটকীয় আকস্মিকতায় কাহিনীর মোড় ঘুরেছে। খাঁজাহানের মাতৃভূমিরক্ষার শেষ উপায় দেখতে দেখতে মরীচিকার মত মিলিয়ে গেছে।……খাঁজাহানের আক্ষেপ প্রতিধ্বনিত হয়ে রইল অরণ্যের গহন অন্ধকারে —'হাতের ফল মুখে তুলতে দিলে না।'

খাঁজাহান, দরিয়া, খোদাদাদ, আজিমত, রিজিয়া তাদের সহচরবৃন্দ অন্যান্য সৈন্য সামন্ত সবার আত্মত্যাগের মহিমায় খাঁজাহান নাটকটি বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। আদর্শবাদ ও যুগধর্মের প্রতীকী হিসাবে ও নাটকটি নাট্যসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে রাখবে।

প্রবল জাত্যাভিমান, বিভিন্ন জাতির মধ্যে নিবিড় ঐক্যের পরিপন্থী। পরাধীন মুক্তিকামী জাতির মধ্যে জাত্যাভিমান দূরীকরণে কবি নাট্যকার সাহিত্যিক কেউ পিছিয়ে ছিলেন না। পিছিয়ে ছিলেন না নাট্যকার, ক্ষীরোদ-প্রসাদও। নারায়ণ রাও এর আশ্রয়দানের সময় দাদাজী মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, যদি জাতির অভিমান রাখতে চাও —তাহলে থাকতে বলতে পারি না।

খাঁজাহানের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভূমিকা বিভিন্ন চরিত্রের কাছে যথোচিত শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে। মহাবৎ বলেছে, খাঁজাহান নিজের স্বাধীনতা রক্ষার্থে বেগম পরিত্যাগ করতে কুণ্ঠিত নয়।

দেশপ্রেমের জ্বলন্ত প্রেরণা শুধুমাত্র খাঁজাহান, আজিমত, গুলনারা রিজিয়ার মধ্যেই নয়— দেশের জন্যে নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করবার জন্যে যেন তীব্র প্রতিযোগিতা সবার মধ্যে। যেন সেই রবীন্দ্রকাব্যের দেশপ্রেম 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তার লাগি কাড়াকাড়ি।' শাহাজাদার সঙ্গে বীরের মৃত্যু বরণ করবে কে? খোদাদাদ না

দরিয়া তার পরীক্ষা হবে অস্ত্রযুদ্ধে। যে বাঁচবে তার অধিকার যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মৃত্যু বরণ করবার।

দরিয়া বলেছে, ভাই শাজাদাকে কোলে নিয়ে সুখের মৃত্যু মরবার আমার সাধ হয়েছে।

গান্ধীজির অহিংস আন্দোলন দেশাত্মবোধকে প্রভাবিত করেছিল। সেই অহিংস ধর্মের প্রতি আস্থাও লক্ষ্য করা গেছে নারায়ণের সম্রাট-প্রদত্ত অসি ত্যাগ করার ঘটনায়। দাদাজীর কঠোর ধিক্কার-এ নবাবের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোবৃত্তি অহিংস ধর্মের সংঘর্ষে সুনিয়ন্ত্রিত হয়েছে। চণ্ডালত্বগত ব্রাহ্মণ সন্তানের চোখ ফুটেছে। মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে 'বিনা রক্তপাতে কি প্রতিশোধ হয় না ?'

গভীর জীবনদর্শন নাটকের সংলাপে সংক্ষিপ্ততায় স্থানে স্থানে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি নাট্যকার শ্রদ্ধাশীল। সোফিয়াকে নারায়ণ দেখেনি, রূপসীর রূপদর্শনে তার অক্ষমতা বলে সোফিয়া যখন মন্তব্য করছে দাদাজী তখন বলেছেন, ব্রাহ্মণ দেখতে জানে না ? জাতির চক্ষু দিয়ে সে দর্শন করে। নারায়ণের উক্তিও অভিজ্ঞ দার্শনিকতায় সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম। মানুষের মুখ দেখে মনের গঠন জানতে যাওয়া কি ভ্রম। সত্যিই সেই মূর্তিমান ভ্রম তখন তার চোখের সামনে। সোফিয়া শান্তি চেয়েছিল। দাদাজী তার উত্তরে বলেছে, 'শান্তি কে না চায়' ? দুনিয়ার সকল জীব ঐ একটিমাত্র বস্তুর ভিখারী। তারই জন্যে প্রতাপ আজীবন বনে বাস করেছে। শক্তসিংহ বাদশার দাসত্ব গ্রহণ করেছে। আবার রণক্ষেত্রে ভ্রাতার জীবন রক্ষা করতে জাহাঙ্গীরের সঙ্গ ত্যাগ করেছে। তোমার পিতা মুসলমান হয়েছে, তুমি সিংহাসন পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়েছো। আর আমি তোমার মোহের আকর্ষণে এখানে পীরের দরগায় গড়াগড়ি যাচ্ছি। নাটকের প্রয়োজনের গুরুত্বের কথা বাদ দিলে এখানে শান্তির আপেক্ষিক ভৌগোলিক সংজ্ঞার উদাহরণ এককথায় অপূর্ব।

ঘটনার আকস্মিকতা, পরবর্তী ঘটনার পূর্ব ইঙ্গিত বহন প্রভৃতি সূক্ষ্ম কাজ স্থানে স্থানে সার্থক সৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করছে।

দাদাজীর হেঁয়ালি দার্শনিক উক্তি অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'এই দুনিয়ায় কে মারছে ? কে মরছে ? যে মারছে সে মারছে না, যে মরছে সে মারছে ?'

নারায়ণ চরিত্রের আত্মসমীক্ষা মনোবিজ্ঞানসূত্রে গ্রথিত। এই আত্মসমীক্ষার আলোকে চরিত্রটি ধীরে ধীরে সমুদ্ভাসিত। নারায়ণ শেষ পর্যন্ত তার প্রতিহিংসা পরায়ণতার মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করেছে। শেষ পর্যন্ত সে নবাবের মহত্ত্বে ও সম্রাটের প্রতারণায় খাঁজাহানকে আত্মীয় বলে স্বীকার করে নিয়েছে। 'যেন তোমারি দাসত্ব প্রাণ আনন্দে করিব দান।'

নাটকটির স্থানে স্থানে বিশেষত শেষাংশে মৃত্যু চেতনা রবীন্দ্রভাব-ধারায়

প্রভাবিত। কখনও সে চেতনায় মৃত্যু সুন্দর সৌমদর্শন—'মরণরে তুঁহু মম শ্যামসমান' সদৃশ। কখনও মৃত্যু 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য' স্বরূপ। নাটকটিতে যুদ্ধ বর্ণনার কাব্যিক প্রকাশ ও সবিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। এ নাটকে মহাবৎ খাঁকে ছদ্মবেশে দেখা করতে আসতে দেখা গেছে খাঁজাহানের সঙ্গে। বালকের ছদ্মবেশে সোফিয়াকে দেখা গেছে ভীল সৈন্যদের সাহায্য নিয়ে রন্ধ্র পথে অবস্থান করতে। ক্ষীরোদ নাটকের বৈশিষ্ট্য এই ছদ্মবেশ। সমাপ্তি ক্ষীরোদ প্রসাদের অন্য কয়েকখানি নাটকের মত অনাটকীয়, শিল্প সম্মত নয়। শেষাংশে কিছুটা অনাবশ্যক সংলাপ বর্জন করলেও চলত।

॥ আহেরিয়া ॥

আহেরিয়া নাটকটির জাত বিচারে এটা স্পষ্ট যে নাটকটি মূলতঃ রোমান্টিক ঐতিহাসিক নাটক। আহেরিয়া নাটকের আহেরিয়া উৎসবে বারাহা লাঙ্গাই এর বীরকুলের মেতে ওঠার ঘটনা ঐতিহাসিক। নাটকটি মূলতঃ ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে একটি রোমান্টিক আখ্যায়িকার অনুরূপ। নাটকটিতে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে বিস্ময় বিমিশ্রিত কৌতূহল একটি সীমানা প্রাচীর রচনা করেছে। আহেরিয়া উৎসবে মত্ত বীর বংশীয় বালকের ধমনীতে অকস্মাৎ বীর রক্ত নেচে ওঠার এবং তার বীরবেশে ছুটে চলার পেছনে কী সঙ্গত কারণ থাকতে পারে তার সদুত্তর নাট্যকার দেন নি। বীরবংশে বীর সন্তানের জন্মগ্রহণের বৈজ্ঞানিক সত্যকে মেনে নিলেও কোন যুক্তিতে মেনে নেওয়া যাবে যে মহাবীর্যবান হওয়ার জন্যে শিক্ষার ভূমিকা একেবারেই গৌণ। Heridity-র সঙ্গে Environment এর সংযোগেই তো শিক্ষা। তা না হলে কী নাটক কী গল্প উপন্যাস সব কিছুতেই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু নাটকে বীর বালককে দেখা যায় সে এক অলৌকিক শক্তিবলে সুশিক্ষিত রাজপুত্রদিগকে অশ্বারোহণে ও যুদ্ধে একে একে পরাস্ত করেছে। এই ধরনের চারিত্রিক অসঙ্গতির জন্যে নাটকটি ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলি থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং রোমন্টিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াসসূত্রে নাটকটি ক্রমান্বয়ে উপকথার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে।

নাটকটি কিন্তু উপাদানের বৈশিষ্ট্যে, ভাবদ্যোতনার বৈচিত্র্যে অদ্বিতীয়। এতে আছে রাজপুত্র বারাই লাঙ্গাই ভট্টি প্রভৃতির বীরোচিত আচরণ—মর্যাদাবোধের লড়াই। জাতির অভিমান এখানে প্রতিজ্ঞার আকারে প্রচারিত। সে প্রতিজ্ঞার ক্রয় মূল্যে যত কিছু সংঘাত। এখানে অন্যায়ের প্রতিশোধের মধ্যে উগ্রতা নেই—তীব্রতা আছে। প্রতিশোধ স্পৃহার পিছনে আছে ত্যাগের মহিমা—আছে তপস্যার তিতিক্ষা।

নাটকাটির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে বাক্‌সংযম। সংলাপের ভাষা বহুলাংশে বিভিন্ন ভাবের বাহন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে। শেষাংশে মুক্ত পন্তার ছন্দের প্রয়োগও ভাবানুগামী। দীর্ঘ সংলাপের বাধা ঠেলে নাটকটিকে পথ করে নিতে হয় নি। যা কিছু বাধা তাও অকিঞ্চিৎকর।

সংখ্যার দিক দিয়ে চরিত্র অনেক, তবে কয়েকটি চরিত্র স্বাতন্ত্র্যে ও ব্যক্তিত্বে অনন্য হয়ে উঠতে পেরেছে।

ছদ্মবেশের দৃষ্টান্ত ক্ষীরোদনাট্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ নাটকে কিন্তু সে ছদ্মবেশ কাহিনী বিন্যাসের অন্যতম উপাদান। এ ছদ্মবেশের রহস্য উদ্ঘাটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের অতীত উপাদান সুষ্ঠুভাবে পরিবেশিত হতে পেরেছে। ঈশ্বরী রাও দেবীদাসের ছদ্মবেশে যা কিছু করেছে তার অভাবে নাটকটির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়তো।

শাক্তধর্মের প্রতি নিষ্ঠা এবং ধর্মীয় আচার আচরণ, সংস্কার প্রভৃতিকেও নাটকটির অপরিহার্য উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। মন্দিরে দেব রায়ের অনুসন্ধানকারী শত্রু বারাহদের একে একে বলি প্রদান (ঈশ্বরী রাও কর্তৃক) নাটকের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে,—ধর্মীয় মতবাদ ও বিশ্বাসের প্রতিও আনুগত্য দেখাবার সুযোগ ঘটেছে।

এ নাটক একদিক দিয়ে মিলনান্ত—দেব রায় কেতুর মিলনে ও বারাহ লাঙ্গাই ভট্টি-ত্রি শক্তির মধ্যে সন্ধি স্থাপনে—(রেবা সুজন ও গরধন সুরার প্রত্যাশিত মিলনেও বটে) এবং বিজেতা বিজিত-এর পরস্পর ভাব-সম্মিলনে। বিশ বৎসরের তপস্বিনী কমলা যে মূল্যে কেতুকে পুত্রবধূ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন কেতু সেই মূল্যের প্রতি যথাযথ মর্যাদা জানিয়ে নিজেকে ক্ষত্রিয় নন্দিনী বলে প্রমাণ করেছে। মুলরাজও বিনা পণে কন্যাকে দান করতে রাজী হন নি—নিজের খণ্ডিত মস্তকের মূল্যে তিনি বিশ বৎসর পূর্বেকার তনু রায় হত্যার অন্যায়ের প্রতিকার করেছেন আত্মবিসর্জন দিয়ে। বারাহ লাঙ্গাই ভট্টি এই ত্রিশক্তির মধ্যে তিনি বেঁধে দিয়েছেন মৈত্রীর ও ঐক্যের রাখীবন্ধন—একজাতি একপ্রাণ একতার জাতীয় বন্ধন।

এ নাটকে রোমাণ্টিক দৃশ্য রয়েছে একাধিক। কিন্তু সে দৃশ্য সংযমের সুতোয় বাঁধা—ক্ষত্রিয় রমনীর প্রতিজ্ঞা কিংবা কঠিন পণে সে অনুরাগ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। সে আগুনে খাদ গলে আসল ধাতু বেরিয়ে এসেছে।

ঐতিহাসিক উপাদানের আলোছায়ায় এ এক অপূর্ব কাহিনী। ত্যাগ, তিতিক্ষা, প্রতিশোধ, পণ, প্রতিজ্ঞা, বীরোচিত আচরণ, কাপুরুষতার প্রতি ধিক্‌কার-সব কিছু এতে স্থান পেয়েছে। এতে রয়েছে সত্যের জয়গান, অন্যায়ের প্রশান্ত প্রতিকার। অন্যায়কারী এখানে 'ভিলেন নয়' রক্ত মাংসের মানুষ মর্যাদামণ্ডিত রাজা। তার পূর্বকৃত অন্যায় রাজনীতির বিচারে অন্যায় নয়। তিনি যোগ্যকে সমাদর করতে জানেন—বীরকে বরণ করে নিতে গিয়ে সংস্কারের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জয়ী হওয়ার সাধ্য

রাখেন। এতে আছে অস্পৃশ্যতার প্রতি অবজ্ঞা, ঘৃণা এবং শেষ পর্যন্ত তার প্রতিকার। তাদের স্বীকৃতি যদিও তা প্রচারমূলক—রাজার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া—স্বেচ্ছায় দান নয়, তবুও বলবো, চামার গৃহে প্রতিপালিত দেবরায়কে রাজ্য দানের মধ্যেই তার স্বীকৃতি হয়ে গেছে। রাজার ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্যেই যেন তার উল্লেখ।

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের শেষ দৃশ্যের বৈশিষ্ট্য সমন্বয়, সন্ধি। এখানে শেষাংশে দেশ প্রেম, ঐক্য ও সাম্যবাদ, সুস্পষ্ট। অবশ্য কাহিনীর সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে এই পরিণতিকে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা কতকাংশে সাফল্য লাভ করেছে।

বারাহ লাঙ্গাই ভাট্টি-ত্রিশক্তি মিলনে, তোমাদের প্রেম আচ্ছাদনে

একজাতি এক প্রাণ এক ভাষা এক গান, অটুট অব্যয় শক্তি হোক রাজস্থানে।

জাতিভেদের প্রশ্নটা অমীমাংসিত রাখতে রাজী হন নি নাট্যকার। চমৎকার রুইদাস যে রাজাকে ফিরিয়ে দিল মানুষ করে—কমলাকে সাহায্য করল তার ব্রতপালনে—তারা কি অপাংক্তেয় থাকবে? ''আজি হতে তারা জাতি মধ্যে হ'ল প্রতিষ্ঠিত।

কি সাধু, অনার্য আমি ?'

দেব রায় :—তোমার চরণস্পর্শে রাজা, অনার্য ক্ষত্রিয় হয়। ক্ষত্রিয় দ্বিজত্ব করে লাভ।

দেব রায় জয়ী। জননী কমলা কি দেখতে এলে ? সংলাপ সুন্দর—এসেছ মা : হতভাগ্য সন্তানের মর্মঘাতী জয় দেখিবারে এতক্ষণ পরে ?'

—এ যেন কর্ণকুন্তি সংবাদের প্রতিধ্বনি : দেবতার চরিত্র চিত্রণে তার এই মর্মজ্বালা ক্ষীরোদনাট্য সাহিত্যের উল্লেখ্য নিদর্শন। —'সব লয়ে জননী আমার ক্ষুদ্র সেই পর্ণশালা দাও ফিরাইয়া।'* থালায় মুণ্ড হস্তে কেতুর অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার নির্মম অথচ অপূর্ব সুন্দর শেষ সংলাপ—বল মা, বল মা আমি ক্ষত্রিয় নন্দিনী—এক কথায় মর্মান্তিক অথচ অপূর্ব সুন্দর সংলাপ মালা।

* এ যেন রবীন্দ্র কবিতার প্রতিধ্বনি—'দাও ফিরে সে অরণ্য লহ এ নগর।'

॥ বঙ্গে রাঠোর ॥

রঙ্গলালের বীরত্ব প্রদর্শনের সূত্রে একের পর এক ঘটনা ঘটে গেছে। ঐতিহাসিক, অনৈতিহাসিক, ধর্মীয় ভাব-প্রভাবিত অনেক কিছু ঘটনাই ঘটেছে নাটকে। রঙ্গলাল ও কলি বেগমকে ঘিরে রোমাণ্টিক পরিবেশ, পরিস্থিতি ও ঘটনা-সৃষ্টি নাটকটিকে আকর্ষণীয় করেছে মাত্র, নাট্যকাহিনী গ্রন্থনে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে নি কিংবা নাট্যবৃত্ত রচনায় কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে নি।

ভোলাই এর ছোটবারু রঙ্গলাল সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। দুর্দান্ত পাঠান-বীর মুন্দা খাঁর কবল থেকে তার চল্লিশ জন সঙ্গীর হাত থেকে এক এক আওরতকে ছিনিয়ে নেওয়া সহজ কথা নয়। এই নিয়েই নাট্যারম্ভ এবং নাট্য-কাহিনীর জাল বিস্তার। রঙ্গলালের 'সিভালরি' ও দুঃসাহস—সাবধানতা সত্ত্বেও পাঠানীর মুখ দেখার রোমাণ্টিকতা আর নেশাখোরের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ-সব মিলিয়ে একটি সত্যিকারের মানুষকে কেন্দ্র করে নাট্যকার একটি যথাযথ ঐতিহাসিক নাটকের পরিমণ্ডল সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছেন। নাটকে কলিবেগমের প্রতি রঙ্গলালের আসক্তি ও প্রণয়ের ব্যাপারে তিনি প্রয়োজনীয় সাবধনতা অবলম্বন করেছেন। কলি বেগমের প্রতি রঙ্গলালের আকর্ষণানুভূতি সুকৌশলে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। কলি বেগম নিজের অজ্ঞাতে প্রাণমন সঁপে দিয়েছে রঙ্গলালকে কিন্তু তা কতটা কাব্যিক পরিচ্ছন্নতার আকারে এসেছে তার আত্মীয়ের বিবরণ প্রসঙ্গে তা জানা গেছে। রঙ্গলালের কর্তব্যনিষ্ঠা অবশ্য তার স্বাভাবিক ইচ্ছাকে অবদমিত করে তাকে সচেতন করে দিয়েছে—সংযমের শক্ত দড়িতে বেঁধে রেখেছে। কলি বেগমের পিতা অবশিষ্ট পাঠান সৈন্য নিয়ে প্রাণপণে শত্রুকে বাধা দিয়েছে। কলি বেগমের রক্ষীরা তাঁকে ফেলে পালিয়ে গেছে। এখানে কাহিনী গ্রন্থনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' বা 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রভাব প্রত্যক্ষ।

অদৃষ্টে কি আছে কলি বেগম বা রঙ্গলাল—কেউই তা জানে না। —এই তো নাটক।

কলি বেগমকে দেখে ভুবনেশ্বরী তন্ময় : একেই তা'হলে রঙ্গলাল দুরাত্মার হাত থেকে উদ্ধার করেছে : প্রদীপ্ত দেশপ্রেমের জ্বলন্ত উদাহরণ। যেখানে শিশোদীয় কন্যা আছে সেখানেই সত্য হৃদয় ক্ষাত্রতেজে উদ্দীপ্ত করে রেখেছে।

ভুবনেশ্বরীর নির্দেশে ফটক বন্ধ করে বাইরে থেকে চাবি দিয়ে সে চাবি নন্দলালের হাতে দিয়ে যেন চলে যায় রঙ্গলাল। এখানে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের কিছু প্রভাব থাকতে পারে।

প্রথম অঙ্কের নাট্যকাহিনী যেন সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবুও নাটকের বৈশিষ্ট্য এর একমুখীনতা। নাটকে ভোলাই মাতাল, তাহলেও তার তাল ঠিক

আছে। কথায় বলে জাতে মাতাল, তালে বেতাল নয়। তার পা টলছে, তবুও সে কর্তব্যে অটল। আরো আশ্চর্যের কথা, ভোলাই মাতাল হলেও দার্শনিক। রঙ্গলালও তার মতে মাতাল—প্রেমে মাতাল। রঙ্গলাল যে মদ খেয়েছে তার নেশা এ জন্মে ঘুচবে না।

সাবাজ দাঁ নিজের অতীত বর্ণনায় মুখর হওয়ার আগে প্রকৃতির সাহায্য নিয়েছেন। এই নাটকে প্রকৃতি বর্ণনা বিরল দৃষ্টান্ত। তবুও শিল্পগুণের দিক দিয়ে এর মূল্য অনস্বীকার্য।

এ নাটকে অদৃষ্টবাদও নাট্যকাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। "খোদার বিচিত্র মর্জি। আজ তারই ইচ্ছায় উজীরসাহেব আপনার ঘরে অতিথি। তাই তো কোথা থেকে উজীরও এসে জুটল। তাই কিনা—এই রাত্রেই?" —কাহিনী গ্রন্থনে এই আকস্মিকতাই নাট্যকারের অন্যতম সম্পদ বা সম্বল।

ঘটনার ঘনঘটায় নাটকে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে যখন রঙ্গলালের সঙ্গে যেতে কলি বেগম আপত্তি জানিয়েছে। কলি বেগম ও রঙ্গলালের রহস্যালাপে রোমাণ্টিকতা আরোপিত। কলি বেগম বলেছে—'বাবুসাহেব, আমার স্বামী আছেন। তিনি দীর্ঘজীবী হউন।' কিন্তু কে তার স্বামী? —রঙ্গলাল ধরতে পারে নি। তার কাছে তা রহস্য। প্রেমের দুরন্ত প্রকাশে কলি বেগমের রোমাণ্টিকতা যে কী নিঃসংকোচ হয়েছে তা ভাবলে নাট্যকারের দুঃসাহসে বিস্মিত হতে হয়। 'অতি কঠোর সমাজ বাধা না দিলে আজ আমি তোমার মুখ চুম্বন করতুম।'

কলি বেগমের নন্দলালকে অভিবাদনের দৃশ্যে স্বাভাবিক স্নিগ্ধতা লক্ষ্য করার মত। প্রকৃত ঘটনা কলিবেগম নিজের মুখে বলে রঙ্গলালের দোষ স্খালন করেছে। ফলে কাহিনী গুটিয়ে নেবার সচেতন প্রয়াস প্রকট হয়ে উঠেছে।

কলিবেগম থাকবে কোথায়—তা নিয়ে নাট্যসমস্যার সূত্রপাত করার চেষ্টা হয়েছে এবং নূতন দুর্যোগের ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক নাটক মূলতঃ সাহস ও বীরত্বের ইতিকথা। প্রসিদ্ধ পাঠানবীর জুনিদ খাঁ কলিবেগমের পাণিপ্রার্থী। তা জেনেও নন্দলাল বলেছে—'তোমাকে গৃহে রাখতে যদি আমার গৃহ ধূলিস্যাৎ হয়, তাও স্বীকার, তবুও তোমাকে আমি রাখবো।' নন্দলালের ধারণায় কলি ও তার পিতা উজীর সকলের একত্রে সমাবেশ অভাবনীয়, অচিন্ত্যনীয় ঘটনা। এসব অবশ্য নাট্যকারের সচেতন প্রয়াসেরই ফলশ্রুতি।

শেষাংশে নাটকটি ভাবসমৃদ্ধ ধর্মমূলক হলেও নাটকটিতে বাঞ্ছিত গতিবেগ সঞ্চারিত হয় নি। দুয়ারের সামনে মন্দিরের বিগ্রহ চূর্ণ হয় হয়। এই অংশে কিছু কিছু 'সাসপেন্স' সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। জৈনুদ্দিনের চোখকে মনে হয়েছে গোপালের চোখ। আছাড় মেরে পুতুলটাকে মাটিতে গুঁড়িয়ে দিতে গিয়েই চরম ঘটনা ঘটল। মুর্দা খাঁকে নিহত হতে হল জৈনুদ্দিনের হাতে।

মুর্দা খাঁর নিজের মুখেই হিন্দুদের প্রশস্তি—"অতি অত্যাচারে পাথরেপ্রাণ এসেছে। অচল গোপাল সচল হয়েছে। অস্ত্র ধরে আমায় কেটেছে।" এখানে কাহিনী বিস্তারে ও সংলাপে নাট্যকার মঙ্গলকাব্যের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এরপর সেই অন্তিম দৃশ্য। অভাবনীয় চমকপ্রদ সব ঘটনার সমাবেশ। বংশের কেউ যা করতে পরে নি সচল গোপাল সেই অসাধ্য সাধন করেছে। জৈনুদ্দিন ভুবনেশ্বরীর গলা জড়িয়ে ধরে তাকে মাতৃ সম্বোধন করেছে। সে যেন ভুবনেশ্বরীর জন্ম জন্মান্তরের হারানিধি।

নাটকটি যে আসলে ঐতিহাসিক নাটক এবং এ নাটকে একটি বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি অপরিহার্য, নাট্যকারের সে কথা সম্ভবতঃ মনে পড়েনি। তাই জৈনুদ্দিন চরিত্রটিতে পুরোপুরি বৈষ্ণবভাব আরোপ করেছেন তিনি নিদ্ধিধায় এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবে। ঐতিহাসিক নাটকে এ ধরনের ধর্মভাব বিশেষ করে বৈষ্ণব ধর্মের অনুপ্রবেশ ঐতিহাসিক নাটকের গাম্ভীর্য হরণ করেছে। তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা স্বীকার না করে উপায় নেই, বাস্তবতার আধারে এ নাটকে যা কিছু ভক্তিভাব সব কিছুতেই অনাবশ্যক পীড়াদায়ক উচ্ছ্বাস নেই—আছে আত্মবিশ্বাস ও পরিতৃপ্তির আশ্বাস। বিধর্মী নাসির খাঁও যেন ভক্তিবাদের স্রোতধারায় ভাসমান, পরম প্রাপ্তির আনন্দে মশগুল—বিচিত্র লীলাদর্শণে বিমোহিত। 'অরূপের সন্ধানে আমি দুনিয়া ঘুরে এলুম এই বনদেশে এনে রূপের সাগরে চুবিয়ে দিলে!'—এ সংলাপ বৈষ্ণব ভাবাদর্শে সিক্ত নয়তো কি? মোট কথা এ নাটকে নাট্যকার কিছুতেই ভক্তিভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। নাসির মামুদ ও জৈনুদ্দিনের মধ্যে কথাবার্তায় যে ধর্মীয় ভাব প্রত্যক্ষ তাতে ভাবপ্রবণতার উচ্ছ্বাস নেই। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকের পক্ষে এসব অপরিহার্য নয়। তবে ঐতিহাসিক নাটকেও যে ভক্তিরসধারা সিঞ্চিত হতে পারে, ধর্মীয়ভাবের অনুপ্রবেশ ঘটানো যায় অবলীলাক্রমে—এ নাটকটিই তার প্রমাণ। ঐতিহাসিক নাটকের উপাদান সংগ্রহ ও যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টিতে নাট্যকারের সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের কথা বলা না গেলেও আংশিক সাফল্য তিনি স্বচ্ছন্দে দাবী করতে পারেন। তবে নাটকটি ঐতিহাসিক নাটক বলে প্রচলিত হলেও বহুলাংশে ধর্মমূলক নাটকের লক্ষণাত্মক।

কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্যও এ নাটকে আছে। "বক্তিয়ার খিলজীর সময় থেকে এদেশে পাঠানরা বাস করছে। পাঠানদের সঙ্গে কত রাজপুত এদেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে। এই জেলাতেই কিছু না হোক বিশ পঁচিশ হাজার খিলজী পাঠান আছে। সৈন্যের আপনার ভাবনা কি?" নাটকটি ঐতিহাসিক হলেও বহুলাংশে ধর্মমূলক নাটকের লক্ষণাত্মক। উদ্ধৃতি—"তোমারা মৃন্ময় মন্দির ভাঙতে পারো, কিন্তু চিন্ময় গোপালকে তো ভাঙতে পারবে না।"

আসলে নাটকটি ঐতিহাসিক নাটক নামাঙ্কিত একটি বীরত্বব্যাঞ্জক বিয়োগান্ত নাটক। ভাবসম্পদ সংগ্রহের উন্মাদনায় বিভোর নাট্যকার ঐতিহাসিক নাটকের প্রতিকূল অনেক কিছুরই অবতারণা করে হৃদয়াবেগের শিকার হয়েছেন। কি দিয়ে শুরু, কোথায় শেষ করতে হবে সব কিছু যেন বিস্মৃতি। গোপাল-মদের নেশায় আত্মবিস্মৃত নাট্যকার তাই বহুলাংশে একটি ঐতিহাসিক নাটকের পরিচিতির আড়ালে ভাবসমৃদ্ধ একটি ধর্মীয় ভাবাপন্ন নাটকই রচনা করে গেছেন।

রঙ্গলাল ও কলিবেগমের রোমান্টিক সংলাপ যেন সামাজিক নাটকের সংলাপ। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটি সামাজিক নাটকেরই যেন এক স্বাভাবিক দৃশ্য। কলিবেগমের মত স্ত্রী চরিত্রের এমন সুন্দর স্নিগ্ধ আত্মপ্রকাশ এর আগে ক্ষীরোদনাট্যে দেখা যায়নি। স্থানীয় লোকের বিচিত্র সংলাপ নাট্যকারের বাস্তব প্রবণতার বৈশিষ্ট্য। এ নাটক তা থেকে বঞ্চিত নয়।

॥ বাংলা গীতিনাট্যের বৈশিষ্ট্য ॥

॥ এক ॥

সংস্কৃতে নৃত্যগীত সহযোগে নাট্য নিবেদনের ব্যাপারটি গীতিনৃত্য অভিধায় প্রচলিত ছিল। গীতিনৃত্য স্বাভাবিকভাবেই গান ও নাচ এই দুই প্রক্রিয়ার সমন্বয় ধর্মী। গান স্বাভাবিকভাবেই এই নৃত্যনাট্যের মূল আকর্ষণ ছিল। নাচ ছিল এর আনুষঙ্গিক। প্রশ্ন হল—ইংরেজী অপেরা বা মিউসিক্যাল ড্রামার মত বাংলা নাট্য জগতে গীতিনাট্য কথাটির প্রচলন কোন সময় থেকে ?

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে গীতিনাট্য শব্দটির প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করা গেছে। বিনোদবিহারী দত্তের 'কনককানন' গীতিনাট্যই (১৮৭৯ খৃঃ) সর্বপ্রথম বাংলা গীতিনাট্য নামাঙ্কিত গীতিবহুল নাটক নয়, তবে তার আগেও গীতিনাট্যের প্রচলন থাকতে পারে তার লিখিত নিদর্শন মেলেনি। এর পরের উল্লেখযোগ্য গীতিনাট্য বলে প্রচলিত ন্যাট্যগুচ্ছের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এর গীতিনাট্য নিশ্চয়ই সবিশেষ উল্লেখ্য। তাদের দ্বারাই গীতিপ্রধান্যযুক্ত নাটক গীতিনাট্য আখ্যায় ভূষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের শ্রেণী বিন্যাস প্রসঙ্গে গীতিনাট্য শব্দটির বহুল ব্যবহার করেছেন।

১৮৮০।১৮৮১ খৃষ্টাব্দ থেকেই বাংলা নাট্য সাহিত্যে গীতিনাট্য শব্দটি বহুল প্রচারের সুবাদে সুপরিচিত হয়েছে এবং নাট্য-শ্রেণী বিন্যাসে গীতিনাট্য আপন বৈশিষ্ট্যে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করেছে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রচিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানময়ী এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর বসন্তউৎসব গীতিনাট্য প্রকাশের পর বাল্মিকী প্রতিভা (১৮৮১)-র গীতিনাট্য রূপে আত্মপ্রকাশ বাংলা নাট্য সাহিত্যে গীতিনাট্যের শ্রেণী বিন্যাসকে সুরক্ষিত ও সুবিন্যস্ত করেছে। বাংলা গীতিনাট্য শব্দটি বহুল প্রচলনে সাহিত্যের অঙ্গনে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল—এই গীতিনাট্যের স্বরূপ কি ? এর সংজ্ঞা কি ভাবে নির্ণীত হবে ? বাংলা নাট্যসাহিত্যের নবজাতক এই গীতিনাট্য কোন গোত্রীয়—তাও স্পষ্ট করে জানতে হবে। এই গীতিনাট্যকে যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা, গীতাভিনয়, নাট্যগীতিকা, গীতিকা—কোনটির স্বগোত্রীয় বলে ধরা হবে ?

গীতিনাট্য যদি কোনটিরই স্বগোত্রীয় না হয়, তবে এর স্বরূপ নির্ণয় করা হবে গীতি বহুলতার প্রতীক বিচার করে ?

ইংরাজ শাসনের আদিপর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে গানের প্রয়োগ দেখা গেছে

যাত্রার সংলাপের অংশবিশেষ রূপে। ছড়া পাঁচালীর দ্বারা প্রভাবিত কথকতায় গানের বহুল প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে ওঠে। গানের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গভঙ্গিমার প্রচলনও শুরু হয়েছিল। অনুমান করা অসঙ্গত হবে না—এই অঙ্গভঙ্গিমার পিছনে সুরের মায়াকে দেহের সীমায় মিলিয়ে দেওয়ার মানসিকতাই সম্ভবতঃ সক্রিয় ছিল। বাংলা নাটকে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে গীতিনাট্য রচনাধারার উৎস সন্ধানে কৃষ্ণযাত্রার স্বগোত্রীয় যাত্রাগানের প্রকৃতি ও উপাদানের দিকে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিতে হবে। কৃষ্ণ চৈতন্য ও অন্যান্য দেবদেবীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত যাত্রাগানে গানের বহুল প্রয়োগ থাকলেও নাচের ব্যবহার ছিল—এমন কথা বলা যায় না। কাহিনীর পরিধি মহাভারত, পুরাণ, বিদ্যাসুন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার পর রুচিবিকারের পূর্ণ লক্ষণ দেখা দেয় এবং তার প্রকাশ কবিগান, হাফ আখড়াই ও খেউড়ির মধ্যে।

হরিমোহন রায় 'জানকী বিলাপ' গীতাভিনয় লিখছেন কিংবা তার অভিনয় হচ্ছে কোলকাতায় তখনই বা তার আগে থেকেই ইতালীয়ান অপেরার বহুল প্রচলন শুরু হয়েছিল কোলকাতায়। সুতরাং হরিমোহন রায় তার গীতাভিনয়ে ইতালীয়ান অপেরার প্রভাব যে এড়িয়ে যেতে পারেন নি তা বোধহয় বলাই বাহুল্য। তাই তার গীতাভিনয়ে ইতালীয় অপেরার সম্যক প্রতিফলন সহজলভ্য। অপেরা শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ 'গীতাভিনয়' একথা বলা বোধহয় সঙ্গত হবে না। বিশেষ শ্রেণীর অভিনয়—যাকে গীতিকা বলা হয় তা পাশ্চাত্ত্য রীতি অনুযায়ী 'অপেরা' শব্দটির সার্থক ও সুষ্ঠু প্রয়োগ কি না বিচার করে দেখা দরকার এবং এই গীতিকা অপেরার সগোত্রীয় কি না তা ও দেখা দরকার। হরিমোহন রায়ের পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানময়ী গীতাভিনয় বা নাট্যগীতিকা অপেরার সগোত্রীয় বলে ধরে নেওয়া যায়। বাংলা নাট্যসাহিত্যে গীতিনাট্য পাশ্চাত্ত্যের গ্রাণ্ড অপেরার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ডক্টর সুকুমার সেন এর প্রতিশব্দরূপে নাট্যরসিক বা গীতিনাট্য কথাটির উল্লেখ করেছেন তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পুস্তকে। অপেরা বুফ বা অপেরা কমিক তাঁর কাছে আখ্যাত হয়েছে নাট্যগীতি নামে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে অপেরা গীতিনাট্যরূপে চিহ্নিত হয়নি। তাঁর গীতিনাট্যের ধারণা অপেরাকে বাদ দিয়ে—সঙ্গীত সমৃদ্ধ নাট্যানুষ্ঠানকে ঘিরে। সঙ্গীতের স্বরূপ বোঝাতে প্রসঙ্গত তাঁর মন্তব্য :—'বাল্মিকী-প্রতিভা-পাশ্চাত্ত্য ধ্যান ধারণায় অপেরা বলতে যা বোঝায় ঠিক সেই পর্যায়ভুক্ত নয়। সুরে নাটক, তাই বক্তব্যের ইঙ্গিতে এটা স্পষ্ট যে বাল্মিকী প্রতিভায় সঙ্গীত প্রাধান্যের চেয়ে নাট্য প্রাধান্যই বেশী।'১

রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপ প্রবাসকালে অপেরার প্রকৃতিগত রূপান্তর ঘটেছিল। অপেরার মধ্যে যুগধর্মের অনিবার্য প্রভাব তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বিরাট ফাটলের সৃষ্টি করেছিল। হাল্কা হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ ভরা অপেরা যথেচ্ছ গানের লীলায় এক নতুন বিকৃত রুচির স্বাদ এনে দিয়েছিল। রুচিবিকার ও যুগধর্মের গড্ডালিকা

১. জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ।

প্রবাহের উজান বেয়ে প্রবীনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নবীন ভাবনার ফসলের তরী ভিড়েছিল বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির তীরে। রুচি বদলের ভেলায় একে একে ভেসে উঠেছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য নাটকের অনুবাদ আর নতুন ভাবাদর্শে নতুন ভাবধারার নাটক। নাট্য তালিকায় (১৮৫২) তারাচরণ শিকদার ও যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভদ্রার্জুন ও কীর্তিবিলাস এর পাশে একে একে আবির্ভূত হয়েছিল ইংরাজী ও সংস্কৃত নাট্যাদর্শে লেখা বা অনুবাদ সামাজিক নক্সা, প্রহসন, ট্র্যাজেডি বা ফার্স।

সংস্কৃত ও ইংরাজী নাটকের আদর্শে রচিত বাংলা নাটকের অভিনয় যাত্রার রেশ সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। আঙ্গিক ও অভিনয় এর গতানুগতিকার সঙ্গে উপকরণের অভিনবত্ব মিলিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টার স্বাক্ষর রয়েছে সমসাময়িক অজস্র নাটক বা যাত্রাগানে। ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে নাটককে ভেঙ্গে যাত্রায় টেনে আনার অভিপ্রায়কে জয়যুক্ত করলেন হরিমোহন রায় রত্নাবলী নাটক অবলম্বনে 'রত্নাবলী' গীতাভিনয় সৃষ্টি করে। এই গীতাভিনয় সৃষ্টির পিছনে যাত্রাকে নাটকের পর্যায়ে উন্নীত করার মানসিকতা সক্রিয় ছিল বলে অনুমান করে নেওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন হল এই গীতাভিনয় এর স্বরূপ কি? গীতাভিনয়ে গানের ব্যবহার বা প্রয়োগ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠে না। গানের প্রাধান্য গীত কথাটির মধ্যে স্পষ্ট। অভিনয় শব্দটি যোগে গীতাভিনয়—নাট্য পর্যায়ভুক্ত হওয়ার ইঙ্গিতবাহীও বটে। অথচ গীতাভিনয় ঠিকমত নাটক বা যাত্রা কোনটার আঙ্গিকের সঙ্গেই হুবহু মেলে না। তা সত্ত্বেও দুয়েরই কিছু কিছু লক্ষণ সহজেই গীতাভিনয়ের মধ্যে ধরা পড়ে। সুতরাং গীতাভিনয়কে যাত্রা বা নাটক কোনটিরই সগোত্র না বলে দুয়ের সম্মিলিত রূপ বলাই যুক্তিসঙ্গত। তবে গীতাভিনয় ও গীতিনাট্য এক নয়, দুইকে এক পর্যায়ে ফেলা যাবে না এবং তা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। **Music first, then he reduced plot development and let the action revolve around one or two crucial scene**। ওয়াগনারের ধ্যান ধারণার অনুকূলে Musical Drama-র আদলে রবীন্দ্রনাথ এবং তার প্রভাবের পরিমণ্ডলে অবস্থিত প্রায় সমসাময়িক নাট্যকারগণ গীতিনাট্যরচনার এক নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। এই ধারার সঙ্গে ওয়াগনারের অপেরার প্রভাবমুক্তি ও নূতন গীতিনাট্য প্রণয়নের মানসিকতার কিছু কিছু যোগ ছিল। ওয়াগনার পৌরাণিক কাহিনীর মোহজাল ছিন্ন করে স্বাভাবিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে সক্ষম হন নি—রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর গীতিনাট্যকারগণ যা পেরেছেন। জীবনের কাহিনী বিন্যাসে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, ট্র্যাজিকজীবনের রূপদানে কিংবা জীবনের গভীরে প্রবেশ করে সামগ্রিক কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গীতের সমীকরণ কার্যে রবীন্দ্রনাথ যে সার্থকতা অর্জন করেছিলেন ওয়াগনারে তা নেই। ব্যালে, অপেরা, গ্রাণ্ড অপেরা ও সঙ্গ্ প্লের অপেরা বুফ্ বা কমিক এর রূপান্তর বাংলা নাট্য সাহিত্যে যাত্রাগান, পাঁচালী, নাট্যগীতি, গীতাভিনয় —গীতিনাট্য প্রভৃতির পর্যায়ক্রমিক রূপান্তরের সামিল বলে গণ্য হতে পারে। ওয়াগনারের রীতি অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের বাল্মিকী প্রতিভার কথা বাদ দিলে

অর্কেস্ট্রার ভূমিকা কোন বাংলা গীতিনাট্যেই মুখ্য হয় নি এবং এক কথায় বিটোভেনের প্রদর্শিত আদর্শে অর্কেস্ট্রা বাংলা গীতিনাট্যের প্রাণস্বরূপ হয় নি কোন দিনই।

ক্ষীরোদপ্রসাদের গীতিনাট্যগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে সেখানে গানের বিশেষ ভূমিকা বা মর্যাদা স্বীকৃত হলেও এবং নাট্য লক্ষণগুলি পুরোমাত্রায় বজায় না থাকলেও নাট্যগুণ ইতস্ততঃ উঁকি মেরেছে নাটকগুলির অনেক জায়গায়।

ওয়াগনারের মুাজিক্যাল ড্রামার ধ্যান ধারণা রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এবং বাংলা নাট্য সাহিত্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে প্রজ্জ্বল হয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

পাশ্চাত্ত্য অপেরা তখন বিকৃত রুচির শিকার হয়ে এক কলঙ্কিত রূপ ধারণ করেছে। এর থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই ওয়াগনারের এই মুাজিক্যাল ড্রামা প্রবর্তনের কাজে আত্মনিয়োগ।

"Wagner's denunciation of the modern theatre are balanced and releived by his idealised vision of Greek theatre that incorporated all the conditions of the great art a relegious reason the participation of the entire community and the co-operation of all the arts in the dramatic representation of the mystic action."3

ওয়াগনারের নবপ্রবর্তিত মুাজিক্যাল ড্রামা রবীন্দ্রনাথেয় কল্পলোককে আলোকিত করেছিল এ ধারণা অসঙ্গত হবে না। সে জন্য বাল্মিকী প্রতিভার অপেরার কাছ থেকে যত বেশী দূরত্ব মুাজিক্যাল ড্রামার কাছে তত বেশী নৈকট্য। রবীন্দ্রনাথ তাই গীতিনাট্য বোঝাতে ওয়াগনারের মুাজিক্যাল ড্রামাকেই সম্ভবতঃ বোঝাতে চেয়েছেন। বাল্মীকি প্রতিভায় দস্যুদের হালকা ভাবের গান কিংবা অন্যান্য গানের সুরের তরল ইমোসন্ য়ুরোপের তৎকালীন অপেরার সগোত্র হলেও সামগ্রিকভাবে ভাবাদর্শ ও সঙ্গীতপ্রয়োগবৈশিষ্ট্যে বাল্মীকিপ্রতিভা ওয়াগনার প্রবর্তিত মুাজিক্যাল ড্রামা বা গীতিনাটোর সগোত্র। প্রকৃত গীতিনাট্যের স্বরূপ অবশ্য অধিক পরিমাণে মায়ার খেলাতেই প্রত্যক্ষ।

ইতালীয় অপেরার অবক্ষয়ের যুগে অভিনেতারা অপেরার বিষয়বস্তুকে অধিকতর ভোগ্য করে তোলার জন্যে নাটকের বিষয়বস্তুকে অবজ্ঞা করে নিজেদের সঙ্গীত প্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করতেন। ফলে দর্শক ও শ্রোতারা অপেরার সামগ্রিক অবনতি সত্ত্বেও এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই নাট্যবস্তু বা নাটকীয় ঘটনাবলী তখন গৌণ হয়েছিল—অভিনেতারা তাদের সঙ্গীত প্রতিভার সম্যক বিকাশেই তখন যত্নশীল ছিলেন বলে বাংলা নাটকেও বিশেষ করে ক্ষীরোদপ্রসাদের

২. **Mnsical Drama—Wagner.**

৩. **Musical Drama—Wagner.**

গীতিনাট্যে নাট্যবস্তুর প্রতি উপেক্ষা অভিনেতা অভিনেত্রীদের পরিবর্তে নাট্যকারের পক্ষেই প্রযুক্ত হয়েছিল অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। দর্শক শ্রোতাদের মন ভোলাবার জন্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ অনেক সময় সঙ্গীতকে যথেচ্ছ প্রাধান্য দিয়ে নাটকের শর্ত লঙ্ঘন করেছেন—গীতিনাটকগুলিকে গীতিপ্রাধান্যের আওতায় এনেছেন। রবীন্দ্র পরবর্তী গীতিনাট্যে এই লক্ষণ অন্য নাট্যকারের পক্ষে প্রযোজ্য হোক বা না হোক ক্ষীরোদপ্রসাদের পক্ষে অবশ্যই প্রযোজ্য। তার অধিকাংশ গীতিনাট্যে নাট্য মুখ্য নহে—গান ই মুখ্য।

গান ও সংলাপের অস্তিত্বের সুবাদে যাত্রাভিনয়, গীতাভিনয় ও দাশরথি রায়ের পাঁচালী গীতিনাট্যআখ্যার অসঙ্গত দাবি করলেও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের বিচারে ঐ গুলি উত্তীর্ণ হতে পারে না। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা গীতিনাট্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবহীন জীবন চর্চার ছায়া এবং যাত্রা-গানের রেশ ওয়াগনার প্রবর্তিত ও রবীন্দ্র প্রভাবান্বিত ম্যুজিক্যাল ড্রামায় স্পষ্টভাবে নূতন রূপে প্রতিফলিত হয়েছে।

সঙ্গীতের অশ্লীল ভাষা ও লঘু বিষয়বস্তু গ্রহণের বিকৃত রুচির দাপটে একটা জরাগ্রস্ত গীতিবহুল নাটকে প্রাণের জোয়ার এল রবীন্দ্রনাথ—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ওয়াগনারের ম্যুজিক্যাল ড্রামার আদর্শে অনুপ্রাণিত বাংলা গীতিনাট্যের অবতারণায়। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক কথোপকথনের সজীবতায় বাংলা গীতিনাট্য তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ক্ষীরোদপ্রসাদ এই নূতন আদর্শের গীতিনাট্য প্রণেতাদের অন্যতম অংশীদার-রূপে গণ্য হওয়ার জন্যে নিঃসন্দেহে দাবি রাখতে পারেন।

'মায়ার খেলা'তে গানের যথেচ্ছ ব্যবহার নেই। সুতরাং এতে অপেরার প্রভাবের চেয়ে ওয়াগনারের ম্যুজিক্যাল ড্রামার প্রভাব বেশী। তবে গীতিনাট্যে নাট্যলক্ষণের চেয়ে সঙ্গীতই সম্যক প্রাধান্য পেয়েছে।

ওয়াগনারের গীতিনাট্য সম্পর্কে জীবনবোধ ও মূল্যবোধ গড়ে ওঠে সঙ্গীত শিল্পী বিটোভেনের প্রভাবের আওতায় এসে।

"Wagner's hopes for a rebirth of tragedy in the modern world sprang ultimately from his awareness of the great new power tnrough Beethwoven's music. But Beethwoven in Wagner's eyes was actually musical Colombus who seeking one world has accidentally discovered another and greater one".4

নাটকে সঙ্গীতের প্রয়োজন সম্পর্কে এবং সঙ্গীতকে নাটকের অপরিহার্য অঙ্গের অঙ্গীকারে আবদ্ধ করার স্বপক্ষে ওয়াগনারের মতামতটি উল্লেখ্য—**"Recognising the power of music to create excitement instantly Wagner relied upon the Orchestra to warm up the audiance for the dramatic climex that**

would otherewise have to be prepared through one or more acts. Further he knew that music would add enormous weight to the climex".5

মনোমোহন বসু গিরিশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্যন্ত সকলের মধ্যেই ওয়াগনারের 'নাটকে সঙ্গীত সম্পর্কে নূতন চেতনা ও মূল্যবোধ' সক্রিয় ছিল—এ অনুমান অসঙ্গত নয়। "To make the spectator utterly responsive to the movement of the Soul Wagner used every means at his disposal to heighten audiance response and to make all responsive."6

ক্ষীরোদপ্রসাদের গীতিনাট্য পর্যায়ের নাটকগুলিতে কোথাও বা গীতি প্রাধান্যের ভারে নাটক মিউজিক্যাল ড্রামার লক্ষণাত্মক, কোথাও বা সঙ্গীত নাট্য কাহিনী বিন্যাসের অন্যতম সহায় ও সংলাপের বিকল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নাটককে শ্রীমণ্ডিত করেছে, কোথাও বা কাহিনী চরিত্রচিত্রণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দর্শক শ্রোতার উদ্দেশ্যে নাট্য নিবেদনকে অনুকূল পরিবেশে এনে হাজির করেছে। মনোমোহন বসু প্রবর্তিত গীতাভিনয় ধারার উত্তর-সাধকরূপে ক্ষীরোদপ্রসাদ নিজেকে আবিষ্ট ও আচ্ছন্ন রাখতে চান নি। সজ্ঞান প্রচেষ্টায় তিনি তার গীতি নাটকগুলিকে পাশ্চাত্য ভাবধারায় সিক্ত করে নেন। তাই তাঁর গীতি নাটকগুলিতে যেখানে নাটকের দৈন্য সেখানে গীতি বা সঙ্গীতের সংযোজন সে দীনতাকে ঢেকে দিতে চেয়েছে। যেখানে সংলাপে হাস্যরসসৃষ্টির উদ্দেশ্য সেখানে মজাদার গান নাট্যকারের উদ্দেশ্যের সহায়ক হয়েছে। Wagner এর ভাষায় "To make the spectator utterly responsive to the movement of the Soul—এতটা গভীরে তিনি তার গীতি নাট্যকে নিয়ে যেতে পারেন নি, তবে ওয়াগনারের পরবর্তী পথনির্দেশ :—Wagner used every means at his disposal to highten audiance response and to make all responsive" ক্ষীরোদপ্রসাদ তার প্রায় প্রত্যেকটি নাটকে যথাসাধ্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার যে চেষ্টা করেছেন তার গীতি-নাটকগুলির আলোচনায় তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

৪, ৫, ৬—Musical Drama—Wagner.

॥ দুই ॥

নাটকে কৌশলে সামাজিক অবস্থা বা রূপবর্ণনার সুযোগ করে নিলেও ক্ষীরোদপ্রসাদ জমাট ও কৌতূহলোদ্দীপক গল্পবস্তুর জন্যে পৌরাণিক নাটকে পুরাণ কাহিনীর মত রঙ্গনাট্য, ব্যঙ্গনাট্য ও কৌতুকনাট্যে বিদেশী কাহিনী ব্যবহারের জন্য আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আরব্য উপন্যাস বা পারস্য উপন্যাস কাহিনীগুলির গল্পাংশে আকর্ষক বহুবিধ সামগ্রীর মধ্যে রোমান্স, বিস্ময়, কৌতুক, দ্বেষ, হিংসা, প্রেম, প্রীতি, প্রণয়, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, আনন্দ, বেদনা—কোন কিছুর সংযোজনেই কমতি ছিল না। নাটকে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য সম্পাদন এবং নানান ভাব প্রকাশের মাধ্যমে নাট্যকাহিনীতে চমক সৃষ্টির পরিকল্পনায় নাট্যকার উদ্মুখ হয়েছিলেন—এটাই স্বাভাবিক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য প্রভাবহীন জীবনচর্চায় যাত্রাগানের অবাঞ্ছিত প্রভাব ও বিকৃত রুচির দাপট পাশ্চাত্ত্য নাট্যাদর্শের আলোক প্রাপ্ত নাট্যকারদের বিরক্তি উৎপাদন করছিল। এর থেকে মুক্তির আস্বাদ লাভ করার জন্যে বিদেশী সাহিত্য সম্ভারের হাতছানি উপেক্ষা করার অবিমৃশ্যকারিতা বা নির্বুদ্ধিতা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কোন নাট্যকারই প্রদর্শন করে নি। ক্ষীরোদপ্রসাদও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। পৌরাণিক নাট্যসম্ভারের জন্য তিনি পুরাণ ও রামায়ণ মহাভারত এর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করে ঐতিহাসিক নাটকের বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছিলেন। সামাজিক নাটক রচনাকারীদের তালিকায় ক্ষীরোদ-প্রসাদের অনুপস্থিতির কারণেই সম্ভবতঃ সামাজিক উপন্যাসকার হিসাবে তার আবির্ভাব। ঐতিহাসিক নাটক রচনার পর যখন বৈচিত্র্যের বিস্তৃত প্রজাপতিপাখায় আরও রঙের রোশনাই এর প্রয়োজন হল তখনই নাট্যকার বিদেশী সাহিত্যের লোভনীয় হাতছানিকে স্বাগত জানালেন। গিরিশচন্দ্রের প্রদর্শিত পথে তখন ভিনু দেশের কাহিনীভিত্তিক গীতি বা কৌতুক নাটকসৃষ্টির সংখ্যা একান্তই নগন্য। গিরিশচন্দ্রের আবুহোসেনই বলতে গেলে সে পথের একমাত্র উল্লেখ্য ইসারা। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্য রচনা সৃষ্টির বৈচিত্র্যে তখন আকাঙ্খিত পথ পরিক্রমার জন্যে উন্মুখ। আলিবাবা. আলাদিন, কিন্নরী, বাদশাজাদী সেই আকাঙ্খিত পথপরিক্রমার এক একটি পান্থ নিবাস।

মনোমোহন গীতাভিনয় রূপের যে নাট্যধারার সূত্রপাত করেন তার পরিণতি রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকে। তিনি নানান ধরণের নাটক লিখলেও পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকেই তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। লঘু বিষয়ক রূপকথা উপকথা অবলম্বনে কৌতুক ও হাস্যরস পরিবেশনের ধারাটি কিন্তু রাজকৃষ্ণ রায়ের মধ্য দিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদে এসে পৌঁছায় নি। আসলে এই ধারাটির সম্যক পরিপুষ্টি ক্ষীরোদপ্রসাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের মাধ্যমেই। গিরিশচন্দ্র অন্যান্য নাটকের সঙ্গে পঞ্চ রঙ নামে এক ধরণের লঘু সংক্ষিপ্ত এবং নিতান্ত সরল ও সাধারণ

ঘটনা সম্বলিত কাহিনী নাট্য রচনা করেছিলেন। এরই পাশা পাশি কিছু কিছু গীতাভিনয় তার হাত দিয়ে বেরিয়েছিল। তার উল্লেখযোগ্য গীতিনাট্যগুলি হ'ল মলিনমালা, মলিনা বিকাশ, স্বপ্নের ফুল, দেলদার প্রভৃতি। গীতিনাট্যের যে ধারাটি ক্ষীরোদপ্রসাদের মধ্যে পূর্ণ বিকশিত হয়েছিল তার বীজ অংকুরিত হয়েছিল আরব-পারস্য দেশের রূপকথা, উপকথা অবলম্বনে রচিত গীতাভিনয়ের সগোত্র গীতিনাট্য 'আবুহোসেন' এর মধ্যে। 'আবুহোসেন' গিরিশচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গীতিনাট্যরূপে স্বীকৃত। 'আবুহোসেন' এর কৌতুককর কাহিনী বহুলাংশে ক্ষীরোদপ্রসাদকে এই ধরণের কাহিনী নির্বাচনে অনুপ্রাণিত করেছিল বলে মনে করা ভুল হবে না। 'আবুহোসেন' এর রোমাণ্টিক ও হাস্যরসাত্মক সুর ক্ষীরোদপ্রসাদের এই পর্যায়ের নাটকগুলির মধ্যে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছিল।

ক্ষীরোদপ্রসাদের সমসাময়িক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এর জনপ্রিয়তার কারণ তার গীতিনাট্য নয় প্রহসনগুলি। অবশ্য এই সব প্রহসন থেকে গান বাদ দিলে প্রহসনগুলি নীরস ও কৌতুক বর্জিত হয়ে যায় এবং এর মূল্যায়নেও গুরুতর তারতম্য ঘটে। নাটকের আঙ্গিক বিচারে ক্ষীরোদপ্রসাদের গীতিনাট্যের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের গীতিপ্রধানপ্রহসনগুলির কোনরূপ সাদৃশ্যই উল্লেখ্য নয়। স্বরূপ বা প্রকৃতির দিক দিয়ে দুই নাট্যকারের গীতিপ্রধান নাটকের মধ্যে মিলের চেয়েও গরমিলই চোখে পড়ে বেশী। উদ্ভট, বিস্ময়কর ও কাল্পনিক মজাদার ঘটনা সমাবেশের ফাঁকে ফাঁকে সরস গান থেকে উদ্ভুত হাস্যরস দ্বিজেন্দ্রলালের বৈশিষ্ট্যের তালিকায় পড়ে না। এই দিক দিয়ে আলিবাবা কিন্নরী প্রভৃতি কয়েকটি নাটকে যে অনাবিল হাস্যরস কৌতুক কাহিনী বিন্যাস সূত্রে স্বতঃ উৎসারিত তার স্বরূপ ও প্রকৃতির সন্ধান মিলতে পারে দীনবন্ধু ও অমৃতলালের সরস ও কৌতুকাবহ বাক্য নির্বাচন করার সংযোজনে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াসের মধ্যে। গান যে নাটকের অন্যতম আকর্ষণ এবং গানের আধিক্য অনেক সময় পীড়াদায়ক না হয়ে মনোরঞ্জক হতে পারে এই ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে অমৃতলালের নাটকগুলি অনেকক্ষেত্রে গতিবহুল গীতিনাট্য ধর্মী অপেরার অক্ষম অনুকরণে পর্যবসিত হয়েছে। রসরাজ এর রসসৃষ্টির সচেতন প্রয়াস থেকেই যে তার নাটকে গানের আধিক্য তা বোঝার অসুবিধা হয় না। থিয়েটারের অভিজ্ঞতায় বাঙালী দর্শকদের চাহিদা তিনি জানতেন এবং তদনুসারে তিনি এত অধিক গীত তার নাটকে সন্নিবেশিত করেছিলেন। মাঝে মাঝে ছড়ার আকারে পদ্য রচনাও আছে। গান এবং ছড়া নাটকের সরসতা বৃদ্ধি করার জন্যেই ব্যবহার করেছিলেন তিনি। ক্ষীরোদপ্রসাদের এই ধারার অনুবর্তন মাঝে মাঝে লক্ষ্যণীয়।

'ক্ষীরোদপ্রসাদের গীতিনাট্যগুলিতে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ-এ নৈপুণ্য কিংবা সূক্ষ্ম রসপরিচয় নাই। অপেরা শ্রেণীভুক্ত কাহিনীগুলিও মৌলিক নহে। গিরিশ-চন্দ্রের আরব, পারস্যের রূপকথা অবলম্বনে নাটক রচনার যে ধারা ক্ষীরোদপ্রসাদে

তারই অনুবর্তন লক্ষ্য করার মত। এই শ্রেণীর নাটকগুলিতে ক্ষীরোদপ্রসাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যে তার নাটকগুলিতে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা এবং অবকাশ কম। রূপকথা উপকথা ভিত্তিক রম্য কাহিনীতে চ রিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকাশ খুব সহজসাধ্য নয়- সে প্রচেষ্টার বিপদও আছে, তাতে রূপকথা উপকথার রোমাণ্টিক কাহিনীর বা মজাদার গল্পের গতি ব্যাহত হওয়ার আশংকা থাকে, রূপকথা উপকথার কাহিনী বিন্যাশের ছন্দপতন ঘটে, নাটকটিতে ঈপ্সিত রূপকথা বা উপকথার পরিমণ্ডল গঠিত হতে পারে না।'

প্রচলিত মতবাদ অনুযায়ী ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে গিরিশচন্দ্রের আদর্শ প্রতি-ফলিত এবং রোমাণ্টিক ধর্ম প্রবলতর। শুধু এটুকুও নয় নিরংকুশ কল্পনাবিহার ও ভাবাবেশ প্রবণতার যুগধর্ম অবশ্যই ক্ষীরোদপ্রসাদে পূর্ণ মাত্রার বিরাজমান, তবে ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার স্বাতন্ত্র্য সেই ভাবাবেশ প্রবণতার সংযম বুদ্ধিবাদ ও মুক্তিবাদের বিকাশ। ক্ষীরোদপ্রসাদ যুক্তি-বাদের সাহায্যে নাটকে সত্যপ্রকাশ করতে চেয়েছেন। ভাবাবেশের সংযমের বল্গায় আবেগপ্রবণতাকে বেঁধে রাখতে পেরেছেন তিনি অবাস্তব উপকথা অবলম্বনে লেখা নাটকে। ইতিহাস পুরাণ কাহিনীতে গল্পের রসকে জমাট বাঁধাতে না পারলেও এই সব রোমান্সধর্মী নাটকে তিনি স্বকীয়তার এবং নাট্য শিল্প সুষমার পরিচয় রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ নিছক শিশুরাজ্যের রূপকথাকে নাটকে রূপান্তরিত করার দুঃসাহসিক কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। তাই অনেক সমালোচক প্রশ্ন তুলেছেন এ গুলি কি নাটক না প্রচলিত জনপ্রিয় কাহিনীর নাট্যরূপ? রূপকথার কাহিনীর নাট্যরূপে নাট্যকারকে নিশ্চয়ই স্মরণ রাখতে হয়েছিল যে রূপকথার পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কাহিনী বিন্যাসের মূল লক্ষ্য হবে নাটকটির বিষয়বস্তুকে রঙীন মধুর করে উপস্থাপিত করা। এই প্রাথমিক শর্ত পূরণের মাধ্যমেই রূপকথা অবলম্বিত নাটকের নাট্যরস আস্বাদন রূপকথা পরিমণ্ডলের মধ্যেই সম্ভব। 'আমাদের বাস্তববাদী যুক্তিতর্ক সংবাদী বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিমান প্রৌঢ় মনটি যখন ঘুমাইয়া পড়ে তখন আমাদের কল্পনা পিপাসু শিশু মনটি বাস্তব অবাস্তবের মধ্যে অতিক্ষীণ সারস্বত বিশ্বাসের সূত্র মাত্র অবলম্বন করিয়া কল্পনার স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করে আর তখনই সে আস্বাদন করে রূপকথা।' ৭ এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে যে কথাটি স্মরণ করার মত তা হল—রূপকথা লইয়া যদি কোন নাটক হয় তবে সে নাটক আস্বাদনে প্রয়োজন শিশুমনের এবং সে নাটক বিচারে যুক্তিবাদী শিশুমনেরও প্রয়োজন আছে '

তখনকার দর্শক সাধারণের চাহিদা ছিল নাটকে নাচগান, গল্পরস, কৌতুক। রোমান্সে কৌতুক রসই ঈপ্সিত। তাই কল্পময় স্বপ্নাচ্ছন্ন এক রোমাণ্টিক পরিবেশে মনকে আচ্ছন্ন করে রাখার সচেতন প্রয়াসে ক্ষীরোদপ্রসাদের রোমান্স গীতিনাট্যগুলি বা গীতিবহুল নাটকগুলি সুচিহ্নিত।

৭—বাংলা সাহিত্য নাটকের ধারা—ডঃ বৈদ্যনাথ শীল।

॥ গীতিনাট্য । রঙ্গনাট্য ॥

॥ ব্যঙ্গনাট্য   নাট্যগীতি ॥

॥ কালানুক্রমিক তালিকা ॥

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়বস্তু । নাটকের নাম	প্রকাশকাল
	বাংলা গীতিনাট্যের বৈশিষ্ট্য	
১)	আলিবাবা (রঙ্গনাট্য)	১৮৯৭
২)	প্রমোদরঞ্জন (রঙ্গনাট্য)	১৯ অক্টোবর, ১৮৯৮
৩)	জুলিয়া (গীতিনাট্য)	২৪ জানুয়ারি, ১৯০০
৪)	দোলতে দুনিয়া । সপ্তমপ্রতিমা	১৩ ডিসেম্বর, ১৯০২
৫)	বেদৌরা (গীতিনাট্য)	১৩ জানুয়ারি, ১৯০৩
৬)	রক্ষ ও রমনী	১০ জানুয়ারি, ১৯০৭
৭)	আলাদিন (রঙ্গনাট্য)	২৫ ডিসেম্বর, ১৯০৭
৮)	বাসন্তী (গীতিনাট্য)	৫ জুলাই, ১৯০৮
৯)	বরুণা (গীতিনাট্য)	১০ জুলাই, ১৯০৮
১০)	ভূতের বেগার (রঙ্গনাট্য)	২৮ ডিসেম্বর, ১৯০৮
১১)	পলিন (গীতিনাট্য)	২ মার্চ, ১৯১১
১২)	রূপের ডালি (রঙ্গনাট্য)	২৩ অক্টোবর, ১৯১৩
১৩)	বাদশাজাদী (কল্পনামূলক গীতিনাট্য)	৩১ ডিসেম্বর, ১৯১৫
১৪)	কিন্নরী (গীতিনাট্য)	১৭ আগস্ট, ১৯১৮
১৫)	জয়শ্রী	২০ ডিসেম্বর, ১৯২৬

এর মধ্যে আলাদিন, পলিন রূপের ডালি ও বাদশাজাদী নাটক নাট্যকারের নাট্যসৃষ্টির সম্ভারে সবিশেষ উল্লেখ্য নয় বলে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

॥ আলিবাবা ॥

কাহিনীর দিক দিয়ে আলিবাবা আরব্যউপন্যাস কাহিনীভিত্তিক রঙ্গনাট্য। বলাই বাহুল্য নাটকটি গীতিবহুল, এবং এটি গীতিনাট্যের পর্যায়ভুক্ত। আলিবাবায় গীতিনাট্যের লক্ষণ শুধু গানের সংখ্যাধিক্যের সুবাদে নয়—গানগুলির অধিকাংশই হয় সংলাপের বিকল্পরূপে প্রযুক্ত কিংবা পরিস্থিতি ও পরিবেশের আনুকূল্যে সংযোজিত কিংবা চরিত্রের মানস প্রতিফলনের প্রতীক হিসাবে উপস্থাপিত। গানের কৌতুকরস প্রায় সর্বত্র ব্যাপ্ত। করুণ পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বহিরঙ্গে করুণ রসাত্মক গানের অন্তরালে নাটকের মূল লক্ষ্য কৌতুকরস পরিবেশন আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে। কাহিনীবিন্যাস ও পরবর্তী ঘটনার ইঙ্গিতপ্রদানে নাট্যকার বেশ কয়েকটি গানের সদ্‌ব্যবহার করেছেন। যেমন প্রস্তাবনা গীতেই মূলকাহিনীর বীজ নিহিত আছে একথা জোর দিয়ে বলা যায়।

'মসকরা করছিস যে'—'আমি কি বেগম হতে পারি না?' আবদালার প্রতি মরজিনার এই দৃপ্ত উক্তি ও রহস্যালাপ কাহিনী বিন্যাসে উল্লেখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 'ফের মসকরা?' 'তবে আমি যেমন করে পারি বেগম হবো।' কাহিনীর পরিণতিতে এই সংলাপেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। মরজিনা হুসেনের মিলন নাটকের সূচনায় যা অসম্ভব অকল্পনীয় ছিল তা বাস্তবায়িত করেছিল। তবে এর জন্যে মরজিনার নিজস্ব কোন চেষ্টা, কোন আত্মিক তাগিদ, মানসিক প্রচেষ্টার কোন স্বাক্ষর মরজিনা চরিত্রে পাওয়া যায় না। মরজিনার ভাগ্যবিবর্তন ঘটনাশ্রয়ী, যদিও সে ঘটনা নিয়ন্ত্রণে মরজিনার বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি প্রভৃতি গুণগুলি যথাযথ সহায়তা করেছিল।

নাটকটিতে করুণরসের অবতারণা কৌতুকরসের ছলমাত্র। করুণ ও কৌতুকরসের আলোছায়ার মধ্যেই নাট্যকাহিনী গ্রন্থনা এবং নাট্য সংলাপ সংযোজন অতি সতর্কতার সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে। আলিবাবার উপকথার কাহিনীকে বাস্তব জীবনের পরিধির মধ্যে বেঁধে বাস্তব অবাস্তব প্রত্যক্ষ ও কল্পলোক-এর ব্যবধান কমিয়ে সমন্বয়ের সূত্রে গ্রথিত করে এক বিচিত্র স্বাদের নাটক সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। তাই এই উপকথার কাহিনী নাটকে নিছক আষাঢ়ে গল্প হয়ে দাঁড়ায় নি। নাটকে কিছু কিছু অন্তর্দ্বন্দ্ব, মানবিক আচার আচরণ, অতি সংক্ষিপ্ত বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ-মালা নাটকটিকে সজীব ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। নাটকের কোথাও কোথাও শিল্প চাতুর্যের সুবাদে জীবনের সংঘাতপূর্ণ দুঃখময় সমস্যা ও জটিলতার আস্বাদ সুখানুভূতির সৃষ্টি করে।

আলিবাবার বিশাল অর্থপ্রাপ্তি নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয় ঘটনা। ঘটনাটি আকস্মিক উত্তেজনাময় এবং সেই অর্থে নাটকীয়ও বটে। ঘটনাটি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আনুষঙ্গিক ঘটনা ঘটেছে একের পর এক স্বাভাবিক নিয়মে। ফতিমা সাকিনা কাশেম······চরিত্রগুলি শতদলের মত পাপড়ি মেলে বিকশিত হয়েছে আপন আপন বৈশিষ্ট্যে ও স্বকীয়তায়।

আলিবাবা প্রচুর অর্থ পেয়েছে। কিন্তু সেই অর্থ আনছে সে সম্পূর্ণ সংগোপনে। নাটকের যে শর্ত নাটকীয়তা, সাসপেন্স নাট্যকার তার কিছুটা রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন বিশাল সম্পত্তিপ্রাপ্তি খবরটা একেবারে না জানিয়ে ধাপে ধাপে জানানোর প্রচেষ্টার মধ্যে।

হ্যাগা, ও কি গাছের কাঠ ?
আস্তে-আস্তে।
···হ্যাগা, ও বুঝি চন্দন কাঠ গা ?···
আস্তে-আস্তে।

এইভাবে নাট্যকার উৎকণ্ঠাকে দীর্ঘায়িত করার প্রচেষ্টায় সফল হয়েছেন।

অপ্রত্যাশিত বিশাল অর্থপ্রাপ্তির ফলে অত্যধিক আনন্দে যে মানসিক বিপর্যয় দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক ফতিমার আচার আচরণ ও সংলাপে তার পূর্ণ প্রতিফলন। কাহিনীর পরবর্তী অংশে কাশেমেরও বিপুল ধনপ্রাপ্তির প্রাক্‌কালে উন্মাদনায় উত্তেজনায় উপস্থিত বুদ্ধি ও স্মৃতিনাশ নাটকীয় দক্ষতায় ও মনস্তাত্বিক সূক্ষ্মতায় নাটকে যথাযথভাবে চিত্রিত হয়েছে। অধিকরাত্রে মোহর গোনার জন্য কুনকে চাইতে আসার প্রশ্নে মরজিনাকে প্রথমে বিস্নতা ফতিমা কিছু বলতে চায়নি। নাট্যকারও সেই সূত্রে কৌতূহল বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত বিমূঢ়া ফতিমার মুখের অসংলগ্ন উক্তি নাট্যরসের দিক দিয়ে কৌতুকনাট্যের উপকরণ হতে পেরেছে। সত্যকথা বলতে না চাইলেও শেষ পর্যন্ত ফতিমার মুখ থেকে সত্যের আভাস পাওয়া গেছে এবং সেই সত্যের আভাস এবং কুনকের তলায় আঠাল দ্রব্য প্রয়োগের ফলশ্রুতিতে নাট্যকাহিনী স্বাভাবিক ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

আমার কাছে যা বল্লে আর কারো কাছে এমন পাগলের মত বলো না, বিপদ ঘটবে। মরজিনার সাবধানবানীর পর মুহূর্ত থেকেই বিপদের সূত্রপাত। সংলাপের মাধ্যমে পরবর্তী ঘটনার ইঙ্গিত নাট্য ব্যাকরণ সম্মত ভাবেই নাটকে স্থান পেয়েছে।

নাট্য কাহিনী গ্রন্থনে মোস্তাফার প্রয়োজন অনিবার্য ছিল। মরজিনার সংস্পর্শে এসে এই সাধারণ নগন্য চরিত্রটিও উজ্বল হয়ে উঠেছে। অজানা আশঙ্কায় মুস্তাফার মরজিনাকে অনুসরণ করার দ্বিধা নাট্যগ্রন্থনায় সূক্ষ্ম কারুশিল্পের পরিচয় দিয়েছে। মরজিনার পোলাও খাওয়ানোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে মুস্তাফা সরাসরি, চাই না বাবা, আমার পোলাওতে কাজ নেই, তুমি ছেড়ে দাও, তোমায় আমি ঘুগনি দানা

খাওয়াবো।' বোনাই-এর আদরে হাতে টাকা গংজে দেওয়ার ব্যাপারে মোস্তাফার অ-ন্তর্দ্বন্দ্ব নাটকটিকে রহস্যময়তার বৈচিত্র্যমণ্ডিত করেছে। 'কে জানে বাবা, এর ভেতরে কি গোলক ধাঁধাঁ আছে।'—এ রহস্য, এ অনিশ্চয়তার পরিবেশ নাট্য প্রয়োজনের সঙ্গত কারনেই।

প্রভুর অজানা বিপদের আশংকায় মরজিনার মানস প্রতিক্রিয়া সেই রহস্যময়তাকে আরও গাঢ় করেছে, আরও ঘনীভূত করেছে। 'আমি হলুম কি, লোক দেখলে সন্দেহ করি, হাসি শুনলে ভয় পাই, রাতে অতিথি দেখলে শুকিয়ে যাই। ঘরে একটা কুটো দেখলে অস্ত্র বলে ভয় করি। জানলা দিয়ে হাওয়া বইলে আঁতকে শিউরে উঠি।' নাটকে এই মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণও উল্লেখ্য।

গরম তেল ঢেলে ডাকাত দলকে শেষ করার মধ্যে মরজিনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নাটকে স্বকীয় ঔজ্জ্বল্যে প্রতিফলিত। কিন্তু এর পরের ঘটনাগুলি নাট্যসূত্রে গ্রথিত হয় নি—আরব্য উপন্যাস কাহিনীটি কোন মতে শেষ করার প্রয়োজনেই নাট্যকার শেষ পর্যন্ত কাহিনীটির নিছক ছেদ টেনে কর্তব্য শেষ করেছেন।

ডাকাত দলকে পর্যুদস্ত করার অবিশ্বাস্য তৎপরতায় মরজিনাকে অলৌকিক শক্তির অধিকারিনী বলে আলির মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তাই আলির বিস্ময়... তুই কোন পরীর রাজ্য থেকে এসেছিলি মা...সঙ্গত কারণেই নাটকের যথার্থ সংলাপ রূপে চিহ্নিত হতে পারে। গভীর জীবন দর্শন হঠাৎ নাটকটিতে নীতিবোধ ও ধর্ম-ভাবের এক ঝিলিক হাওয়া বইয়ে দিয়েছে। মরজিনার উত্তর, আমি উপলক্ষ্য। ঈশ্বরই আমাকে প্রভাতে খড়ির চিহ্ন দেখিয়েছেন—ঈশ্বরই আমাকে তেলের জন্য সওদাগরের জিনিষ চুরি করতে পাঠিয়েছেন। নাটকের ঘটনা নিয়ন্ত্রণে নেপথ্যে দক্ষ বাজিকরের মত নাট্যকার ঘটনা নিয়ন্ত্রণের রজ্জু তুলে দিয়েছেন ঈশ্বরের হাতে।

এরপরের ঘটনা এবং সংলাপ নাট্যপ্রয়োজন কতটা সিদ্ধ করেছে তা উল্লেখ্য নয়। কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক, অবান্তর ও নিষ্প্রভ বলে মনে হয় এই অংশটি। অসঙ্গতি ও অনৌচিত্য এখানে প্রকট। দস্যুরাজ সর্দারকে দরবেশের ছদ্মবেশে এনে হাজির করার ব্যাপারে নাট্যকার কিছু কৌতূহল জাগিয়ে ঘটনার স্রোতকে কিছুটা দীর্ঘায়িত এবং বেগবতী করেছেন। এই বেগ শেষাংশে মরজিনার ছোট ছোট সংলাপ থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং ঐ ছোট ছোট তাৎপর্যময় সংলাপ নাটকের ঘটনা প্রবাহে এক একটা বিরাট তরঙ্গের কাজ করেছে। আবদালার সঙ্গে মরজিনার কথোপকথনও সংক্ষিপ্ত ও সাংকেতিক। ছদ্মবেশী দরবেশ যে দরবেশ নয় ডাকাত, প্রায় নিঃসংশয়া মরজিনাকে পরবর্তী ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণে তার সেই সিদ্ধান্তই প্রেরণা জুগিয়েছে। 'উপযাচক হয়ে বিনা স্বার্থে কি কেউ কারো সঙ্গে ভাব করে?' মরজিনার ঈশ্বরে বিশ্বাস অটল। ঈশ্বর আর একবার সহায় হও। যদি নিরপরাধ হয় আমার হাত নিষ্পন্দ করো, যদি দস্যু হয় হাতে বজ্রের বল দাও। কি করি? একটা ভালমানুষকে

কি শেষকালে হত্যা করে বসবো।' এ অন্তর্দ্বন্দ্ব শুধু মরজিনা চরিত্রকেই জীবন্ত করেনি —নাট্য কাহিনীকেও একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জীবন্ত রেখেছে।

নৃত্যগীতরতা মরজিনার গুপ্ত ছুরিকায় নিহত দস্যু সরদার-এর আকস্মিক সজ্জনে রূপান্তরিত হওয়া নাট্যকাহিনীতে আকস্মিক নাটকীয়তা আনলেও ঘটনার দিক দিয়ে অনাটকীয়। মরজিনাকে কন্যা জ্ঞান করার মধ্যে নাট্যকারের নীতিজ্ঞান সহসা সজাগ বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। মৃত্যু পথযাত্রী সর্দারের হঠাৎ নীতিবাগীশ হয়ে ওঠার ঘটনা নাট্যকাহিনীধারার অনুকূল নয়। এককথায় নাটকের সমাপ্তি নাট্যরস সৃষ্টির সহায়ক হয়নি। অবশ্য একথাও বলে নিতে হয় যে নাটকের সূচনায় মরজিনাকে বেগম বানাবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার অনুকূলেই নাট্যকাহিনীর শেষাংশ রচিত হয়েছে। কাহিনী গ্রন্থনের ব্যাপারে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটি হল দস্যু সর্দারের আলির বাড়ীর সন্ধান পাওয়ার ব্যাপারে প্রথমবারের ঘটনা নাট্যসূত্রে গ্রথিত হলেও দ্বিতীয়বারের ঘটনা নাট্যধারার সঙ্গে তাল রেখে চলেনি।

নাটকটির জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। নাট্যকাহিনী. সঙ্গীতের প্রয়োগ, অভিনয় সব কিছুই যুগোচিত রসরুচি অনুযায়ী হলেও বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে অদ্বিতীয় ছিল। অভিনয়ের উপযোগিতা ও সাফল্যই জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ বলে ধরে নেওয়া যায়। কাহিনী নির্বাচন ও জনপ্রিয়তার আর এক কারণ বলে গণ্য হতে পারে। উপকথার হালকাচালের কাহিনী গ্রন্থন অনায়াসেই বিচারপ্রবণ যুক্তিপ্রবণ মনকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। সেই আচ্ছন্নতার প্রবাহে দর্শকদের বেশীক্ষণ ভাসতে দেন নি নাট্যকার, আবার পরমুহূর্তে সজীব চরিত্রচিত্রনের মাধ্যমে বাস্তবের মাটির স্পর্শে তিনি সবাইকে সচকিত করেছেন। কল্পলোক ও মাটির পৃথিবীর মধ্যে অবাধ বিচরণ নাট্যকাহিনীকে নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়তার ঊর্ধ্ব শীর্ষে উত্তীর্ণ করেছে।

জনপ্রিয়তার অন্যতম চাবিকাঠি অবশ্য আবদালা মরজিনার দ্বৈত নৃত্যগীতের সংযোজন ও সুষ্ঠু পরিবেশন। আকর্ষণ হাস্যচটুল নৃত্যগীত রসাল সংলাপ। মাঝে মাঝে করুণ রসের অবতারণার আবরণে নিছক হাস্যরস পরিবেশনের চমকপ্রদ কৌশলও দর্শকবৃন্দকে সহজেই আকৃষ্ট করেছে। যুগোচিত রসরুচি চরিতার্থ করতে পেরেছে নাট্যামোদীরা নাটকটির ঘটনাশ্রয়ী সংলাপধর্মী হাস্যরসের মাধ্যমে। সুপ্রযুক্ত গান, চটুল নাচ, নাচগানের উপযোগী সংলাপধর্মী গানের বাণী-সব কিছুই নাটকটির জনপ্রিয়তার অনুকূলে রায় দেবে। প্রচলিত কাহিনী বহির্ভূত কয়েকটি নূতন সৃষ্ট চরিত্রের সজীবতা ও নাটকীয় উপস্থাপনাও নাটকটির জনপ্রিয়তার একটি কারণ।

নৃত্যগীত, ঘটনার চমক, রোমান্স. বিষয় বৈচিত্র্য এবং সর্বোপরি সাহিত্যগুণে

সম্পন্ন না হয়েও মঞ্চ সাফল্য ও অভিনয়ের উপযোগিতা-জনপ্রিয়তার কারণ বলে সহজেই চিহ্নিত হতে পারে।

রূপকথা বা উপকথানির্ভর কাহিনীর প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রাণান্ত চেষ্টার কসুর করেন নি নাট্যকার। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের আলোয় উজ্জ্বল করে তোলার সীমিত সুযোগ পেয়েছেন নাট্যকার মাত্র কয়েকটি চরিত্রে। তার মধ্যে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল অন্যতম চরিত্র মরজিনা। নাট্যকাহিনী বিন্যাসে, ঘটনা নিয়ন্ত্রণে মরজিনার ভূমিকা আগাগোড়া মুখ্য। মরজিনার উপস্থিতবুদ্ধি, সহানুভূতিশীলতা, ন্যায়-নীতিবোধ নাটকের ঘটনার গতিশীলতার ধারাকেই যে শুধু অব্যাহত রেখেছে তা নয় মরজিনার রসাল ও বুদ্ধিদৃপ্ত সংলাপ নাটকটির অন্যতম আকর্ষণও হয়েছে। এছাড়া কাহিনীতে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যুর ভয়াবহ পরিণতির নৈতিক দিকটিও নাটকটির আংশিক আকর্ষণ বলে ধরে নেওয়া যায়। আরবি ফার্সি ও উর্দু শব্দ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যও নাটকটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

নাটকটির মূল লক্ষ্য বস্তুর সঙ্গে গভীর জীবনদর্শনের সমন্বয় খুব সহজসাধ্য নয়। তাই নাট্যকার নাটকটিকে কোন গভীর জীবন দর্শন কেন্দ্রিক করে তোলেন নি। ঈর্ষা এবং লোভের পরিণতি কী ভয়াবহ তার প্রকাশে নাট্যকারের কিছুটা প্রয়াস লক্ষ্য করা কঠিন নয়। আকস্মিক ধন লাভেও আলিবাবার উচ্ছ্বাসহীনতা, নিরুত্তাপ আচরণ এবং অনাসক্তভাবের পরিণতির পাশে আকস্মিক বিপুল ধনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্মহারা কাশেমের উচ্ছ্বাস ও উন্মত্ততা এবং লালসামত্ত হৃদয়ের বিকট আত্মপ্রকাশের পরিণামের বৈপরীত্য নাট্যকারের লোভে পাপ, পাপে মৃত্যুর নির্মম এবং নৈতিক জীবন দর্শনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

নাটকটির বিভিন্ন বিচিত্র পরিবেশে নাট্যকারের জীবনবোধ আবার কোথাও কোথাও বা সমাজ চেতনা ধনী সম্প্রদায়ের আগ্রাসী লোভের বিরুদ্ধে মৃদু ধিক্কার-সংলাপের মাধ্যমে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে।

আলির স্ত্রীর কাছ থেকে কাঠ কেনা লাভজনক-একথা জানার পর সাকিনার কাজের সমর্থন জানাতে কাশেম বলেছে, 'খাসা কাজ, তোফা কাজ। এরকম কাজ করো, কিন্তু দেখো তুমি যেন তাকে নেমতন্ন করে বস না।' কারণটি চমৎকার। নাট্যকারের গরীবদের প্রতি ধনীদের মনোভাবের সার্থক প্রকাশ লক্ষণীয় পরবর্তী সংলাপে 'থাকৃতির পেট গো-গ্রাসে গিলবে। বুঝেছ বিবি, পাঁচজনের খোরাক একলা মেরে দেবে।' নাট্যকারের সমাজ সচেতনতা এখানে লক্ষণীয়।

ফাতিমা বিবি স্বামীকে কুড়ুল কাঁধে নিয়ে আবার কাট কাটতে বেরুতে দেখে সহানুভূতিসূচক প্রশ্ন করে. 'ও কি, তুমি আবার এখুনি কুড়ুল কাঁধে বেরুচ্ছ যে?' আলির মুখ দিয়ে নাট্যকারের উত্তর মর্মস্পর্শী ব্যঙ্গোক্তির পর্যায়ে পড়ে। 'ওটা কাঁধের সঙ্গে কি রকম একটা আঠা লেগে জড়িয়ে গেছে। ওটার দিকে নজর কর না'।

সদাজাগ্রত ন্যায়নীতিবোধ নাট্যকারের সংলাপমালায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সাকিনা কাঠের যথার্থ দাম দেয় না কিন্তু ফতিমার মতে—'দাম যে দেয় এই যথেষ্ট।' তার দায়িত্ববোধ ও উদারতাও লক্ষ্যণীয়। তাই আলির অভিযোগের উত্তরে বলেছে—'ও যদি বড়মানুষের মেয়ে না হত, তোমার ভাই যদি রোজগার করতে না পারত তাহলে তোমাকে যে সমস্ত ভার নিতে হত।'

সাকিনার মধ্যে যার অভাব অর্থাৎ নীতিবোধ ফতিমার মধ্যে তা একান্তভাবে উপস্থিত। আলিবাবার কাছে মোহরের কথা শুনে বিস্মিত ফতিমার সবিস্ময় উক্তি—'আমরা দিন আনি দিন খাই। কোনদিন বা পাই, কোনদিন বা না পাই। আমাদের মোহর কি গো? তুমি ডাকাতি করতে শিখেছো নাকি? ওগো আমাদের কি সর্বনাশ হল গো।'

মরজিনা চরিত্র চিত্রনের ব্যাপারে নাট্যকার একটি নিরাসক্ত সরল মনের পরিচয় দান প্রসঙ্গে এক অপূর্ব জীবন বোধের পরিচয় দিয়েছেন। টাকার নেশা আলির সহ্য হচ্ছে না। তাই পরিচারিকা মরজিনার কাছে প্রস্তাব—'আমরা অনেক টাকা পেয়েছি। তার নেশা আমরা কেউ বরদাস্ত করতে পারছি না, টাকাগুলো তুই নিবি?' (ফতিমার প্রতি) তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে এই বুঝি আমার বকসিস? আমায় পাগল করতে চাও। আমি বাঁদী। তোমরা স্বাধীন গেরস্ত। তোমরা টাকার ধাক্কা সইতে পারলে না, আমি সইতে পারবো? তোমরা পাগল হলে দেখবার লোক আছে। আমার কে আছে? মরজিনার এ সংলাপ অনবদ্য।

নাট্যকারের আধ্যাত্মচেতনাও নাট্যকাহিনীর শেষাংশে স্পষ্ট আকার নিয়েছে। গরম তেল ঢেলে ডাকাত দলকে শেষ করার ব্যাপারে মরজিনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রকাশ পেলেও আলির বিস্ময় 'তুই কোন পরীর রাজ্য থেকে এসেছিলি মা।' গভীর জীবন দার্শনিক নাট্যকার মরজিনার মুখ দিয়ে শোনালেন—'আমি উপলক্ষ্য। ঈশ্বরই আমাকে প্রভাতে খড়ির চিহ্ন দেখিয়েছেন। ঈশ্বরই আমাকে তেলের জন্য সওদাগরের জিনিষ চুরি করতে পাঠিয়েছেন।' সংলাপের মধ্যে আধ্যাত্মচেতনা কৌশলে নাট্যকার সংযোজন করতে সক্ষম হয়েছেন।

লঘুবিষয়ক গীতিনাট্য গিরিশচন্দ্রে যার সূচনা—দিগদর্শন, ক্ষীরোদপ্রসাদে তার প্রসার। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে নাটকটির অন্যতম আকর্ষণ হাস্যচটুল নৃত্যগীত। নাটকটিতে কৌতুকরস সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। কাহিনীর দিক দিয়ে এটিকে কৌতুকরসাত্মক রঙ্গনাট্যে এবং গীতিনাট্যে রূপায়িত করার প্রচেষ্টা দুঃসাহসিকতার সামিল বলেই গণ্য হওয়া উচিত। কারণ নাটকটির বহু স্থানে করুণরস ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু তবুও এ ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে করুণরসের অবতারণা কৌতুক রসেরই ছলমাত্র। নাটকের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে কখনও বিষাদ, কখনও বিপদের আশঙ্কায় রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা, কখনও করুণ পরিণতির পরিপূরক আকস্মিক

অকাল মৃত্যু—কিন্তু তবুও প্রবাদ'এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গে ভরা'র মত নাটকে কৌতুক প্রবণতার জোয়ারে ভাঁটা পড়ে নি। 'সুখে দুঃখে জীবন ছুটে চলেছে মন্দাক্রান্ত ছন্দে। করুণ ও কৌতুক রসের আলোছায়ার মধ্যেই নাট্যকাহিনী গ্রন্থনা, নাট্য সংলাপ সংযোজন অতি সতর্কতার সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে।'

নাটকটির হাস্যরস মূলতঃ ঘটনাশ্রয়ী ও সংলাপধর্মী। কৌতুক গীতিগুলিও সমানে হাস্যরসের জোগান দিয়েছে এবং পরিস্থিতি ও পরিবেশকে রসাল করে তুলেছে। আবদালা মরজিনার দ্বৈত নৃত্য গীত ও হাস্যরস কৌতুকরসের অন্যতম উপাদান রূপে নাটকে স্থান পেয়েছে।

আকস্মিক ধন প্রাপ্তিতে ফতিমার মানস বিপর্যয়কে সুকৌশলে নাট্যকার হাস্যরসের উপদানে রূপান্তরিত করেছেন। ফতিমা চিৎকার করে যখন প্রায় সব জানাজানি করে দিচ্ছিল, ঠিক সেই সময়, সে আবার বুদ্ধি করে পেট ব্যথার সুন্দর যে অভিনয় করে তাতে পর্যাপ্ত হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। হাস্যরস সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় কৌতুকরসেরও যে সৃষ্টি হয়েছে একথা না বললে নাট্যকারের প্রতি অন্যায় করা হবে। এ হাস্যরস সৃষ্টিতে মাত্রাজ্ঞান না থাকলে এই সমস্ত কার্যকলাপ নির্ঘাত ভাঁড়ামির পর্যায়ে পড়তো। নাট্যকার তা হতে দেন নি।

মরজিনা অবদালার সংলাপমালায় হাস্যরস খণ্ড খণ্ডরূপে শোভা পেলেও হাস্যরস দু একটি বিশেষ ঘটনা থেকেও অতি সতর্কতার সঙ্গে নাট্যকার উৎসারিত করেছেন। কাশেম ধনরত্ন নিয়ে প্রস্থানোদ্যত। কিন্তু ফটকের বাইরে যাবার সূত্র—সেই দুটি সাংকেতিক শব্দ বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছে। মুহূর্তে ধনাগার কাশেমের কাছে মৃত্যুর গহ্বরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। মুক্তির অস্থিরতায় সে যত ছটফট করেছে হাস্যরসও পরিবেশন করেছে ঠিক সেই পরিমানে। সাংকেতিক শব্দ দুটি মনে এলেই মুস্কিল আসান হত—কাশেমের সাংকেতিক শব্দ দুটি মনে পড়লে অন্যান্য উদ্ভট সব শব্দ উচ্চারণের মজা জমতো না—রঙ্গরসও দানা বেঁধে উঠতো না। এই পরিস্থিতিতে বিশাল ধনসম্পত্তির অধিকারী হতে হতে এ ধরনের বিস্মৃতি এবং কৌতুককর আচরণ সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞানসম্মত এবং এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত হাস্যরস স্বতঃউৎসারিত এবং স্বাভাবিক।

আলিবাবা গীতিনাট্য ও রঙ্গনাট্যে Wit নেই. কিছু কিছু Humour ও আছে আর আছে স্থূল ভাঁড়ামির পর্যায়ের কিছু তরল রঙ্গতামাসা ও কৌতুকরস। তবে কোথাও তা অসহ্য নয়. বরং উপভোগ্যই।

পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি জনিত হাস্যরস ও কৌতুক প্রবণতা ছাড়াও কিছু কিছু সংলাপ কৌতুকরসের পরিপোষক হয়েছে। তবে আবদালা ও মরজিনার কথোপকথনের মধ্যে হাস্যরসের সন্ধান মিললেও আবদালার সংলাপ মাঝে মাঝে অসঙ্গত। অসঙ্গত এই কারণে আবদালার মুখে কাব্যিক উক্তি স্বাভাবিক হতে পারে না। মরজিনা বাস্তব

জগতের মানুষ। মাটিতেই সে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আবদালার একটানা ভাবাশ্রয়ী সংলাপকে যে যেন কান ধরে নাড়া দিয়েছে।

মরজিনা—মিছে নয়, আমার ভেতরে কাঁড়িখানেক কি যেন ঢুকেছে। কিসে সারে বল দেখি?

আবদালা—গান গা, গানের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে।

মরজিনা—ঝড়ে আবার গান কি?

আবদালার উক্তির মধ্যে আবার কিছুটা অসঙ্গতি. তবুও সংলাপ উপভোগ্য। ঝড় বাইরেই হু হু করে, বাঁধা ঘরের জানালায় গিয়ে বাঁশী বাজায়। তুই বাঁদী, তোরও বাঁধা বরাত। আমি বান্দা আমারও নিটোল দুঃখ। তুই হাউমাউ কর, আমার কানে মধুর ঠেকবে তখন।

হঠাৎ বড়লোক হওয়ার পর ফতিমা ও আলির কথোপকথন কৌতুককর। কি যে করবে আর কি যে করবে না কিছুই তারা ঠিক করতে পারছে না। অজস্র সুখস্বপ্নের মাঝখানেও অস্বস্তি আর উদ্বেগের কাঁটা বিঁধছে তাদের অহরহ। ফতিমা তাই শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করেছে আলির কাছে। 'আমার প্রাণটা যেন কুঁকিয়ে উঠছে। আমি বসতে পারছি না, দাঁড়াতে পারছি না, শুতে পারছি না।' আলিরও স্বস্তি ছিল না। আমি হাসতে পারছি না, কাঁদতেও পারছি না। গানের মধ্যেও ফতিমার সেই একই অস্বস্তিকর আর্তনাদ। তার চিৎকারেও একই সুরের প্রতিধ্বনির অপূর্ব অভিব্যক্তি। 'মাগো আমার কি হল গো আমার ঘুম হয় না কেন গো, ক্ষিদে পায় না কেন গো—আমার চোখ ফেটে জল আসছে কেন গো,'—ইত্যাদি।

বিশাল ধনপ্রাপ্তির আনন্দে কাশেমের মানসিক অস্থিরতা প্রকাশে তার দীর্ঘ স্বগতোক্তি নাট্যব্যাকরণসম্মত না হলেও উপভোগ্য। আনন্দে আত্মহারা কর্তব্যে দিশেহারা কাশেম কি করবে কি না করবে নাটকে তার মানস চিন্তা প্রতিফলিত। এ এক ধরনের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গীতসূচক দিবাস্বপ্ন। চরিত্র বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে ও হাস্যরস সৃষ্টির উপযোগিতায় এই দীর্ঘ স্বগতোক্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

কাশেম ধনপ্রাপ্তির সংবাদ আলির কাছ থেকে আহরণ করবার জন্য হঠাৎ আলির প্রতি সদয় হয়েছে। আলি কাশেমকে বিলক্ষণ চিনতো। 'তুমি এত ধনের অধীশ্বর। আলি ভাই কতদিন অনাহারে কাটিয়েছে। ফিরেও দেখো না। শুনেছি তুমি ভাই বলতেও ঘৃণা কর।' স্বার্থপর কাশেম কার্যসিদ্ধির জন্য যে চমৎকার উত্তর দিয়েছে তাতেও হাস্যরস স্বতঃউৎসারিত 'কে বলে কে বলে, কোন শালা বলে?' সংলাপ হিসাবেও এমন বাস্তব সংক্ষিপ্ত নাট্যরসাশ্রয়ী সংলাপের ব্যবহার সে যুগের বিচারে বিস্ময়কর।

ফতিমা যে রকম কাঠের ব্যবসার সূত্রপাত করেছে তাতে আলির বোধ হয় ঘরে থাকা সম্ভব হবে না। চির বনবাস করতে হবে। তাই পুত্র হুসেনের কৌতূহল নিবৃত্ত-

করার ব্যাপারে আলির উক্তি 'ঐ যে আসছেন ওরই মুখে শুনলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে এখন।' নাট্য কৌতূহল অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে এই ধরনের সংলাপ সবিশেষ কার্যকরী হয়েছে।

কুনকে থেকে সাকিনার কথামত মোহর বেরুতে দেখে মত্ত অবস্থায় কাশেমের মাতলামি উগ্ররূপ ধারণ করেছে। আবদালা ফরমাস মত একপেয়ালা সিরাজি এনেছে। কিন্তু কাশেমের ঈর্ষাকাতর অস্থির মন তাতে সন্তুষ্ট হয়নি। পরিকল্পিত পরিবেশে সংলাপ ও কাসিম চরিত্রের (মুভমেন্ট) গতিবিধি বাস্তবানুগ। তবে চরিত্রের দিক দিয়ে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে সাকিনার পরবর্তী সংলাপের মধ্যে। 'অমন করে পাগলামি করলে তো হবে না। উপায় কর, ভাল করে খবর লেও। দেখ দেখি এ কোন বাদশার মোহর।'

আবদালা মরজিনা হুসেন প্রসঙ্গে কিছু কিছু সংলাপমালা উল্লেখ্য। নাট্য প্রয়োজন মিটিয়েছে তারা অনায়াস দক্ষতায়। মরজিনার সংলাপ মাঝে মাঝে দীর্ঘ, কিন্তু তবুও প্রাণবন্ত। আবদালা মরজিনার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী কিন্তু মরজিনা অত্যন্ত বাস্তববাদী। আবদালা মরে গেলে গোর দেবে কে? মরজিনার পক্ষে তাও যে সম্ভব নয়। আমার হাতে বড় ব্যথা। হুসেন প্রসঙ্গে আবদালা যখন বলল, 'লাফ মেরে উঠলি যে? হুসেন এল বলে এল। একেবারে মরজিনা বিবির বর্গ ঘেষে এল।' হুসেনের সঙ্গেও মরজিনার সংলাপ শান্ত পরিবেশ সৃষ্টির অনুকূল।

মরজিনার সংক্ষিপ্ত সংলাপ এককথায় তার মানস প্রতিক্রিয়ার সার্থক রূপায়ণ— 'তোর গল্পটা বড় মিষ্টি লাগছে রে।'

দস্যুর হাত ধরে মুস্তাফা এসেছে চিনিয়ে দিতে। রাস্তায় পরস্পরের সংলাপ রীতিমত কৌতুককর। মুস্তাফার মুখে মরজিনার বর্ণনা রঙ্গনাট্যকে প্রণোচ্ছল করে তুলেছে। ঝগঝগে রগরগে পোষাক, পানা পানা মুখ. গোলাপী রঙের ঠোঁট তাতে পটল চেরা চোখ—তাতে বিতিকিচ্ছির ঠার, মজাদার হাসি রাঙা ঠোঁট দিয়ে সিরাজ-মাখানো কথা।

নাটকটির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ সংলাপ ও গানের মেলবন্ধন। যেখানে সংলাপ কৌতুক রস পরিবেশনের অনুকূল পথ খুঁজে পায়নি সঙ্গীত এসে সংলাপের পাশে দাঁড়িয়েছে—আবার সঙ্গীত যেখানে থেমে গেছে সংলাপ ঠিক ঠিক জায়গায় নিজের দায়িত্ব পালন করেছে।

কাশেমের ব্যর্থ প্রতীক্ষাকে মরজিনা সান্ত্বনা দিয়েছে যথারীতি। সাকিনার মুখ দিয়ে একটা সত্য কথা প্রকাশ পেয়েছে. কি করলুম মরজিনা, কেন পরের ধন দেখে হিংসা করলুম মরজিনা?' এই অংশে সাকিনার অনুশোচনা আংশিক দীর্ঘ সংলাপের মধ্যে বিবৃত হয়েছে। অত্যধিক সংলাপ নাট্য বিচারে অনেক সময় গভীর উদ্বেগ প্রকাশের প্রতিবন্ধক-নাট্যকার সাময়িকভাবে সে কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে নাটকটির গানগুলি বহুক্ষেত্রেই নাটকটির অপরিহার্য অঙ্গরূপে প্রতিভাত হয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই পরিবেশকে মজাদার, পরিস্থিতির সুরে সুরেলা করে তোলার জন্য গানগুলি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

প্রথম দৃশ্যের গানে হিন্দি ও বাংলা শব্দের সংমিশ্রনে ধ্বনিবৈচিত্র্য লক্ষণীয়। তা ছাড়া প্রস্তাবনা গীতে মূল কাহিনীরও ইঙ্গিত আছে। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে আবদালা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যে গানটি গেয়েছে মরজিনার সঙ্গে সেটির বাণী অপূর্ব, পরিবেশানুগ ও কৌতুকপ্রদ। চতুর্থ দৃশ্যের সূচনাতেও যে গানটি রয়েছে তাতে বুভুক্ষু মানুষের অন্তর্জ্বালা অভিব্যক্ত।

আলিবাবা গীতিনাট্যে গানের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কাশেম তখনও ফিরছে না। উৎকণ্ঠিতা সাকিনার মানসিক অস্থিরতার প্রতিক্রিয়া তার শরীরে ও তার আচার আচরণে—চলনে বলনে—তার অঙ্গসঞ্চালনের প্রতিটি পর্বে। গানের একটি কলির উদ্ধৃতি থেকেই সে কথার পরিষ্কার প্রমাণ মিলবে।

আমার কেমন কেমন করছে মন
চোখ ছলছল পা টলটল রগ কেন টনটন।
আমার শিউরে শিউরে উঠছে কেন গা
খালি হৃদয় করতেছে খাঁ খাঁ
(আমার) হাত মড়মড় বুক ধড় ফড়
প্রাণ কেন ঝন্ঝন্।
এমন ফটফটানি প্রাণ পোড়ানি
কি ছাই অলক্ষণ।

কাশেমের জন্যে সাকিনার ব্যর্থ প্রতীক্ষার অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে কৌতুকরস নাটকটিকে ঝিমিয়ে যেতে দেয় নি—বরং বেশ জমিয়ে তুলেছে।

আলিবাবাকে স্বামীর সন্ধানে প্রেরণ করে কিছুটা নিশ্চিন্ত সাকিনা, তবে সংশয় তার মন থেকে যায় নি তখনও। গানের ভাব ও ভাষা তার সংশয়ের সার্থক বহিঃপ্রকাশ।

দ্বিতীয়দৃশ্যে দস্যুদের গান, গানের বাণী ও ভাব পরিবেশানুগ। তৃতীয় দৃশ্যে ফকিরের গান, সাবধান বাণী পরবর্তী ঘটনাস্রোতের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ। শয়তান ঘুমরহে হরদম শখানে রহো হুসিয়ার। সাকিনা, ফতিমা, হুসেন সবাই মরজিনা বলতে পাগল, এখানে মরজিনার গান সেই মূলভাবের দ্যোতক হলেও ব্যাপারটি পুনরুক্তিমাত্র, অপরিহার্য নয়।

পঞ্চম দৃশ্যে গরম তেল ঢেলে ডাকাত দলকে শেষ করার প্রসঙ্গে সমবেত সঙ্গীতটি

সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তির পরিস্থিতি-পর্যালোচনার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।\

আলিবাবা গীতিনাট্যটির অন্যতম আকর্ষণ নৃত্যগীত। এই নাটকটি যুগরুচির প্রতীক হিসাবে দর্শক শ্রোতার হৃদয় জয় করতে একদিন সমর্থ হয়েছিল—সেই সামর্থ্য কালপ্রবাহে আজও শক্ত মাটির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে প্রমাণ করেছে। তাই আলিবাবার অভিনয় বা তার নৃত্যগীত সংলাপ শুনলে বা দেখলে আমাদের কৌতুক-প্রবণ মনপ্রাণ একাত্ম হয়ে তার দিকে আকৃষ্ট হয়।

॥ প্রমোদরঞ্জন ॥

প্রমোদরঞ্জন নাট্যকার কর্তৃক রঙ্গনাট্য রূপে চিহ্নিত। মানুষকে ভালবেসে মানুষের উপকারের বিনিময়ে কী পেল প্রমোদরঞ্জন?—উপহাস, অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা। মানুষের প্রতি বীতস্পৃহ, সংসারের প্রতি উদাসীন প্রমোদরঞ্জনের তাই মনুষ্যসমাজ বিবর্জিত হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এক কাল্পনিক রাজ্যে উত্তরণ ঘটেছিল। সেখানে রোমান্স, প্রভৃতির মাধ্যমে নাট্য পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছে।

সূচনায় গান (বিশেষ করে সমবেত) ক্ষীরোদ রঙ্গনাট্যের বৈশিষ্ট্য।

মানুষের বিশ্বাসঘাতকতায়, অকৃতজ্ঞতায় বীতস্পৃহ প্রমোদ কি করে বন্ধুকে ছেড়ে যাওয়া যায়, মায়া কাটানো যায় তার উপায় বের করেছে। এ ব্যাপারে হিমালয়ের আশ্রম বালক-বালিকা যথাক্রমে চঞ্চল ও চঞ্চলার অদৃশ্য হস্তক্ষেপ অন্যান্য নাটকের আঙ্গিকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হিমালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জয়ন্তী কাহিনীর অদৃশ্য নিয়ন্তা।

মানুষ প্রসঙ্গে নাট্যকারের কিছু বক্তব্য নাটকে অপ্রাসঙ্গিক না হলেও বাহুল্যের পর্যায়ে পড়ে এবং স্বভাবতই তা নাট্য রসাস্বাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে।

জয়ন্তী মানুষ খুঁজেছে, অথচ কারণ কিছু বলে নি। রঞ্জন প্রকৃত মানুষ কিনা পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছে জয়ন্তী। মানুষ প্রসঙ্গে রঞ্জনও সব কথা খুলে বলতে চায় নি, যদিও প্রমোদের অমানুষিক আচরণ তার ক্ষোভের কারণ হয়েছে।

মানুষের আচরণে তার ও পর বিশ্বাস হারানোর নৈরাশ্য প্রমোদের দীর্ঘ সারগর্ভ

সংলাপ নাট্যপ্রবাহে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। তার জীবনদর্শনে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি। প্রমোদরঞ্জনের বিস্ময়—'কোথায় তার কল্পিত আদর্শ বাস্তব মানুষ।' নাটকে প্রমোদের গভীর জীবনবোধের অভিব্যক্তি চরিত্রটিকে মাঝে মাঝে দৃপ্ত করে তুলেছে। অত্যাচার বাড়ার সূত্রে জাতির অগ্রগতি। 'এ বেটার জাতের কিছু হল না। মারামারি, কাটাকাটি-সর্বনাশ।' অত্যাচার যতই বাড়ছে—বেটার জাতি বলে, আমরা উন্নত হচ্ছি।'

জয়ন্তীর সংলাপ—'দে রামা মানুষ দে' নাটকে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। জয়ন্তীর এই উদ্ভট সংলাপকে কেন্দ্র করে পাঁচ পথিকের রসাল সংলাপ নাটকের কাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় নয়, স্বাভাবিক রসগ্রহণে বরং ব্যাঘাতই সৃষ্টি করেছে। তবে নাট্য-কারের স্বাভাবিক রঙ্গরসিকতার যে প্রবণতা—তার মুক্তি সাধন ঘটেছে। পরোপকার প্রবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও উপকার না করতে পারার অজুহাত ডি. এল. রায়ের নন্দলাল কবিতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'ওরে বাবারে, কি করলেম রে। আমার ওপর যে ভারতের অনেক আশা আছে রে।'

'দে রামা মানুষ দে'; মানুষ খুঁজলেই কি মানুষ পাবে জয়ন্তী? এর স্বপক্ষে নাটকের কাহিনীর দিক দিয়ে না হলেও—নাটকের ইজম্ এর দিক দিয়ে প্রমোদের মানুষ চরিত্র বিশ্লেষনের চেষ্টাকে স্বাগত জানাতে হয়। সীতাহরণের সময় মানুষ না আসার উদাহরণটি উপযোগী। 'একটা মানুষ এসে তার চোখ মুছিয়ে ছিল বেটী?' মানুষ এল না, বানর এল। বানর এসে রামকে কোল দিল। উপকার করছি না ভাবলে কি হবে?' জয়ন্তী বলেছে, তার বৃথা মানুষ খোঁজার হায়রানির হাত থেকে বাঁচিয়ে প্রমোদ তার উপকার করেছে।

রঞ্জন মুক্তি প্রসঙ্গে নাট্যকার পাশাপাশি আর একটি কৌতুক উপকাহিনীর জাল বিস্তারে প্রয়াসী হয়েছিলেন। সে কাহিনী নাট্য প্রয়োজনের মানদণ্ডে যথাযথ হয়নি। ২য় অংকের ৩য় দৃশ্যের রঞ্জনের দীর্ঘ স্বগতোক্তি আলো আঁধারের জোয়ার ভাটার সৃষ্টি করেছে। দীর্ঘ হওয়ার ফলে নাট্যগুণ হারালেও এই স্বগতোক্তি দর্শকদের এক বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি করে দিয়েছে। কৃত্রিম রাগ করে ভালবাসা যাচাই করতে গিয়ে রঞ্জনের ফ্যাসাদ কৌতুকপ্রদ ও নাট্যোপযোগী। মিছিমিছি 'চলে যাচ্ছি' বলে রঞ্জন মুক্তির ভালবাসার পরীক্ষা নিতে চেয়েছে। এই দৃশ্যে হুসেনের প্রেমভিক্ষা ও মর্জিনার কটাক্ষ—এর কথা মনে পড়ে যায়। যাবো বলে ও যখন যেতে নারাজ রঞ্জন, মুক্তি তাকে একহাত নিতে চলেছে,—কারণ সে আর অপেক্ষা করতে নারাজ। রঞ্জন শেষ পর্যন্ত বেপরোয়া, আর তাতেই প্রত্যাশিত কৌতুক।

জয়ন্তীর নেপথ্য কাহিনী নিয়ন্ত্রণের সুবাদে রঞ্জন ও মুক্তি—দুটি প্রাণ শেষ পর্যন্ত কাছাকাছি এসেছে। রঞ্জনকে উপযুক্ত শাস্তি দাও। সে আর মানুষের ওপর ঘৃণা না করে, এমন উপায় করো। এ আশ্রমের যে যেখানে আছে ছদ্মবেশে থাকতে

আদেশ দাও। তুমি হও ভূতের রাজা আর এ বেটা হোক পেত্নীর রাণী। ক্ষীরোদ নাট্যের বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা—বিভিন্ন চরিত্রের সুযোগ পেলেই ছদ্মবেশ ধারণ ও কৌতুক সৃষ্টির প্রয়াস এ নাটকেও অনুপস্থিত নয়।

কিছু কিছু ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টির অবকাশ ছিল। কিন্তু নাট্যকারের স্বভাব-সুলভ হাস্যরস সৃষ্টির আচমকা প্রবণতায় তা নষ্ট হয়েছে।

মানুষের ওপর রাগ করে প্রমোদ শেষ পর্যন্ত ভূতের দেশে এসে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে দীর্ঘ সংলাপের সেই গতানুগতিক অসংযম। সংলাপ যদি বা কিছুটা রসাল তবুও নাট্যকলার দিক দিয়ে ত্রুটিমুক্ত নয়। এতে একঘেঁয়েমির ক্লান্তির হাত থেকে রেহাই নেই।·· রঞ্জন আমাকে একটা পেত্নী গছিয়ে দিয়েছে···' এরপর শিশু সাহিত্যের ভূতের নৃত্য। শেষাংশ কিছুটা কৃত্রিম। কৃত্রিম ভূতের ভয়ে প্রমোদও যেন পালিয়ে বাঁচল। এরপর যে দৃশ্যে প্রমোদকে সাঁড়াশি দিতে—রঙ্গরসিকতা—কথার মারপ্যাঁচ—সে দৃশ্যটির নাট্য প্রয়োজন অকিঞ্চিৎকর। —'উঃ, ছেড়ে দে, দে, আরে তোর এ কোমল হাতে ব্যথা লাগবে। বলি ও লোহার চাঁদ। ছাড়—ও ইস্পাতের চাঁদ। এ দৃশ্যটির নাট্যোপযোগিতা স্বীকার করে নেওয়া যায় না—এখানে নিছক কৌতুক প্রবণতার শিকার হয়েছেন নাট্যকার।

নাটকে কিছু কিছু উৎকণ্ঠা উদ্বেগের মুহূর্তও আছে। মুক্তির মুখে সরস সংলাপে প্রমোদ বুঝতে পেরেছে পেত্নীরূপিনী শান্তি তার বিরহে কাতরা। শেষ পর্যন্ত প্রমোদ আত্মসমর্পণ করতে বলে—'পেত্নী বে করবো'—যা কেউ কখনও করে নি, তাই করবো। জীবন্ত পেত্নী বিবাহ করতে পারলেম না। আমায় প্রেত কর।'

রঞ্জন উৎকণ্ঠিত। নদীতে কি শেষ পর্যন্ত জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল প্রমোদ? মুক্তি এ কথায় আমল দিতে চায় না। রঞ্জন রেগে ওঠে ক্রোধে ফেটে পড়ে। সর্বনাশী নরহত্যা করবার জন্যেই কি তোরা প্রেম করিস। শান্তি পার্বতীর মত ফুল দিয়ে প্রমোদকে পূজা করেছে। শান্তির আদ্যোপান্ত কাহিনী যাতে প্রমোদের সঙ্গে পরিচয় পর্বের উপস্থাপন, নাটকের কাহিনী গুটিয়ে নেবার কৌশল বলে ধরে নেওয়া যায়। শান্তির জীবনের দুঃখের কাহিনীতে প্রমোদের সহানুভূতিকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আমার পানে চেয়েছিল, আমায় কুরূপা দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলে। সেই আফশোষে ভেঙ্গে পড়েছে শান্তি। এর effect টিও চমৎকার নাটকীয়রূপে প্রকাশিত। যে শালা এমন নিষ্ঠুর—আর ফিরল না—বল, সে শালার বাড়ী কোথায়?

আদ্যোপান্ত সব কথায় যখন প্রকাশ পেল সে শালা আর কেউ নয় স্বয়ং প্রমোদকুমার তখনই নাটকের নাট্য মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে।

ঠিক তোমা মতন।
আমি শালা নই তো?

কিন্তু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না তাই প্রমোদকুমারের কুণ্ঠিত জিজ্ঞাসা, তুই কি বড় কুৎসিৎ?

শেষ পর্যন্ত নাটকের কাহিনীর যে জাল বিস্তার করা হয়েছিল—সে জালে ঈপ্সিত বাঞ্ছিত ফল আটক পড়েছে।

যাবি কোথায়? কুৎসিতে; তুই আমার স্ত্রী, তুই আমার হৃদয়েশ্বরী। চোখ্ দাও। আমি আমার ধর্ম পত্নীকে স্বর্ণচক্ষে দেখি।

যার হাত এত কোমল, কণ্ঠ এত সুমধুর সে কি রে কুৎসিৎ; সৌন্দর্যের একটি নিটোল কবিতায় কি করে ঘটবে ছন্দপতন!

অসুন্দরকে, কুৎসিৎকে ভালবাসার মাধ্যমে সুন্দররূপে পাওয়া যায়—এ সত্য চিরন্তন এবং এই সত্যের প্রতিষ্ঠাতেই নাটকটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

কাহিনী বিন্যাসের দিক দিয়ে নাটকটিতে জমাট নাট্যকাহিনী গড়ে ওঠে নি। খণ্ড খণ্ড কয়েকটি দৃশ্যে উপভোগ্য পরিস্থিতি ও পরিবেশ সৃষ্টি করে কৌতুক পরিবেশন করা নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল। নাট্যকলার নিয়ম মাফিক চাহিদা মিটুক—কৌতুক সৃষ্টির সুযোগ যেখানেই পেয়েছেন নাট্যকার সব কিছু ভুলে তাই সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিয়েছেন। কৌতুক সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু জীবনদর্শন প্রচারের দিকেও নাট্যকারের সযত্ন অচেতন প্রয়াস ছিল। সুতরাং সর্ব হিসাবে নাটকের সামগ্রিক রসবিস্তারে এর এলে স্বভাবতই বাধার সৃষ্টি হয়েছে।

নাটকে শুধু এই নাটকেই নয়—নাট্যকারের প্রায় সব নাটকেই সংলাপ প্রয়োগের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সংলাপের যৌক্তিকতা কোন কোন ক্ষেত্রে মেনে না নেওয়া গেলেও সংলাপের সাহিত্যগুণ অস্বীকার করা যায় না। সংলাপ মাঝে মাঝে বাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং কৌতুক পরিবশনে উচ্চমানে পৌঁচেছে।

রঞ্জনের কাছে মুক্তির আত্মপ্রকাশ অভিনব।

মুক্তি—দাসীকে এতদিন ফেলে কোথায় ছিলেন?

রঞ্জন—আজ্ঞে মাতৃগর্ভে। আপনার বিরহে কাতর হয়ে এতকাল সেই খানেই আশ্রয় নিয়েছিলুম।

দুজনের মধ্যে রসাল কৌতুককর সংলাপ আরও কিছু আছে। 'আরে আরে মধুভাষিনী, শুভাকাঙ্ক্ষিনী, দাসীরূপিনী মনোমোহিনী মাগী, এতকাল কোন চুলোয় ছিলি···(রঞ্জন)।

আরে আরে মধুভাষী সদাউদাসী চিরপ্রবাসী মিনসে। আমি কি দ্বিচারিণী··· (মুক্তি)

দৃশ্য জুড়ে এই রকম ছোট ছোট কৌতুকরসসিক্ত সংলাপ।

পন্থে পথিকের সমাপ্তি সংলাপে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরের প্রভাব স্পষ্ট—সংলাপের কিয়দংশ রসগ্রাহী এবং সে কারণে উল্লেখ্য।

'দোহাই মা গন্ধেশ্বরী, আমি মানুষ নই—গরু।—পাঁচ ইয়ারে ছিঁড়ে খায়। পৈতৃক বিষয়রূপে ভাগাড়ে যখন পড়ে থাকি, তখন কত শিয়াল-কুকুরে যে আমাকে উচ্ছিষ্ট করে তার সংখ্যা নেই। …মরে গোভূত হয়ে বেড়াচ্ছি। হিন্দুর দেবতা মা, আমার ওপর লোভ কোরো না।'…

শান্তি প্রমোদরে সংলাপেও মজা আছে। কৌতুক পরিবেশ সৃষ্টির প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছে। শান্তির প্রশ্ন সোজাসুজি। আমি কেমন দেখতে ভাই?

প্রমোদের সংলাপ…তোমার পটল-চেরা চোখ, পান পানা মুখ রাঙা রাঙা ঠোঁট, প্রাণভরা হাসি, গলাভরা কাসি, তুমি অতি সুন্দর।

নাটকে কয়েকটি সুন্দর সংলাপ আছে। 'প্রেততত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথা নিয়ে মানুষের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। কিন্তু গরীব আয়ানের জন্যে কখনও কি কাহাকেও একফোঁটা চোখের জল ফেলতে দেখা গেছে!'

মুক্তির কথায় রঞ্জন বলেছে, তুমি কি মনে কর আমি সবার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত। মুক্তির আর একদফা সুন্দর সংলাপ।

প্রেম বিসর্জনের তুলনায় প্রাণ বিসর্জন অতি তুচ্ছ। সবার জন্যে প্রাণ দিতে কাতর নয় কিন্তু তার জন্যে আমাকে ত ত্যাগ করতে পারলে না? প্রাণ দেওয়া যায় প্রেম দেওয়া যায় না। পুরাতন ভূতপ্রেত প্রসঙ্গ নিয়ে সংলাপ বৈচিত্র্যহীন—কিছুটা একঘেঁয়ে।

ক্ষীরোদ প্রসাদের নাটকের সনাতন বৈশিষ্ট্য—সঙ্গীতের মাধ্যমে সমাপ্তি। মিলনান্ত নাটকে পটপরিবর্তন। তার পরে মধুর রসাশ্রয়ী একটি গানের মাধ্যমে দর্শক বাঞ্ছিত সুন্দর সমাপ্তি। অন্যান্য নাটকেও এই একই রীতি—একই আঙ্গিকের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে—গীতি নাটকের বেলা ত কথাই নেই।

নাটিকাটি গীতিপ্রধান। রঙ্গকৌতুক সৃষ্টির প্রয়াসে এর অধিকাংশ গানই সুপ্রযুক্ত। প্রয়োগ নৈপুণ্যের দিক ও effect সৃষ্টির সযত্ন প্রয়াসে এ নাটকের বহুলাংশ আলিবাবা গীতিনাট্য সৃষ্টির সঙ্গে সমকক্ষতা দাবী করতে পারে।

প্রস্তাবনায় যে গীত তাতে মূলভাবের দ্যোতনা খুব সহজেই প্রকাশিত। নাট্যকারের বিশেষ টেকনিক্—গানটির আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ বলে দাবি করার যোগ্য।

প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যের গানটি spell of love—প্রেমের ফাঁদ বিস্তারের প্রারম্ভিক হিসাবে পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় ছিল। গানের বাণীতে চলিত ব্যবহার্য ধ্বন্যাত্মক শব্দ থাকায় গানের effect নাটকটিকে রসঘন করে তুলতে সাহায্য করেছে।

চতুর্থ দৃশ্যে আচমকা 'বে করতে হবে'—এই ঘোষণা শুনে মুক্তির মনের প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলনের জন্যে গানটি ভাবানুগ এবং সুপ্রযুক্ত। একই দৃশ্যে রঞ্জনের সঙ্গে

প্রেমের অভিনয়ে—প্রেমালাপ প্রসঙ্গে মুক্তির রঙ্গগীতি-রঙ্গগীতিনাট্যের অন্যতম উপাদান। গানের কথা সহজ। বক্তব্য সোজাসুজি।

পঞ্চম দৃশ্যে তৃতীয় পথিকের গৌরাঙ্গ বিষয়ক গান নাটকের কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ করে নি। ৬ষ্ঠ দৃশ্যে মুক্তির কাছে রঞ্জনের আত্মনিবেদনের গান মধুর রস বিস্তারের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেনি।

২য় অংকের তৃতীয় দৃশ্যের গানটি সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন আছে। রঞ্জন ও মুক্তি দুজনের ঘনিষ্ঠতা জয়ন্তী এসে বাড়িয়ে দিয়ে যায়। সেই ঘনিষ্ঠতার পরিণতি দু'জনের নিবিড় সান্নিধ্য।

পরস্পরের কাছাকাছি আসার ঘটনা তাদের দ্বৈত সঙ্গীতে বিধৃত। গানের ছোট ছোট সংলাপগুলি চমৎকার—কৌতুক নাটকের প্রাণস্বরূপ। এই গান মর্জিনা আবদালার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—সেই যে বিখ্যাত গানটি-আমি বাদশা বনেছি আমি বেগম সেজেছি, তার কথা।

২য় অংকের ৫ম দৃশ্যে মানুষ প্রমোদকে ভয় দেখানোর উপযোগী বাণী সম্বলিত গান গেয়েছে প্রেতিনী মূর্তিধারিণী গিরিবালারা। গানের বাণীর মধ্যে ছেলে ভুলানো শব্দ প্রয়োগের প্রবণতা লক্ষণীয়। একই দৃশ্যে প্রেমে মজেছে প্রমোদ। তার কাছে সুশ্রী কুৎসিতে ভেদ নেই। তাই গানের মাধ্যমে একটু কৌতুক করার প্রয়াস অসহ্য মনে হয়নি।

তৃতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে মুক্তি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রমোদের সখার পরিচয় দিয়ে একটা গান গেয়েছে। এ গানে আত্মবিশ্লেষণের সুর যথার্থই বেজেছে।

সমাপ্তি সঙ্গীত হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী। গানটি মিলনান্ত নাটকের বৈশিষ্ট্য সূচক। পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবার একটি গান। প্রকৃতি কেন্দ্রিক গানটিতে মিলনান্ত নাটকের মধুর আমেজ ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে।

নাটকে মোট গানের সংখ্যা আঠারো।

গানেম উদার দানশীল। বাঁদীদের সে মুক্তি দিয়েছে তার দার্শনিক যুক্তিতে—'আমার চেয়ে দুঃখী, তারা যদি হাসতে পারে গান গায়, আমি কি ধৈর্য ধরতে পারবো না?'—সমাজবাদ ও অর্থনৈতিক সমস্যার চিত্র স্পষ্টভাবে আঁকা হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে নাটকের মূল কাহিনীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সুযোগ নিয়েছেন নাট্যকার প্রথম দৃশ্যেই। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য। নাটকে এই কথাটি প্রমাণ করার জন্যেই যেন নাটক রচনা করা হয়েছে। দস্যুর হাতে পড়ে লাঞ্ছনা, ভগ্নী হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া, শেষ পর্যন্ত আয়ুবের ঘরে ক্রীতদাস হওয়ার যাবতীয় ঘটনা আজিবের বিশ্বাসে সব কিছুই মঙ্গলময়ের নির্দেশে সংঘটিত। তাই তার প্রার্থনা মঙ্গলময় তোমার কার্যে যেন আমার সন্দেহ না হয়। তোমার প্রতি ভক্তি যেন চিরদিন অটল থাকে। দৈব নির্ভরতা এ নাটকের প্রাণকেন্দ্র।

আবদুল গানেমের অভিভাবক। বাহার একটি অদ্ভুত প্রাণবন্ত কিশোর চরিত্র। বাহারের সংলাপ আচরণ, একদিকে যেমন আমাদের হাসির উদ্রেক করে, অন্যদিকে তেমনি সে আচরণ জীবন রহস্যের বহু সত্য উদ্ঘাটন করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমাদের দোষ ত্রুটি অসঙ্গতি সব কিছু দেখিয়ে দেয়। আজিব-গুলনারসংলাপে দুটি হৃদয়ের ভালবাসার স্পর্শ আছে, অথচ উত্তাপ নেই। ওদের মিলনের বড় সমস্যা আজিবের বংশ মর্যাদা। আজিবের ধারণা মঙ্গলময় ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই আজিবের বোগ্দাদ যাওয়া হয় নি। তার বক্তব্য :—এই ক্ষুদ্র বালিকার এই ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুতে সাগর প্রমাণ করুণা থাকতে পারে, তাই দেখবার জন্যে ঈশ্বর আমাকে বোগ্দাদে যেতে দেন নি। আমার পরম মঙ্গলের জন্য খোদা আমাকে গোলাম করেছেন। প্রত্যুত্তরে বাস্তববাদী ঐহিক সুখপিয়াসী গুলনারের স্বাভাবিক প্রত্যুত্তর নাটকীয় সংলাপের অঙ্গীভূত হয়েছে।

গুলনার :—'ছাইএর জন্য করেছেন পাঁশের জন্য করেছেন। আমি এর কিছুই বুঝতে পারি না। আজিবকে পাওয়ার পথে যা কিছু বাধা ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে তা মানতে রাজী নয় গুলনার। গুলনার আজিবের প্রতি অনুরক্ত। আজিব গানেমের মার কাছেও অবাঞ্ছিত ব্যক্তি নয়—শুধু অবাঞ্ছিত তার বংশ মর্যাদা। নাট্য সমস্যার উঁকি ঝুঁকি এই অংশে কিছুটা প্রত্যক্ষ। গানেমের মার কাছে সবচেয়ে যে দ্বিধা মানসিক বিরোধ তা হল আজিবকে মনেপ্রাণে গ্রহণও করতে পারছেন না, আবার ত্যাগ করার কথাও চিন্তা করতেও শিউরে উঠছেন। 'এমন সোনার ছেলে তুমি কেন বান্দা হলে?' গানেমের মার মুখে সমস্যার কথা আরও আছে সেগুলি নাটকীয়

সংলাপ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। 'বংশ পাত্র আর পোড়া মেয়ের নজর—এই তিনে আমার হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়ে মারলে। তারপর পাত্র মিলল পোড়া মেয়ের নজর ঠাণ্ডা হল। কিন্তু জ্বালা চারগুণ জ্বলে উঠল। আজিব, সব মিলল, বংশ মিলল না।'

মেয়ের খোরাক কমে যাওয়ার প্রসঙ্গে গানেমের মার সংলাপ পরিবেশ অনুযায়ী লঘু—গ্রাম্যতা দোষ বর্জিত নয়। যৌবনে নিজের খোরাক কমে যাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত তা পূরণ হওয়ার ব্যাপারে তার স্মৃতিচারণ : যেদিন তার সঙ্গে সাদী হল সাতদিনের খোরাক একদিনে মেরে দিলুম। প্রত্যুত্তরে আজিবের সংলাপ যেমন বাস্তব তেমনি হাস্যরসের উপাদান স্বরূপ। 'দূর বুড়ি,এইসব কথা কি ছেলের কাছে কয় ?' এই দৃশ্যে স্নিগ্ধতা আছে আর আছে সমস্যার সমবেদনার রসে অভিষেক। সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছে আজিব নিজেই। আমি যদি রাজপুত্র হতুম, তাহলে তোমার আর কোন গোল থাকত না। শেষ পর্যন্ত এই সূত্র ধরেই কাহিনী মিলনান্ত নাটকের শর্ত পূরণ করেছিল। কিন্তু কথা হচ্ছে নাটকের কলেবর বৃদ্ধি, চরিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং এক প্রেমিক যুগলের সুন্দর সংলাপ উপহার দেওয়া ছাড়া নাটকের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে এই দ্বন্দ্বের কি উপযোগিতা থাকতে পারে ?

ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য—এই মূল theme নাটকের এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের দিক দিয়ে বিচার করলে এই উপকাহিনীর প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করা যায় না। রোমান্টিক দৃশ্য হিসাবে এটির বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কিন্তু কাহিনী বিন্যাসে এর মূল্য অকিঞ্চিৎকর—তাই এর বিশদ বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। তবে নাট্যকৃতি হিসাবে কিছু কিছু সংলাপ উল্লেখ্য। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য প্রমাণ করার জন্য নাটকের বিচিত্র উপাদান, বিস্ময়, চমক, অদ্ভুত কার্যকলাপ সব কিছুরই সমাবেশ ঘটিয়েছেন নাট্যকার।

২য় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে কবর স্থানে জুলিয়া অবাক হয়ে ভাবছে তার হারেমে এতসব অবাঞ্ছিত লোক এল কী করে। বান্দাও ফটকের ফাঁক দিয়ে কৌশলে পালিয়ে এসেছে। তার ভাষায় গোরস্থানের মধ্যেই নাটকের প্রাণবিন্দু। মূল ঘটনার পরিণতির বীজ এই দৃশ্যেই চোখে পড়বে বাহারের সংলাপ অনুসরণ করলে। চুপি চুপি মাটিতে কফিন পুঁতে আবার চুপি চুপি ফিরে গেল দেখে আমার সন্দেহ হল। তারা চলে গেলে মাটি খুঁড়ে কফিন বার করেছি। খুলে দেখি তার ভেতরে এক আওরাৎ। এমন সুন্দরী আওরাৎ আমি কখনও দেখিনি। দেখে মনে হল মরে নি।

চমকপ্রদ অপ্রত্যাশিত ঘটনার কৌতূহল নাটকের কাহিনীকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করেছে। অবশ্য পরে এই ঘটনার সম্ভাব্য সব প্রকার প্রতিক্রিয়া বিশেষ করে মানসিক প্রতিক্রিয়ার পূর্ণ বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

জুলিয়া ও বাহারের রসসিক্ত সংলাপে নাট্যক্রিয়া উল্লেখ্য। জুলিয়ার ভ্রূকুটিতে

তোমার প্রাণে ভয় নেই ? এটা কালিফের হারেম তা জানো ? বাহারের বুদ্ধিদীপ্ত কটাক্ষ চমৎকার Humour এর নজীর রেখেছে। 'এবার থেকে যাকে গাল দেবার দরকার হবে তাকে বলবো কালিফের হারেমে যাও।'

বাহারের রসবোধের পরিচয়ের নিদর্শন আছে নাটকের বহু জায়গায়।

জুলিয়া : আমি খানাপিনা করে পালঙ্কে শুয়ে ছিলুম, এখানে এলুম কেমন করে ?

বাহার : কফিনে করে বিবিসাহেব।

জুলিয়া ও গানেমের সঙ্গে এই অংশে কথাবার্তা—আবেগশূন্য বুদ্ধিদৃপ্ত অথচ স্বাভাবিক ও সুন্দর। জুলিয়া (গানেমের প্রতি)—আমার এই সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে এই যন্ত্রণাময় জাগরণের মাঝে আবার টেনে এনে কাজ ভাল করেন নি। বাহারের সত্যভাষণ ভবিষ্যৎ ভাষণের সামিল হয়েছে। 'খোদার মর্জিতে হুজুরের বরাতে তুমি নাচছ, তাই মাটিতে পুঁততে তুমি যে আবার গজিয়ে উঠলে বিবিসাহেব।'

প্রথম অঙ্কে নুরবিহারের মুখে গানেমের পরিচয় পেয়ে তার প্রতি অনুরক্ত হতে জুলিয়ার প্রাণ চেয়েছিল, সংস্কারাচ্ছন্ন মন চায় নি। তাই গানেমকে হঠাৎ আবিষ্কার করার চমক নেই—চেনার মধ্যে নাটকীয় বিস্ময়বোধও নেই। জুলিয়ার পক্ষে গানেমকে চিন্তা করাও পাপ—এখানেও সেই 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়।' গ্রহণ করা তো দূরের কথা। কিন্তু এ যে কী বেদনা। ছোট্ট সুন্দর সংলাপে নাট্যকার তার আস্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন।

বাহার : আমার কান্না আসছে কেন বিবিসাহেব ?

জুলিয়া : তোর মনিব না আসতে আসতে আমাকে আবার কফিনে পুরে পুঁতে ফেল।

বাহারের জবাব চমৎকার Humour অথচ সংবেদনশীলতার স্পর্শে অভিষিক্ত।

বাহার : তোমায় কফিন থেকে বের করাতে হাতে আমার চোট লেগেছে—আর পারবো না বিবিসাহেব। জুলিয়ার অন্তর্দাহ ও বেদনার সার্থকপ্রকাশ—'ভাই হয়ে হতভাগিনী ভগ্নীকে জীবন্ত দগ্ধ করিস নি। আমায় মাটি দে।'

বাহার : খোদা পোড়ায় পুড়বে। মাটির ভেতরেও তো অদ্দিন থাকে বিবিসাহেব।

গানেমের উদ্দেশ্যে জুলিয়ার অনুযোগ—হৃদয়ের বেদনাকে নিঙড়ে দিয়েছে সে, অথচ গানেমের সাড়া মেলে নি।

'প্রাণ থাকতে কবরে পাঠিয়ে সমস্ত জীবনের সঙ্গে মরণ গেঁথে দিলে। একেবারে হত্যা করে পাঠালে বেশী কি অপরাধ করতে ? নুরবিহার গানেমের নামের সঙ্গে

সঙ্গে যন্ত্রণা এনেছিলি। সর্প-শিশু ছিল, সর্বনাশী দেখে যা, আজ সে অজগর হয়েছে।' এ সংলাপ তুলনাহীন।

গানেমের পুনর্জীবন গানেমের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন প্রণয়ের সুন্দর দৃশ্যটি বর্ণনা করার পর এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ার কথা জানিয়েছেন নাট্যকার। সাহী বিবির (ষড়যন্ত্রকারী) নুরবিহারের প্রতি সান্ত্বনা প্রতিক্রিয়ার একদিক। 'যে গেছে কাঁদিলে সে কি আর আসবে? না জেনে কি খেতে দিতে কি দিয়েছিস? ভালবাসতিস, ইচ্ছা করে ত আর মেরে ফেলিস নি।' কিন্তু সাহীবিবির অন্তর এখানে লুকানো, তার আসল রূপ নাট্যকার একটু পরেই তুলে ধরেছেন।

আমার হাতের বিষ, সে বেটি মরেছে আর এ বেটি আসামী হয়েছে। এরপর আবদুল রাগের মাথায় সাহীবিবির কাছে বিকিয়ে বসল বাহারকে। কিন্তু রাগ পড়তেই আবদুলের পিতৃহৃদয় আবার বাহারকে দাবি করে বসল। 'আমার আর কেউ নেই—আমি হাতে করে মানুষ করেছি।' সাহীবিবির কাছে সব আবেদনই ব্যর্থ। কাহিনী বিন্যাসে চরিত্রের সামঞ্জস্য রাখতে অবশ্য এর প্রয়োজন ছিল। কারণ সাহীবিবির ষড়যন্ত্র যে অন্ততঃ একজনের অজানা নয়, বাহারকে নিজের আয়ত্তে না পেলে জানতে পারতো না সাহীবিবি।

বাহার ঃ আমায় নিয়ে কি করবে বিবি সাহেব?

সাহীবিবি ঃ সোনার পালঙ্কে শুইয়ে ঘুম পাড়াব?

বাহার ঃ আর সেই ওষুধ খাইয়ে দেবে?

সাহীবিবি ঃ (চমকিয়া) কোন ওষুধ?

সার্থক কাহিনী বিন্যাস। সুন্দর সংক্ষিপ্ত সংলাপ।

গানেমের কাছে জুলিয়া বিদায় নেবে। তঞ্জাম এসেছে। কিন্তু তার আগে সুন্দর গানেমকে দেখে যেতে হবে অন্ততঃ একবার। বেয়াদপি মাফ্ হয়, আমি, হাঁপিয়ে মরে যাচ্ছি। (অবগুণ্ঠন মোচন)—আহা কি গানেম। কি সুন্দর গানেম।

কিন্তু যেতে যে মন চায় না। তাই নিজেকে প্রশ্ন করে জুলিয়া, হৃদয় কারে দিতে কারে দিয়েছি।......দয়ার আধার সম্রাট, শুধু ভক্তি নাও, আমার হৃদয় ফিরিয়ে দাও।

সংঘাত এর পর কোন বাহিরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নয়—একান্তই অন্তরীন।

'এ যন্ত্রণা থেকে ঈশ্বর আমাকে মুক্তি দেবেন কি?' এখান থেকেই নাট্য সংকটের সূত্রপাত—অবশ্য চরিত্রগত জটিলতা সৃষ্টিই উল্লেখ্য।

জুলিয়া মুখ ঢাকতে চায় না, গানেম তাই বলেছে এ সমাজ বিরুদ্ধ ব্যবহার। একজন অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে এ প্রকার পরিচিতের ন্যায় সম্ভাষণ আপনার ন্যায় মহিলার উচিত নয়। নাট্যকারের সাহস উল্লেখযোগ্য।

গানেমকে ভালবেসেও নিরুপায় জুলিয়া। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস! তাই বাহারের কাছে সে তার সহিষ্ণুতার কথা বলেছে অকুণ্ঠিতচিত্তে।

জুলিয়া : দেখ ভাই বাহার, দুর্দশায় আমার হাসি এসেছে।

বাহার : হাসি মানুষ চেনে—জায়গা চেনে, তাই এসেছে।

জুলিয়া : আমি আলোক দেখেছি।

বাহার : আলোক যে দুর্দশার গোলাম বিবিসাহেব।

আজিবের মুখ থেকে গানেমের মুখ থেকে এসব দার্শনিক কাব্যমণ্ডিত সংলাপ শুনলে অবাক হতে হয় না—বাচ্ছা বাহারের মুখে অশিক্ষিত অনুচরের মুখে এ ধরনের সংলাপ একটু কেমন বেমানান, বেসুরো শোনায়। শেষ পর্যন্ত নাট্য সমস্যার যথার্থ রূপ দেখা গেল জুলিয়ার আচরণে। সে কালিফের কাছে ফিরে যাবে না। কবরের মানুষ কবরে ফিরে যাবে তাতে ভয় কেন গানেম।

এদিকে তাতার জয়ের যে যশ কালিফের মতে ধর্মতঃ আজিবেরই তাতে সম্পূর্ণ অধিকার। আজিব প্রতিদান নিতে অস্বীকৃত। কিন্তু কি দিলে আজিবের মনিবকে জয় করা যায়? অভিমান, জেদ—একটা সদাগর পুত্রের কাছে কালিফ মাথা হেঁট করবে? তা হতে পারে না। 'কি করে কৃতজ্ঞতা দেখাই।' কালিফের এই মনোভাবই শেষ পর্যন্ত নাটকটিকে মিলনান্ত করেছে—গানেম জুলিয়ার অসম্ভব মিলনকে সম্ভব করেছে—নাটকটিকে স্বাভাবিক পরিণতির দিকে সচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে নিয়ে গেছে। চরিত্র সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কাহিনী বিন্যাসের কাজের সুষ্ঠু সমন্বয় নাটকটিকে সহজ স্বাভাবিক ও সাবলীল করেছে।

তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে কালিফের দীর্ঘ স্বগতোক্তি নাট্যরস ক্ষুণ্ণ করেছে। বিচিত্র সংলাপের মাধ্যমে কালিফ সন্ধান পায় বাহারের মনিবের। বাহারের পরিচয় পাওয়ার পর কালিফের সংলাপ প্রাণবন্ত হয়েছে। 'তোর সেই বেইমানী মনিব কোথায়? বেইমান, তোদের না দেখে বুড়ো উন্মাদ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তোমরা এখানে আমোদ করছ!'

এদিকে ধীরে ধীরে জুলিয়ার মানস বিবর্তন ঘটছিল। সে বিবর্তন গানেমকে গ্রহণ করার অনুকূলে। কিন্তু এরপরেই গানেমের কৃত্রিম সংলাপ—জুলিয়া বন্দনা—যে জুলিয়া কালিফ—গৃহিনী। তাই সংলাপের কৃত্রিমতা অন্যদিকের বিচারে স্বাভাবিক। ধর্মভীরু গানেম যখনই জেনেছে জুলিয়া কালিফের—সেই মুহূর্ত থেকে তার আচরণ অদ্ভুত। 'অন্যকথা কও বিবিসাহেব। আমার পরম সৌভাগ্য তোমার সেবার নিযুক্ত আছি, আমাকে লাঞ্ছিত কর বিবিসাহেব।' সংঘাত তীব্রতর হওয়ার এমন সম্ভাবনা পূর্ণতা পায় নি।

প্রাকৃতিক বর্ণনার চমৎকারিত্বের মাধ্যমে জুলিয়া অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে

অনুচ্চারিত কথা বলতে চায়। কিন্তু গানেমের সামনে যে দুস্তর বাধা। বাধা কালিফ, তার সততা, ধর্মভীরুতা।

জুলিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আস্বাদনের মাধ্যমে বেদৌরা নাটকের প্রভাব কে স্বাগত জানিয়েছেন নাট্যকার। এই রকম রাত্রিকালেই চীনা রাজকুমারী বেদৌরা বাগানের মর্মর বেদীর ওপর বসে সখীদের সঙ্গে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল ......ভাগ্যবতী বেদৌরা স্বপ্নসাগর পার হয়ে প্রাণেশ্বরের পায়ে হৃদয় পুষ্প উপহার দিয়েছিল। তাই অদৃষ্টে স্বপ্ন সত্য হল। কিন্তু আমার কি অদৃষ্ট। সত্য আমার নসীবে স্বপ্ন হবে।'

নাটকীয় প্রবেশের পর কালিফ অবাক। জুলিয়া অপরিচিত যুবকের সম্মুখে। কিন্তু জুলিয়ার ভয়ে নাটকের প্রয়োজনে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। 'আমায় ক্ষমা কর গানেম। রহস্য করছিলুম। খোদার দোহাই, আমি তোমার মহত্বের পরীক্ষা করছিলুম।

প্রেমের নতুন স্বরূপ—আত্মনিবেদনের নতুন তাৎপর্য ফুটে উঠেছে জুলিয়ার অপূর্ব সংলাপের আলোয়।

এই হস্তপদ—এই মাটির দেহ কালিফের সম্পত্তি—আবার কালিফের রাজকোষভুক্ত হবে। কিন্তু গানেম—প্রেমময় গানেম। অভাগিনী আজন্ম দুঃখিনী জুলিয়া স্বেচ্ছাপ্রণোদিতা এই হৃদয়পুষ্প যে তোমার পায়ে অঞ্জলি প্রদান করেছিল। দোহাই গানেম-দয়া কর গানেম, সেটিকে চরণ প্রান্তে আশ্রয় দাও—ফিরিয়ে দিও না। সেটি কালিফের ঘরে ফিরে যাবে না। এ যেন রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার প্রেমতত্ত্ব।

অপরকে হৃদয় দান করে শুধু মাত্র মাটির দেহ কালিফকে উপহার। রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা বিবিসাহেব।......ফুলের সৌন্দর্য শুধু রূপে নয়—গন্ধে। হৃদয়হীনা নারী তার কীট দুষ্ট পলাশ একই পদার্থ। কালিফকে কি তাকেও মাথায় তুলে রাখতে বল সুন্দরী! সংলাপে উচ্ছ্বাস নেই—রাগের আবেশ সংযত—সংহত। কালিফের কাছে এই দেহের প্রলোভন একদিনও কি তার চক্ষে প্রাণহীন দেখাবে না? অমাবস্যার অন্ধকার চপলার হাসিতে কতক্ষণ আলোকিত থাকে সুন্দরী। দয়িতের বিপদাশঙ্কায় জুলিয়ার উদ্বেল হৃদয়ের আকুতি আর একবার প্রমাণ করল সে গানেমকে ভালবাসে।

গানেমের অদ্ভুত সংলাপ একাধারে বিস্ময় ও চমক উদ্রেক করে। যে কথা গোপন করে আসছি—নিজের কাছেও যে কথা বলতে সাহস করিনি, যে কথা আমার সঙ্গে সঙ্গে কবরে আশ্রয় গ্রহণ করত তাই আজ প্রকাশ করি। শুন জুলিয়া কালিফের প্রিয়তমা। তুমিই আমার প্রাণেশ্বরী। জাহাপনা বাঁদী বেইমানী করেছে, শাস্তি চায়।

রাজাদেশ। শাস্তির ব্যবস্থা হবে। এই প্রণয়ীযুগলকে একসঙ্গে সুবর্ণ শৃঙ্খলে

আবদ্ধ করে আমার প্রমোদোদ্যানে—যেখানে এই সুন্দরীর সমাধি মন্দির নির্মিত হয়েছে, সেইখানে নিয়ে যাও। কি ঘটবে তার কৌতূহল সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার। কিন্তু সে কৌতূহল বেশীক্ষণ রাখতে পারেন নি। কালিফের স্বগতোক্তিই তার অকাল সমাধি ঘটিয়েছে।

'কালিফের একটা তুচ্ছ প্রজা গানেম! গানেম, তোমার মত প্রজার অস্তিত্বেই কালিফের গৌরব, কালিফ তোমাকে সেলাম করে।' ব্যাস। কৌতূহলের ইতি এবং অনিবার্য ফলশ্রুতিতে নাট্যরস ক্ষুণ্ণ।

গানেমের সব প্রিয়জনেরই প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হবে—এইরকম প্রায় স্থির বলেই সবাই জানতাম কিন্তু তার জন্যে কি বাহারের একটু ভয় আছে? সাহস ও প্রাণশক্তিতে সে ভরপুর। 'কেন চুপ করবো কেন? একটু বাদে যখন একেবারেই চুপ করতে হবে তখন এমন সাধের কথাগুলো পেটের ভেতর রেখে যাব। আমি মরব আমার সঙ্গে আমার কথাও মরবে কেন?'—এ যেন ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখে রবীন্দ্র সংলাপ।

নাটকটিতে শেষ পর্যন্ত মিলনান্ত নাটকের সব শর্তই পূর্ণ হয়েছে। অবশ্য ক্ষেত্র আগেই প্রস্তুত ছিল। আজিব ও গুলনারের সম্পর্কের নৈকট্য ও মিলন ঠিক অনুক্ত হয়ে না থাকলেও যথোচিত গুরুত্ব লাভ করে নি—নাটকের এ একটা মস্ত ত্রুটী। নাটকে নুরবিহারের পরিণতি অসম্পূর্ণ। সে উপেক্ষিতা। জাঁহাপনা মেহেরবাণী করে হুজুরের মত গানেমের মত 'জুলিয়া লাভ' একটা শান্তি আমায় দিয়ে দাও। কিন্তু নুরবিহার তো মুখ ফুটে কিছু বলল না। 'নুরবিহার' নিরাকাঙ্খারূপিনী, তুই যখন কিছু চাইলি নি, তখন এ মিলনে যত আনন্দ সব তোর।'

॥ দৌলতে দুনিয়া ॥

॥ অন্যত্র সপ্তম প্রতিমা ॥

ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যান্য নাটকের মত এতেও কল্পনার ঐশ্বর্য এবং কাহিনী বিন্যাসের মুন্সিয়ানা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ নাটক চাওয়া না পাওয়া, না চাওয়া পাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই যেন লেখা। মুরাদ পেশমন, মৃত বাহাদুর শার উত্তরাধীকারীরা সবকিছু হারিয়ে পর্ণ কুটিরে বাস করেছে, তবু মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে নি। শেষ পর্যন্ত ফকীরকে আশ্রয় দান করে তাদের অবস্থার রূপান্তর। ফয়জুল্লার অনেক কিছু পেয়েছে যা তার পাওয়া উচিত নয় তবুও তার বিবি জহুরার সঙ্গে তার আলাপের পরিধি বহুদূর বিস্তৃত। পেশমনের ঈর্ষায় তারা কাতর। এ কাহিনীর সঙ্গে আলিবাবা কাহিনীর অনেকটা মিল আছে। আলিবাবার ঐশ্বর্যে কাসিম সাকিনার যে ঈর্ষা, যে মানসিক অবস্থা এ নাটকে অনেকটা সেই অংস্থা সেই উম্মত্ততা আর ঈর্ষার আগুনে ঝলসে যাওয়ার অস্বাভাবিকতা সুন্দরভাবে রূপায়িত। তফাৎ শুধু পরিণতির। এ নাটকে নাট্যকারের সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও সত্যের জয়, ধর্মাচরণের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে নাটকটিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। নাটকটিকে ধর্মীয় প্রচারের মুখপত্র হিসাবে গোপন করতে পারেন নি নাট্যকার।

ক্ষীরোদ নাট্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য শুরু থেকেই গতিবেগ, কৌতূহলকে সদাজাগ্রত রেখে কাহিনীর বিস্তার ঘটানো— ক্ষীরোদ প্রসাদ নাটকের অন্যতম শর্ত হিসাবেই যেন ধরে নিয়েছেন। রোমান্টিক পরিবেশে মেহেরার স্বপ্ন দর্শন দিয়েই নাটকটির সূত্রপাত। এই স্বপ্ন দেখার ঘটনা সমগ্র কাহিনীটিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে; স্বপ্নে মেহেরার সিরাজ শহরে যাওয়ার বাস্তবতা প্রমাণিত হয়েছে মোবারকের সংলাপে। বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়ার পেছনে যে কাহিনীটি আছে তার উল্লেখে নাটকটি রসঘন হয়ে উঠেছে। স্বপ্নে যে ফকিরকে দেখা গেছে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার আবির্ভাব ঘটিয়ে তার আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকাহিনী স্বাভাবিকভাবেই ক্রম পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। স্বপ্নের বাস্তবতা সমর্থিত হয়েছে ফকিরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। সিরাজ শহরে মোবারকের ভাগ্য বিবর্তন, প্রতিশ্রুতি-বিবাহের প্রথম ফল তুলে দিতে হবে ফকিরের হাতে। স্বপ্নের ফকিরের অতর্কিত আবির্ভাব নাটকের প্রত্যাশা পূরণ করেছে। তার সম্বন্ধে ঠিক যখন আলোচনা চলেছে তখনই তার আবির্ভাব ঘটেছে নাট্য-কৌতূহলের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের সূত্রে। এরপর বাহাদুর শার পুত্র মুরাদের দুরবস্থার বিবরণ সব পেয়েও হারানোর পরবর্তী অধ্যায় পর্ণকুটিরে বাস, —জীবনাদর্শের ব্যাখ্যা সত্যাশ্রয়ের সমস্ত ঝুঁকি নেওয়ার প্রতিজ্ঞা। এ পরিস্থিতি

পরিবেশ As you like it এর নির্বাসিত Duke এর দুরাবস্থা অথচ অত্মতৃপ্তি শান্তির সন্ত্বনা ক্ষীরোদ নাট্যের অন্যতম বিশেষত্ব। মাকে নিয়ে পথে নিক্ষিপ্ত, সব কিছু থেকে বঞ্চিত……অতর্কিতে স্বপ্নদর্শন… …সত্য পথ থেকে বিচ্যুত না হওয়ার প্রতিজ্ঞা। স্বপ্নে সুদূর আরব মরুভূমির মধ্যে এক বালিকার সাহায্য প্রার্থনার দৃশ্য : এ নাটকে স্বপ্নের এই বিশেষ ভূমিকা লক্ষণীয়। মুরাদ নিজেই অবাক বিহ্বল। স্বপ্নে আমি মরুভূমি যেতে প্রতিজ্ঞা বন্ধ হলুম। দেখলুম এক সুন্দরী বালিকা। আরব দেশের এক বিশাল মরুভূমির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আমি যে তাকে রক্ষা করতে প্রতিজ্ঞাবন্ধ হয়েছি। জহুরার চরিত্র স্বাভাবিক, ফয়জুল্লার মত সে ও মর্তের মানুষ। ভাইএর বিয়ের কথায় তার মন্তব্য অভিমানব্যাঞ্জক। বিয়ে দেবার ইচ্ছে থাকলে কি এতদিনে তাকে আইবুড়ো করে ফেলে রাখ। অপুত্রক এক নারীর মাতৃ হৃদয়ের আকুতিও দেখানো হয়েছে চরিত্রটিতে। একটা কিছু হল না দেখে মনে করেছিলুম ভাইএর সকাল সকাল বিয়ে দিয়ে তার দুটো একটা সোনার চাঁদ নিয়ে নাড়চাড়া করবো, তা তুমি প্রাণ থাকতে হতে দেবে ?

শেষ পর্যন্ত বাঞ্ছিত পরিণতির দিকে এগিয়েছে নাটক। পেশমন বিবি সর্বহারা। পুত্র অভাব অনটনে দিশেহারা, গৃহত্যাগী। জহুরার ভাই উল্লসিত—পেশমন বিবিকে আমার দেউড়িতে ভিক্ষে করতে দেখবো ?

পেশমন বিবিও নিঃসম্বল। তার নিজের মুখেই শোনা, নুরবক্‌স জোর দিয়ে বলেছে, সত্যি তার কিছু নেই। ফয়জুল্লার জীবনদর্শন লক্ষণীয়। নুরমিয়া পথ দেখ, আমার বাড়ীতে তোমার চাকরি চলবে না। দুনিয়াকে বিশ্বাস করে তুমি আমার চাকরি করবে ? তা হলে তুমি একদিনেই আমায় দেউলে করে দেবে। ফয়জুল্লার সন্দেহপ্রবণ মনের সুন্দর প্রকাশ সত্যের জয়, মিথ্যার ক্ষয়—কেতাবের এই মিথ্যা কথাগুলো কেবল শুনে যাবে, শুনে যাবে। কাজের সময় উল্টো করবে—কাজের সময় মৌলবীরও কথায় বিশ্বাস করবে না। যদি বিশ্বাস করেছ কি সত্যি করেছ ত অমনি মরেছো।

……যাবে উত্তরে বলবে পশ্চিমে, ভাজবে উচ্ছে, বলবে পটোল। নুরবাকসর বিস্ময়ের সংলাপও যথাযথ। 'ওরে বাবারে। কি শালা শয়তানের খপ্পরে পড়েছিলুম রে।'

নাটকে বৈপরীত্য—নীচতার পাশে মহত্ত্বের নিদর্শনও আছে। ফয়জুল্লা পেশমন বিবির চুনির আংটি হাতাতে চায় অথচ নুরবক্‌স তার যৎসামান্য সঞ্চিত দিতে চায়।

ক্ষুধার্ত ফকিরকে তাড়ানোর চেষ্টায় কৃতকার্য হওয়া শেষ পর্যন্ত জহুরার যোগ্য আচরণই হয়েছে। তবে এই বিতাড়নের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল। পেশমন বিবি তার বাড়ীতে তাকে যেতে বলে নিজের কৌশলে আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

পেশমন বিবি নিজেই যেতে পাচ্ছে না, তার ওপর আবার অতিথি। ফকির যে নাছোড়বান্দা, আমি তাই তাড়িয়েছি, আর কেউ হলে পারতো না। পেশমন যত

বলবে আমার নেই, ফকির ততই বিশ্বাস করবে আছে। শেষে দুই উপোষীর লড়াই লেগে যাবে। কাহিনী বিন্যাসে এই ঘটনার গুরুত্ব অত্যধিক অথচ আচরণ চরিত্রানুগ।

নাটকে বহু জায়গায় ছোট ছোট সংলাপে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পচা খাবার গছিয়ে আংটি নেওয়ার ব্যাপারে নুরবক্স যে সভা করেছে—হাস্যরস সৃষ্টির ব্যাপারে তা উল্লেখযোগ্য।

এ রদ্দি মালে এ আংটি বিকোয় না।

তবে রে শালা, চোর।

শেষ পর্যন্ত অনুনয় বিনয়, কাকুতি, তবু আংটি দিতে নুরবক্স নারাজ। শেষে জহরার দীর্ঘশ্বাস আফশোষ। 'মিনসে দুনিয়ার কাউকে বিশ্বাস করবি নি, তা কি হবে? আমার হাতে কখনও কি পয়সা রাখিস?' কৌতুকরস সৃষ্টির প্রয়াস বহুলাংশে সার্থক।

এরপর মোবারকের আবির্ভাব। মিস্ত্রিকে একদিন এক সুন্দর প্রাসাদ তৈরি করে দেওয়ার নির্দেশ। এখানে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের ঘটনার প্রতিফলন লক্ষণীয়।

মুরাদ ও মেহেরার দেখা রাস্তায়। রোমান্টিক দৃশ্য হিসাবে এটি সুনিপুণভাবে গ্রথিত হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু কার্যতঃ তা হয়নি। নাটকে মধুর রস পরিবেশনের সুযোগ নাট্যকার সূচনায় দীর্ঘসংলাপ যোজনায় নষ্ট করে ফেলেছেন। তাছাড়া সংলাপ যতটা স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি—কৃত্রিমতায় ভরা সংলাপ। ফকিরের কষ্টকল্পিত সাজানো ঘটনায় তার কন্যা বেলার আবির্ভাব। এক আসরফী, বিনিময়ে মেহেরাকে বিক্রি করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায় ফকির। যে মানিক মুরাদ বা নুরবক্স কেউ নিতে রাজী নয় বেলা সেই মানিকের বিনিময়ে মেহেরাকে ক্রয় করে নেয়। এইভাবে ঈপ্সিত পরিণতির দিকে নাট্য কাহিনী এগিয়ে চলেছে।

জহিরণেরও ঘরের কোহিনুর চুরি গেছে। সেও স্বপ্নের প্রভাবে। স্বপ্ন—নিষ্ঠুর স্বপ্ন। মোবারকেরও অদৃষ্টে স্বপ্ন জাগরণ সমান হয়ে গেছে।

বাহাদুরশার প্রেতমূর্তির আবির্ভাব পাশ্চাত্ত্য এবং শেকস্‌পীরীয় নাটকের অনুরূপ। কাহিনী বিন্যাসে এর প্রয়োজন ছিল।······'প্রেতমূর্তিতে কুঠারের প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।······আমাকে এ যন্ত্রণাময় অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে একমাত্র তুমি।' এরপর রুদ্ধশ্বাস কৌতূহল—আলিবাবা নাটকের আঙ্গিক। পুত্রের চক্ষের সমুখে ধনাগারের দ্বার উম্মোচন করতে বলল প্রেতমূর্তি, এরপর ধনাগারে বিভিন্ন মূর্তির প্রতীকের মাধ্যমে বাহাদুরশার অতৃপ্ত আত্মার দুরন্ত কামনাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাহাদুরশার অতৃপ্ত আত্মা কিসে তৃপ্ত হবে—

তা জানার মধ্যে মর্মান্তিক চমক সৃষ্টির কৃতিত্ব নাট্যকারের। হৃদয় যার করকমলে তার উপর হৃদয় বিদারক পরীক্ষা চালাবার নির্দেশ দানের মধ্যে পিতৃআদেশ ও দয়িতার প্রতি প্রেমের দুর্বলতা—দুয়ের নাট্যসংঘাত এর সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু প্রিয়ার সন্ধান যদি না পায় মুরাদ ?—এ পুরুষের উপযুক্ত কথা নয়।……পৃথিবী যেমন বিশাল……মানুষের জীবনও তেমনি দীর্ঘ। এই দীর্ঘ জীবনেও কি তার সন্ধান পাবে না ? মর্মান্তিক নির্দেশটি এইরূপ—

পারস্যের প্রান্তদেশে উচ্চশৈল প্রাচীর বেষ্টিত এক হ্রদ আছে। সেই হ্রদ মধ্যে এক অতীন্দ্র দ্বীপ। সেই দ্বীপে একটি গভীর জলময় গহ্বর……গভীর…… গভীর। বিবাহের পরক্ষণই যদি তাকে সেই গহ্বর মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারো—তবেই তোমার পিতার মুক্তি।……যন্ত্রণা……বড় যন্ত্রনা পুত্র—আমাকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি প্রদান কর। বীভৎস রসের অবতারণা করে কৃত্রিম উপায়ে নাট্যসংঘাত এবং সংকট সৃষ্টির উদাহরণও আছে।

পিতা পিতা, নিষ্ঠুর হয়ো না—অন্য উপায় থাকে তো বলে দাও।

মেহেরা—মেহেরা—আর আমাকে দেখা দিও না—স্বপ্নে দেখা দিয়ে উন্মত্ত করেছ—জাগরণে দেখা দিয়ে মরণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়েছ এবার দেখাও নরক। পিতার কাছে আমি প্রতিশ্রুত আমি তোমাকে খুঁজব। কিন্তু তুমি ধরণীর প্রান্তে আত্মগোপন কর—এ হতভাগ্যকে আর দেখা দিও না—নাটকে যাত্রার ঢঙে হলেও এই অংশ সত্যিই হৃদয় বিদারক।

ক্ষীরোদ নাট্যের একটি প্রচলিত রীতি—ফরমুলাও বলা চলে—কোন কোন চরিত্রের ছদ্মবেশ ধারণ (এখানেও সেই শর্তের প্রতি অনুগত্য লক্ষ্য করা যায়)। বেলার সঙ্গে রাস্তায় দেখা গেল বালকবেশে মেহেরাকে। কিন্তু এ ছদ্মবেশের কোন প্রয়োজনই ছিল না নাট্যকাহিনীর দিক দিয়ে। কারণ মুরাদ তাকে দেখেই চিনতে পারল, অথচ ছদ্মবেশের কোন উল্লেখও নেই তার সংলাপে।

প্রত্যাক্ষিত মিলনের প্রাক্‌কালে আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় সে ব্যাকুল।

স্বপ্ন আপনার ও আমার মিলনের ঘটক। আপনি ছাড়া অন্য কাউকে হৃদয় দিতে আমার অধিকার নেই। কিন্তু মিলন যে বড় সাংঘাতিক। এ মিলন বিষময়, তার উত্তরে মেহেরা জানিয়েছে—তা হলে সুধা ও বিষে কি প্রভেদ আমি জানি না। প্রার্থিনীর প্রার্থনা পূর্ণ কর। নুরবক্‌স ভাবল, দুঃখিনী মেহেরার দুঃখের বুঝি অবসান হল। কিন্তু বেলা ঠিকই বুঝতে পেরেছে—যদি জীবনের অবসানে তার দুঃখের অবসান হয়—তা হলে মেহেরার সে সময় এসেছে।

ফকিরকে পেয়ে ফয়জুল্লা ঠিক করতে পারে কি সে চাইবে। তাইতো কি নেব। দুনিয়ার মালিকানী চাইব, ধনদৌলত চাইব। যা চাইব, তাই পাব। ফকীর তাড়া দেয়, কি, আর কতক্ষণ ? সর্বনাশ করলে এ যে কিছুই ঠিক করতে পারছি

না। মানসিক দ্বন্দ্ব কোনটা ছেড়ে কোনটা রাখবে, চমৎকার ফুটেছে নাটকে ফয়জুল্লার মনন বিশ্লেষণে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বাঞ্ছিত আপোষ দুটি ইচ্ছাপূরণের বর এর মাধ্যমে। ইচ্ছা শক্তির অপপ্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাপূরণ গল্পের প্রভাব। খোঁড়াকে দেখে ব্যঙ্গ—তোর কি রে শালা? খোঁড়ার আবার ইচ্ছে। ফয়জুল্লা সুবিধাবাদী। ফকীর তাকে সীমিত ইচ্ছে দিয়েছে, তাই ফকীরকেও সে গাল দিতে ছাড়ে না। 'উঃ শালার ফকীর।' নুরুকে খোসামোদও উপভোগ্য। ধরে তোল ভাই, ধরে তোল নুরুরে, তুই যে আমার দোস্ত। তা জানতুম না।

……এরপর বকাউল্লার পাল্লায় পড়ে তার একটা ইচ্ছে মাঠে মারা গেল। বকাউল্লা বাঘের ভয় দেখাতে ফয়জুল্লার অস্থিরতা নাটকীয় কাহিনী বিন্যাসের সহায়ক হয়েছে।

স্বপ্ন প্রসঙ্গে জেগে স্বপ্ন দেখারও ঘটনার উল্লেখ করেছেন নাট্যকার কৌশলে। পেশমন বিবির রাতারাতি এতবড় অট্টালিকা চোখে দেখেও স্বাভাবিকভাবে স্বপ্ন বলে মনে হয়েছে ঈর্ষান্বিতা জহরার। এই প্রসঙ্গে স্বামী স্ত্রীর কৌতুককর সংলাপ উপভোগ্য।

যদি জেগে থাক, তাহলে আমার কানটা ধরে বার দুই মোয়েম করে নাড়া দাও ত, নইলে শালার ঘুম আজ কিছুতেই চোখ ছাড়তে চাইছে না। আমি এখনও যেন স্বপ্ন দেখছি।

স্বপ্ন আবার কি? শালা স্বপ্ন একেবারে একটা বাড়ী ভাড়া করে চোখের তারায় বসে গেছে। নইলে সন্ধ্যে বেলায় যেখানে ফাঁকা, সকাল বেলায় সেখানে বাড়ী।……পেশমন বিবিটার অট্টালিকায় খুব সুরৎ বাঁদীদের দেখে অবাক হয়েছে ফয়জুল্লা। ফয়জুল্লার বেশভূষায় তাকে বান্দা বলে ধরে নিয়ে বাঁদীরা ঠাট্টা করেছে। কাছে বসে যে ক'গাছি কাঁচা চুল আছে, তুলে দেব। বেলার কাছ থেকে সব ব্যাপারটা জানার চেষ্টায় নাটকীয়তা আছে। বেলা প্রসঙ্গে ফয়জুল্লার আক্ষেপ নাটকে হাস্যরসের উপাদান হয়েছে। আমার চারে মাছ এসে ঘাই মারল, আর সে মাছ একজনের খালি বঁড়শীতে কানকোয় গেঁথে উঠে পড়ল। আফশোষ এককাঁড়ি বাসি পোলাও সকাল বেলায় ভাইবোনে গাঁই গাঁই গিললে তার এক ফোঁটা ফকরে বেটাকে দিলে কি এই সর্বনাশ হয়। হা নসীব। কি করছি। আমাকে দিতে এসে পেশমনকে দিয়ে ফেললি।

বেলার দুষ্টুবুদ্ধি নাটকে যথাযথ কৌতুক রসের যোগান দিয়েছে। শাক খাইয়ে যদি এই দৌলত হয়, তাহলে ফকীরকে পোলাও খাওয়াতে পারলে কত দৌলত পাবে তা কি বুঝতে পেরেছ।

দ্বীপস্থ শহরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার প্রাক্‌কালে মুরাদ মেহেরার সংলাপে আন্তরিকতার চেয়েও আরোপিত ভাবাদর্শের প্রভাব বেশী। মুরাদও প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সেই গহ্বরে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল—ফকীর এসে তাকে নিরস্ত্র করে। দৃশ্যটি বিয়োগান্ত করুণ-রসাত্মক, কিন্তু মনে কারুণ্যের ছাপ রাখতে পারে নি।

লোভী ফয়জুল্লার চরিত্র পূর্ণ বিকশিত। বেলার সামনে বলে—কলজে ভেঙ্গে যদি লুকোতে পারতুম তাহলে এখন তোমাকে কলজের ভেতর পুরে রাখতুম।

নাটকীয় যথাযথ মুহূর্তে জহরার আবির্ভাব ঘটিয়ে নাটকটিকে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা উল্লেখ্য। 'ওগো, তুমি নাকি ইচ্ছে পেয়েছ ?

বোকার ধাপ্পায় পড়ে শেষ ইচ্ছেটা হাতছাড়া হওয়ায় ফয়জুল্লার আপশোষ ক্লাসিক। 'খুন করবো, বোকা শালাকে খুন করবো। আমার দুনিয়া গেল—দৌলত গেল—সব গেল।'

এরপর মুরাদ দেখলে তার পিতার ধনসম্পত্তি। কিন্তু ঐ ঐশ্বর্যের মূল্য দিতে হয়েছে মুরাদকে পিতৃআদেশে। জীবনপ্রতিমার বিনিময়ে মণিময়ী পুত্তলিকা। জীবন ধারার পরিবর্তে জীবনশূন্য শিলা।

শেষাংশে আবার মায়াজালের প্রভাব। মুরাদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তার পুরস্কার ফকীর তাকে শেষ পর্যন্ত দিয়েছে। যুবক সত্যরক্ষা করেছে। 'সত্যের আশ্রয়ে সতী তোমার মুরাদের পার্শ্বে মেহেরা।······তোমার পিতার মুক্তির এই সনন্দ যত্নে হৃদয় পেটিকায় আবদ্ধ কর।' (মেহেরাকে দান)।

নাটকের শেষে ফয়জুল্লার অবিশ্বাস্য আকস্মিক পরিবর্তন—হজরত রক্ষা কর। কেবলমাত্র তোমার করুণা ভিক্ষা করি। এ পরিবর্তন সম্পূর্ণ অনাটকীয়। তাড়াহুড়ো করে কাহিনী গুটিয়ে ফেলার নগ্ন প্রচেষ্টা নাট্যকাহিনীকে শিথিল করেছে। নাটকটির মিলনান্ত পরিণতিও কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়। তবে এ পরিণতি আকস্মিক হলেও অস্বাভাবিক অবাস্তব বলে গণ্য হবে না।

নাটকটিতে বহু চরিত্রের সমাবেশে নিছক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কোন চরিত্রই ঠিকমত প্রধান্য পায় নি। নাট্যকাহিনীর এক মুখীনতা স্পষ্ট হয়নি। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন স্বাদের নাট্যরস পরিবেশনই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাট্য বস্তু রচনার যে পূর্ণ সুযোগ ছিল উদ্দেশ্যের এক মুখীনতার অভাবে তার সদ্ব্যবহার ঘটানো হয়নি।

॥ বেদৌরা ॥

আরব্য উপন্যাসকাহিনীর একটি কাহিনী নাটকটির প্রাণবস্তু। কাহিনীটিকে প্রথম থেকেই কৌতূহলোদ্দীপক করার দিকে নাট্যকারের সজাগ দৃষ্টি ছিল। রূপকথার অবিশ্বাস্য কাহিনীকে বিষয়বস্তু করে নাটকটির অঙ্গীভূত করার ফলে নাট্যকারের ওপর একটি গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। কতকগুলি চরিত্রকে রক্ত মাংসের মানুষে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে নাট্যকারের সচেষ্ট প্রয়াস লক্ষণীয়। উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, নিদারুণ বিপদের মুহূর্তে বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ, অসহায় অবস্থার কিংকর্তব্য বিমূঢ়তা, প্রেম ভক্তি প্রীতি—ঈর্ষা দ্বেষ, চাঞ্চল্য সমস্ত কিছু মানবিক বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে ধৃত। অসম্ভব উদ্ভট কল্পনার রাজ্যে অবাধ বিচরণ করার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকার সচেতন ছিলেন যে মূল চরিত্রটি আসলে মাটির মানুষ। দৈত্য দানব, তাদের অলৌকিক কার্যকলাপের দ্বারা নাট্যকাহিনীর নিয়ন্ত্রণ যেমন অনিবার্য বলে প্রতিভাত হয়েছে, ঠিক তেমনি নাট্যকারের বাস্তব নিষ্ঠা, অলৌকিক কার্যকলাপের পরিপূরক বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের অবতারণা—সমস্ত কিছুর প্রতিই নাট্যকারের সজাগ দৃষ্টি ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাটকে ভৌগোলিক তথ্যের প্রতি আনুগত্য। একদিকে সুদূর চীনদেশ, অন্যদিকে খালেদান রাজত্ব, মাঝখানে নদীপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা। যাতায়াতের পথে এবনি উপদ্বীপ। তিন রাজ্যের রাজা রাজকুমার কিংবা রাজকুমারী নাটকের প্রধান চরিত্র। খালেদান রাজকুমার চীন রাজকুমারী ও এবনি উপদ্বীপের রাজকন্যা নাটকের নায়ক নায়িকা। স্বপ্নে পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ অঙ্গুরী বিনিময় থেকে রাজকুমার ও চীন দেশের রাজকুমারীর সঙ্গে প্রণয়ের সূত্রপাত—এই হল নাটকের উপজীব্য। শেষ পর্যন্ত কাহিনী বিন্যাসের গুণে কল্পনার সমৃদ্ধির ফলে এবনি উপদ্বীপের হয়তান রাজকনা ছদ্মবেশী বেদৌরার (রাজকুমার বেশী) সঙ্গে অদৃষ্টচক্রে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ। নাটকের এই অংশের কাহিনী বিন্যাস চরিত্র চিত্রণ অনবদ্য। বেদৌরার নিরুপায় স্বামীর উদাসীন অভিনয়, অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের আবেদনে নিষিক্ত হয়তানের সব কিছু পাওয়ার মধ্যেও না পাওয়ার নিগূঢ় বেদনা নাটকটির অনেকগুলি মুহূর্তকে জীবন্ত করে তুলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেদৌরার এক অন্তিম মুহূর্তে আত্মপরিচয়দানের দৃশ্যটি সত্যই নাটকে একটি স্মরণীয় নাটকীয় মুহূর্ত বলে গণ্য হবে। আত্মপরিচয়দান অবশ্য কিছুটা আকস্মিক। এছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু আত্মপরিচয়দানের পর হয়তানের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক নয়। তার অশান্ত হৃদয়ের

উদ্বেলতা, আশাভঙ্গের দীর্ঘশ্বাস নাটকে সার্থকভাবে ও সম্যকরূপে রূপায়িত হয় নি। নাট্য প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছায় নি। চরিত্রচিত্রণ ও সংলাপের দিক দিয়ে এই অংশে নাট্যকারের কিছুটা ত্রুটী লক্ষ্য করা যায়।

নাটকটি মিলনান্ত। এটিকে মিলনান্ত নাটকে রূপান্তরিত করার জন্য নাট্যকার সচেতন ও সযত্ন প্রয়াসের মাধ্যমে সুপরিকল্পিত পথে অগ্রসর হয়েছেন।

নাটকে দুটি প্রধান সন্ধি। স্বপ্নে পরস্পরের সাক্ষাৎকার, বিরহপর্ব দুজনেরই উন্মাদাবস্থা, রোগ দূরীকরণের চেষ্টা এবং উন্মাদনা রোগের সূত্র ধরেই পরস্পরের সঙ্গে মিলন, প্রণয় এবং বাঞ্ছিত পরিণতি, বিবাহ, পিতার কাছ থেকে কন্যার অনিবার্য বিচ্ছেদের বেদনা—সবকিছুই নাটকে স্বাভাবিক প্রাণস্পন্দনের মাধ্যমে অনুভূত। এইখানেই নাটকের একটি স্পষ্ট পর্ব বা সন্ধির শেষ।

নূতন নাটকীয় ঘটনা দানা বেঁধে উঠেছে পরবর্তী অধ্যায়ে। মৈমুনি ও কাসকাসের হস্তক্ষেপের ফলে মৈমুনি দানহাসের কাছে মাথা নত করতে রাজী নয়। তার মতে রাজকুমার বেশী সুন্দর। কিন্তু কার্যতঃ তা প্রমান হয় নি। রাজকুমার নিজেই উপযাচক হয়ে রাজকুমারীর দ্বারে উপস্থিত হয়েছে। বাজী জিতে দানহাসের জয় হতে চলেছে। সুতরাং এদের মিলনে বিরহের বেড়া তুলে কৌশলে নতুন করে প্রমান করতে হবে—এরা মনেপ্রাণে এক। তাই চীন রাজার দেওয়া রক্ষা কবচ, তাবিজ আর কোমরবন্ধ (মণিমাণিক্য খচিত) চুরি করে কাসকাসের চিলের ছদ্মবেশ ধারণ করার মাধ্যমে ওদের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। চিলের বেশ ধারণ করে তাবিজ চুরির ঘটনাকে বাস্তব লক্ষণযুক্ত নাটকের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। দানহাসও চিল সেজে সেই তাবিজ উদ্ধার করেছে শেষ পর্যন্ত। তাবিজ ও কোমরবন্ধ খোয়া যাওয়ার পর বেদৌরা কমরলজমানের বিচ্ছেদ পর্ব—চিলের পেছনে অনর্গল ছুটে চলা, বেদৌরার রাজপুত্রের ছদ্মবেশে এবনি দ্বীপে উপস্থিত হওয়া ও রাজার কাছে কমরলজমান বলে তাকে ধরে নেওয়া—কন্যার সঙ্গে বিবাহ দান ঘটনার সমারোহ ও চমৎকারিত্ব নাটকটিকে জমিয়ে তুলেছে।

এ নাটকে গল্পবস্তু এবং নাটকের ফর্মে তার উপস্থাপন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। ক্ষীরোদ প্রসাদের অন্যান্য নাটকে যে অনাবিল হাস্যরসের ফল্গুধারা বইয়ে দেবার প্রবণতা এ নাটকেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপের মাধ্যম ছাড়াও তিনি কিছু কিছু কৌতুককর পরিস্থিতি ও পরিবেশের সুযোগ নিয়েছেন। সংলাপের মাধ্যম ছাড়াও এ্যাকসন এর মাধ্যমে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস তা ঠিক ভাঁড়ামি না হলেও কতকটা তার সগোত্র হয়েছে। এ দোষ নাট্যকারের সব নাটকেই আছে।

চরম মুহূর্তে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে যা অস্বাভাবিক তাও ঘটিয়েছেন নাট্যকার তার স্বভাবসুলভ সরস সংলাপ যোজনার দ্বারা। সুযোগ পেলে এবং সুযোগ না পেয়েও সুযোগ সৃষ্টি করে নাট্যকার রঙ্গ রসিকতার সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়েছেন।

রাজা সাজমান বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লাভ করেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে পুত্র বিবাহে অনিচ্ছুক—রাজার আক্ষেপের এই অংশে মনোবেদনা প্রকাশের ভাষায় সংযম থাকা উচিত ছিল। নাটকে বিশেষ মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে রাজোচিত দৃঢ়তার সূত্র ধরে। রাজপুত্রের জিদ বিয়ে সে করবে না। রাজা সাজামানের নির্দেশ পরবর্তী ঘটনার জাল বিস্তার করার সুযোগ করে দিয়েছে। এই পাপিষ্ঠকে বেঁধে আমার পুরাতন দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ করে রাখ। দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ থাকাকালীন অপ্রাকৃত ঘটনার জাল বিস্তার করা হয়েছে। মৈমুনির চোখে দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ করলজমানের মত অপরূপ সুন্দর পুরুষ পৃথিবীতে নেই। অনুরূপ ধারণা দানহাসেরও—আমি সে মেয়েকে দেখে মনে করেছি যে তার যোগ্য সুন্দরী দুনিয়ায় নেই। নাট্যকাহিনীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এইটাই।

চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়েও কমরলজমান ও বেদৌরা—দুটি চরিত্রে সামঞ্জস্য আছে। রূপের অহংকারে সে বিবাহ করবে না ঠিক করেছে। তাকেও চীনারাজ শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে। তবুও তার তেজ ভাঙ্গে নি।

মৈমুনি ও দানহাসের মধ্যে বাজী—কে বেশী সুন্দর - এই বাজী জেতার নেপথ্য লড়াই থেকেই কাহিনীর বিস্তার সম্ভব হয়েছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য—সুযোগ পেলে ক্ষেত্রাক্ষেত্র বিচার না করে যে কোন পরিস্থিতিতে রঙ্গ রসিকতার অবতারণা করা।

কাসকাস ঃ হুকুম পরীরাণী, এই জিনকে কি ঠেঙাতে হবে ?

দানহাস ঃ অতটা কষ্ট তোমায় করতে হবে না, তুমি কাহিল মানুষ, হাতে কি শেষকালে খিল ধরবে।

কাসকাসের কিছু কিছু সংলাপ হিন্দিতে, আবার কখনও বাংলায়। এই হিসাবে কিছু কিছু অসঙ্গতি চোখে পড়ে।

দানহাস ঃ মুখখানি যেন অষ্টমীর চাঁদ।

কাসকাস ঃ আমি অষ্টমীতে জন্মেছিলুম।

দানহাসের বুদ্ধিমত্তা প্রশংসনীয়। কাসকাসের মোটা বুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে দানহাসের কৌশল অভিনব—'পয়গম্বরের দুসমন, আমি যা ভাল বলবো, শালা তার উলটো বলবেই বলবে।'

এরপর নাটকে চমকপ্রদ রোমান্টিক দৃশ্য পরিকল্পনা। পাশাপাশি দুজনকে শুইয়ে বিস্ময় প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। দুজনের সংলাপের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই দীর্ঘ সংলাপের ক্লান্তি। পরিমিত সংলাপের অভাবে রোমান্স জমে ওঠে নি। কাহিনীর নতুন মোড়—মৈমুনির নির্দেশনা মারফৎ তার নতি না স্বীকার করার ঘটনায়। মেয়েটাকে তার দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। যে যার জন্য বেশী উন্মত্ত হবে তার হার। সাজামান চরিত্রে ব্যক্তিত্বের অভাব—

রাজোচিত দৃঢ়তা নেই। তার মতে যত অনিষ্টের মূল উজীর। তার কথাতেই পুত্রকে বাধ্য হয়ে তিনি কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন।

ভবিষ্যৎবাণীকেও নাটকে ঘটনা নিয়ন্ত্রণের কাজে লাগানো হয়েছে। 'এই বারে শুভ ফল ফলবে।'—উজীরের এই ভবিষ্যৎ বাণী শেষ পর্যন্ত সত্যে পরিণত হয়েছে।

রাজকুমার ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখল সব ভোঁ ভোঁ। এ ঘটনা নাটকের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হাস্যরস পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকার সংলাপের মাধ্যমে চমক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

কমরলজমান—আমার পাশে কে শুয়েছিল দেখেছিলি ?

বান্দা—আজ্ঞে হ্যাঁ জনাব, একটা বেড়াল বাচ্চা শুয়েছিল। সমস্ত রাত আপনার পাশে শুয়েছিলেন, এখন খিদে পেয়েছে, তাই চুপিচুপি ইন্দুর ধরছেন।

স্বভাবসুলভ সংলাপে রসিকতা, তবে পরিমিত নয়, দীর্ঘায়িত। রাজকুমার স্বপ্নে দেখা সুন্দরীর জন্য উন্মাদপ্রায়। উচ্ছ্বাসময় আবেগপ্রধান সংলাপের মাধ্যমে কমরলজমান নিজের আন্তরিক আকুতিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। স্বপ্নের মধ্যেও বাস্তবতার স্পর্শ-আলো আঁধারের রহস্য। কমরলজমান (অঙ্গুরী দেখাইয়া) —একেও তুমি স্বপ্ন বলতে চাও ? স্বপ্নকেও বাস্তব বলে দাবি করেছে রাজপুত্র। তার সংলাপে দেহবাদ ও মানবিক উত্তাপ অনুভূত। স্বপ্নে দেখা রাজকন্যার জন্যে উন্মাদপ্রায় রাজপুত্রের উদ্ভট আচরণ এর মারফৎ কাহিনীর বিস্তার সাধন করা হয়েছে।

চরম মুহূর্তে নাট্যকারের স্বভাবসুলভ হাস্যরস পরিবেশন প্রবণতা লক্ষণীয়।

ধাত্রীর অজ্ঞতার সজ্ঞান অভিনয় প্রধানতঃ সংলাপাশ্রয়ী হাস্যরসের অবতারণা করেছে। ধাত্রী—আজ মেয়েটার খসম্ দেখে কত আমোদ করব, তা না করে কিনা আজ প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর করে প্রাণটা আকুলি বিকুলি করছি। এখন যাতে দিদিমণি আমার শীগগির ভালো হয়, তাই কর। প্রাণেশ্বর বেটে মাথায় দিলে যদি সারে ত তাই দাও। আর ঢক্ করে খাইয়ে দিলে যদি বেমোর আরাম হয়-ত গলা চিরে ঢক্ করে খাইয়েই দাও ? দিদিমণির আমার বুকের ধড়ফড়ানিটে কমে যাক।

সংলাপে দুরন্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার। বেদৌরা পিতার কাছে অসংকোচে বলেছে—যে যুবাকে কাল রাত্রে আমার পাশে শয়ন করতে আদেশ করেছিলেন আমাকে তারই হাতে সমর্পণ করুন। আধুনিক যুবক যুবতীদের মনের নাগাল পাওয়ার প্রসঙ্গে চমৎকার সংলাপ ধাত্রীর মুখে। 'আজকালকার ছেলেমেয়েদের রোগই ওই, খেতে দাও খাবে, শুতে দাও শোবে। কিন্তু মাথায় হাত দাও গরম, গায়ে হাত দাও ফোসকা।'

মার্জমানের কাছে বেদৌরার হাতের আংটির রহস্য উদ্ঘাটন খুব বিজ্ঞানসম্মত উপায়েই ঘটেছে। বাস্তবস্পর্শী চরিত্রানুগ সংলাপের অবতারণা হয়েছে।

মার্জমান—কোথায় দেখেছি কোথায় দেখেছি, হাঁ হয়েছে হয়েছে—যে দেশে এ আংটি হয় সে দেশে আমি গিয়েছি। মনে পড়েছে মনে পড়েছে। খালদান রাজ্যের কারিগর এইরকম আংটি প্রস্তুত করে।' খালেদান এক বৎসরের পথ। তাহলে কি করে অঘটন ঘটল। নাটকে অলৌকিক ঘটনার সমাবেশে নাট্যকার অবাস্তবকে বাস্তবমণ্ডিত করতে চেয়েছেন।

কাহিনীর অন্তরালে মৈমুনী ও দানহাসের এক অদৃশ্য প্রেসটিজ ফাইট্—মর্যাদার লড়াই। বেদৌরা ও কমরলজমানকে নিয়ে বাজী জেতা।

উজীরের চিন্তাধারা 'প্রাক্টিকাল'। সাজাদির পাগলামি সম্বন্ধে কি করণীয়? 'আমার ছেলে হলে এতদিনেও ও রোগ কবে কোন কালে সারিয়ে দিতুম।······ও আপনার রোগ কি আদরে সারে?······আগাপাস্তলা জলবিচ্ছুটি হয়। তাহলে এক লহমায় রোগ ছুটে যায়।' দানহাস মৈমুনীর মতলব জেনে যাওয়ায় নাট্যকাহিনীর রোমান্স নষ্ট হয়েছে। একই দৃশ্যে কমরলজমান এর বিরহ জ্বালায় অভিব্যক্তি নিতান্তই মামুলি ও গতানুগতিক। এ বিরহে হৃদয়ের উত্তাপের স্পর্শ নেই। হাস্যরসসৃষ্টির মাধ্যমে হিসাবে নাট্যকার অতিপ্রাকৃত ঘটনার অবতারণা করেছেন এটা তার প্রায় সব নাটকের বৈশিষ্ট্য। সচেতন কমরলজমান এর প্রহারে—হাকিমের অসহায় অবস্থার বর্ণনায় কৌতুক সৃষ্টি সার্থকতা মণ্ডিত।—'উঃ শালার ছেলে মারের মত মার লাগিয়েছে। এখন উল্টে আমার নাড়ী না ছাড়লে হয়।' এ সংলাপ মানবিক আবেদনসিক্ত অথচ এতে বিশুদ্ধ হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস চিহ্নিত। বান্দার সংলাপও দীনবন্ধু মিত্রের সরস সংলাপের সগোত্র :—ও বাবা চীনে মুলুকে মানুষ আছে, আমি জানতাম চীনে মুলুকে চীনে থাকে আর চীনের মাটি থাকে, মানুষ থাকে তা জানতুম না।

কৌতুককর উদ্ভট সংলাপে মার্জমানের অবদানও অনুল্লেখ্য নয়। ইলবিন ইম্ন, কিলবিন কিম্ন, মসাল্লা ঠিক মিলা। মার্জমানের চীনে ভর হয়েছে। সে এসেছে সাজাদাকে সারাতে, চীনে ভর, তাই বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসাত্মক সংলাপ 'হায়াং হো ইয়াং নি-কিয়াং-কোয় টং-লি ইয়ং।'—হাস্যরস সৃষ্টির জন্য সর্বপ্রকার সযত্ন প্রয়াসের অন্ত নেই। নাট্যকার হাস্যরস সৃষ্টির জন্য সংলাপের মাঝে মাঝে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দির ব্যবহার করে নাটকটি জমিয়ে তুলেছেন। কিন্তু এইসব অংশ কিছুটা লঘু ছন্দে lightmood-এ লেখা—হালকা মানসিকতার ফসল।

তৃতীয় অংকে মার্জমানের বুদ্ধি কৌশল উল্লেখ করার মত। চীন দেশে পেঁছে মার্জমান ও কমরলজমানের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। কিন্তু রাজপুত্র একা উচ্চৈস্বরে যে কৌতুককর সংলাপ পরিবেশন করেছে তা নাটকীয় উৎকণ্ঠার মুহূর্তে লঘু রসিকতার নামান্তর হয়েছে।

বেদৌরাকে আরোগ্য না করাতে পারলে অর্ধেক রাজত্ব লাভের সঙ্গে রাজকন্যাকেও

লাভ করা যাবে না। কমরলজমানের চরিত্রে বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছেন নাট্যকার তার দৃপ্ত সংলাপের মাধ্যমে। 'বিবাহ আমি রাজনন্দিনীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে করতে চাই না।'

বেদৌরা সহানুভূতিশীলা, নিরীহের একের পর এক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় তার অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষ্যণীয়। 'এই সর্বনাশীর জন্য কত হতভাগ্য এই এক বৎসরের ভেতরে প্রাণ বিসর্জন দিলে। এমন করে নিত্য নিত্য নিরীহের হত্যাই বা কেমন করে দেখি।'

বান্দার মুখে যুবকের রূপের ইতিকথা শুনে বেদৌরার হৃদয় আন্দোলিত। তিনি যদি না হন আমার যদি সে স্বপ্নের ধন না হয়, তাহলে কি ঈশ্বর, আবার এক নিরপরাধের মৃত্যুর কারণ হব।

রূপকথার গল্পকে এমন নাটকীয় কাহিনীতে বিবৃত করা কৃতিত্বের পরিচয়।

ঈশ্বরের দয়ায় তিনি যদি এসেই থাকেন তাহলে আমার আংটিতো তিনি দেখাতে পারেন। দূর থেকেই তো তিনি আপনার পরিচয় দিতে পারেন। মানসদ্বন্দ্ব ও সংঘাতের চমৎকার নিদর্শন।

বেদৌরার অলৌকিক আরোগ্য লাভের সংবাদে রাজার আত্মহারা হওয়ার কথা, কিন্তু রাজার কথায় বাক্ সংযমের সুন্দর সংহত নিদর্শন।—'শীঘ্র এ যুবার বন্ধন মোচন করে দাও।'

রাজা কন্যা জামাতাকে রাজ্যের সীমানা পার করে দিতে—বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এগিয়ে এসেছেন। তার নিরুত্তাপ দীর্ঘ সংলাপে একটি গুণ বর্তমান—সেটি পথ বর্ণনায় বাস্তবতার প্রতি আনুগত্য।

রূপকথার বিষয়বস্তু হলেও নাটকের গতি অব্যাহত রয়েছে। কাসকাস চিল হয়ে কমরলজমানের তাবিজ ছোঁ মেরে নিয়েছে। উদ্ভট কল্পনার মিশ্রনে হাস্যরসের বৈচিত্র্য সাধনের প্রচেষ্টা বহুলাংশে সার্থক হয়েছে।

মৈমুনি—দেখিস যেন না খাইয়ে মেরে ফেলিস নি।

কাসকাস—ভয় নেই, ভয় নেই, পথে পথে খোরাক ছড়িয়ে রাখব।

উচ্ছে গাছে বোম্বাই আম ঝুলিয়ে দেব।—ঘুঘুর ডিমে দুম্বো ভেড়ার বাচ্ছা—খাক্‌না, খাক্‌না কত খাবে।

ক্ষীরোদনাট্যে কৌতুক পরিস্থিতি সৃষ্টির একটি উপাদান—একজনকে অন্যজন বলে ভুলকরা। বান্দা মার্জমানকে দেখে ভাবলে সে সাজাদাকে পেয়ে গেছে। 'ওই সাজাদা, আলবৎ সাজাদা, নইলে এত রাত্রে এ পথে আর কে আসবে? ঠিক হয়েছে—ইয়া আল্লা।' আর একটি বৈশিষ্ট্য নিদারুণ মুহূর্তেও রসিকতার উদ্দাম বন্যা খুলে দেওয়া—এ নাটকেও উপস্থিত।

সাজাদা সাজাদীর সন্ধানে মার্জমান চিন্তান্বিত তার মধ্যেও তার সংলাপ

রসসিক্ত।—'এমন চাঁদনী রাত, কিন্তু চাঁদমণি আমার কোথায় মুখ লুকিয়ে বসে আছেন? সুমুখে এমন একটা জলা, তাতে চাঁদ পড়ে কোথায় কিলবিল করবে, না সব যেন মলিন—যেন একটা নিঝুমের পালা।—বান্দার সঙ্গে রসিকতায় মার্জমান মুখর, অনুপাতে সংলাপও অনবদ্য। কমরলজমানের মুখে মাঝে মাঝে দীর্ঘ সংলাপও বিসদৃশ—নাট্যরস বিরোধী—অবশ্য সে দৃষ্টান্ত বিরল (পৃঃ ৩৮)। সঙ্গীত রসিক এবং শিল্পী এক পথিকের সঙ্গে তার কথোপকথন উপভোগ্য।

কমরলজমান—পথ আবার কতটা হারিয়েছ কি?

পথিক—বলি সবটা, না খানিকটে—না মাঝামাঝি?

তে তে দে দে খেড়ে নাক্।

পথ হারানো প্রসঙ্গে—'তা থাকলেই হারায়। না থাকলে হারাবে কি? আমার বাপের পয়সা ছিল, আমি হারিয়েছি, তোমার বাপের পথ ছিল তুমি হারিয়েছো।'—চমৎকার নিরাসক্ত দর্শন।

শেষ পর্যন্ত বেদৌরাকেই কমরলজমান বলে ধরে নিয়েছে দূত। এইখান থেকেই কাহিনীর নববিন্যাস। অবশ্য বেদৌরা তার পুরুষ বেশধারণ সম্বন্ধে যে কথা বলেছে তা নাটকে বাহুল্য বা অতিভাষণ বলে ধরে নেওয়া যায়। নাটকে নূতন সমস্যার সূত্রপাত করেছে অম্নানস তার কন্যার জন্য কমরলজমানকে পাত্র হিসাবে নির্বাচন করে।'

আমাকে বিয়ে করতে হবে নাকি? তা হলে ত মুস্কিলের ওপর মুস্কিল।

বিবাহ করতে হবে?

পছন্দ না হয় করবে কেন?

রবীন্দ্রনাথের শেষরক্ষা ও চিরকুমার সভা নাটকের অনুরূপ ঘটনা।

মূল সমস্যা হায়তানের। এমন রূপবান স্বামী পেয়ে হা ঈশ্বর। এ আমার কি করলে; রত্ন দিলে কিন্তু সে রত্ন ব্যবহার করতে অধিকার দিলে না; মণি আমার কাঁচের সিন্দুকেই পোরা রইল। শুধু দৃষ্টি সুখ। হাতে করে নাড়তে চাড়তে পেলুম না। খোদা, এই কি আমার বিবাহের পরিণাম। বেদৌরা পুরুষবেশী মেয়ে। সুতরাং নবপরিণীতা হায়তনের মানসিক বেদনা স্বাভাবিক।

বেদৌরার জীবনদর্শন সংলাপের মাধ্যমে সৌন্দর্যানুভূতি সৃষ্টি করেছে। প্রিয়জনের কাছে দুঃখের কথাই সুখ। বেদৌরার আত্ম পরিচয়দানের চরম মুহূর্তটিও নাটকীয় সৌন্দর্যের স্বাভাবিক পথেই উদ্ভাসিত।

হায়তান: আজ তোমায় আমি অন্যঘরে যেতে দিচ্ছি না। ঈশ্বরের আরাধনা করতে চাও আমার সুমুখে কর।

বেদৌরা: আজ তাহলে ত দেখছি বিষম বিপদ।...

কতদিন আমি এ বালিকার কাছে আত্মগোপন করে থাকবো। হা প্রাণেশ্বরি! তুমি কি তবে আমাকে প্রতারকই স্থির করলে।

সংকটের রূপ সুন্দরভাবে প্রতিভাত; এ ছাড়া নিদারুণ সংকটের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অন্তর্দ্বন্দ্বের ও সংঘাতের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট।

বেদৌরা—উভয় সংকট; এখন যদি আত্মপ্রকাশ না করি ত বড়ই লজ্জার কথা।

কিন্তু আত্মপরিচয়দানের পর হায়তানের মধ্যে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কই? হায়তান তার দুঃখের কথা শুনে শুধুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করেছে কিন্তু সে দুঃখ প্রকাশও কৃত্রিম। এর পর আরব্য উপন্যাসের গল্পের মুড।—'যেমনকরে পারি তার কাছ থেকে তাবিজ কেড়ে নিতেই হবে। দানহাসের এই ঘোষণার সূত্র ধরে নাটকের ইপ্সিত পরিণতির দিকে কাহিনী এগিয়ে চলেছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত হায়তানের আশাভঙ্গের বেদনা তার সংলাপে মূর্ত করে তোলার কথা মনে পড়েছে নাট্যকারের।

এরপর চোর বলে ধৃত কমরলজমানকে অম্নানস ও সাজাদার কাছে আনার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছুর রহস্যের যবনিকার পতন ঘটেছে।

কাহিনীর জটিলতার শান্তিপূর্ণ সমাধান বেদৌরার সংলাপে। একটি ছিলুম দুটি হয়েছি। অগ্রে আমার এই ভগিনীটিকে গ্রহণ কর। কোরাণ ছুঁয়ে আমি এই বালিকাকে আমার সর্বস্ব সমর্পন করেছি।

দুনিয়ায় তোমার যা আপনার, আমারও তা। আমি তোমার দেওয়া উপহার সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করলুম।

সাজাদা—আমি এক কন্যা খুঁজতে এসে দুই কন্যাকে পেয়েছি।

নাটকটি মিলনান্ত। অসম্ভব, উদ্ভট কল্পনার মিশ্রণে নাটকটিতে রূপকথার মুড্‌কে নাট্যকার বিলীন হতে দেন নি। কাহিনীপ্রধান নাটকটিতে গল্পবস্তু যথাযথ প্রাধান্য পেয়েছে—নাট্যাবেগ বা প্রতিক্রিয়া ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সম্ভব—তার বেশী প্রত্যাশিত পর্যায়ের ওপর ওঠে নি। যাদের অদৃশ্য পরিচালনায় নাটকটির কাহিনী গ্রথিত সেই দানহাস ও মৈমুনির সমাপ্তি সঙ্গীত মিলনান্ত নাটকের মুড্‌কে আরও সহজ, সাবলীল ও সুন্দর করে তুলেছে।

॥ রক্ষ ও রমণী ॥

নাটকটি বহুলাংশে রঙ্গাত্মক। কাহিনীর বাস্তবতা খুঁজতে যাওয়া বৃথা। তবে কাহিনীকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে নাটকীয় পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অন্যান্য নাটকের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এতেও প্রস্তাবনাপর্বে গান। গানের বক্তব্য নাটকে প্রতিফলিত। ফুল ফোটাতে হলে যথাযোগ্য কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজনকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

নাটকটি কাহিনী প্রধান। এতে উদ্ভট রসের প্রাধান্য বেশী। কোন গুরুতর তত্ত্বকথা বা উৎকট নীতিপ্রচারের দোষে দুষ্ট না হলেও এ নাটক সে ব্যাপারে ঠিক নির্দোষ নয়। কোন কার্য করলে তার জন্যে দণ্ডলাভ করতে হয়, শাপভ্রষ্ট হতে হয় এবং শাপমোচনও হয় মিলনান্ত পরিণতির মধ্যে। নাট্যসংঘাতের সুযোগ বা বৃত্তগঠনের সুযোগ নাটকে খুবই কম। রঙ্গরস পরিবেশনের সুবাদে কোন কোন দৃশ্য খণ্ডিতভাবে উপভোগ্য হয়েছে মাত্র।

এ নাটকে হাস্যরস স্বতঃউৎসারিত। রোমান্স স্বাভাবিকভাবেই নাট্যকাহিনীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কৌতুক পরিস্থিতির অবতারণা করে নাট্যকার কিছু মজাদার সংলাপের সুযোগ নিতে পেরেছেন। অবশ্য এটি মিলনান্ত অল্পাবিস্তার প্রায় সব নাটকেই নাট্যকারের বৈশিষ্ট্য। কাহিনী গ্রন্থনে ছদ্মবেশের দিকে ক্ষীরোদ প্রসাদের একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষণীয়। (ছদ্মবেশে এই বনদেশে ষোল বছর বাস করেছি—কেশবের এই উক্তি তার প্রমাণ)।

ত্র্যম্বককে ডেকেছে কেশব। ষোল বৎসর পর আবার তার ধনপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। সুরাট বন্দরের এক সময়কার শ্রেষ্ঠী ছদ্মবেশী স্বয়ং কেশবদাস। মালদ্বীপে এখনই যাওয়া দরকার। হৃত জাহাজ পণ্য সমেত উদ্ধার হয়েছে। এ যুগের দারিদ্র্যে অভ্যস্থ মেয়েও দারিদ্র্যের মধ্যে দীক্ষিত। এখন আবার নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সূচনায় যথেষ্ট নাটকীয় সম্ভাবনার অবকাশ ছিল। কিন্তু সে সম্ভাবনা কি সত্যিকারের প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছে? কেশবদাস ভেবেছিল তার ভোগ লালসার প্রবৃত্তি এক যুগের অনাহারে নির্বাপিত। কিন্তু তাই কি?

আজীবন দরিদ্র্যের সংজ্ঞায় পরিচিতা কন্যা সর্বাণী ঐশ্বর্যের কথায় বিস্মিতা। সর্বাণীর সারল্য, অনভিজ্ঞতা নাটকের কাহিনী গ্রন্থনে অন্যতম পাথেয়। কেশব ধন সম্পত্তি আনতে গেলে তার অনুপস্থিতি সর্বাণী কেমন করে সহ্য করবে? কাহিনীর সূচনায় এই চমক কাহিনীর পরিধি বিস্তৃত করেছে।

পিতা বিদেশ যাওয়ার প্রাক্‌কালে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করতে ভোলেন নি, তিনি তার জন্যে কি আনবেন। সর্বাণীর প্রার্থনা অকিঞ্চিৎকর একটি প্রফুল্ল পদ্মফুল। কিন্তু প্রফুল্ল পদ্মফুল সংগ্রহের ব্যাপারটাই কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অনেকদূর। নাটকে এই ঘটনার সূত্রটিকে Key-point বলা চলে। গুরুর কাছে গচ্ছিত রেখে যাচ্ছে কন্যাকে, সুতরাং কেশবদাস নিশ্চিন্ত। এর মধ্যেও যেন কোন ইঙ্গিত রয়েছে। এইভাবে কৌতূহল জাগিয়ে রাখার নাট্যশর্ত পূরণ করেছেন নাট্যকার।

একটি দৃশ্যের মাধ্যমে যোগানন্দ সর্বাণীকে ভয় দেখিয়ে তার অভিজ্ঞতার পরিধি বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করেছেন। সর্বাণীর ভীতি মনস্তাত্ত্বিক ও সম্পূর্ণ সঙ্গত। সর্বাণীকে সুপরিকল্পিত ভাবে ভীতি প্রদর্শনের ব্যবস্থা নাটকের পক্ষে কতটা প্রয়োজনীয় বলা কঠিন। আপাতদৃষ্টিতে মোটেই প্রয়োজনীয় নয়। তবে মহেশ্বরীর আশ্রয় পাওয়ার জন্যে হয়তো এর প্রয়োজন ছিল। কাহিনী গ্রন্থনে এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিন্তু যোগানন্দের ধারণা স্বচ্ছ। 'আত্মরক্ষায় সমর্থ করে তোলার জন্যে তাকে শক্ত করে তুলতে হবে।'

এ নাটকে ঠিক প্রথম দর্শন জাত প্রেমের ব্যাপারটা প্রাধান্য পায় নি। যোগানন্দ এমন ব্যবস্থা করতে চায় যার ফলে সর্বাণীর হৃদয়ে সহজে প্রেমের উদ্রেক না হয়। সর্বদা তার ওপর সতর্ক প্রহরীর কার্য করতে হবে। দেখো, যেন কোন যুবক তার আশ্রমে না প্রবেশ করতে পায়। এখান থেকেই রোমান্টিক পরিবেশের উপস্থাপন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—ঠিক এ কথাগুলি বলার পরই নাটকের নায়ক রাজকুমার শৈলেশ্বরের আবির্ভাব ঘটেছে। শৈলেশ্বর তৃষ্ণার্ত—তার এই তৃষ্ণাকেই নাট্য কাহিনীর প্রাণবিন্দু করা হয়েছে। ফলতঃ কাহিনী একান্তভাবে বাহিরের ঘটনা নির্ভর হয়ে গেছে, অন্তর্মুখীন হতে পারেনি।

অহংবোধ হঠাৎ জাগ্রত হয়ে ওঠায় অতিথি অবজ্ঞায় বিক্ষুব্ধ শৈলেশ্বর যে কাণ্ড করে বসেছে তা কষ্ট কল্পিত নাট্য কাহিনীর অন্যতম প্রাণবিন্দু হয়ে উঠলেও অতি নাটকীয়তার দোষ মুক্ত হতে পারে নি। 'তবে রে হৃদয়হীনা পিশাচী' বলে পশ্চাৎ থেকে সর্বাণীর কেশ আকর্ষণ, তাকে হত্যার জন্যে অস্ত্র উত্তোলন এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মানুশোচনার প্রকাশ 'এ আমি কি করলুম'—সব কিছুই অতি নাটকীয়তার লক্ষণাত্মক।

এরপরই প্রায়শ্চিত্ত পর্বের মাধ্যমে নাট্যকাহিনীকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনীর ধাঁচে যোগানন্দের শাপ প্রদানে শৈলশ্বর ও তার আশ্রিত সবাই রাক্ষসে পরিণত হয়ে যায়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত মুক্তির উপায়ও বলা হয়েছে আর সেটাই নাটকীয় পরিণতির ইঙ্গিত। নাট্য কাহিনীর ক্রমপর্যায়ে এইভাবে নাটক জমিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন নাট্যকার।

সর্বাণী তার জন্যে আনীত একটি ফুলের জন্য পিতার চক্ষু উৎপাটিত হওয়ার দণ্ড হবে এটা সহ্য করতে পারে নি। সে দেখতে চায় কে সে উদ্যানস্বামী যার এত নিষ্ঠুর আদেশ। কাহিনী গ্রন্থনে মুন্সিয়ানা নাটকে বাঞ্ছিত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

নাটকটিতে বাইরের ঘটনার প্রাধান্য থাকলেও নাটকটিকে শুধু বাইরের ঘটনাশ্রয়ী নাটক বলা চলে না। নাটকে মনস্তত্ত্বের সুন্দর প্রয়োগেরও কিছু কিছু নমুনা দুর্লভ নয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্যে অভিভূত সর্বাণী। কিন্তু কেশবদাসের কাছে তার অন্য ব্যাখ্যা।—আমি দেখেছি সকলে যেন আমার চক্ষু দুটি অপহরণ করবার জন্যে ছটফট করছে-হাত বাড়াচ্ছে। ভগবান তাদের নিশ্চল করেছেন বলে চলে আসতে পারছি না।

শেষ পর্যন্ত সর্বাণী কমল অপহরণের ইতিবৃত্ত বলে নিজেকে এর জন্যে দায়ী করেছে এবং এর জন্য প্রাণদণ্ড কেশবদাসের আপত্তি সত্বেও গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। মোটামুটিভাবে কাহিনীকে সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে পরিকল্পিত পরিণতির দিকে টেনে আনা হয়েছে।

বন্দিনী সর্বাণীর প্রতি সদয় আচরণের সূত্র ধরে শৈলেশ্বরের মনে প্রেমের উন্মেষ এবং শেষ পর্যন্ত বিবাহের প্রস্তাব। নাটকে সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা চুরমার হয়ে গেছে কাহিনী বিন্যাসের বেপরোয়া খেয়ালখুশীতে। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মহিমায় যেমন অলৌকিক ব্যাপার ঘটে এখানেও শৈলেশ্বরের আদেশে তার অনুচরেরা পিতৃদর্শনে আকুল সর্বাণীকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে।

কেশবদাসের মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তে সর্বাণীর প্রবেশ নাটকীয়। নাটকটিকে মিলনান্ত করার প্রচেষ্টায় নাট্যকার এইভাবে ধাপে ধাপে এগিয়েছেন।

যমুনা তবু ত্র্যম্বকের প্রেম অর্জন করেছে, কিন্তু শৈলেশ্বর কি সর্বাণীর দয়া বা প্রেম অর্জন করতে পেরেছে? শৈলেশ্বর মৃত্যু শয্যায়। তার ওষুধ জানে সর্বাণী। কিন্তু কি সে ওষুধ? শৈলেশ্বরের বুক ফাটে, মুখ ফোটে না। মৃত্যু যন্ত্রণার চেয়ে বলার যন্ত্রণা আরও কঠিন। কৌতূহলকে জাগিয়ে রাখা এবং কমিডি নাটকের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা দুই কাজই একসঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে।

নাট্যকার প্রচ্ছন্নভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন অদৃষ্টের অমোঘ নির্দেশ যেন কাহিনীর নিয়ন্তা। ঘটনার ঘনঘটা মূল বক্তব্যকে কোন সময়েই স্পষ্ট হতে দেয় নি। প্রারম্ভে ফুল ফোটাতে হলে যথাযোগ্য কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন নাট্যকার সে কথা জানিয়ে অবশ্য মূল বক্তব্য পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। পাপকার্যের দণ্ড ভোগ করতে প্রস্তুত থাকা উচিত, নাটকে এ বক্তব্য স্পষ্ট। নীতি গল্প এবং রূপ কথার নাটকীয় রূপ বলে ধরলে নাটকটির মিলনান্ত মধুর রসগ্রহণে খুব একটা অসুবিধার কথা মনে হবে না।

নাট্যকারের আর একটি মূল্যবান বক্তব্য-নাটকটির সাহিত্যরস বিস্তারের সহায়ক হয়েছে। 'সুন্দরের সংজ্ঞা সে কি শুধু দৈহিক সৌন্দর্যের সীমানার মধ্যে?'— রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার কথা মনে করিয়ে দেয়—ঐ ছোট্ট সংলাপটি। এখানে নাট্যকার স্পষ্টতঃ দার্শনিক। প্রেমতত্ত্বের সার্থক প্রয়োগ ও পরীক্ষায় নাট্যকার বহুলাংশে সফল। 'যদি জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর থাকে সে তুমি। যদি জগতে দেবতা নামে কেউ পূজার পাত্র থাকে সে তুমি। যদি এ হৃদয় পুষ্প অঞ্জলি দিতে হয় ইষ্টদেব তুমি ভিন্ন আর কাউকেই তা দিতে পারি না।'

যথারীতি নায়িকার বাঞ্ছিত আত্মসমর্পণে এ নাটক ক্ষীরোদ কমিডি নাটকের বৈশিষ্ট্যে নির্দিষ্ট স্থান করে নিয়েছে।

নাটকে অন্যান্য ক্ষীরোদনাট্যের মত কিছু কিছু ভাবসমৃদ্ধ সংলাপ চোখে পড়ে। কেশবদাসের উক্তি—'আবার আমার ঐশ্বর্য ভোগের ইচ্ছা-কন্যাকে রাজনন্দিনী দেখার সাধ'—নিঃসন্দেহে ভাবসমৃদ্ধ সংলাপ। সমুদ্রতীরে আশ্রয় খুঁজছে ত্র্যম্বক। সেই প্রসঙ্গে কেশবদাসের সঙ্গে কথোপকথন যদিও অপরিচিত পরিবেশানুগ কথাবার্তা-তবুও এই অংশে সংলাপ অনাবশ্যক দীর্ঘ। সংলাপের মাধ্যমে রোমাণ্টিক ভাব পরিবেশনের প্রচেষ্টাও প্রচ্ছন্ন নয়—প্রত্যক্ষ। ক্ষুধার্ত ত্র্যম্বককে ফল দিয়ে গেল যমুনা। Fantasy-র নমুনা। 'ও বাবা ক্ষিদে এলোই বা কোথা থেকে গেলই বা কিসে? চতুর্দিকে আহারের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। শুধু আহার নয় তার সঙ্গে তামাকু সেবন।'

ত্র্যম্বক রাক্ষসীর কবল থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছে। বর্ণনার চমৎকারিত্ব উল্লেখ্য। 'পেগুর টাট্টুর মতন পা চালিয়েছি রাক্ষসীর ক্ষমতা কি সে আমার সঙ্গে ছোটে। হাজার হোক জাতটা অবলা ত।' যমুনার আগমনে রগড় আরো জমে ওঠে।

যমুনা—প্রাণেশ্বর চোখ বুজে বসলে যে!

ত্র্যম্বক—আমি জপ কচ্ছি।

কিন্তু ত্র্যম্বকের বিরুদ্ধে অভিযোগ-ভালবাসা কি তার প্রাণে নেই একটুও?

ত্র্যম্বক শেষ পর্যন্ত অনেক খুঁজে বলে, সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু সেটুকু সব মুখে, প্রাণে নেই।

রসিকতা, রগড় তুঙ্গে ওঠে সংলাপের মাধ্যমে।

যমুনা—প্রাণেশ্বর, অধীনীর প্রতি এত নিদয় হয়ো না।

ত্র্যম্বক—প্রাণেশ্বরী, অধীনের প্রতি এত সদয় হয়ো না।

ত্র্যম্বক যমুনার পতিত্ব এড়িয়ে যেতে চায়, তাই বলে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণও হতেই পারে না। তবে স্ত্রী বলেই ত্যাগ করতে বল ত কতকটা রাজী রাছি। কিন্তু নাটকের Climax-যেমনি যমুনা আবরণ খুলেছে এবং ত্র্যম্বক বাইরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছে- ত্র্যম্বক দেখে অবাক—'এ যমুনা তো রাক্ষস নয়।' যমুনার সংলাপ

রসসৃষ্টিতে সার্থকতা লাভ করেছে।—'এখন আবার প্রাণেশ্বরী কেন ?—পালাচ্ছিলে না ?' এখানে আলিবাবা নাটকের আবদাল্লা মরজিনার সংলাপ স্মরণীয়।

শৈলেশ্বর নীতিহীন নয়, পরের ধন দেখে লোভ সংবরণ করতে না পেরে যে গ্রহণ করে আমরা তার চোখ তুলে নিই। নীতির দিক দিয়ে সংলাপ সহজবোধ্য ভাষায় ধারালো বলা চলে।

শেষ পর্যায়ে মহেশ্বরীর সংলাপ হঠাৎ যেন বেসুরো। এই করুণায় সংসারের শোভা-শান্তির অস্তিত্ব। জীব করুণা কর-করুণা কর—।

শৈলেশ্বর যমুনার বাঞ্ছিত মিলনে নাটকটি কমেডি নাটকের পরিণতি লাভ করেছে। শেষদিকে এ্যম্বক ও যমুনার হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস কমিডির ভাব মণ্ডলে অনুকূল হাওয়া বইয়ে দিয়েছে।

যমুনা—বাঁদর যদি প্রেমের পাকে মানুষ হয়, তখন এ তামাসা দেখতে কমলমণি জল ছেড়ে কি ডেঙ্গায় আসতে পারে না ?

এ্যম্বক—রাক্ষসি, আমায় ভোজন করবি ?

যমুনা—বললেই হয়, মশলা আঁচলে বাধা।

এই অংশে হাস্যরসসৃষ্টি এবং কমেডির পরিমণ্ডল রচনাই যে নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

সমাপ্তি সঙ্গীতের মাধ্যমে নাটকের পরিসমাপ্তির কৌশল নাট্যকার প্রায় সব নাটকেই নিয়েছেন। এটিও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রস্তাবনা পর্বে গানও অন্যান্য নাটকের মত মামুলি। তবে গান এ নাটকে একটি বিশেষ ভূমিকা নিতে পেরেছে। নাটকটির আয়তনের তুলনায় গানের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়।

নাটকে মোট গান চৌদ্দটি। ক্ষুদ্রায়তন নাটকটিতে চৌদ্দটি গান দেখে মনে হয় এটি গীতি বহুল রঙ্গনাট্যের পর্যায়ভুক্ত কিন্তু এ নাটকে গান অপরিহার্য অঙ্গ নয়। কাহিনীর পরিচ্ছন্ন নিপুণ গ্রন্থনে নাট্যকার সমস্ত আকর্ষণ কেন্দ্রভূত করতে চেয়েছেন ঘটনা ও কয়েকটি চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর। কয়েকস্থানে গান অপরিহার্য-অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাহুল্য। তবে গানগুলি ভাবোপযোগী-প্রতি দৃশ্যের ঘটনার অনুগামী। ভাববিস্তারের দিক দিয়ে গানগুলির সার্থকতাও অনস্বীকার্য।

॥ বাসন্তী ॥

মোট গানের সংখ্যা এগারটি। প্রস্তাবনাবাদে দৃশ্য সংখ্যা আটটি—একই অংকের মধ্যে সীমিত।

প্রস্তাবনাদৃশ্যে মানবচরিত্রের বিচিত্র বিশ্লেষণ-'চিরদিনই মানুষ কষ্ট পায়-স্বভাবের দোষে কষ্ট পায়। দেবতারা শত চেষ্টা করলেও মানুষের দুঃখ দূর করতে পারবে না।'

ভাব ব্যঞ্জনায় ভাষার মনোহারিত্বে রোমাণ্টিক পরিবেশ সৃষ্টিতে নাট্যকারের সযত্ন প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। স্বর্গের রাণীর ইচ্ছায় চিত্রলেখা চলল মানুষের চোখের ওপর মনের মত ছবি আঁকতে।—মানুষের দুঃখের ওপর সুখের সাময়িক পর্দা টানতে। এরপর কাহিনীর বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রিত হয়েছে চিত্রলেখা এবং অপ্সরা নায়ক পুষ্পরথের কার্যকলাপের দ্বারা। অবশ্য সে কার্যকলাপ প্রকাশ্যে হলেও তাদের ছদ্মবেশ ধারণের মাধ্যমে। ছদ্মবেশ কাহিনী গ্রন্থনে এ নাটকেও স্থান পেয়েছে।

পুষ্পরথ চিত্রলেখার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ—'এ ভুবনমোহন রূপ নিয়ে কোথায় চলেছ সই? নীলাম্বরে নববিকসিত কৌমুদীর পাড় দিয়ে কুন্তলে অঞ্চলে তারকা গেঁথে নব-কাদম্বিনীর বেণী দুলিয়ে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত অধীর সমীরণে ভর দিয়ে আমাকে ফেলে কোথায় চলেছ সই?'

ছোট বারিবিন্দু একত্রে গেঁথে তুষার রেখায় পরিণত করে একটি বাণ তৈরি করেছিল পুষ্পরথ। কিন্তু কাকে বেঁধবার জন্যে? চিত্রলেখার আকুল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে পুষ্পরথ—'যে আমাকে সৃষ্টির আরম্ভ থেকে বিঁধে আসছে—তাকে বেঁধবার জন্যে?—যে রহস্য করে কথা কইতে কোমল ভ্রূভঙ্গে এখনও আমার হৃদয় বিদ্ধ করছে।'—এ কথোপকথন শান্ত মধুর রস সৃষ্টি করেছে।

পুষ্পরথের নিক্ষিপ্ত বাণ চিত্রলেখার কাছে না পৌঁছানোর কারণ কি? পুষ্পরথ সহজ অথচ কাব্যিক ভাষায় উত্তর দিয়েছে পরের হৃদয় আঁকতে গিয়ে তুমি নিজের হৃদয় হারিয়ে ফেলেছ।—সঙ্গত অনুযোগ। কিন্তু ভাষার স্নিগ্ধতায় এ অনুযোগ সহজেই প্রেমাস্পদের হৃদয় জয় করেছে। ভূমিকার পর মূল নাট্যকাহিনী শুরু হয়েছে। মাতৃহীনা দরিদ্র বালিকা পরমাসুন্দরী। অর্থাভাবে বাপ তার মেয়েকে সৎপাত্রে দিতে পারছে না। আবার বিপুল বিত্তবান—'বৃদ্ধ বয়েসে স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে—ছেলে মেয়ে পৌত্তর দৌহিত্তুরে ঘর বোঝাই ঃ—সে আবার বিবাহ করবার জন্যে পাগল হয়েছে।'—কাহিনীর এই মাল মশলা ও বিষয়বস্তু থেকেই চিত্রলেখার ছবি আঁকবার জিনিষ মিলেছে। বস্তুত সমগ্র কাহিনীটিও এই বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে।

পুষ্পরথ পৃথিবীর মাটিতে পদার্পণ করেছে। তার অভিজ্ঞতার দর্পণে মানব চরিত্রের স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে সার্থক নাটকীয় সংলাপের মাধ্যমে। 'সমস্ত ধরণীর ভেতর এমন একটাকেও দেখলুম না যে সম্পূর্ণ সুখী, এমন একটাকেও দেখলুম না যার একটা না একটা কামনা নেই। যার পুত্র আছে তার পয়সা নেই, যার পুত্র নেই, তার পয়সা আছে, যার চোখ আছে তার সুমুখে রূপ নেই। যার সুমুখে রূপ আছে তার চোখ নেই।' এ সংলাপ ক্লাসিক সংলাপের পর্যায়ে পড়ে।

গীতিনাট্য হলেও স্থানে স্থানে এবং বিশেষ করে কাহিনী পরিকল্পনায় নাট্যকারের সমাজ চেতনা প্রবল। সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে কেন্দ্র করে কন্যাদায়রূপ সামাজিক কর্তব্য যে করুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে ক্ষীরোদপ্রসাদের সচেতন দৃষ্টি তাতে নিবদ্ধ ছিল। শুধু অর্থনৈতিক বৈষম্যই ট্র্যাজেডির কারণ নয়, অদৃষ্টের পরিহাসও কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে সমানভাবে সমস্যার সম্মুখীন করেছে। 'যার রূপসী কন্যা আছে তার পাত্রস্থ করার পয়সা নেই, যার পয়সা আছে তার কন্যার রূপ নেই।'

প্রস্তাবনা দৃশ্যটি মূলত: স্বর্গের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ণের দৃশ্য। পার্থিব জটিলতা, মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সামাজিক, অর্থনৈতিক বৈষম্য, বিভিন্ন মানুষের প্রকৃতিগত চরিত্রের কৌতুককর বৈচিত্র্য সর্বোপরি মূল কাহিনী পরিকল্পনার ইঙ্গিত—সমস্ত কিছু নিয়েই প্রস্তাবনা দৃশ্যটির অবতারণা। এই দৃশ্যের শেষ সংলাপ পুষ্পরথের। সে সংলাপ কাব্যময়-মনোহর। গানের পূর্বে এই ধরনের সংলাপ গীতিনাট্যকে সহজেই সার্থক করে তুলতে সাহায্য করেছে। 'স্বপ্নের ফুল মাথায় নিয়ে চল, ফুলরাণী—একবার ভবের বাজারে বেচা কেনা করে আসি।' নাট্যারম্ভের এই রীতি নিঃসন্দেহে অভিনব—শুভ সূচনার সূত্রপাত—নাট্যকৌতূহলকে উদ্দীপিত করার এই টেক্‌নিক্‌ অবশ্য অন্য দু একটি নাটকেও অনুসৃত হয়েছে।

বিচিত্র মানব চরিত্রের অভিজ্ঞতার কিছু নমুনা যেমন রয়েছে চিত্রলেখা ও পুষ্পরথের সংলাপের মধ্যে তেমনি চাকাদাস চরিত্রের গতিবিধির মধ্যেও। মানব চরিত্রের বৈচিত্র্যের বিস্ময় স্বভাবতঃই চোখে পড়বে। শ্রেষ্ঠী রঘুবরকে সুদখোর কুড়োরামের দেনা শোধ করতে হবে। মাত্র সাত দিনের সময়, দেনা শোধ করতে না পারলে ভিটেমাটি ক্রোক হয়ে যাবে। এক সময়কার বাড়ীর বেতনভুক কর্মচারী টাকার জোরে প্রাক্তন প্রভুর কন্যাকে দাবি করেছে ঋণ পরিশোধের শর্ত হিসাবে। চাকাদাস অকৃজ্ঞতার চরম পর্যায়ে পেঁাচেছে। সুরেশ্বরের বাবার গচ্ছিত প্রায় লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছে চাকাদাস। মৃন্ময়ীর ভাষায় 'এইরকম পাঁচ জনের মেরেই তো ওর পয়সা।' পিতৃঋণ শোধ করার জন্য জয়া আত্মসমর্পণ করতে এল চাকাদাসের কাছে। চাকাদাস উল্লসিত। আকাশের চাঁদ যেন নেমে এসেছে ওর

মুঠোর মধ্যে। এর পরের ঘটনা অবিশ্বাস্য—Fantacy—রূপকথার গল্পের মত। —অবশ্য নাটকীয় ঘটনার দিক দিয়ে নির্দোষ।

নূতন কর্মচারী নিবারণের কারসাজিতে পুঁইরাণীর আবির্ভাব। পুঁইরাণী কুড়োরাম ও মানিনীর বাৎসল্যের কন্যা। অনেকদিনের হারানো সন্তান পুঁইমাচার নীচে পোঁতা অসম্পূর্ণ মাংসপিণ্ডের পরিণত আবির্ভাব আকস্মিক তবুও বাস্তবতার বীজ নিহিত ছিল পুঁই মাচার নীচেই।

পিতৃঋণ শোধ করার জন্য জয়া অকপটে আত্মসমর্পণ করেছে চাকাদাসের কাছে। বৃদ্ধের কামনার বহ্নিতে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার সমস্ত দায়—সমস্ত বোঝা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কাহিনী গ্রন্থনে সামাজিক ট্রাজেডির বীজ রোপন করে নাটকটিকে স্বাভাবিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।

সুরেশ্বর নিদারুণ লজ্জা ও অপমানের হাত থেকে জয়াকে উদ্ধার করার জন্য কুৎসিৎদর্শনা পুঁইরাণীকে অর্থের যৌতুক নিয়ে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। কিন্তু সে আত্মত্যাগের সার্থকতার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে যখন সুরেশ্বর জেনেছে 'গিরিমেণ্ট' (Agreement) সই হয়ে গেছে। জয়া নিজেকে বিক্রির কাজ শেষ করে চাকাদাসের দখলে চলে গেছে। নাটকীয় সংঘাতের সূত্রপাত এখান থেকেই। সুরেশ্বরের কিঞ্চিৎ বিলম্বের জন্য ঘটনার গতিপথ আমূলভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অদৃষ্টের পরিহাস! জয়া যেমন বৃদ্ধ কামুক চাকাদাসের সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত বিবাহে চুক্তিবদ্ধ, সুরেশ্বরও তেমনি অর্থের যৌতুকের রজ্জুতে বাঁধা প্রেতিনীপ্রায় কুৎসিৎ দর্শনা পুঁইরাণীকে বিবাহ করার অঙ্গীকারে। জয়ার চোখ অনুশোচনায় সজল। 'বিদায় নিই, ক্ষুদ্র পাখী, না বুঝে ব্যাধের জালে বাঁধা পড়েছি।' সংলাপের সংক্ষিপ্ততা সুন্দর ট্রাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

অনিবার্য ট্রাজিক পরিণতি থেকে হঠাৎ মিলনান্ত পরিণতির দিকে মোড় ঘুরিয়েছেন নাট্যকার। ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে চিত্রলেখার বুদ্ধিদৃপ্ত চাতুর্যে। জয়ার প্রতি ঈর্ষার অমোঘ অস্ত্রপ্রয়োগে বিয়ে পাগলা বুড়ো চাকাদাস কুপোকাৎ। কাহিনী বিন্যাসে নাট্যকার শেষাংশে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। 'নারী ঈর্ষার ক্ষীর ফেলে নিম খায়।' —চিত্রলেখা ঈর্ষায় অধীর হয়ে বলেছে—'আমার বর যে জয়াকে ভালবাসে সেই জয়া তোমাকে বিয়ে করবে। আমি একটাও পাবো না—সে দুটো পাবে—এও কি সহ্য হয়।'

চিত্রলেখা নিরুপায়। বিয়ের চুক্তি সম্পন্ন। ছোঁড়া (সুরেশ্বর) জয়াকে না পেলে তাকে (পুঁইরাণী ওরফে চিত্রলেখা) ছাড়বে না। সুতরাং ছোঁড়াটার সঙ্গে জয়ার বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবটা খুব জোরদার। অকাট্য যুক্তির কাছে চাকাদাসকে নতি স্বীকার করতে হয়। অন্যথায় চিত্রলেখাকে পাওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। কুড়োরামের কুৎসিৎ কন্যা রাতারাতি পরমাসুন্দরী হল কেমন করে! সন্দেহ নিরসন করার ব্যবস্থা করতেও ভুল করেন নি নাট্যকার। 'পাছে রাজা

জানতে পেরে আমাকে হরণ করে নিয়ে যায় এই জন্যে বাবা আমাকে কুৎসিৎ বলে রটিয়ে রেখেছে।'

এরপর হাতে হাতে ওষুধের ফল ফলেছে। কুড়োরাম আর চাকাদাস—দুই যক্ষির ধন কিনা ছোঁড়া ছুঁড়িতে উড়িয়ে দেবে! 'চাকাদাসের আনন্দ—পাব টাকা ভারা ভারা—সঙ্গে সঙ্গে অপ্সরা।' পয়সা দিয়ে কেনা মেয়ে বিয়ে করতে হল না। জয়ার জন্যে হাজার টাকার ঋণের দাবি ছেড়ে দিতে হচ্ছিল। চাকাদাসের কথায়—'সুদে আসলে প্রেম বেরিয়ে যেত।' হাস্যরস পরিবেশনার প্রচেষ্টায় নাট্যকার কিছুটা সফল হয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকাদাসকে বোকা বানিয়েছে চিত্রলেখা। চাকাদাসের বিয়ে হল আসলে কুৎসিৎ দর্শনা পুঁইরণীর সঙ্গে। চিত্রলেখা লুকিয়েছে পুঁইরাণীর কদর্য রূপের আড়ালে। জয়ার দাবি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছে চাকাদাস। চোখের সামনেই প্রায় বিয়ে হয়ে গেল জয়া ও সুরেশ্বরের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে চিত্রলেখা ও পুষ্পরথের স্বপ্নের মায়াজাল বিস্তার সার্থক হয়েছে। নাট্যকারের অভিপ্রায় এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাঞ্ছিত পরিণতির দিকে নাট্যকাহিনীকে এগিয়ে দিতে পেরে নাট্যকার যেন ধন্য। দুটি বুভুক্ষু হৃদয়ের বাসনা মিলিয়েছেন তিনি একটি বিন্দুতে। সুরেশ্বর তার বাবার গচ্ছিত টাকাও ফেরৎ পেয়েছে চিত্রলেখার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে।

পিতার মুক্তি কামনায় যে আত্মোৎসর্গ করতে জানে তাকে ক্ষুদ্র চাকাদাস কেন, কেউই বাঁধতে পারে না। কাহিনী গ্রন্থনে সামঞ্জস্য রক্ষার ব্যবস্থায় ত্রুটী রাখেন নি নাট্যকার। নিঃস্বার্থ হিতৈষী সৎচরিত্র যুবক সুরেশ্বরও চিত্রলেখার হাত থেকে পেয়েছে তার নিঃস্বার্থপরতার পরম আকাংখিত পুরস্কার—জয়ার নিস্কলঙ্ক প্রেম স্বামীত্বের অভিপ্রেত অধিকার।

বৃদ্ধ কুড়োরামপত্নী মানিনী চরিত্রটি প্রথম থেকেই তার আন্তরিক ক্ষোভ প্রকাশে সোচ্চার। 'আঃ এক চোখা বিধেতা। যে খেতে পায় না তার ঘরে কুকুর বাচ্চার মতন ছেলে পাঠাচ্ছিস। আর আমাকে একটা কানা খোঁড়া ছেলে দিতেও হাতে আগুন লেগে গেছে!' মানিনীর উক্তি কোথাও কৌতুককর, কোথাও বা রসাল, আবার এক এক জায়গায় সার্থক ব্যঙ্গোক্তির সংলাপ নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। প্রথম আবির্ভাব থেকেই মানিনী সজীব, সোচ্চার, স্বতঃস্ফূর্ত। মানিনী কুড়োরাম এবং সুরেশ্বর—সবার উক্তির মধ্যেই অনাড়ম্বরতা ও স্বাভাবিক গ্রাম্যতা চরিত্রগুলিকে সজীব ও বাস্তবানুগ করে তুলেছে।

কুড়োরাম—(সুরেশ্বরের উদ্দেশ্যে)—এতবড় স্পর্ধা—মিনসে কে তুই? 'মিনসে' কথাটা গ্রাম্য মেয়েদের মুখেই ভাল মানায়। অবশ্য সুরেশ্বরের সংশোধনী সংলাপ উপভোগ্য হাস্যরস সৃষ্টির সহায়ক। মিনসে ও মাগী বলে পূর্ব সম্বোধন সংশোধন করেছে সুরেশ্বর। আচ্ছা ভুল হয়েছে। খোকা আর খুকী। তা খোকামণি

এ মেয়েটাকে কাঁদাচ্ছ কেন ?—তবে এ হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস কিছুটা হাস্যকর, কষ্টার্জিত। সুরেশ্বরের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় ছাড়া এ প্রয়োগের সার্থকতা প্রশ্নাতীত নয়।

সহানুভূতিশীল আদর্শ যুবকরূপে সুরেশ্বর চরিত্র চিত্রণ কিছুটা সার্থক। এই সহানুভূতি থেকেই অনুরাগ পর্বের যথারীতি সূচনা। জয়ার মর্মবেদনা মর্মস্পর্শী সংবেদনশীল মনকে সহজেই নাড়া দেয়। 'অভাগা যেদিকে চায়—সাগর শুকায়ে যায়।'—তার সংস্পর্শে এসে সুরেশ্বরেরও চোখে জল। ব্যাকরণসম্মতভাবেই অনুরাগের প্রথম পর্ব উপস্থাপিত করেছেন নাট্যকার।

নাটকে বিভিন্ন মুহূর্তে বিচিত্র রসসৃষ্টির ক্ষমতা সব নাট্যকারের থাকে না। অথচ বিভিন্ন মুহূর্তে বিচিত্র রস সৃষ্টির প্রয়াস সার্থক নাটকের পক্ষে একান্তভাবে অপরিহার্য। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে চাকাদাস মৃণ্মীয়ীকে 'মেরনো' বলে সম্বোধন করেছে। এ সম্বোধন সংক্ষিপ্ত সংলাপের মাধ্যমে সার্থক হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস। আবার মৃণ্ময়ীর উক্তির মধ্যে পরমুহূর্তেই করুণরসের বিস্তার। চাকাদাসের 'গরীবের কথায় একাবার কান দাও। ও মেরনো'—এর উত্তরে উত্তরে মৃণ্ময়ী বলেছে 'তামাসা কর কেন বাপু ? আমরা গরীব পেট ভরে দু বেলা খেতেই পাই না—আমাদের ঠমক্ হবে কিসে ?' যেন মেঘরৌদ্রের লুকোচুরি।—অর্থনৈতিক বৈষম্যের ইতিকথা এখানে প্রচ্ছন্ন।

মৃণ্ময়ী রঘুবরের বাড়ীর পরিচারিকা। কিন্তু ব্যক্তিত্বে তেজস্বিতায় অন্যায়ের প্রতিবাদে দ্বিধাহীন, সোচ্চার। বিয়ে পাগলা বুড়ো চাকদাসের প্রতি তার বিদ্রূপোক্তি উপভোগ্য। চাকাদাস—'বলি এই বসন্তের নবপ্রভাতে একটা টেকো হাতে কোথায় চলেছো ?' মৃণ্ময়ী—'এই বুড়ো হয়েও মিনসেগুলোর রস মরে না দেখে তাদের গলায় দড়ি দেবার সুতো কাটতে চলেছি।'

ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে নির্যাতিত মানবাত্মার বিক্ষোভ প্রকাশে নাট্যকার যথাযথ সংলাপ প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন। যে বাড়ীতে দীর্ঘদিন কাজ করেছে চাকাদাস সে বাড়ীর প্রভুর অজ্ঞাতসারে অসদুপায়ে প্রভুর অর্থ আত্মসাৎ করা বা তাকে প্রতারণা করার মধ্যে কাহিনী বিন্যাসের অস্বাভাবিকতার প্রশ্ন ওঠে না, বরং নৈতিক অধঃপতনের সূচনা হওয়ায় যুগধর্মই প্রকাশিত হয়েছে বলা চলে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে চাকাদাসের প্রবৃত্তির যৌক্তিকতা নিয়ে। যাকে স্বাভাবিক ভাবে ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে, ভৃত্য হলেও সম্ভবতঃ অপত্যস্নেহে লালন পালন করেছে—বুড়ো বয়েসে বিয়ে করার ইচ্ছে হলেও ঠিক জয়াকেই বিয়ে করার জন্য পাগল হবে—এ আচরণ কষ্ট কল্পিত বলেই মনে হয়। অসঙ্গতির সুস্পষ্ট উদাহরণ। অবশ্য আধুনিক মনোবিকার মনোবিকলন ইত্যাদির সূত্রে এর চেয়েও জঘন্য পাশবিক প্রবৃত্তিকে নিয়ে পরবর্তীকালে গল্প নাটক উপন্যাসের কাঠামো তৈরি হয়েছে।

চাকাদাসের দুরভিসন্ধির উত্তরে মৃণ্ময়ীর সংলাপে আধুনিক চিন্তাধারার

প্রতিফলন স্পষ্ট। 'তোমরা যা করো তাই সাজে।' ধনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সার্থক বিদ্রূপাত্মক সংলাপ বলে এটিকে নিঃসন্দেহে চিহ্নিত করা যায়। এই দৃশ্যে মৃন্ময়ীর কিছু কৌতুককর সংলাপও উপভোগ্য।

কাহিনী বিন্যাসের দিক দিয়ে চতুর্থ দৃশ্যটির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সমস্ত কাহিনীটির পিছনে একটি পরিকল্পনা আছে। মর্তের নরনারীর সুখদুঃখ, হাসিকান্নার সম্বন্ধে স্বর্গের রাণী বাসন্তীর কৌতূহলের অন্ত নেই। মানুষের চোখে সুখস্বপ্নের ছবি অক্ষয় হোক—এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের জন্য প্রস্তাবনা দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। চতুর্থ দৃশ্যে সে পরিকল্পনা পুষ্পরথ ও চিত্রলেখার মায়াজাল বিস্তারের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে।

অপুত্রক মানিনীর মর্মবেদনা মর্মস্পর্শী। সে মর্মান্তিক বেদনার বহিঃপ্রকাশ বিধাতাকে ধিক্কারে—'মুখে আগুন দেবতার, মুখে আগুন বিধাতার। একটা কানা খোঁড়াও দিতে পারলে না গো।'...এই ধরনের সহজ সরল অনাড়ম্বর মর্ম-বেদনার প্রকাশ মানিনীর সংলাপে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।...সৌভাগ্যের, প্রাচুর্যের অংশ নিতে কেউ নেই। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! অর্থনৈতিক বৈষম্যের নিদারুণ পরিণতি, অপুত্রকের মর্মজ্বালা সংলাপের মাধ্যমে সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে।

পঞ্চম দৃশ্যটিতে নিবারণের (ছদ্মবেশী পুষ্পরথ) সংলাপ এবং রহস্যোক্তি কৌতুকোদ্দীপক। মাঝে মাঝে তার সংলাপ রসাল এবং সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই রসাল সংলাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুঁইমাচার নীচে থেকে সদ্যোত্থিতা পুঁইরাণীর বিকৃত উচ্চারণ সম্বলিত সংলাপও হাস্যরস সৃষ্টির ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে। তবে হাস্যরস সৃষ্টির গুণগত মানের দিক দিয়ে একে খুব উচ্চশ্রেণীর হাস্যরস সৃষ্টি বলে চিহ্নিত করা যায় না। কাহিনীর বাস্তবতার প্রশ্ন এখানে না তোলাই ভালো। কারণ গীতিনাট্যটি ঠিক সামাজিক গীতিনাট্য নয়, যদিও এখানে নাট্যকারের সমাজবোধ, অর্থনৈতিক চেতনা প্রভৃতি যথেষ্ট সজাগ বলে প্রতিভাত হয়েছে।

হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস চাকাদাসের সংলাপের মাধ্যমে বহুলাংশে সার্থক হয়েছে। অনুপ্রাসবহুল উপভোগ্য সংলাপ বৃদ্ধের বিরহ প্রকাশের ভঙ্গিমার দিক দিয়ে অপূর্ব।

এ নাটকে ট্র্যাজিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াসের সার্থকতা ও অকিঞ্চিৎকর নয়। সুরেশ্বর ও জয়া দুজনেই চুক্তিতে আবদ্ধ। রঘুবরকে বাঁচাতে চাকাদাসের কাছে আত্মসমর্পণ করল জয়া, আর জয়াকে চাকাদাসের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যে কুড়োরামের কুৎসিৎ কন্যাকে বিয়ে করতে রাজী হল সুরেশ্বর। দুজনের মধ্যে হৃদয়তন্ত্রীতে দুজনেরই বিরহের মর্মদাহ—গানের মধ্যে তার সার্থক অভিব্যক্তি। "বাঁধনে দুজনে ভাসিয়া চলিল, তটিনীর দুটি পারে।" প্রহরীর কণ্ঠে হিন্দি সংলাপ নাট্যরস সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। রূপসী চিত্রলেখার সপ্তম দৃশ্যে আবির্ভাবের আকস্মিকতাও চমকপ্রদ।

চিত্রলেখা চাকাদাসকে বলেছে—'জয়ার জন্যে তোমার অহরহ বিরহ—দারুণ দুঃসহ, আর আমার বেলায় একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসও তোমার নেই?' কৃত্রিম ঈর্ষার অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে নারী চরিত্রের সার্থক রূপায়ণ। 'তুমি জয়াকে দেখে কতবার প্রাণেশ্বরী বললে, কিন্তু আমাকে তো একবারও বললে না।' সতীনের উল্লেখের মাধ্যমে চাকাদাসের কাছে জয়ার দাবি নস্যাৎ করার কৌশল উপভোগ করে চিত্রলেখা চরিত্রটিকে জীবন্ত বলে মনে হয়। কৌতুক সৃষ্টির দিক দিয়ে চিত্রলেখার গীত মজাদার—সে গানে চাকাদাসের নেশা ধরে গেছে। তার পাল্টা গানের জবাবও রংদার—উপভোগ্য।

কাহিনী বিন্যাসে নাট্যকারের বুদ্ধির পরিচয় মেলে নাটকটির শেষাংশে। পুঁই-রাণীকে কুৎসিৎ বলে রটনার যুক্তি প্রদর্শনের বুদ্ধিদীপ্ত একটি তোখোড় নারীর পরিচয় মেলে চিত্রলেখার মধ্যে। চাকাদাসের সঙ্গে চিত্রলেখার কৃত্রিম প্রেমাভিনয়ও নাট্যরস অব্যাহত রেখেছে।

কুড়োরামকে চাকাদাসের সম্মোধন—'বাপু বলুন', 'বাছা বলুন' ইত্যাদি কৌতুককর সংলাপ হবু সম্পর্কের স্বপ্নে মশগুল বুড়োর মুখে মানান সই এবং উপভোগ্য হয়েছে। এছাড়া চাকাদাসের উক্তি (যখন কুড়োরাম বললে—'তুমি যে আমার চেয়ে দশ বছরের বড়)—'ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, ও আমার দেড় পলে মাস আর পাঁচ পলে বছর। বসুন, বসুন, বয়সেতে বিজ্ঞ নয় বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।'—সময়োপযোগী নাটকীয় উক্তি।

জয়ার উদ্দেশ্যে চিত্রলেখার সান্ত্বনাদায়ক সংলাপ উল্লেখ্য—'পিতার মুক্তি কামনায় যে আত্মোৎসর্গ করতে জানে তাকে বাঁধে কে জয়া?'

মিলনান্ত নাটকের পরিসমাপ্তিটি মধুররস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। চিত্রলেখার কৌশলে তার উকিলের জেরায় সুরেশ্বর ফেরৎ পেল তার বাপের গচ্ছিত লাখ টাকা আর পেল তার মানসসুন্দরী জয়াকে—পরিবর্তে চিত্রলেখার দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে দেখল চাকাদাস—চিত্রলেখার সুন্দর রূপ অন্তর্হিত। তার বদলে তার সামনে দাঁড়িয়ে কুৎসিৎ দর্শনা পুঁইমণি। এ যেন এক রূপকথার রূপক। যে সুন্দর, তার সামনে দণ্ডায়মানা মূর্তিমতী বীভৎসাও যেমন তার দৃষ্টির যাদুতে মানস-প্রতিমায় রূপান্তরিত হয়ে গেল—তার পুণ্যের জোরে। আর যে কুৎসিৎ, যার প্রবৃত্তি পাশব, সে অনন্ত সৌন্দর্যের সারভূতা মূর্তিকে হাতের মধ্যে পেয়েও হারিয়ে ফেলল। তার অশুচি দৃষ্টির স্পর্শে সুন্দরও হয়ে গেল অসুন্দর। সুরেশ্বর ও জয়ার মিলন এবং চাকাদাসের পুঁইমণিকে পাওয়ার মধ্যে এই ইঙ্গিত বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ। নাটকের এই প্রচ্ছন্ন রূপকটি নাট্যকাহিনীর অন্যতম সম্পদ বলে গণ্য হতে পারে। এ নাটকেও ছদ্মবেশ নাট্যকারের বিশেষ প্রবণতার পরিচয় বহন করে।

॥ বরুণা ॥

(রঙ্গনাট্য)

নাটকের বিষয়বস্তু নাট্যকারের অন্যান্য অনেকগুলি নাটকের ন্যায় প্রণয়ঘটিত ব্যাপার। এখানেও মূল বিষয় রাজপুত্র পুণ্ডরীকের পূর্বরাগ। পূর্বরাগের সূত্র মৃগয়ায় গিয়ে একটি অপূর্ব সঙ্গীত শ্রবণ এবং মনোরম উদ্যান পরিদর্শন। কিন্তু এই সঙ্গীতের এবং উদ্যানের অন্তরালে কে সেই অদৃষ্টপূর্ব নিপুণ শিল্পী? সে কি বেদেনী? পুণ্ডরীকের স্থির বিশ্বাস এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন রাজকুমারীর অস্তিত্ব বর্তমান। সঙ্গীত শ্রবণ এবং উদ্যানসৌন্দর্য পরিদর্শনের পর অন্যান্য নাটকের নায়কের ন্যায় পুণ্ডরীকের উন্মাদাবস্থা লক্ষণীয়। শিববর্মার সামনে পুণ্ডরীক সম্বন্ধে কুণ্ডরির বিবৃতি পাওয়া যায় এই পূর্বরাগ সম্বন্ধে। নাট্যকারের প্রায় প্রত্যেক নাটকে এই ধরনের ঘটনা আছে। বেদৌরা নাটকেরও নায়কের উন্মাদ লক্ষণ এর বিবরণ আছে।

বরুণাকে প্রথমে পুণ্ডরীকের কাছে ধরা দিতে নিষেধ করে দেয় অভিরাম। তার মতে পুণ্ডরীকের আকর্ষণ ক্ষণিক মোহ কিনা যাচাই হওয়া দরকার। সুতরাং বহিন বরুণাকে অপেক্ষা করতে হবে। জটাবতী প্রসঙ্গে পুণ্ডরীকের প্রতীক্ষা মানস-সুন্দরীর প্রতি আকর্ষণ—এই বিষয়বস্তু নিয়ে কৌতুককর পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। পরে অবশ্য কাঞ্চী রাজকুমারীর প্রেমাকর্ষণ ও তার রূপের মোহের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেষ পর্যন্ত পুণ্ডরীকের মানস-সুন্দরী বরুণার আকর্ষণই জয়ী হয়েছে। এখানে কাহিনী বিন্যাসে অসঙ্গতি লক্ষণীয়। গান শুনে মোহিত হয়ে অভ্যর্থনা জানাল যাকে—সে যখন বেদেনীর মূর্তি নিয়ে দাঁড়াল তাকে দূরে সরিয়ে দিল পুণ্ডরীক যেহেতু সে বেদেনী—রূপবতী, রাজকুমারী নয়। তা হলে শেষ পর্যন্ত রূপময়ী রাজকুমারীকেও সে প্রত্যাখ্যান করে কেন? কারণ গানের প্রকৃত স্রষ্টা সে নয়। পুণ্ডরীক কি তাহলে রূপের কাঙাল না গানের প্রকৃত মালিকের পাণিপ্রার্থী।

এ নাটকে একটি উপকাহিনীর প্রাধান্য নাট্যকার স্বীকার করে নিয়েছেন। উপকাহিনী অভিরাম (কেরল রাজকুমার ছদ্মবেশী) ও রাজপালিতা মাধবীর প্রণয় প্রসঙ্গে। অভিরাম মাধবী প্রসঙ্গটি নাটকে একটি বিশেষ স্থান দখল করেছে। কিন্তু নাটকের কাহিনী নিয়ন্ত্রণে এ প্রেম প্রসঙ্গের অবতারণা কি অপরিহার্য ছিল?

মাধবী অভিরাম প্রসঙ্গে মধুর রস পরিশনে নাট্যকার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। কুণ্ডরিকের কাছে অভিরামের আসল পরিচয়ের ইঙ্গিত পেয়ে মাধবীর অভিরামকে

অনুযোগপর্বে সংলাপে প্রসাদগুণের চমৎকারিত্ব মনে রাখার মত। অভিরাম চরিত্রটি দোষগুণে রঙ্গরসিকতায় ভরা একটি নিটোল চরিত্র। বুদ্ধি, কর্তব্যনিষ্ঠা, রসবোধ মানবতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব—সবকিছু মিলিয়ে তার চরিত্রের কাছে নায়ক পুণ্ডরীকও নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

এ নাটকে অন্যান্য নাটকের বৈশিষ্ট্য ছদ্মবেশ-এর প্রয়োগও বাদ যায় নি। এখানে বরুণা, অভিরাম, মানবেন্দ্র—সবার পরিচিতির অন্তরালে একটি করে আসল পরিচিতি আছে যা নাটকের কাহিনী বিন্যাসের অন্যতম উপাদান।

মেলোড্রামাটিক্ সিচুয়েশনেরও এতে অভাব নেই। মানবেন্দ্রর প্রাণদণ্ডাজ্ঞার ব্যবস্থা, নাটকীয় উৎকণ্ঠার মুহূর্তে পুণ্ডরীক বরুণার প্রবেশ, তার পূর্বে অভিরামের সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে নাটকে রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন নাট্যকার। ফলশ্রুতি কতটা হয়েছে বলা মুস্কিল। কারণ তার আগেই সবাই জেনে গেছে—এরা আসছে। ওদের ঈপ্সিত মিলনও ঘটে গেছে। তাছাড়া শেষে আনন্দগিরির পদকের মাধ্যমে বরুণার পরিচয়দানের চমকই বা কোথায়? যদি পরিচয় নাই দেওয়া হত? রাজা শিববর্মা তো মাধবীকে তুলে দিয়েছিলেন রাজপুত্র অনুচর অভিরামের হাতে। এ অনেকটা যাত্রারীতির অনুসরণ বলা যেতে পারে।

তবে এ নাটকে ভাবগত আদর্শের জয়গান করা হয়েছে এবং প্রেমের নতুন সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। পুণ্ডরীকের মানস-সুন্দরীর অন্বেষণই নাটকের মূল বিষয়বস্তু এবং সেই বিষয়বস্তুকে—মূল প্রতিপাদ্যকে স্বাভাবিক পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে নাট্যকার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

অভিরাম ও শিববর্মা চরিত্র দুটির মধ্যে স্বভাবগত, সংলাপগত কিছুটা সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। উভয়ের আচরণ কিছুটা উদ্ভট্। সংলাপ আপত-কৌতুককর হলেও তা বুদ্ধিদীপ্ত সুদূরপ্রসারী, অর্থবাহীও বটে।

শিববর্মার আচরণ উদ্ভট বটে কিন্তু তার হৃদয়ে স্নেহ পরায়ণতা ও দয়ামায়াও আছে অন্তঃসলিলা ফল্গু ধারার মত। শিববর্মার চরিত্রে হবুচন্দ্র রাজার স্বভাব আরোপ করা হয়েছে। স্থানে স্থানে কৌতুককর উক্তির মাধ্যমে নাট্যকারের লঘু মেজাজ প্রকাশিত হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিববর্মা ঠিক সময়ে রাজোচিত দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে পেরেছেন। বরুণার চরিত্র ব্যক্তিত্বের ব্যাঞ্জনায়দীপ্ত। আমাকে বেদের মেয়ে বলে যদি সে গ্রহণ করে তবেই আমি তার হতে পারি, নইলে নয়। ভালবাসার পরীক্ষায়, আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তায়—এ চরিত্র সবিশেষ উল্লেখ্য।

প্রথম থেকেই নাটকটিতে রোমান্টিক সুর। বরুণার ভূমিকা যেন তারই প্রতিধ্বনি। প্রথম দৃশ্যে অভিভাবক বেদে মংরু প্রকাশ করে দিয়েছে—'তুই রাজার বেটী।'

বরুণা বলেছে, 'এতদিন পর নিষ্ঠুর হলে বাপ, আমাকে ছেড়ে দিলি।'—এতবড়

একটা সংবাদের পর এই সামান্য প্রতিক্রিয়া ? কাহিনী বিন্যাসের প্রতি নজর রেখেছেন নাট্যকার। তাই মংরুর মুখ দিয়ে বলিয়ে নিলেন, শহরে যেতে ইচ্ছা হয়েছে যা, তবে শুধু যাস নি। যে পদকটি তোর গলায় বাঁধা ছিল, সেইটি গলায় পরে যা।

পুণ্ডরীকের অনুমান এই বেদের বনে অজ্ঞাতবাসে কোন অপূর্ব শিল্পী অবস্থান করছে। অভিরামের সঙ্গত ধারণার সঙ্গে কাহিনীর মিল আছে। সে শিল্পী রমণী। কাহিনীর বিন্যাস ঘটেছে দুটি মূল ঘটনাকে কেন্দ্র করে। একদিকে পুণ্ডরীকের অপূর্ব রমণী শিল্পীর অনুসন্ধান, অন্যদিকে বরুণার রাজপুত্র অনুসন্ধান।—'তুই রাজপুত্রের সন্ধান দিতে পারিস ?······ভগবান রাজপুত্রকে যেমন অত্যাচারের অস্ত্র দিয়েছে গরীব বেদের মেয়েকেও তেমনি মান বাঁচাবার নাগপাশ দিয়েছে। রাজপুত্র দেখুক, কার জোর বেশী।' শিল্পী অনুসন্ধান প্রসঙ্গে হাস্যরস সৃষ্টির পরিবেশ রচনা করা হয়েছে এবং তা বহুলাংশে সার্থক হয়েছে।

নাটকে একটি বিশেষ নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে কেরল রাজকুমারীর পরিচয় প্রসঙ্গে। কেরল রাজকুমারীর শৈশবে নিরুদ্দিষ্ট হওয়া, তার সন্ধানে কেরল রাজকুমারের অন্তর্ধান—এসব সংবাদের পর স্বভাবতই ছদ্মবেশী কেরল রাজকুমার অভিরামের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। নাট্যমুহূর্ত—যখন শিববর্মা অভিরামকে প্রশ্ন করলেন—

মাধবীটি কে জান ?
ওই কেরল রাজকুমারী নাকি ?

তোমার কি বোধ হয় ?

অভিরামের ধারণা হয়েছে তার নিরুদ্দিষ্ট ভগিনীই হল মাধবী। তার সঙ্গে তার প্রেম-ভালবাসা ! কি লজ্জা ! কি মর্মান্তিক পরিহাস !

অন্তর্যামিন। রক্ষা করুন, অজ্ঞানে মহাপাপ করেছি। মাধবী আমার—মাধবী আমার—

কিন্তু নাটকে এই নিদারুণ সংঘাতের সম্ভাবনাকে লালন পালন করতে নাট্যকার ভয় পেয়েছেন। তাই কাহিনীর বিপদজনক জাল সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে নিয়েছেন। তা না হলে এ নাটক এক দুঃসাহসিক সাহিত্য প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত হতে পারতো (রাজা ইদিপিয়াস)।

নাট্যকার সমস্যার ঝড় তুলেই সঙ্গে সঙ্গে তা থামিয়ে দিয়েছেন। 'ভগিনী নয়, ভয় নেই, ওঠ। কেরল রাজকুমারী জ্ঞানে মাধবীকে পালন করেছিলুম। কিন্তু অনুসন্ধানে জেনেছি তা নয়।'

নাটকে সংকটের স্বরূপ বরুণার দাবীতে—'হামি সোয়ামী পেলে খুশী হই।··· হামি টাকা লিবো না—হামি সোয়ামী লিবো।' নাট্যসংঘাত মানবেন্দ্রর যুক্তিবাদে।

শিববর্মা অভিরামকে কন্যা আনতে বলেছেন, যাকে এনেছে তাকে পুত্রবধূ হিসাবে গ্রহণ না করলে—'তবে কি আমি সত্যে পতিত হব ?'

মানবেন্দ্র : পুত্রের দেহের ওপর পর্যন্ত আপনার অধিকার, তাকে বন্দী করতে পারেন, গুরু অপরাধে হত্যা করতে পারেন। কিন্তু তার জাতি-ধর্মের উপর আপনার অধিকার নেই।

পুণ্ডরীকের আগমনে তার মুখের সংলাপে পরিস্থিতির জটিলতার জট অনেকটা খুলে গেছে।

পুণ্ডরীক : মহারাজ আমি রাজকন্যা ভ্রমে ওর হাত ধরেছিলুম।

বরুণা : তুই বিয়ে না করলে হামাকে ত আর জাতে লিবে না।

এরপর নাটকের নতুন ঘটনা বিন্যাসের কৌশল অবলম্বন করেছেন নাট্যকার।

বরুণা : আচ্ছা এক বছর সময় লে রাজা। এই এক বছরের ভিতর ওর যদি মনের মত বহু মিলে ত হামি ওকে ছাড়িয়ে দিব।

মানবেন্দ্র কাহিনীর জট সৃষ্টির প্রয়াসে সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছে—যদি না মেলে ? বরুণার দৃঢ়োক্তি তার ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু প্রকাশের সহায়ক। 'তা হলে তোরা বিচার করবি। রাজা আছিস, বিচার করবি না ? হামি এক বরষ পরে আবার আসবো।'

শেষ দিকে নাট্যরস বিস্তারে ছন্দপতন ঘটেছে হঠাৎ ভক্তিরসের সংযোজনে। বরুণাকে তার পূজা গ্রহণ করেছে ঠাকুর—একথা কে বলেছে ?

আনন্দগিরির মুখে এক চাঞ্চল্যকর অলৌকিক ব্যাখ্যা—সে আমি নই, স্বয়ং বেঙ্কটনাথ। তোমাকে পূজার মন্ত্রোপদেশ দিয়েছেন।

কাহিনীর প্রয়োজনে বরুণার গলা থেকে পড়ে যাওয়া অভিজ্ঞান পদক কুড়িয়ে কাছে রেখে দিয়েছে আনন্দগিরি। এরপর পুণ্ডরীক জটাবতী প্রসঙ্গের অবতারণা অনাবশ্যক নাট্যকাহিনীর জটিলতা সৃষ্টি করতে চলেছিল। পুণ্ডরীক জটাবতীর রহস্যালাপে পুণ্ডরীকের প্রাণান্ত। হাস্যরস, কৌতুককর পরিবেশ সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত নাট্যকার তার স্বাভাবিক ক্ষমতা বলে এই অংশটিকে রসাল করে তুলেছেনা বিশ্রাম করতে চেয়েও কি শান্তি আছে পুণ্ডরীকের ? জটাবতী সঙ্গে সঙ্গে বলে বসেছে—আমি পাশে বসি, তুমি বিশ্রাম করো।

কাহিনীর ঈপ্সিত পরিণতির ইঙ্গিত রয়েছে পুণ্ডরীকের পরবর্তী স্বগতোক্তির মধ্যে। 'হে ভগবান যদি আমাকে বেদেনীদানই অভিপ্রেত হয় তো তাই দাও। আমাকে এ রাক্ষসী মায়াবিনীর হাত থেকে রক্ষা কর।

বধ্যভূমিতে মানবেন্দ্রর মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞার বাস্তব রূপায়ণ প্রচেষ্টা যাত্রারীতির সগোত্র। এর কি সত্যই প্রয়োজন ছিল ? আকস্মিক চমকের জন্য যাত্রার এই সুলভ টেক্‌নিক্‌ নিয়েছেন নাট্যকার। পুণ্ডরীক ঠিক এক বছরের মধ্যে ফিরে এল।

সাজানো কাহিনী। নাটকের অনিবার্য দুর্নিবার পরিণতি নয়। আর একটু বিলম্ব হলে মানবেন্দ্রর প্রাণহানি হতে চলেছিল। রুদ্ধশ্বাসে সবাই প্রহর গুণছে, শেষ পর্যন্ত সবদিক রক্ষা হল। মিলনান্ত নাটকের সর্ব প্রকরণ সব আয়োজন যথাযথ করে রাখলেন নাট্যকার।

ঠাকুরের আশীর্বাদেই শুধু নয়—নাট্যকারের পরিকল্পিত প্রয়াস ও নিষ্ঠায় পুণ্ডরীকের মহত্বের পুরস্কার প্রাপ্তির সুবাদে বধ্যভূমিকে বাসরগৃহে রূপান্তরিত করতে পেরেছেন নাট্যকার।

নাটকটি নিঃসন্দেহে সংলাপ সমৃদ্ধ। নাটকটিতে মাঝে মাঝে নাট্যকারের লঘু মেজাজের সঞ্চরণ তাঁর স্বভাবসুলভ। আগের কয়েকটি নাটকেও দেখেছি গুরুতর পরিস্থিতিতেও নাট্যকার কৌতুক সংলাপ সংযোজনে অসংযমের পরিচয় দিয়েছেন। কৌতুককর পরিস্থিতিতে মজাদার সংলাপের অবতারণা নতুন কিছু ঘটনা নয়। এর দৃষ্টান্ত ভূরি ভুরি মিলবে। 'গান শুনে বেসামাল পুণ্ডরীক, ঘুমুতে ঘুমুতে আৎকে ওঠে—বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়েছে।' রাণীর এই বিবৃতির উত্তরে শিববর্মা কি বললেন—শোনা যাক। 'তাতো পড়বেই। বাটুল রোগ খোঁচা রাগিনী আর কোৎকা তাল। ছেলের ঘুমন্ত প্রাণে যেই চিপ করে লেগেছে, অমনি আৎকে উঠেছে।' —উদ্ভট সংলাপ মজাদার ও কৌতুকরস বিস্তারী।

প্রহরীদের আচরণে মোটা বুদ্ধি দিয়ে রহস্য রসিকতা করা প্রায় সব নাটকেরই একটি বিশেষ অঙ্গ। অভিরামকে রাস্তা ছাড়ার প্রসঙ্গে প্রথম প্রহরীর ও বেদেনীর উক্তি উল্লেখ্য।

১ম বেদিনী : তোর কি কেনা রাস্তা হ্যায় যে তোর হুকুমে রাস্তা ছেড়িয়ে দেবো ?

১ম প্রহরী : আলবৎ ছোড়তে হবে। হামরা বিল্লিক বেটাকো গ্রেপ্তার করতে চলিয়েছি।

যো আদমি সড়কপর খাড়া হবে উসকো হামু লোগু ঠেলিয়ে ফেলিয়ে চলিয়ে যাবে।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দি সংলাপ উপভোগ্য। সবাইকে প্রণাম করতে নির্দেশ দিতে গিয়ে ব্রাহ্মণ কঞ্চুকি প্রসঙ্গে বলেছেন—এর আশীর্বাদে রাজ্য হয়, রাজপুত্র হয়—কি না হয়। একে চিপ্ চিপ্ করে প্রণাম কর।······এইবারে দেওয়ানজী চেপে ধর—পা চেপে ধর। উনি তুষ্ট হলে রাজা তুষ্ট, রাজা তুষ্ট—জগৎ তুষ্ট। সুন্দর সার্থক সরল সংলাপ। এ সংলাপ—এ্যাক্সান-এ, প্রসাদগুণে অনবদ্য।

মাধবী বরুণার সংলাপ স্বাভাবিক সংক্ষিপ্ত সুন্দর।

কি বউ, নমস্কার ফিরিয়ে দিলি যে।

বহু হলেম না যে বহিন। তোর ভাই ত আমাকে নিলে না ভাই।'

মাধবীর মন্তব্য দার্শনিক গুণসম্পন্ন। চোখের সামনে নিধি ভাসছে, সে তা ফেলে সাগরে ডুব দিতে গেল ?

নাটকের শেষাংশে অভিরাম নিজে যে ভঙ্গিতে আচমকা পুণ্ডরীককে অবাক করে দিয়েছে তা অভিনব।

পুণ্ডরীক—পাপিষ্ঠ নরাধম অভে, এখানেও তুই ?

অভিরাম—তুমি শিবরাত্রির সলতে
তোমাকে পারি ভুলতে ?
এ কি প্রাণে সবে, নিভে যাবে
ভরাদীপে পুরে জ্বলতে।

অন্যান্য নাটকের মত এতেও শুরুতে প্রস্তাবনা পর্বে গীতি সমাপ্তি পর্বেও গীত। প্রথমে গানে মূলভাবটি কৌশলে প্রচার করার চেষ্টা হয়েছে। গানটির বাণী জীবন-দর্শন কেন্দ্রিক।

চোখ থাকে ত রূপ থাকে না বিধাতার মানা।
দেখে দেখে জনম গেল আঁখির ছলনা।

মিলনান্ত নাটকে যে ভাবে নাট্যকার সমাপ্তি সঙ্গীত সংযোজন করেছেন, এতেও ঠিক সেইরকম বাণী সম্বলিত গীত লক্ষণীয়।

কোথাছিল কুমুদিনী সঙ্গোপনে
চারুশশী ছিল বসি কোন গগনে।...

মূল চরিত্র বরুণার সঙ্গে আমাদের পরিচিতিও গানের একটি কলির মাধ্যমে—

প্রাণ বলে আজ খেলব এক খেলা
কার যে সঙ্গে কেমন রঙ্গে করব কত মেলা।

বরুণা মূলতঃ কাহিনী প্রধান নাটক—ঠিক গীতিনাট্য নয়—সুতারং গানের ভূমিকা এ নাটকে গৌণ।

॥ ভুতের বেগার ॥

॥ রঙ্গনাট্য ॥

নাট্যকারের বৈশিষ্ট্য 'প্রস্তাবনায় সঙ্গীত' এ নাটিকাতেও অনুপস্থিত নয়। চাকুরি গত প্রাণ বাঙালীর প্রতি কটাক্ষ হেনে নাট্যকার তার রঙ্গনাট্য শুরু করেছেন।

কলম পিষে দিবারাত
দুবেলা জোটে না ভাত
বসে বসে গেঁটে বাত (অফিসে)

বাঙালীর চরিত্রের ত্রুটী বিচ্যুতি প্রবণতা সম্বন্ধে নাট্যকারের সচেতনতা নাটকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। পাশ্চাত্য অনুকরণের স্রোতে একদল নব্য বাঙালী সাহেব ধীরে ধীরে সর্বনাশের ফাঁদে পা দিচ্ছিল। আনন্দলাল নাটিকার মূল চরিত্র—এই দলেরই একজন। ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহীর মানসিকতা আনন্দলালে অবশ্য নেই, ব্যক্তিগত স্বার্থ বিদেশীদের পিঠ চাপড়ানীতেই চরিত্রটি বিস্তৃতির শেষ পর্যায়ে পেঁাচেছে বলে ধরে নিতে কষ্ট হয় না। সাহেবকে তোষামোদ করে ভেট পাঠিয়ে একরাশ টাকা জামিনের বিনিময়ে কোম্পানীর এজেন্টের পদ লাভ করার স্বপ্নে আনন্দলাল মশগুল। নাটিকায় এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার মত কাহিনী গ্রন্থনের মালমশলা সংগ্রহ করতে নাট্যকারের কষ্ট হয় নি।

স্ত্রীর নামে কেনা কোম্পানির কাগজ বিক্রি করে এবং বাইরে থেকে ত্রিশ হাজার টাকা ধার করে আনন্দ বাউল-এল সাহেবের কৃপায় এজেন্ট হয়ে বসল। আনন্দলাল গ্রামের প্রতি বীতস্পৃহ গ্রামছাড়া চাকুরিগত সাহেবিয়ানার প্রতি আসক্ত বাঙালীবাবুর প্রতিনিধি। উমেদারের উৎপীড়নে ওস্ঠাগত প্রাণ, আনন্দলালের তবুও সান্ত্বনা কারণ এ যে সম্মানের অত্যাচার। শ্বেতপাথরে আনন্দলালের নাম খোদাই হয়ে এল—এ. এন. জি. ব্যানরাজী। বাংলায় আনন্দলাল নামটা বড় পাড়া গেঁয়ে।

আনন্দলালের খুল্লতাত (পল্লীবাসী) মুরলী তার ভগিনীপতি মুকুন্দকে নিয়ে শহরে বেরিয়েছে গ্রাম ছাড়া দেশত্যাগী তার বংশধর আনন্দলালের সন্ধানে। সাধারণ সরল পল্লীবাসীর চোখে শহর কোলকাত্য এক আজব শহর। নাটকে কৌতুক পরিবেশন করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে নিয়েছেন নাট্যকার। নাটকের গল্পাংশও বর্ণিত হয়েছে ধাপে ধাপে। কিন্তু আনন্দের সন্ধান পাওয়াও কণ্টকর। মুরলীকে আশাবাদী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই আনন্দের সন্ধান অব্যাহত থাকে মুরলীর মারফৎ। আনন্দের সরকার নিতাইএর বাড়ীতে তার সন্ধান চলে এবং শেষ

পর্যন্ত সদানন্দের সাহায্যে আনন্দের সন্ধান মেলে। শহুরে জীবনের বিষে জর্জর আনন্দের বিকৃত মানসিকতা ধরা পড়ে দীনবেশধারী ব্রাহ্মণকে নিজের খুড়ো বলে পরিচয় দিতে লজ্জিত হওয়ার ঘটনায়। কারণ হিসাবে অবশ্য একটা সঙ্গত যুক্তি খাড়া করেছেন নাট্যকার। এরকম অসভ্য লোক তার খুড়ো—এ কথা জানাজানি হলে তার পসার জমবে না। কাহিনীর স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত মুরলী শেষ পর্যন্ত আনন্দের স্ত্রী শারদার অনুরোধে তার ক্ষমাপ্রার্থনার ঐকান্তিকতায় ফিরতে বাধ্য হয়। নাটকের ঘটনানির্ভর সংঘাত দানা বাঁধতে না বাঁধতে —সব কিছু কেমন যেন তরল হয়ে যায়।

কাহিনীর মোড় এখান থেকে এমনিতেই অন্যদিকে ঘুরে গেছে। সেই হিসাবে মুরলীকে আরও কয়েকদিন লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত অবস্থায় রাখলে নাটকের সংঘাতময় পরিবেশকে জিইয়ে রাখা যেত। সমস্যার জাল বোনা হতে না হতেই জাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। এদিকে বাউএল সাহেব পলাতক। কোম্পানি লাটে উঠেছে। জামিনের টাকা ফাঁক। রাস্তার ফকির হয়ে 'হায় হায়' করেছে আনন্দ। নাট্যকারের সুন্দর প্রতিপাদ্য—নকল বাবুয়ানির পরিণাম—বকবকম্ শেষ। স্বাভাবিকভাবেই আনন্দর পাওনাদারদের হাতে লাঞ্ছনা, অপমান জুটেছে। ঘটনাচক্রে না কি কাহিনীর সহজ পরিণতির প্রতিশ্রুতি পালনে মুরলীর হাতের মজুত একরাশ টাকায় পাওনাদারদের পাওনা মিটে যায়। বাঞ্ছিত পরিণতির দ্বারপ্রান্তে এসে নাট্যকারকে সাফাই গাইতে হয়েছে—'মুরলীর কাছে শারদা কুল লক্ষ্মী, তার পুত্রকন্যা, তার নাতিনাতনি গলার হার-মাথার মণি। তার সব সম্পত্তি তাদের জন্যেই তো রেখে দিয়েছে সে।' নাট্যকাহিনীর সমীকরণ—বিনাবাধায় বাঞ্ছিত পরিণতি আদর্শবাদের হাওয়ায় নাট্যসূত্র উধাও। ইয়ং-বেঙ্গলের উদ্দাম ব্যক্তিত্ব কোথায় আনন্দর মধ্যে? সামান্য ঝড়ে নুয়ে পড়া মেরুদণ্ড নিয়ে নাটকের নায়ক সাজা চলে না।...আনন্দ ক্ষমা চেয়েছে খুল্লতাতের কাছে। সুবোধ বালকের মত ফিরে যেতে চেয়েছে নিজগৃহে। চাকুরী করার শখ শহর বাসের শখ মিটে গেছে। সবাই সানন্দে রাজী হয়েছে অশান্তির শহর ছেড়ে চিরশান্তির নীড় গ্রামে ফিরে যেতে। কাহিনী বিন্যাসে ঠিক এইখানে এসে না থামতে পারলে নাট্যকারের সচেতন উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হত। 'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর, কবির এই বাণী কিংবা Go back to village—এই সুন্দর প্রবাদোপম প্রবচনটি নাটকের কাহিনীর সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছে—নাটকটির স্বপক্ষে অবশ্যই এটুকু বলার আছে।

'ভূতের বেগার' আসলে একটি ছোটগল্পের নাট্যরূপ—অথচ এই ক্ষুদ্র পরিসরেও বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্যে ও গুরুত্বে এটি একটি প্রহসন হতে পারতো কিন্তু কার্যতঃ তা হয় নি।

নাটকটির প্রধান ত্রুটী মাঝে মাঝে দীর্ঘ সংলাপ। বিশেষ করে নিতাই ও শারদার সংলাপ —এই ত্রুটীর পর্যায়ে পড়ে। অবশ্য নিতাই এর সংলাপ মাঝে মাঝে

রসিকতার রসে সিক্ত—রসাল, বিশেষ করে সাহেবের স্বভাব বর্ণনায় তা স্পষ্ট। মুরলীধর ও মুকুন্দের কথোপকথনের মাধ্যমে কোলকাতার সরস বর্ণনায় পূর্ববঙ্গীয় ভাষার সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। তবে এখানেও দীর্ঘ সংলাপ নাটকের গতি ব্যাহত করেছে। অনাবশ্যক বর্ণনার ভারে নাটক বহু স্থানে বিসদৃশভাবে ভারাক্রান্ত হয়েছে। নাটকে ঘটনার ঘনঘটা নেই তবে সংলাপ উপভোগ্য করার আন্তরিক প্রচেষ্টার স্বাক্ষর সহজেই মেলে। পল্লীবাসীর কোলকাতা আগমন ও দর্শনের কৌতুককর অভিজ্ঞতা এবং কোলকাতা কাল্‌চারের স্বরূপ বিশ্লেষণের বৈশিষ্ট্য নাটকটির অতিরিক্ত আকর্ষণ। নিতাই ও গৌরমণির দাম্পত্য কথোপকথন নাটকীয় সংলাপের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সাধুতার আস্ফালনে নিতাই নিষ্ক্রিয়। সে রূঢ় বাস্তববাদী হিসেবী সংসারী লোক। দীর্ঘ সংলাপের দোষে নাটিকাটি যেমন কোথাও কোথাও ভারাক্রান্ত, নাটকের গতি মন্দীভূত, সদানন্দের যথোচিত সংক্ষিপ্ত সংলাপও তেমনি অন্যদিকে নাট্যসংলাপের গুণমণ্ডিত। মাষ্টারমশাই ও ছাত্রছাত্রী—সঞ্জীব ও পটলার সংলাপও কৌতুককর, স্বাভাবিক, নাট্যক্রিয়ার অনুকূল। সংলাপে **Humour** আছে **Wit** এরও কিঞ্চিৎ আভাষ মেলে তবে কিছুটা একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর। শেষাংশে মুকুন্দ ও মুরলীর সংলাপ সংক্ষিপ্ত এবং নাটকীয় গতিবেগ সৃষ্টির সহায়ক। নাটকে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়।

নিতাইএর মুখে পাড়াগাঁয়ের দোষ বর্ণনা দীর্ঘ সংলাপাশ্রয়ী। এতে মাত্রাধিক্য, অতিশয্য আছে তবে নাটকটির মূল বক্তব্যের সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে। সবচেয়ে উপভোগ্য সংলাপ উড়িয়া বামুনের। নাট্যকার বহু ভাষা জানতেন এটি তার প্রমাণ।

নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার বিষময় পরিণতি সম্বন্ধে সম্যক সচেতন নাট্যকার নাটকে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণ করতে পেরেছেন। নাটকে সংঘাত নেই—সংঘাতের সম্ভাবনা সহজ সমাধানের পথে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। নির্মম লাঞ্ছনা আর দুঃসহ অপমানে বিজড়িত মুরলীর আনন্দর দুরবস্থা দেখে তার প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন কাহিনী গুটিয়ে ফেলার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রতীকরূপে দেখা দিয়েছে। অবশ্য মুরলীর আচরণকে বাস্তবসম্মত করার প্রয়োজনে নাট্যকার কার্পণ্য করেন নি। আনন্দর পাওনাদারদের পাওনা মিটিয়ে তাকে রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব মুরলীর ওপর বর্তেছে। যুক্তি অবশ্যই আছে। শারদা তার কাছে কুললক্ষ্মী, তার পুত্রকন্যা, তার নাতিনাতনি-গলার হার, মাথার মণি। তার সব সম্পত্তি তাদের জন্যেই তো রেখে দিয়েছে সে।

অশান্তির শহর ছেড়ে শান্তির শহরে সকলের প্রত্যাবর্তন নাটকের মিলনান্ত সুরকে স্বাগত জানিয়েছে, সহজ সমাধানের পথ সুগম করেছে।

একাঙ্ক নাটকটিতে ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ততার সঙ্গে নাট্যকাহিনী বিন্যাসে—কাহিনীর ঠাসবুনুনি নেই—কেমন যেন আলগা খাপছাড়া যত্নবিহীন প্রয়াস

নাটক্যটিতে যত না নাটকের রস পরিবেশন করেছে তার চেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছে ছোটগল্পের মেজাজ ও মননের আচ্ছন্নতায়।

দর্শকদের প্রত্যাশা, গীতিপ্রধান রঙ্গনাট্যের গানগুলি কৌতুকপ্রদ হবে। ক্ষীরোদপ্রসাদ সে প্রত্যাশা অনেক নাটকেই পূরণ করেছেন। তবে গানগুলির জাতি বিচারে দেখা যায়—সব গানগুলিই নির্ভেজাল হাস্যরস সৃষ্টি করতে পারে নি। কোথাও কোথাও হাস্যরসে বিদ্রূপের কশাঘাত তিক্তরসের অবতারণা করেছে—ব্যঙ্গের বক্রোক্তিতে হাস্যরসাত্মক গানের বাণী স্বকীয়তা হারিয়েছে। ভূতের বেগার নাটিকাটি রঙ্গনাট্যের পর্যায়ভুক্ত হলেও তার সঙ্গীতগুলি সবক্ষেত্রে কৌতুকপ্রদ নয়—কিংবা নির্ভেজাল হাস্যরসের আধাররূপে ভূতের বেগার নাটকটিকে গণ্য করা যাবে না। চাকুরীগত প্রাণ বাঙালীর চাকুরী প্রিয়তার ওপর কটাক্ষপাত করে একটি গানের মাধ্যমেই তাই নাটকটির শুরু।

চাকরী চাকরী চাকরী (ওগো)
বাবুরা চাকরী নিয়ে গেছে সদরে।
কলম পিষে দিবারাত
দুবেলা জোটে না ভাত
বসে বসে গেঁটে বাত—(অফিসে)
(কেবল) লোক দেখানো দেঁতো হাসি মাখা অধরে।···

রঙ্গনাট্য হলেও এটির বৈশিষ্ট্য কয়েকটি দৃশ্য সংলাপবিহীন, শুধুমাত্র গীতিসর্বস্ব—যেমন প্রস্তাবনা দৃশ্য, প্রথম অঙ্কের ২য় ও ৪র্থ দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কের ৩য় ও ৫ম দৃশ্য ও বিশেষ করে শেষ অঙ্কের উজ্জ্বল দৃশ্য। উল্লিখিত দৃশ্যগুলির শুধুমাত্র গানই সম্বল।

নাট্যকার-চিহ্নিত রঙ্গনাট্যটির সব কটি গান থেকেই প্রত্যাশিত রঙ্গরসিকতা যে স্বতঃউৎসারিত নয় সেকথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সঞ্জীব ও পটলার—'ব্রিঙ্জেল বার্ত্তাকু কোকম্বর শশা···' গানটির বাণী ডি. এল. রায়ের হাসির গানের বাণীর অনুরূপ। গানটি হাস্যরসাত্মক ও মজাদার। দ্বিতীয় অঙ্কের ৩য় দৃশ্যের উড়িয়া চাকর ও তার স্ত্রীর দ্বৈত সঙ্গীত উপভোগ্য। ৫ম দৃশ্যের গান—ধর্মতলার মোড়ে বিলাসিনীগণের কণ্ঠে—কিন্তু মোটেই হাস্যরসাত্মক নয়, নির্জলা ব্যঙ্গাত্মক এবং গ্রামবাংলার গতানুগতিক জীবনের প্রতি কটাক্ষপাতের উপাদান সম্বলিত।

শেষে উজ্জ্বল দৃশ্যের সংযোজক গানটি গুরুগম্ভীর, রঙ্গনাট্যের পক্ষে কিছুটা বেমানান।

॥ কিন্নরী ॥

নাটকটি মিলনান্ত। এর বহুলাংশ কৌতুক প্রধান। মর্তের মানুষ সুধন ও কিন্নরী-লোকের কিন্নরী ভদ্রার প্রেম বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছে। নাটকটি কাহিনী প্রধান বা কৌতুকপ্রধান হলেও এতে মানুষের জয়গান সগর্বে ঘোষিত হয়েছে। মানবতার অন্যতম শর্ত করুণার অজস্র বর্ষণে নাটকটির কাহিনী অভিষিক্ত। কৌতুক, কৌতূহল রোমান্স, অদ্ভুত পরিবেশ, কৌতুকগীতি-সব কিছু মিলিয়ে নাটকটি জমজমাট।

কাহিনীর সূচনা দুইদিক দিয়ে। একদিকে মর্তের রাজপরিবার, ধনপতি রামা ও সুধন। অন্যদিকে কিন্নর রাজা পরিবার ব্রহ্মদত্ত, বিতস্তা ও ভদ্রা। এদের মাঝে ব্যাধদম্পত্তি উৎপল ও মাকড়ীর বিশেষ ভূমিকা। দুটি পরিবারের পারিবারিক তথা রাজ্যের সমস্যার উৎপত্তি যথাক্রমে পাত্রী ও পাত্র নির্বাচনের ব্যাপারে। দুটি ক্ষেত্রেই পাত্রপাত্রীর নিজস্ব পছন্দের স্বাধিকার ঘোষণায় রাজার ও পিতার আভিজাত্য বোধ ও জিদ অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে-অথচ নাটকীয় সংঘাতের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সুধন ভেবেছিল বিবাহ সে করবে না। কিন্তু সে পিতার একমাত্র পুত্র। বংশরক্ষার অজুহাতে তার বিবাহ না করার ঘটনায় পিতার সাবধান বাণী—তিনি নিজেই বিবাহ করে বংশ রক্ষা করবেন। তার অনিবার্য ফলশ্রুতি সুধনের মাতার মর্যাদা ও অধিকারে প্রচণ্ড আঘাত ও চ্যালেঞ্জ। মাতৃভক্ত সন্তান শেষ পর্যন্ত বিবাহে মত দেয় তবে শর্ত—নিজের পছন্দমত পাত্রীকে বিবাহ করবে। নাট্যকাহিনীতে এই আধুনিকতার বলিষ্ঠ প্রকাশে নাট্যকার নিঃসন্দেহে অভিনন্দিত হবেন।

নাটকের শুরুতেই নাট্যসমস্যার সূত্রপাত। পিতার নির্বাচিত পাত্র যদি কন্যার মনোনীত না হয়? আধুনিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ—সামাজিক নাটকের সমস্যাকে এই নাটকে সুন্দররূপে নাট্যসমস্যার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে। মানুষকে যদি কখনও দেখ নি তবে-তাকে হীন বললে কেমন করে? ভদ্রার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও মনুষ্যজাতির প্রতি এই শ্রদ্ধার ভাব নাটকীয় পরিণতি ও তার চরিত্র বিকাশের পথে সহায়ক হয়েছে। মানুষকে ছুঁলে কি হয়? বিতস্তা মানুষ্য-লোক থেকে ফিরে আসা তার সখী সুভদ্রাকে জিজ্ঞেস করায় নাট্যকৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। নাট্যবীজের সূত্রপাত বিতস্তার সংলাপ থেকে। অবাধ্য কন্যার প্রতি বিরক্তি থেকে যে ভবিষ্যাৎবাণীর উদ্ভব তাই শেষ পর্যন্ত নাট্য পরিণতি হিসাবে গণ্য হল। শোনবার সঙ্গে সঙ্গে অভিসম্পাত-আমাকে মানুষের দাসী হতে হবে? দৃঢ়চেতা

আত্মমর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিতা ভদ্রার প্রতিজ্ঞা, যে তার রূপের লালসায় দাসী হতে তাকে গ্রহণ করতে আসবে তাকে সে প্রত্যাখ্যান করবে। উপযাজক হয়ে তাকে বরণ করতে গেলেও সে যদি আমাকে গ্রহণ করতে না চায় তবু আমি তার। আমার এমনই কি দুর্ভাগ্য হবে দেব, যক্ষ, গন্ধর্বাদির ভিতরে সে রূপ পুরুষ পাবো না ? সে পুরুষপ্রবর কি মানুষ ? এ জিজ্ঞাসার উত্তরেই তো নাট্য কাহিনীর গ্রন্থনা।

বিদূরথ প্রমোদরঞ্জন প্রভৃতি নাট্যকাহিনীতেও অনুরূপ মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে অন্যের কৌতূহল নাট্যকাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুভদ্রার অভিজ্ঞতার আলোকে মনুষ্য চরিত্রের সুন্দর বিশ্লেষণ নাট্যকারের কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাদের রূপ আমাদের মত চিরস্থায়ী নয়ঃ সেখানকার সুন্দর কালে কুৎসিৎ। কুৎসিৎ ভীষণ হয়। এখানে যেমন গুণের অনুযায়ী রূপ, যে ভাল সে দেখতেও ভাল, যে মন্দ সে দেখতেও মন্দ সেখানে সে নিয়ম খাটে না। সেখানে সুন্দর আবরণের মাঝখানে পিশাচ লুকিয়ে থাকে। এর চেয়ে সহজ করে মানব চরিত্র বিশ্লেষণ সম্ভব কি ?

প্রেমাঞ্জলিতে নারদকে নিয়ে মেয়ে মহলের যে কৌতুক, সুভদ্রার পাণিপ্রার্থী উপযাজক দেবতাকে নিয়েও সে ধরনের কৌতুকের পরিবেশ একটা সৃষ্টি হচ্ছিল-তা পরিণতি লাভ করলে নাটকের পক্ষে মারাত্মক হতে পারত, কাহিনী গ্রন্থনায় শৈথিল্যও দেখা দিত। কিন্তু নাট্যকার সচেতন। এ দেবকুমারকে পরে মহৎ কার্যে নিযুক্ত করতে হবে। সুতরাং এ কৌতুকের পরিধি কেবলমাত্র রঙ্গরসিকতা ও ভদ্রাকে লুকিয়ে রাখার কৌতুকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। কিন্নরীদের রূপে বিভ্রান্ত দেবকুমার ঠিক এই পরিবেশে যেমন অপ্রতিভের মত নাট্যকারের অন্যান্য চরিত্রে আচরণ করে থাকে ঠিক তেমনই আচরণ করেছে।

চিন্তিত রাজা ব্রহ্মদত্ত সুভদ্রার মুখে যা, শুনলেন তাতে যেমন নাটকীয় চমক তেমনি সুভদ্রার সংলাপে আসল রহস্য প্রকাশে মন্থরতা নাট্য কৌতূহল জাগিয়ে রাখার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

দেবকুমার সুভদ্রার প্রেমে হাবুডুবু। তার উপস্থিতিকে হাস্যরসের আধার করে দেখানো হয়েছে। সুভদ্রা রাজকন্যা হোক বা না হোক তাকেই সে বরণ করবে স্ত্রী বলে—এখানে প্রত্যাশিত রোষের বদলে তার অদৃষ্টকে স্বীকার করে নেওয়ার প্রশান্তি নাটকটিকে মহান ভাবাদর্শে অভিষিক্ত করেছে।

ভদ্রারই অবাধ্যতার কল্যাণে তার সখী সুভদ্রা দেবতা-স্বামী লাভ করার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু যার প্রতারণায় কিন্নরকুল অপরাধী সেই অবাধ্য কন্যা ভদ্রার ললাটে পড়ল বর্জনের ছাপ-নরলোকে নির্বাসন। কাহিনী বিন্যাসে এর প্রয়োজন ছিল। অথচ সে প্রয়োজন সিদ্ধ হল স্বাভাবিক ঘটনা পারম্পর্যে।

কি অদ্ভুত পরিণাম। যার জন্যে নির্বাসন, যাকে এড়িয়ে চলার জন্য এত আপ্রাণ চেষ্টা, কঠোরতা, অদৃষ্টের এমনই লীলা সেই আদেশই মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্টতার সুযোগ করে দেয় ভদ্রার। এই তো নাটকীয়তা। রবাহূত, অপ্রত্যাশিত অবাঞ্ছিতের আগমনের পথ সুগম করে দেওয়া। নির্জন বনে ভদ্রার এই একাকীত্ব শকুন্তলা ও কপালকুণ্ডলার কথা মনে করিয়ে দেয়।

অনুরূপ ঘটনার সমাবেশ নাটকের নায়ক চরিত্রকে কেন্দ্র করে। বিবাহের শর্ত অদ্ভুত। প্রথমত সে বিবাহে অনিচ্ছুক, কিন্তু মা বামাদেবীর বক্তব্য—এতে করে রাজার বংশলোপ পাবে কারণ সেই একমাত্র পুত্র। পিতার মনোনীতা নয় নিজের মনোনীতা কন্যাকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে রাজী হয় সুধন। সংঘাতের সূত্রপাত এবং এখান থেকে নূতন ঘটনার ইঙ্গিত। পাত্রী মনোনয়ন নিয়ে সম্ভাব্য সংঘাতের পটভূমি তৈরি করে নিয়েছেন নাট্যকার।

এক বৎসরের সময়ের পরিবর্তে শেষ পর্যন্ত রফা হয়েছে সুধনের এক সপ্তাহের সময়। সুধন রাজার পুত্রবধূ বলে যাকেই নির্বাচন করবে রাজা নির্দ্বিধায় তাকে গ্রহণ করবেন। অন্যথায় যা করণীয় তিনি করবেন। নাট্যকাহিনীর জটিলতার সূত্রে কাহিনী এগিয়ে চলেছে আপন গতিতে। কাহিনী ও পরিস্থিতির জটিলতা সৃষ্টিতে নাট্যকার নাট্যরস জমিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সুধন বুঝতে পেরেছে পিতার মনের কুবাসনার কথা—তাই তাকে বেশী সময় দিতে তিনি নারাজ।

নাটকে প্রত্যাশিত রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস বহুলাংশে সাফল্যমণ্ডিত। গুজব ও জনশ্রুতির প্রকৃতি আরও একবার সুন্দররূপে প্রকাশিত হয়েছে। সবাই বিশ্বাস করেছে ভদ্রা কিন্নরী এবং রাক্ষসীর সগোত্রা। সব নাটকেই সাধারণ পথিক বা নাগরিক অজ্ঞানতা প্রসূত সহধর্মী আচরণ করেছে।

সামাজিক বৈষম্যের পরিণতি দেখানো হয়েছে উৎপলের ক্ষুব্ধ সিদ্ধান্তে। 'বাড়ীতে গিয়ে না খেয়ে শুকিয়ে মরব। তার চেয়ে একেবারে রাক্ষসীর পেটে ঢুকে নিশ্চিন্ত হই।' নাটকে ভাবসমৃদ্ধি ঘটাবার চেষ্টা আছে, ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্য নাটকেরই মত। সুধনের বক্তব্য—যার মুখে অপূর্ব সুরের গান, সে কখনও রাক্ষস হতে পারে, অসম্ভব! ভদ্রার নির্জনত্ব নাট্যকাহিনী গ্রন্থনে প্রয়োজনীয় উপাদান। সুধনকে দেখে তার জিজ্ঞাসা—'এই সেই তথাকথিত অস্পৃশ্য মানুষ—এত সুন্দর। সবাই বললে অধম। সমস্ত জেনে তোর অধমে দৃষ্টি টানে কেন?' Love at first sight এর বাস্তবায়ন। ভদ্রাকে ফিরতেই হবে। তার নিজস্ব পছন্দের মতবাদ সে বিসর্জন দিয়ে পিতার মনোমত পাত্রকেই বরণ করে নেবে।

মানুষ সম্বন্ধে কিন্নর লোকের ভুল ধারণা-রূপের অনুযায়ী গুণ হয় না। সেই সন্দেহ বাধার সৃষ্টি করে নাট্য জটিলতা সৃষ্টি করেছে। তাই ভদ্রার আফশোষ

…কিন্নরী না হয়ে যদি মানবী হতুম। এরপর নাটকে অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ফলে নাট্যরস ক্ষুন্ন হয়েছে।

ধনপতি চরিত্রটি যে ভাবে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত করে চিত্রিত করা হচ্ছিল পরে তা যে লঘুচরিত্রে রূপান্তরিত হতে চলেছিল তার উদাহরণ—'ওই বাপ বলেই কাত। এখন বুঝতে পারলে বিপদ কি। গ্রাম্য পুরোহিতকে আনা হয়েছে তার সংস্কার সমেত। পুরোহিতের মুখে কিন্নরীর শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা শুনে ধনপতি আবার রসিকতায় মুখর। গুরুগম্ভীর পরিবেশে এই ধরনের লঘু আচরণ ক্ষীরোদ নাট্যের অন্যতম ত্রুটী। এই ত্রুটীর স্বপক্ষে অবশ্য একটি কথা বলার আছে, হাস্যরসের অবতারণা এতে ভালভাবেই হয়েছে।

ভদ্রার মুখে পুত্রের রূপের প্রতি শ্রদ্ধা লক্ষ্য করে ধনপতি আবার নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে। ধিক্ আমাকে! শতধিক্! এই সরলতার সুবর্ণ প্রতিমাকে আমি 'নিশাচরী' কল্পনা করেছিলুম। রামাদেবীর ধারণায় সব মীমাংসা হয়ে গেছে। মণিসমেত ভদ্রা আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু বিবেচক ধনপতি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মনুষ্য রাজ। বুদ্ধিমতী ভদ্রা তার কথার তাৎপর্য ঠিকই বুঝে নেয়। এখানে নাটক প্রত্যাশিত শিল্প কর্মমণ্ডিত।

নূতন নাট্য সমস্যার সূত্রপাত মানুষের জয়গান নাটকে মাঝে মাঝে শুনিয়েছেন নাট্যকার। 'মানুষ দেখিনি যখন দেখেছি তখন আমার চোখে দেবতা গন্ধর্ব মলিন হয়ে গেছে। সেই তোমরা আমার কাছে চোর হবে? অনুমতি না দেয় স্বামীর দোহাই দিয়ে চলে আসবো। আবদ্ধ ঘরে, চিরজীবন কাঁদবো। আর সমস্ত আকাশ? ভরে মানুষের জয়গান করবো।' এ যেন সেই মঙ্গলকাব্যের মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপন —অবশ্য সজ্ঞানে, সচেতনভাবে।

পাছে যাত্রা ব্যাহত হয় তাই ভদ্রা দয়িতের সঙ্গে দেখা না করেই চলে যায়। সুধন উম্মত্তের মত অলৌকিক ভাবে তার অনুসরণের সিদ্ধান্ত নেয়।—এখানে কাহিনী হঠাৎ বাস্তব জগতের মাটি ছাড়িয়ে উর্ধমুখী। এই দুঃসাহসিক অভিযানে মাকড়ী ও উৎপল সুধনের সঙ্গী হতে চাইল। কিন্তু ঋষি বল্কালায়নকে এনে তার মুখ দিয়ে বলানো হল, 'কিন্নর লোক মানুষের পক্ষে দুরাধিগম্য নয়—একেবারে অগম্য। এ দৃশ্যে ঋষির দীর্ঘ সংলাপ সম্পূর্ণ বেমানান ও অনাটকীয়! তবে তার অভিজ্ঞতা থেকে পথের নিশানা পায় মাকড়ী ও উৎপল—সেইটুকুই যা কাহিনী গ্রন্থনের চাহিদা মিটিয়েছে।

ব্রহ্মদত্ত বিশ্বাস করতে রাজী নয় তার কন্যাকে মানুষে ধরে নিয়ে গেছে। ভদ্রার নাটকীয় অপ্রত্যাশিত প্রবেশ সঙ্গে সঙ্গে সে সন্দেহের নিরসন করেছে। নাটকের ঝিমানো ভাব উদ্দীপিত হয়েছে।

যা অকল্পনীয়, অসম্ভব শেষ পর্যন্ত তাই ঘটেছে। ভদ্রার মুখে স্বীকারোক্তি।

আমাকে মানুষে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।···সেই মানুষই তার স্বামী। 'অভাগিনী নই মা, আমি ভাগ্যবতী।' কিন্তু ভদ্রার এ প্রেম কি শুধুমাত্র স্বর্গীয়? এর মধ্যে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় দেহবাদ। সে আমার মুখের ওপর মুখপদ্ম সন্নিবিষ্ট করে নিজ বাহুদ্বয় দ্বারা আমার দেহ নিপীড়িত করে···আমার অধর পরিস্ফুট করে এক অপূর্ব আনন্দজনক স্পর্শসুখ আমাকে ভিক্ষা দিয়েছে।'

এই প্রসঙ্গে রাজার বন্য ক্রোধ, কন্যার কেশ আকর্ষণ ও প্রহারের চেষ্টা—একটু কেমন বেখাপ্পা, বেমানান। সুভদ্রা মধ্যস্থতা করে পারিবারিক প্রীতি ও স্নেহের পুনরুজ্জীবন ঘটাবার চেষ্টা করেছে। কন্যা মোহগ্রস্তা, তার টোটকা চিকিৎসার আয়োজন, জোর করে তাকে ধরে রাখার গ্রামীণ চেষ্টা নাটকে অযথা জটিলতার সৃষ্টি করেছে, নাট্যরস জমে ওঠে নি। নাটকের শেষাংশে কাহিনীর ঘটনা কিছুটা জোলো। ঘটনা নির্ভরতা বেশী—সংলাপের প্রাধান্যও কম।

নাটক শেষ করতে গিয়ে নাটকের কাহিনীকে আর একবার ঘুরিয়ে দেবার শেষ সুযোগ গ্রহণ করেছেন নাট্যকার।

কিন্নররাজ সঙ্গত কারণেই কন্যাকে যোগ্য পাত্রে সমর্পন করতে চান। ভদ্রার নির্বাচিত পাত্রকে যদি স্বামী বলে স্বীকৃতি দিতে হয়—পূর্ণ পরীক্ষা করে তাকে গ্রহণ করতে হবে। নিজেকে কিন্নরের খাদ্য হিসাবে অর্পন করতে চেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় সুধন। দেবকুমার হাত ধরে তুলেছে সুধনকে। বলেছে 'করুণার দেহ মৃন্ময় হয় না চিন্ময় হয়।'

নাটকের শেষেও মানুষের জয়গান ঘোষিত হয়েছে। তুমি যদি মানুষ হও—দেবতা কিন্নর গন্ধর্ব আজ আমার সঙ্গে মানুষকে অভিবাদন করুক। ব্রহ্মগুপ্তের মন্তব্য, অতি শুভক্ষণে রাজা তোমার ওপর ক্রোধ করেছিলেন। অতি শুভক্ষণে আমি তোমায় বিন্ধ্যাচলে রেখে এসেছিলুম।

নাটকে এ যেন Comedy of errors। রাজার ভুলে মিলনান্ত নাটকের পরিণতি। উৎপল ও মাকড়ী আমন্ত্রিত। নূতন দৃষ্টিভঙ্গি—তারাও আজ অপাংক্তেয় নয়, এ যেন তার স্বীকৃতি।

শেষ দৃশ্যের বৈশিষ্ট্য—সংক্ষেপে এখানে ইতিহাসের পটভূমি তৈরি করা হয়েছে। ভদ্রা সুধন ফিরে এসেছে বাবা মার কাছে। সঙ্গে ব্রহ্মদত্ত উপঢৌকন নিয়ে অতিথি। ঋষির আবির্ভাব। এই রাজপুত্রই ভবিষ্যতে করুণাবতার শাক্যসিংহ। আর এই কিন্নরীই তার প্রিয়তমা মহিষী গোপা।

সমাপ্তিসঙ্গীত অন্য নাটকের অনুরূপ—রোমাণ্টিক, পরিবেশানুগ গান।

অন্য নাটকের মত এ নাটকও সংলাপসমৃদ্ধ। মানুষ সম্বন্ধে দেবতার দার্শনিক সংলাপ নাটকের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করেছে। মানুষ নিকৃষ্ট, মানুষ আবার শ্রেষ্ঠ। মানুষ মর, মানুষ আবার অমর। নাটক স্থানে স্থানে সংলাপ ভাবসমৃদ্ধ, অথচ

চরিত্রানুগ। 'আমি প্রফুল্লচিত্তে নিকৃষ্ট অপবিত্র মানুষের দেশে পা দিতে চললুম।' নাটকের প্রথমে যে ইঙ্গিত ছিল তা এইভাবে পূর্ণ হল।

নির্জন বিন্ধ্যাচল প্রদেশে নির্বাসন দিতে এসেছে রাজাদেশে মন্ত্রী উপগুপ্ত। তার হৃদয় ভারাক্রান্ত, পিতৃহৃদয় দলিত। কঠোর রাজাজ্ঞার কাছে সখিগণ ও সুভদ্রার আবেগও স্তব্ধ। মমতায় স্নিগ্ধ সংলাপে উপগুপ্ত পরিবেশের মধ্যে এক অপূর্ব রোমাঞ্চ ও রোমান্স ও এর সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করেছে এবং সে চেষ্টা বহুলাংশে ফলবতী হয়েছে।

যখন সুধন জালের দাম দিতে চাইলো লাখ টাকা তখন মাকড়ী চমৎকার সংলাপে ব্যাপারটাকে নিষ্ঠুর ঠাট্টা বলে বর্ণনা করল। এ সংলাপ অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক এবং 'হিউমারাস।'

'মার দেবার সূচনা করছে—পালিয়ে আয় মিন্‌সে—পালিয়ে আয়। একজন এর দাম ব'নাকাড়ি দিতে চেয়েছিল। কেবল একজন জেলে একসের পুঁটিমাছ দিতে চেয়েছিল। তারপর কেউ কানমলা দিয়েছে, কেউ ঠোনা, কেউ চড়—রাজার বাড়ি বেদম মার। দেবতা এবার গলা টিপে মেরে ফেলবে। পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়।' নাটকে এই জাল হস্তান্তরেরও একটা প্রয়োজন আছে, সুতরাং এ নিয়ে সংলাপের জাল অপ্রয়োজনীয় নয় বরং নাটকের পক্ষে আকর্ষক।

ভদ্রার রূপদর্শনে সুধনের বক্তব্য দার্শনিক সংলাপের পর্যায়ে পরে। 'এ রূপ আপনাকে আপনি আলিঙ্গন করেছে—গলে যাচ্ছে।'

ভদ্রা হাত ধরে বাধা দিতে গেল সুধনকে। প্রত্যাশিত স্পর্শানুভূতি। ভদ্রার সঙ্গত সংলাপ। নাটকে দেহবাদের সুন্দর প্রতিষ্ঠা। 'ছেড়ে দাও, আর আমি আত্মহারা হতে পারবো না। ছেড়ে দাও। এ কোমল স্পর্শ আমি স্বপ্নেও কখনও অনুভব করি নি।···সখী বলেছিল, মানুষ ছুঁলেই মরে যাব। সেই মৃত্যু বুকের পথ দিয়ে আসছে নাকি?'

কিন্নরী নাটকে সঙ্গীতের প্রয়োগ বহুলাংশে নাট্যকাহিনীর বিস্তৃতি বা চরিত্র বিকাশের পক্ষে সহায়ক হয়েছে। ত'ছাড়া রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টিতে পরিবেশানুগ সঙ্গীতের প্রয়োগ খুবই কার্যকরী হয়েছে। আলিবাবা নাটকের পর যে নাটকে অধিক সংখ্যক সঙ্গীত সংযোজিত হয়েছে—তার মধ্যে বোধ হয় কিন্নরীই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

প্রস্তাবনায় গীত—রোমান্টিক সম্ভাবনার ইঙ্গিত গানটি নাটকের প্রয়োজনীয় অঙ্গ। ভদ্রা সুভদ্রাকে জিজ্ঞেস করে সে দেবকুমারকে দেখেছে কিনা। সুভদ্রা গানে তার উত্তর দিয়েছে।

'মনে হয় যেন তারে দেখেছি
চোখ দিয়ে কি মন দিয়ে সই
সেইটি কেবল ভুলে গেছি।'—এ গান সংলাপের অঙ্গীভূত।

কিন্নরীরা রোমাণ্টিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য গান গেয়েছে।

'যারে না দেখে প্রাণটা উড়ে গেছে
তারে দেখে না জানি হবে কি?

দ্বিতীয় দৃশ্যে সখিগনের হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াসাত্মক গান লক্ষণীয়। সুভদ্রাকে বেষ্টন করে সখিগণের প্রেমের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য গানও উপভোগ্য। তবে রীতির দিক দিয়ে কতকটা যাত্রার অনুগামী। একই দৃশ্যে সুভদ্রার আবার গান কাহিনীর গতিকে বিলম্বিত করেছে। গানটিতে নিজের ভাগ্য সম্বন্ধে আশা নিরাশার এক অপূর্ব শিহরণ।

তৃতীয় দৃশ্যে ভদ্রা নিজে মর্তের মানুষের দেশে পা দিতে চলেছে। তার বেদনার্ত হৃদয় নিষিক্ত গান নাটকের প্রথমে যে ইঙ্গিত ছিল তা পূর্ণ করেছে।

২য় অঙ্কে ১ম দৃশ্যে নির্বাসিতা ভদ্রা নির্জন পরিবেশে গান গেয়েছে। এ নাটকে গান অজস্র ধারায় বর্ষিত হয়েছে। নির্জন একাকীত্বে গান আসাই স্বাভাবিক। চতুর্থ দৃশ্যে বকালায়নের ধর্মীয় উপদেশমূলক গান নাটকের পক্ষে খুব বেশী প্রয়োজনীয় নয়।

মাকড়ী ও উৎপলকে টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সুধন। সে আশাতীত আনন্দে আত্মহারা দম্পতির চমৎকার গান সার্থক পরিবেশানুগ।

ভদ্রার বিরহ বেদনায় বেদনার্ত উৎপল ও মাকড়ীর প্রবোধজ্ঞাপক গান। নানাভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে বিভিন্ন চরিত্র গানের আশ্রয় নিয়েছে।

তৃতীয় অঙ্কে ৩য় দৃশ্যে—শূন্যে অবস্থিতা ভদ্রা, কিন্তু গানটি হল সুধনের প্রতি নির্দেশসূচক। তাৎপর্যপূর্ণ গান-ইঙ্গিত-ধর্মী। যত রকম উপায়ে গানকে ব্যবহার করা যেতে পারে তার চেষ্টা হয়েছে। একই দৃশ্যে ঋষি বকালয়নের গম্ভীর শ্লোকের গান মাকড়ী ও উৎপলের সংলাপের মাঝে কৌতুকরসে বাধার সৃষ্টি করেছে। পরে উৎপল মাকড়ীর দ্বৈত সঙ্গীতে একই কলির পুনরাবৃত্তি একঘেয়েমি এনে দিয়েছে।

ভদ্রাকে ব্রহ্মদত্ত গ্রহণ করুক, আদর করে ঘরে স্থান দিক—এই অনুরোধ জানিয়ে গানকে সংলাপের অঙ্গীভূত করার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। ৬ষ্ঠ দৃশ্যে কিন্নরীদের জল তুলতে এসে গান নাটকের পক্ষে অপরিহার্য ছিল না।

সমাপ্তি সঙ্গীত ক্ষীরোদ নাট্যের বৈশিষ্ট্যসূচক—মিলনান্ত নাটকের অনুরূপ।

॥ জয়শ্রী ॥

জয়শ্রী নাটকের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বাংলা নাটকে অভিনব। মাত্র একদিনের উৎসবের কাহিনী এর উপজীব্য। দৃশ্য পরিকল্পনা, নির্দেশনা ও নিখুঁত বর্ণনা ক্ষীরোদনাট্যসাহিত্যে জয়শ্রী নাটকটির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান নির্দেশ করেছে।

নাটকের কাহিনীটি ছোট গল্পের লক্ষণাক্রান্ত। নাটিকার অঙ্গিকে একটি ঘটনা-বহুল ছোটগল্প যেন পরিবেশন করা হয়েছে। অবন্তীরাজ্যে স্বাধীনতা স্মরণ উৎসবের আয়োজন চলছে। উৎসবের বৈশিষ্ট্য পুরবাসী বা পুরনারীরা সে দিন সবাই স্বাধীন। সুরাপান এই স্বাধীনতার একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। এইদিন রাজা রাজা নয়, বিধি রাজা। রাজায় প্রজায় এই একটি দিনমাত্র কোন প্রভেদ থাকে না। রাজা রাণী রাজকুমারী যে কোন ব্যক্তির মুখে প্রজারা সুরাপাত্র তুলে ধরলে অন্ততঃ একবিন্দু সুরাও পান করা প্রথা। সুরা প্রত্যাখ্যান করার অর্থ প্রজার প্রতি অমর্যাদা করা। নাটকে এই অনুশাসনকে কাজে লাগানো হয়েছে কাহিনী বিন্যাসে। কাহিনী বিন্যাসে প্রথার আর একদিককেও কাজ লাগানো হয়েছে। স্মরণ উৎসবের সেই নিষ্ঠুর দিকটি হল—রাজার নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে, উৎসব এলাকার মধ্যে কারো, বিশেষ করে কোন বিদেশীর প্রবেশাধিকার নেই। রাজার দেহরক্ষী নারী সেনাদের ওপর দায়িত্ব—নির্বিচারে তারা নির্দিষ্ট গণ্ডী উত্তীর্ণকারীকে বল্লমের মুখে বিদ্ধ করবে। মালবের রাজহস্তী চালক মহিরঙ্গপত্নী যশোমাকে নিয়ে নাট্যসংঘাতের সূচনা। ক্ষুধার জ্বালায় রাজদর্শনের আকুল আগ্রহে নির্দিষ্ট গণ্ডী পার হয়েছিল যশোমা। পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু। নাটকের কাহিনীর পটপরিবর্তন ঘটালেন নাট্যকার। নাটকীয় আবির্ভাব কৌশাম্বী যুবরাজ উদয়নের। কিন্তু সেই ক্ষীরোদ-নাট্যের বাঁধা ছক ছদ্মবেশের মাধ্যমে শবরবেশে। সঙ্গে মা সুমিত্রা। অদ্ভুত ব্যক্তিত্বে সে আকৃষ্ট করলে একের পর এক সুষেনা ও দেবসেনাকে। নির্দিষ্ট গণ্ডী পার হয়ে রক্ষা করল যশোমাকে। কাহিনী বিন্যাসের সচেতনতায় নাট্যকার পুরোহিতকে দিয়ে প্রচার চালালেন—মালবের যুবরাজ প্রবর সেনের সমর্থনে। নাট্যসংঘাত সৃষ্টির জন্য নাট্যকার সঙ্গত কারণেই প্রবর সেনের সমর্থনে—অর্থাৎ প্রতি নায়কের দাবি জোরদার করার জন্য প্রচার করেছেন বেদব্রাহ্মণ রাজার প্রতি মালবের আছে অকুণ্ঠ ভক্তিশ্রদ্ধার নিদর্শন। বোঝাতে চেয়েছেন, প্রজাদের যে মালব যুবরাজ প্রবর সেনের সঙ্গে বিবাহ হলে সনাতন বৈদিক ধর্মের মর্যাদা রক্ষা পাবে—কৌশম্বী যুবরাজ বিধর্মী, তাছাড়া তার পরিচয়েরও স্বীকৃতি নেই।

কাহিনী বিন্যাসে নাটকে এই প্রচারের সমর্থনও মিলবে। উদয়ন নিজ শক্তি বলে পিতার হৃতরাজ্য উদ্ধার করেছে। কিন্তু প্রজাদের কাছে নিজ পরিচয়ের চিহ্ন দেখাতে পারে নি। তাই নিজেই রাজ্য ত্যাগ করে চলে গেছে।

শেষ পর্যন্ত কাহিনীর পরিণতি শবরবেশী উদয়নের সঙ্গে জয়শ্রীর মিলনে। বাঞ্ছিত মিলনের পরিণতিতে পেঁছিতে যতখানি নাট্যসংঘাতের প্রয়োজন ছিল, নাটকে ততটা নেই। পুরোহিত পুত্র উদ্দালক মালবরাজ প্রবর সেনের বিবাহের জন্য সচেষ্ট হলে কি হবে—ব্যক্তিত্বের যতটুকু জোর থাকলে একজনকে আকর্ষণ করা যায় —সে জোর প্রবর সেনের মধ্যে ছিল না—জোর ছিল শুধু জোর করে প্রথার সুযোগ নিয়ে—জয়শ্রীর মুখে সুরাপাত্র তুলে দেওয়ার অক্ষম প্রচেষ্টায়। জয়শ্রীর নিজের তেজ ও দৃপ্ত প্রতিবাদের বন্যায় প্রবর সেনের ইতর প্রচেষ্টা কোথায় যে তলিয়ে গেছে তার ঠিকানা মেলে নি। জয়শ্রীই একমাত্র চরিত্র যা উৎসব মুখরতার ব্যতিক্রম।

নাটকটির কাহিনী বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য আর একদিক দিয়ে। মাত্র একদিনের উৎসবমুখরতার পটভূমিতে নাটকটি রচিত। সবটাই মনে হয় যেন স্বপ্ন। নাটকটিতে নারী প্রাধান্য লক্ষণীয়। রাজার দেহরক্ষী পর্যন্ত নারী। নাটকটির কাহিনী গ্রন্থনায় এই ঘটনা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। নারীসেনা—দেবসেনা ও সুষেণা প্রতিজ্ঞাবদ্ধা নারী হলেও তারা কর্তব্যরতা নিষ্ঠুর সৈনিক। কাহিনীর চমৎকারিত্ব সেখানে যেখানে উদয়নের ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষ সুপ্ত নারীত্ব জাগিয়ে তুলেছে। মুগ্ধ বিস্ময়ে তারা কর্তব্যের কথা ভুলে গিয়ে উদয়নকে ছেড়ে দিয়েছে।

নাটকটির নাট্য সংঘাতের কেন্দ্রস্থল—বর্বর প্রথার প্রতি আনুগত্যের সংস্কার। উৎসবের দিনে রাজা প্রজা এক সমান। যে কেউ সুরাপাত্র মুখে তুলে দেবে তা গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করা নীতিবিরুদ্ধ। এই সুযোগ নিতে চেয়েছেন প্রবর সেন —পুরোহিত পুত্র উদ্দালকের প্ররোচনায়। জয়শ্রীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞার দীপ্তিতে নাট্য-কাহিনীর ঔজ্জ্বল্য বেড়েছে। সে মৃত্যুবরণ করবে তবু পানপাত্র প্রবর সেনের হাত থেকে গ্রহণ করবে না। প্রজারা সবাই খুঁজছে রাজকুমারীকে—তাকে নিয়ে তারা আনন্দ করবে। রাজা আশ্বাস দিয়েছে জয়শ্রীর মুখে পানপাত্র তুলে দিলে নিশ্চয়ই সে গ্রহণ করবে। স্বয়ং রাজারও তা প্রত্যাখ্যান করার সাধ্য নেই। কারণ ঐ দিন রাজা রাজা নয়—বিধি রাজা। নাট্যসংঘাত জমাবার চেষ্টা এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবিলায়, যদিও এই শক্তির গভীরতা প্রকাশ পায় নি—রাজা চরিত্রটির যথোচিত দৃঢ়তার অভাবে। এই সংঘাতের আবর্তের মাঝখানে উদয়নের আবির্ভাব—নাট্য আকস্মিকতার শর্ত মেনেছে—নাটকের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। উদয়নের শবর বেশ ধারণ নাটকে প্রবাহিত করেছে রোমান্সের হাওয়া।

দেশপ্রেমমূলক গান দিয়ে নাট্যারম্ভ। নারী সেনাবাহিনীর প্রাধানা সুষেণার সাবধানবাণী 'যেন কোনমতে অযোগ্যতার দুর্নাম কিনো না।'—উল্লেখ্য

কিন্তু নারী নিজের পরিচিত পরিবেশের সীমা ছাড়িয়ে যেতে চাইলেও তার স্বভাবগত দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে কিনা সে প্রশ্ন আজকের প্রশ্ন। নাট্যকার অদ্ভুত দূরদৃষ্টির সাহায্যে নাটকে প্রশ্নও তুলে গেছেন 'বল্লম হস্তে করলেও তোমরা নারী।'

রাজকুমারী জয়শ্রী যেন আধুনিক নারী সমাজের প্রতীক। রাজার কাছে তার প্রশ্ন—আপনার রাজ্যে এ বর্বর প্রথা কেন? সেকালে রাজ্যে দুর্নীতিরদণ্ড ছিল। দণ্ডদেবের সংলাপে তা জানা গেল—'দুর্নীতির জন্য অতি কঠোর দণ্ড। যে ব্যাভিচারী তার প্রাণদণ্ড। যে সুরাপানে মত্ত তার রসনাচ্ছেদ।'

পরাধীন বাংলার নাট্যকার কল্পনায় ছবি এঁকেছেন—সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাজ্যের স্বাধীনতাস্মরণ উৎসবের। 'বৎসরের মধ্যে মাত্র এই একটি দিন জাতীয় উৎসব। বৎসরের এই শুভদিনে বিদেশীর শাসন থেকে জাতি মুক্তি পেয়েছিল।' ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিখুঁত ধারণা।

নাট্যজটিলতা শুরু হয়েছে—উৎসবে জয়শ্রীর আগমনে। নিষ্ঠুর বর্বর প্রথার প্রতি সে আনুগত্য প্রদর্শন করবে না। এই জাতীয় উৎসবের বর্বর প্রথার উচ্ছেদ করতে যে পুরুষকার যে ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন রাজা চরিত্রে তার অভাব।

এ নাটকে পুরোহিতের ভূমিকা অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শে প্রভাবান্বিত। পুরোহিত সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। বৌদ্ধ ধর্মের অনুপ্রবেশ স্বাভাবিকভাবেই তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি। কৌশাম্বী যুবরাজ উদয়ন সম্বন্ধে তাই অপপ্রচার করে তিনি জনগণের মনে উদয়ন সম্বন্ধে বিদ্বেষ জাগরিত করেছেন।' 'সেই ছল কপট শুধু অন্তজ নয়, সে আবার বিধর্মী অথবা সনাতন ধর্মদ্বেষী। কপিলাবস্তুর রাজপুত্র সেই যে নাস্তিক গৌতম-ঐ দুরাচার রাজা তার ধর্ম অবলম্বন করেছে। দেশের সমস্ত যজ্ঞশালা শ্রমনের বিহারে, পরিণত হয়েছে—যজ্ঞে পশুবলি লোপ পেয়েছে।'

মণ্ডলপতি কৃষক প্রভৃতিকে সুরা বিতরণ করতে করতে তাদের আচ্ছন্ন চৈতন্যের কাছে উদয়ন সম্বন্ধে অপপ্রচার চালিয়েছে পুরোহিত। নাটকে কাহিনী গ্রন্থনে নাট্যকার জটিলতা সৃষ্টির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন পুরোহিত চরিত্রটিকে বিকশিত করার সঙ্গে সঙ্গে। মালবরাজের সঙ্গে বিবাহে জোর প্রদর্শনের বিরুদ্ধে এক সময় রাজাকে সোচ্চার হতে দেখা গেছে। উদ্দালকের প্রতি—'শুনে রাখ, তোমার পিতার ইচ্ছায়, এমন কি আমার ইচ্ছায় এ বিবাহ হতে পারবে না। বিয়ে হবে জয়শ্রীর নিজের ইচ্ছায়।' উদ্দালকের ব্যঙ্গোক্তি সংলাপ মাধুর্যে অনবদ্য।

নাট্য সংঘাতের সূত্রপাত—প্রভু-গুপ্তের সংলাপে যখন জানা গেল উদয়নকেও জামাতারূপে গ্রহণ করার বাধা আছে। 'সে যুবকের নাম উদয়ন বটে·····পিতৃ পরিচয়ের নিদর্শন দেখাতে পারে নি বলে সে আমার রাজ্য ত্যাগ করে চলে গেছে।'

কিন্তু কেন সে পিতৃ পরিচয় দেখাতে পারল না ? মা সুমিত্রার কাছে তা তো ছিল। কাহিনীর অসঙ্গতি পীড়াদায়ক।

চন্ডদেব অসহায়। 'উৎসবান্তে পৌরজন সকলে একমত হয়ে তাকেই (প্রবর সেনকে) কন্যা দিতে আমায় অনুরোধ করে। চিরাচরিত প্রথা, আমি দিতে বাধ্য। বিধির এখানে প্রভুত্ব, আমার নয়।'

নাটকে সংলাপের মাধ্যমে পরবর্তী ঘটনার ইঙ্গিত দানের রীতি পালন করা হয়েছে কোথ্যও কোথাও। জয়শ্রীর সংলাপ লক্ষ্য করা যাক। 'ধর্মের নামে ধর্মের মিথ্যে আচরণ নিয়ে জাতির এই মত্ততা ভগবান গৌতমের কৃপায় মনে হচ্ছে আমা হতেই আজ উচ্ছেদ হয়ে যাবে।' কিন্তু জয়শ্রী দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। স্থির সংকল্প। 'মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবো তবু মদ্য পাত্র মুখে তুলবো না।' জয়শ্রী চরিত্রের এই দৃঢ়তাই সমগ্র কাহিনীটিকে প্রভাবান্বিত করেছে এবং সুষ্ঠু মিলনান্ত পরিণতির দিকে নাটকটিকে টেনে নিয়ে গেছে—যদিও এ ধরনের ব্যক্তিত্বের পরিণতি প্রায়শঃই বিয়োগান্ত হয়ে থাকে।

উদ্দালকের চাপ সত্ত্বেও প্রবর সেনকে দেবসেনা নির্দিষ্ট গন্ডীর ভেতর ঢুকতে দিতে নারাজ। ব্যর্থ প্রেমিকের প্রেম ব্যাকুলতা নিয়ে ব্যঙ্গ নাট্যকারের বৈশিষ্ট্য। প্রবর (দেবসেনার প্রতি) 'তোমার কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে আমি বিগলিত, বিজড়িত, বিমুগ্ধ। তোমার ব্যবহারের মধুরতা অনুভব করে আমি বিগলিত ব্যাকুলতা বিদগ্ধ। হাস্যরস সৃষ্টিতে নাট্যকারের নৈপুণ্য এ সংলাপে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আতিথ্য পালনের রীতি চন্ডদেব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

নাটকে পুনরুক্তি দোষও কিছু কিছু আছে। 'রাজা রাজা নয়—বিধি রাজা।' এ সংলাপ চন্ডদেবের কণ্ঠে বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু চন্ডদেবের রাজোচিত দৃঢ়তা, রাজধর্ম বহুবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'......প্রজারা প্রণামান্তর প্রস্থান করিতেছিল এমন সময় নেপথ্য হইতে রাণীর স্বর শুনিয়া সকলে বিস্মিতের মত দাঁড়াইল।' এতে আকস্মিকতার চমক আছে—রাণীর সংলাপের মধ্যে নূতন নাট্যসংঘাতের সম্ভাবনা সোচ্চার।

'রাজা, প্রিয়তমা কন্যাকে দিয়ে অপমান করবার জন্যেই কি আমাকে আজ এখানে এনেছিলে ?'

নাট্য কৌতূহল জাগিয়ে রাখার চেষ্টায় নাট্যকার প্রথম নাগরিকের কণ্ঠে সংলাপ দিয়েছেন—'রাজা যা জিজ্ঞেস করেছেন তার উত্তর দাও রানী।' নাটকটির গতিশীলতা চলিষ্ণুতা—রাজার পক্ষে উত্তেজক রাণীর সংলাপে—'তোমার অন্তঃপুরে সে যত পারে বিদ্বেষ করুন, এখানেও সে বিদ্বেষ করবে রাজা ?' কাহিনীর জটিলতা প্রমাণিত হয় প্রথম নাগরিকের সংলাপে—'রাজার আজ বিষম পরীক্ষার দিন।' নাটকে বক্রোক্তির নমুনাও পাওয়া যাবে কিছু কিছু—'আমার যখন জীবন রক্ষা হয়েছে তখন আমার

স্কন্ধে উঠে নৃত্য কর।' নাটকে সভ্যতার বিস্ময় চমৎকারভাবে অভিব্যক্ত। নেপথ্যে — হোক্‌ বন্ধ্যা হোক্‌ কঙ্কালসার, হত্যা না করে ফিরে এসো না নারী সেনা। আমরা আজ বিধির প্রাধান্য দেখাতে চাই।

জয়শ্রী—এই ঘৃণিত পাশবিক উৎসব কবে শেষ হবে, রাজা।

এই নাটকটির অন্য নাটক থেকে স্বাতন্ত্র্য এর দৃশ্য সংস্থাপনা ও নাট্য নির্দেশনায়। এই আঙ্গিক বৈচিত্র্যের জন্যে এটিকে আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত নাটক বলে চিহ্নিত করা চলে।

উদয়নের পৌরুষচৈতন্য প্রভুগুপ্তকে প্রশ্ন করেছে, 'রাজার দেহরক্ষী নারী সেনারা কেন?······আমার দেখতে ইচ্ছা করে ঐ রাজাকে, একবার তাকে জিজ্ঞেস করবো—স্ত্রী লোকের বেড়ার ভেতর থেকে সে কোন জন্তু শিকার করে?'

সুমিত্রা পুত্রের খোঁজে বেরিয়ে পুনরায় ফিরে আসে পরিত্যক্ত পুঁটলি সন্ধানে। নাট্যকার কিছুটা রহস্যের অবতারণা করে নাটকটিকে উপভোগ্য করে তোলার সুযোগ গ্রহণ করেছেন।

অদ্ভুত উৎসব দেখতে সুমিত্রা উৎসুক। বিশেষ করে দেখতে একজনকে সকল মত্তের মধ্যে একমাত্র যে অপ্রমত্ত। 'কে সে একজন—যার নাম তুমি আমার কাছে বলতে সাহস করলে না। তাকে দেখার লোভ আমি সংবরণ করতে পারছি না।'

দেবসেনার কর্তব্যনিষ্ঠার পরিসমাপ্তি উদয়নের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। উদয়নের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সে তাকে নির্বিবাদে পথ ছেড়ে দিয়েছে। কাহিনীর প্রয়োজনে এটির অন্তর্ভুক্তি অনস্বীকার্য।

নাটকে রাজার প্রাচুর্যের পাশে, উৎসবের আনন্দের মাঝখানে বৈপরিত্যের সার্থক সংযোজনা—যশোমা ও মহিরঙ্গের হাহাকার-ধ্বনি ও মর্মবেদনা। সামাজিক দারিদ্র্যের চিত্রটি সুন্দরভাবে এই নাটকে গেঁথে দেওয়ার ফলে নাটকটিতে মিশ্র-রসের আনন্দ বেদনার সমন্বয় ঘটানোর দুরূহ কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মহিরঙ্গ :—একমাত্র আক্ষেপ মালবের রাজহস্তি চালকের স্ত্রী হয়ে ক্ষুধার জ্বালায় সে আগুনে পতঙ্গের মত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে।

চণ্ডদেব :—মহিরঙ্গ—তোমার স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ যখন শুনবে তখন তুমি কেমন করে কাঁদবে?······দেখাও মহিরঙ্গ—দেখাও।······আমাকে কি মত্ত দেখছো মহিরঙ্গ? আমি চোখের জল এক ফোঁটাও ফেলতে পারবো না।···—চণ্ডদেবের এই অন্তর্দাহ নাটকের অন্যতম উপাদান।

চণ্ডদেবের জীবনের তথ্য নাটকের সবচেয়ে গভীরতম ট্র্যাজিক সংলাপ। চণ্ডদেবকে পিতা হয়ে কন্যার সর্বনাশ নিজের চোখে দেখতে হবে—নিজের হাতে সম্পন্ন করতে হবে। কারণ 'রাজা রাজা নয়—বিধি রাজা।' সুবর্ণ প্রতিমা আমার জয়শ্রী। তাকে ধরে দিতে হবে তোমার ঐ শূদ্রানীর গর্ভজাত দুর্বৃত্তকে।

······রাজার দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করতে ছাড়ে নি দেবসেনা। "তুমি তো ওদের বলে দিতে পারলে না যেখানে যে অবস্থায় তাকে পাবি বল্লমে, বিঁধে মেরে ফেল্‌বি। তাকে অক্ষত শরীরে ধরে আনতে বললে কেন।"

দৃশ্যান্তরে উদয়ন ও জয়শ্রীকে একত্রিত করার মধ্যে নাট্যকার রোমান্টিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। দৃশ্য পরিকল্পনার মুন্সিয়ানা লক্ষণীয়। 'মুগ্ধের মত একবার জয়শ্রীর মুখের পানে চাহিয়া আপনার পরিচ্ছদের যথাসম্ভব পারিপাট্য করিয়া লইলেন। ইত্যবসরে জয়শ্রীও তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। সুষেণা তার কর্তব্য নিষ্ঠার নিদর্শন রাখবে যশোমাকে বল্লমের মুখে বিদ্ধ করে! কারণ যশোমা বিদেশী এবং নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘনকারিনী।

যশোমা ঃ—ওগো আমি ক্ষুধার জ্বালায় গণ্ডী পার হয়েছি।

সুষেণা ঃ—বেশ করেছিস। বেরিয়ে আয় সকল ক্ষুধা মিটিয়ে দিচ্ছি। বেরিয়ে আয়, শুনছিস না। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলবো বলছি। তবে রে আভাগী—'

এই নিদারুন নাট্য উদ্বেগের পরই নাটকীয় আকস্মিকতা—উদয়নের আবির্ভাব ও যশোমার মুক্তি।—উদয়নের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে নাটকের গতি নিয়ন্ত্রিত—সুষেণার পরবর্তী সংলাপে তার প্রমাণ—'আর বুঝি একটি ছোট কীটকেও বিঁধতে পারবো না।' সুষেণার এই পরাজয় তার চরিত্রের নারীসুলভ কমনীয়তারই নিদর্শন। মস্তক আবৃত করে কান্নার ঘটনাটি ছোট হলেও নাট্যকারের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বব্যাঞ্জক—মানবিক আবেদনে অভিষিক্ত। এদিকে জয়শ্রী শবরবেশী উদয়নের সঙ্গে পালাতে চায়। জয়শ্রীর প্রশ্ন—'ও কি সত্যিই শবর?'

সুষেণা কাহিনীর জটিলতার গতিবেগ দান করতে চেয়েছে। রাজকুমারীও যদি সত্যি নীচ শবর হয়? আমি মত্ত হব—মত্ত হব? মানসদ্বন্দ্ব কিন্তু স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে নি যেহেতু অল্পক্ষণস্থায়ী। অবশ্য পূর্বরাগের আবেগে পরমুহূর্তেই সে প্রগলভা। 'কি সুন্দর ওর পদক্ষেপ, কি সুন্দর বঙ্কিম ওর গ্রীবা। দেখতে দোষ কি!'

চণ্ডদেব চরিত্রটি প্রতি মুহূর্তে ক্ষতবিক্ষত। শবরকে বরং কন্যাদান করা যায়। কিন্তু হীন নীচ মালবরাজকে? 'সেই হীনের চেয়ে একটা শবরেরও মর্যাদা আছে। শবর বেশী উদয়নকে চিনেছে রাজা। এই কথা প্রকাশ করার অন্য উপায় না পেয়ে আবেগপ্রবণতার আশ্রয় নিয়েছে রাজা। বস্ত্রাধার রহস্য নিয়ে চণ্ডদেবের সঙ্গে সুমিত্রার সংলাপ নাটকে গাম্ভীর্যের ও মর্যাদার সৃষ্টি করেছে। অবশ্য বস্ত্রাধার রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে সুমিত্রার সংলাপে। 'পিতৃ পরিচয়ের নিদর্শন দেখাতে পারে নি। এর ভিতরেই তার নিদর্শন—স্বামী ও আমার নামাঙ্কিত কম্বল আর তার সেই সময়ের প্রতিমূর্তি'।

এদিকে চন্ডদেবের কাছে উদয়নের পরিচয়ে এক নূতন সমস্যা 'শুন দেবি, যখন

তোমার পুত্রকে শবর মনে করেছিলুম তখন নিজেকে আমার সান্ত্বনা দেবার উপায় ছিল। এখন আর উপায় রইল না। তোমার পুত্রও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা। নাটকে এই কৃত্রিম সংঘাত সৃষ্টির প্রচেষ্টায় নাট্যকারের কোন গুণ প্রকাশ পায় নি।

ব্যর্থ প্রেমিক চরিত্র নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস ক্ষীরোদনাট্য সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

উদ্দালক ঃ—প্রকৃতপক্ষে হীন কেকা শব্দকারী বিস্ফারিত গুচ্ছধারী পক্ষিরাজ শিখণ্ড।

প্রবর সেন ঃ—বক বলে কি আমি ঝিলের বক, বিলের বক? উদয়নের প্রতি আসক্তির সুন্দর প্রকাশ জয়শ্রীর সংলাপে। 'তোমার মত পুরুষ যদি শবর হতে পারে আমার মত নারীর শবরী হওয়ায় জগতের কোন অনিষ্ট হবে না!'

রাজা বিচার করতে বসেছেন। রূপ অস্ত্রে পরাজিতা নারীর বিচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বদ্ধপরিকর নিজেকেও শাস্তি দেবেন। নাটকীয় আকস্মিকতায় উদয়নের প্রবেশ। দেবসেনা, সুষেণা—সবাই অস্ত্রত্যাগ করেছে। রাজার অস্ত্র উঠল না হাতে। মুগ্ধতায় এইসব অভাগিনী নারীকেও রাজা পরাস্ত করেছেন।

প্রবর সেনের হঠাৎ উদয়নের ভক্ত হয়ে ওঠার ঘটনাটি রীতিমত অনাটকীয়। 'তোমার অসমান্য পুরুষকারের সম্মুখে শির নত করে আমি তোমার সখার স্থান ভিক্ষা করি।' এ কি সেই ব্যর্থ প্রেমিক প্রবর সেনের সংলাপ? ঠিক যেন চেনা যায় না। নাট্য সংঘাতের এই আকস্মিক পরিসমাপ্তি স্বাভাবিক নাট্য পরিণতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মিলনান্ত নাটকে যা সে যুগে চলে এসেছে। গতানুগতিক পরিসমাপ্তি—সবকিছু মিলনান্ত। শেষাংশ বৈচিত্র্যহীন নিরুত্তাপ—নাট্যকাহিনীর স্বাভাবিক পরিণতির পরিপন্থী।

॥ পৌরাণিক নাটকের পটভূমি ॥

ক্ষীরোদপ্রসাদের সময় সমাজের মনোভূমিতে প্রাত্যাহিকতার গতানুগতিক সমস্যা যে ছিল না তা নয়, তবে তার প্রতিফলন ক্ষীরোদ নাট্য সাহিত্যে ঘটে নি—যা কিছু ঘটেছিল তা তার মনোভূমিতে-মানস প্রচ্ছদ পটে—সম্মিলিত ধর্মাবেগ বা জাতীয় ভাবোদ্দীপনার স্বচ্ছন্দ প্রকাশের মাধ্যমে! তখন সাধারণের দৃষ্টি ছিল ঈষৎ বিক্ষিপ্ত। বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্নতার পথ ধরে সে দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল জ্যোতির্ময় ঊর্ধ্ব লোকের দিকে। একদিন ছিল যখন বাঙালী বর্তমান বাস্তবতা থেকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছিল কখনও জ্যোতির্ময় ঊর্ধ্বলোকে আবার কখনও বা দূরস্থিত স্বর্ণ প্রভাতের দিকে,—সে দৃষ্টির পাদপ্রদীপের নীচেই উজ্জ্বলরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক নাটক। 'পৌরাণিক নাটক রচনার প্রেরণার মূলে রয়েছে বাস্তব সমস্যা পীড়িত জীবনের কোলাহল মুখরতা থেকে মুক্তির আকুতি। এই আকুতি কিছুটা পলায়নী মনোবৃত্তি থেকে উদ্ভূত। তাই তার পৌরাণিক নাটকের রূপরীতি বিশ্লেষণে যে সমাজমন ও পরিবেশ থেকে সেগুলি উদ্ভূত তা সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

পৌরাণিক নাটকের সংজ্ঞায় 'পুরাণ' কথাটি সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আক্ষরিক অর্থে পুরাণ কাহিনী সম্বলিত নাটকই পুরাণ অভিধায় অভিহিত হতে পারে। কিন্তু এই পুরাণ কাহিনীর পরিধি কতদূর? বাংলা নাটকের নাট্য উপাদানের ধর্ম বিশ্লেষণে এটা বোঝা যায় যে পৌরাণিক নাটকের পরিধি রামায়ণ মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণকাহিনীর মধ্যে বিধৃত। অথচ পুরাণ কাহিনী নেই তবুও পৌরাণিক নাটক বলেই চিহ্নিত যেসব নাটক সেগুলি কাহিনীগতভাবে পৌরাণিক না হলেও সেগুলিতে পৌরাণিক ভাবাদর্শ মূর্ত হয়ে ওঠার জন্যেই ঐগুলিকে পৌরাণিক নাটকের পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। 'পৌরাণিক নামটি শুধু কেবল বিষয়বস্তু বোঝায় না, তার চেয়ে আরও কিছু বেশী বোঝায়। শুধু কেবল পৌরাণিক কাহিনী নয় পৌরাণিক ভাবাদর্শ মূর্ত করে তোলাও এই নাটকের উদ্দেশ্য।'[১]

[একদিন ছিল যখন বাঙালী বর্তমান বাস্তবতা থেকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছিল কখনও জোতির্ময় ঊর্ধ্ব লোকে আবার কখনও বা দূরস্থিত স্বর্ণপ্রভাতের দিকে—নাটকের কথা ডঃ অজিতকুমার ঘোষ।]

---

১. নাটকের কথা—ডঃ অজিত কুমার ঘোষ।

॥ পৌরাণিক নাটক প্রসঙ্গ ॥

পৌরাণিক নাটক রচনার সার্থক ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন লৌকিক ও অলৌকিক জগতের মধ্যে ব্যবধান দূরীকরণের—নরলোক ও দেবলোকের দূরত্ব রেখাকে একটি বিন্দুতে মিলিয়ে দেওয়ার।

প্রশ্ন হল—পৌরাণিক নাটকের স্বরূপ বা ধর্ম কিংবা পৌরাণিকতা বিচার হবে কি শুধু পুরাণ কাহিনী অবলম্বনের সুবাদে ? শুধু পৌরাণিক কাহিনী সম্বলিত অথচ পুরাণ ভাবাদর্শ ও ভাবচেতনা বহির্ভূত কিংবা পুরাণ পরিবেশের প্রতিকূল কোন নাটক কি পৌরাণিক নাটকের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে ? তাহলে তো মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' বা তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রাজুর্ন' পৌরাণিক নাটকের পর্যায়ে পড়ে যায় ? কিন্তু তা হয় না। মোটকথা পৌরাণিক নাটক সম্পর্কে এটা প্রায় স্বীকৃত যে স্বার্থবিজড়িত বাস্তব জগতের জাগতিক ভাবনা চিন্তা বা মায়ামমতার ঊর্ধ্বে কিছু উচ্চতর, কিছু বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ভাব ভাবনা, কিছু আধ্যাত্মিক চেতনা, ধর্মনীতি জ্ঞান ইত্যাদির অস্তিত্ব ? যে নাটকে থাকে—সে নাটকে নাট্যকারের সজ্ঞান ধর্মীয় চেতনা মূর্ত হয়ে না উঠলেও তা পৌরাণিক নাটকের অভিধায় অভিহিত হতে পারে।

পৌরাণিক নাটকে পৌরাণিক পরিবেশ কাহিনীর ও চরিত্রের পৌরাণিক অভিজ্ঞতা এবং পৌরাণিক ভাবাদর্শের প্রতি আনুগত্য একান্তভাবে অভিপ্রেত ও ঈপ্সিত।

পৌরাণিক নাটকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল দর্শকচিত্তে ধর্মীয় ভাববন্যা প্রবাহিত করা—মায়াবৃত সংসার থেকে তাদের টেনে এনে শান্তির আলোকোজ্জ্বল রাজ্যে উত্তীর্ণ করে দেওয়া—দর্শকচিত্তকে পরম শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

পৌরাণিক নাটকে নাট্যকার ঐহিক সুখশান্তির অকিঞ্চিৎকরতায় ভোগ-ঐশ্বর্যের অতৃপ্তির যন্ত্রনা কাতরতা উপশমের জন্য এমন করে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও পরিমণ্ডল কামনা করেন যেখানে অন্তত সুখশান্তি সদা বিরাজমান—যেখানে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে জীবনের নিত্যক্ষয়ের কোন প্রশ্নই নেই—যেখানে পৌরাণিক চরিত্রের মাহাত্ম্যে মগ্ন দর্শক মুক্তির আস্বাদ পায়—শান্ত সুমহান পৌরাণিক আদর্শের ঔদার্যের ছত্রছায়ায়।

পৌরাণিক নাটকে সঙ্গীতের অস্তিত্ব বা উপস্থিতি অনস্বীকার্য হলেও সংলাপ অপ্রধান নয়। সঙ্গীতের Spell-এ বা যাদুতে বস্তুজগতের বাস্তবতার ওপর পড়ে মায়া জগতের প্রলেপ। আবার কখনও মায়াজগত ও নেমে আসে পৃথিবীর বস্তু-জগতের মাটিতে সংলাপের সোনার কাঠির স্পর্শে। পৌরাণিক নাটকের চরিত্রের সজীবতা এবং প্রাণকেন্দ্রের ভারসাম্য নির্ভর করে সংলাপ প্রয়োগের মুন্সিয়ানায়। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে পৌরাণিক পরিমণ্ডলের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান। তার পৌরাণিক নাটকগুলির সংলাপের প্রাধান্য এবং সঙ্গীতপ্রয়োগের নৈপুন্য

নাটকের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছে। তবে তার পৌরাণিক নাটকে সঙ্গীতের spell বস্তুজগতকে মায়াজগতে রূপান্তরিত করতে কিংবা মায়াজগতকে বস্তুজগতে নামিয়ে আনতে সাহায্য করে নি।

বাংলা পৌরাণিক নাটকের আঙ্গিক কি প্রাচ্যরীতিতে নাকি পাশ্চাত্ত্যরীতিতে? অধিকাংশ নাটকের আঙ্গিক বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্ত্য রীতিতে বিশেষ করে সার্থকনামা পৌরাণিক নাটকগুলির ক্ষেত্রে। ক্ষীরোদপ্রসাদ যেখানে প্রাচ্যরীতির আনুগত্য স্বীকার করেছেন সেখানে তার পৌরাণিক নাটক আড়ষ্ট পৌরাণিক ভাবকণ্টকিত অনাবশ্যক দীর্ঘ সংলাপ ভারে ভারাক্রান্ত এবং গতিহীনতার স্বাচ্ছন্দ্য বঞ্চিত। সাবিত্রী রামানুজ—এই ধরনের দুতিনটি প্রাচ্যরীতির নাটকে এই সমস্ত লক্ষণ সুস্পষ্ট।

পাশ্চাত্ত্যরীতির নাটকে এমন কি পৌরাণিক নাটকেও অনেক চরিত্রের মধ্যেই আবেগ ও প্রবৃত্তির মধ্যে দ্বন্দ্বজনিত রসসঞ্চার প্রত্যাশা করা হয়েছে। পঞ্চাঙ্ক নাটকে প্রতি অঙ্কের ধাপে ধাপে নাট্যগতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ক্রমপরিণতির সর্বোচ্চ স্তরের প্রভাবে। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে এ লক্ষণ থাকলেও শেষ পরিণতি কিন্তু নাট্যসূত্রে গ্রথিত বা সম্পন্ন হয়নি। সেখানে অধিকাংশ নাটকে, নরনারায়ণের কথা বাদ দিলে, মানবীয় শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়েছে দৈবশক্তির প্রভাবে পড়ে। সে যুগের অনেক বাংলা নাটকই অবশ্য এই দোষে দুষ্ট।

টেকনিক হিসাবে একটি ক্রোড় অঙ্কের অবতারণা কিছু কিছু পৌরাণিক বাংলা নাটকের মত ক্ষীরোদপ্রসাদের সবিশেষ বৈশিষ্ট্য। দৈবশক্তির ঐশ্বরিক ক্ষমতার কাছে—ঐশ্বর্যের কাছে মানবের শক্তির আস্ফালনকে অকিঞ্চিৎকর প্রমাণ করে তার কাছে প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তি বিশেষের নিশর্ত আত্মসমর্পণ প্রধান হয়ে উঠেছিল বাংলা পৌরাণিক নাটকে। ক্ষীরোদপ্রসাদের কোন কোন নাটকেও এটা আছে। নাট্যকার পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে মানুষের সুখদুঃখ আনন্দ বেদনার শরিক করে তুললেও এবং বস্তুজগতের পরিবেশ রচনায় স্বাভাবিক সংলাপ সংযোজনের কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেও ধর্মাদর্শের দুর্নিবার আদর্শে অপার্থিব পরিণতির দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। অবশ্য তার নাটকে গিরিশচন্দ্র বা অন্যান্যদের মতো নাটকের স্বাভাবিক পরিণতির অনিবার্যতা ভক্তিরস ধারার মধ্যে আত্মস্থ হওয়ার ঘটনায় বাংলা পৌরাণিক নাটককে নাটক হতে সাহায্য করে নি—এমন ঘটনা খুব সুলভ নয়।

পৌরাণিক নাটকের নাট্যকাহিনী গ্রহণে অসুবিধাও অবশ্য অনেক আছে। যেখানে করুণ রসাত্মক পরিণতি স্বাভাবিক সেখানে সেই অনিবার্য পরিণতির সুরের সঙ্গে তাল ও সামঞ্জস্য রেখে নাটকীয় পরিসমাপ্তি ঘোষণা করতে গিয়েও নাট্যকারকে থমকে যেতে হয়। কারণ পৌরাণিক নাটকে দুঃখই দুঃখের পরিণাম হলে নাটকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না—দেবমাহাত্ম্য প্রচারিত না হলে পৌরাণিক নাটকের আবেদন ব্যর্থ হয়ে যেত এবং তৎকালীন মঞ্চে সে নাটক-এর অভিনয় ব্যবসায়িক দিক দিয়ে অসফল অনভিপ্রেত নাটক বলে বাতিল হয়ে যেত। সে নাটকের অনিবার্য পরিণাম ললাটে বর্জনের ছাপ নিয়ে তাকে বিদায় নিতে হত শুধু মঞ্চ থেকে নয়—নাট্যজগত থেকে।

পৌরাণিক নাটক লেখার সময় ক্ষীরোদপ্রসাদকে কথাগুলি মনে রাখতে হয়েছিল যেহেতু তিনি মঞ্চের সঙ্গে একসময় যুক্ত ছিলেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদের সময় তাই দেখা গেছে মঞ্চে পৌরাণিক নাটক বলে অভিহিত নাটকে পুরাণ আছে, ধর্মাদেশ, ধর্মীয় ভাবাবেগ আছে, ধর্মীয় পরিমণ্ডল আছে—তাতেই নাটক সচল, দর্শক অভিনন্দিত। দর্শকের ভাবাবেগাভিসিক্ত ঘটনা, চরিত্রের সম্বন্ধে সংস্কার আনুগত্যের প্রতীক হয়ে উঠতে পারে। ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক নাটক ও এ সবের ব্যতিক্রম নয়।

তাই ভক্তিরসাশ্রয়ী নাটক সৃষ্টিতে নাট্যকারের অনীহা প্রকাশ পায় নি বরং কয়েকক্ষেত্রে নাটকত্ব বিসর্জনের মূল্যেও ভক্তিভাব ভক্ত দর্শক মনে জাগ্রত করার ঐকান্তিক বাসনা চরিতার্থ হয়েছিল তার পৌরাণিক নাটক রচনাও এবং মাধ্যমে তা রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরার মধ্যে।

'ভক্তিরসাশ্রিত পৌরাণিক নাটকই বাঙালীর গভীরতম ধ্যান কল্পনা ও জীবন সাধনার সহিত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিশিষ্ট। ইহাই বাঙালীর সহজ ও ঐতিহ্যানুযায়ী প্রেরণা হইতে উদ্ভূত। পুরাণের দেবমহিমাজ্ঞাপক বীরের ও ভক্তের আরাধ্য দেবতার নিকট আত্মনিবেদন মূলক কাহিনীগুলি এখন আমাদের বিশ্বাসের প্রাণরসে সজীব ও অন্তরের আলোড়নে স্পন্দিত।'[২]

পৌরাণিক নাটকে তাই পরবর্তীকালের যুক্তিবাদ বা বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাপারের সংযোজন প্রচেষ্টাকে চিরাচরিত 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর'—এই বোধের উজান ঠেলে পথ করে নিতে হয়েছে।

---

২. বৈদ্যনাথশীলের বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা—ভূমিকা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।

॥ পৌরাণিক নাট্য পরিক্রমা

নাট্যকার হিসাবে ক্ষীরোদপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য—তিনি একটানা কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক রচনার চেষ্টা বা আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। শুধু নাট্যরচনাই নয় ফাঁকে ফাঁকে গল্প উপন্যাস, আখ্যান বা ধর্মমূলক কাহিনী উপাখ্যান রচনার মাধ্যমে তাঁর নিজের সৃষ্টি সম্ভারকে তিনি বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে গেছেন।

পৌরাণিক নাটক রচনার কাল বিচার প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যায় তিনি কখনও বা শুধু পুরাণ কাহিনীটুকু অবলম্বন করে পুরাণের ভাবাদর্শ বিসর্জন দিয়েছেন, গুরুগম্ভীর পৌরাণিক কাহিনীর আড়ালে লঘু বিষয়ের অবতারণা করে দেব চরিত্রকে মানবীয় অনুভূতির আধাররূপে চিত্রিত করেছেন, আবার কোথাও বা পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি আন্তরিক আসক্তিবশে পাপপুণ্য-এর অনিবার্য প্রভাব দেখাতে নাট্য রীতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে বিরত হয়েছেন। কোথাও বা পৌরাণিক কাহিনীর আক্ষরিক অনুবাদের অদম্য আন্তরিকতায় নাট্যবৃত্ত রচনার পক্ষে দুস্তর বাধার সৃষ্টি হয়েছে, চরিত্রগুলি সোনার কাঠির যাদুস্পর্শের অভাবে প্রাণহীন আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের রচিত পৌরাণিক নাট্য পরিমণ্ডলের রেখাচিত্র অংকন করা হলে দেখা যাবে নাটকগুলির রচনাকাল দুটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ের কাল ১৮৯৬ থেকে ১৯০৬। দ্বিতীয় পর্যায়ের কালারম্ভ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ থেকে—ব্যাপ্তি নাট্যকারের শেষ রচনার সীমারেখাকে স্পর্শ করে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের মাঝখানে নাট্যকারের সমস্ত মনোযোগ ও একাগ্রতা নিবদ্ধ হয়েছিল ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর উপর যার অনিবার্য ফলশ্রুতি পরপর কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক সৃষ্টি—পদ্মিনী (১৯০৬), পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৭), চাঁদবিবি (১৯০৭), নন্দকুমার (১৯০৮), অশোক (১৯০৮), বাংলার মসনদ (১৯১০), খাঁজাহান (১৯১২)। অবশ্য তার পৌরাণিক নাটক রচনার উল্লিখিত দুই পর্ব বিন্যাসের মধ্যেকার সময়ে তিনি মূলতঃ ঐতিহাসিক উপাদানকে নাট্য রচনার কাজে লাগালেও বৈচিত্র্য পিয়াসী সাহিত্য সেবীর ভূমিকা পালন করতে গিয়ে কিছু কিছু রঙ্গনাট্য, গীতিনাট্য ও কল্পনামূলক নাটকও রচনা করেছিলেন। নাটকের একশাখা থেকে শুধু অন্য শাখায় বিচরণ করাই নয়, নাট্যকার এই সময়টুকুর অবকাশে সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও তার সৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন। বিরামকুঞ্জ (গল্পলহরী—১৯০৯)। পুনরাগমন (সামাজিক উপন্যাস—১৯১২) গীতিনাট্য কালানুক্রমিক বাসন্তী (১৯০৮), বরুণা (১৯০৮) ও পলিন (১৯১১); রঙ্গনাট্য দাদা ও দিদি (১৯০৮),

ভূতের বেগার (১৯০৮)। অন্যান্য নাটক যা এই পর্বে রচিত হয় (১৯০৬-১৯১৩) তা হল রক্ষ ও রমনী (১৯০৭), দৌলতে দুনিয়া (সপ্তম প্রতিমার পরিবর্তিত রূপ—১৯০৯) কল্পনামূলক বিজ্ঞানভিত্তিক নাটক মিডিয়া (১৯১২)।

দুই পর্বের মাঝখানের পৌরাণিক নাট্যপর্বের এই আপাত বিরতির সময়টুকুতেও কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ পৌরাণিক নাটকের পরিমণ্ডল থেকে সাময়িকভাবে কক্ষচ্যুত হলে ও পৌরাণিক যুগের চিন্তাভাবনার হাত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেন নি। তার এই সময়কার পৌরাণিক আখ্যান—'দুর্গা' (১৯০৯) তারই সাক্ষ্য বহন করে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রথম পর্বের (১৮৯৬-১৯০৬) উল্লিখিত নাটকগুলির তালিকায় আছে—(১) প্রেমাঞ্জলি (১৮৯৬), (২) বভ্রুবাহন—নাট্যকাব্য (১৯০০)।

অবশ্য পৌরাণিক আখ্যায় আখ্যাত সাহিত্য শাখার জন্য একটি সৃষ্টি শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা (১৯০০) সবিশেষ উল্লেখ্য। তাছাড়া সাবিত্রী (১৯০২), বৃন্দাবনবিলাস (১৯০৪), উলূপী (১৯০৬) নাটক তো ছিলই।

দ্বিতীয় পর্বের নাটকগুলি যথাক্রমে—ভীষ্ম (১৯১৩), রামানুজ (১৯১৬), মন্দাকিনী (১৯২১), রাধাকৃষ্ণ (১৯২৬) ও শেষ নাটক নরনারায়ণ (১৯২৬)।

গীতিনাট্য রচনার ধারাবাহিকতা ক্ষীরোদপ্রসাদ পৌরাণিক নাট্যোপকরণের মধ্যে দিয়েও অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছেন। গীতিবহুলতার বাহ্যিক লক্ষণ বহন করে তাই এই দুই পর্বের পৌরাণিক নাট্যসম্ভারের মধ্যে পৌরাণিক গীতিনাট্য রচনায় ক্ষীরোদপ্রসাদের বৈচিত্র্য প্রয়াসী ভূমিকা পালনের যোগ্যতাই প্রমাণিত হয়। দুই পর্বের পৌরাণিক গীতিনাট্যগুলি হল—প্রথম পর্বে—বৃন্দাবনবিলাস (১৯০৪) ও দ্বিতীয় পর্বে রাধাকৃষ্ণ (১৯২৬)। প্রথম পর্বের পৌরাণিক নাট্যরচনাকালের ব্যাপ্তি দশ বৎসর (১৮৯৬-১৯০৬) আর দ্বিতীয় পর্বের স্থায়িত্ব ত্রয়োদশ বৎসর (১৯১৩-১৯২৬)।

পাশ্চাত্ত্য নাট্যদর্শের মানদণ্ডে ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক নাট্য সম্ভারকে কি ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় তা বিচার করে স্থির করতে হবে।

পৌরাণিক নাটকের আধুনিক শ্রেণী বিন্যাস হতে পারে এইভাবে:

এক। পুরাণ কাহিনী সম্বলিত হুবহু পুরাণ কাহিনীর অনুবর্তন ঘটে যে নাটকে—সে নাটকগুলিকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। এই পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে পৌরাণিক ভাবাদর্শ মূর্ত হয়েছে—এমন সব নাটককে।

পাশ্চাত্ত্য নাটকে Old testament ও New testament কাহিনী ভিত্তিক নাটকের স্বগোত্র মিসটিরি প্লে-র অনুরূপ বাংলা নাটকগুলিকে এই পর্যায়ে ফেলতে হবে। ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীষ্ম, সাবিত্রী প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত।

দুই ॥ পুরাণ কাহিনী সম্বলিত পৌরাণিক চরিত্র অবলম্বিত ও পৌরাণিক উপাদানে গঠিত নাটক সমূহ ; কিন্তু পৌরাণিক ভাবাদর্শের প্রতি নিষ্ঠার অভাব, গুরুগম্ভীর বিস্ময়বস্তুর বিবরণ বা বর্ণনা বিমুখ ও চরিত্র চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে লঘু মনোভাব যে সব নাটকে প্রকট সেই সব নাটককে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌরাণিক নাটকের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

ইংলণ্ডে মিসাশ্ট্রি ও মিকেলপ্লের পর পেরিরাণিক পরিবেশেকে কেন্দ্র করে যে সব নাটক সৃষ্ট হয়েছে সেগুলকে মোটামুটি দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ইংলণ্ডে মিসট্রি ও মিরাকেল প্লের মধ্যে গম্ভীর ও লঘু বিষয় একত্রে সমাবিষ্ট ছিল। পরবর্তী যুগে গম্ভীর ও তরল দুই বিপরীত ধর্মী নাট্যোপদান-এর আধার রূপে দুটি পৃথক শ্রেণীর নাটক সৃষ্টি হতে লাগল। একটির নাম মরালিটি প্লে অপরটির নাম ইণ্টারলুড। 'বলাবাহুল্য এই প্রথম উপশ্রেণীর নাট্যসম্ভার গুরুগম্ভীর পৌরাণিক বিষয়বস্তু বা ভাবাদর্শের অনুগামী হল আর দ্বিতীয় উপশ্রেণীর নাটকগুলিতে লঘু ও হাস্যরসাত্মক বা কৌতুককর বিষয়বস্তু বা উপকরণ সংযোজিত হতে লাগল। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে আলোচ্য পর্বটিতে কেবল লঘু হাস্যোদ্দীপক কৌতুককর বিষয়বস্তুই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই শ্রেণীর নাটকের মূল উদ্দেশ্যই থাকে দর্শক সাধারণকে আনন্দ দান ও তাদের মনোরঞ্জন। পাশ্চাত্য দেশে ভোজসভায় এই ধরনের নাটক পূর্বে অভিনীত হত। Interlude শীর্ষক এই সব নাটকের বাংলা রূপান্তর ঘটেছে সমসাময়িক নাটকগুলিতে। দেবলোক ও নরলোককে একাত্ম করার উদ্দেশ্যও এইসব নাটকে প্রকট।

ক্ষীরোদপ্রসাদ-এর অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের খণ্ডদৃশ্যে Interlude নাটকের আদর্শ বা মনোভাব মাঝে মাঝে উঁকি মারলেও পূর্ণভাবে এই আদর্শ বা জীবনদর্শন প্রকাশিত হয়েছে 'প্রেমাঞ্জলি' নাটকে। নাট্যকারের নিজের ভাষায় এই নাটকে তিনি 'নারদকে মনের সুখে বাদর নাচ নাচিয়েছেন।' পৌরাণিক নাটকে একঘেয়ে গুরুগম্ভীর আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শ প্রচারের গতানুগতিকতায় নূতনত্ব সৃষ্টি ও হাস্যরস পরিবেশনের তাগিদেই এই শ্রেণীর নাটক রচনার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চেয়েছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ।

তিন ॥ তৃতীয় শ্রেণীর পৌরাণিক নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য হল এগুলি পুরাণ কাহিনী অবলম্বিত নয়। উপকরণগত বা কাহিনীগত ভাবেও পৌরাণিক নাটক নয়। এই শ্রেণীর নাটক আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা সম্বলিত বা ধর্মনীতি ভিত্তিক নাটক। ধর্মমূলক সাংকেতিক নাটক

সমূহও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—এগুলির উপকরণ বাস্তবজীবন বা ঘটনাও হতে পারে। ইংরাজীর 'মরালিটি প্লের' অনুরূপ এইসব বাংলা নাটকের প্রতিনিধিত্বমূলক নাটকের নাম করতে হলে যাত্রার আত্মদর্শন নাটকের নাম করতে হয়।

ক্ষীরোদপ্রসাদের কোন পৌরাণিক নাটকই এই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।

চার ॥ এই পর্যায়ের নাটক জীবনচরিতাবলম্বী। সাধক, ধর্মপ্রচারক, অবতারবাদে বিশ্বাসীদের মতে অবতারদের জীবনকেন্দ্রিক নাটকসমূহ এই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। এইসব জীবনী কেন্দ্রিক নাটকে চরিত্রগুলি অল্প-বিস্তর ঐতিহাসিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এদের জীবনেতিহাস বা কিংবদন্তীই নাট্য কাহিনীর প্রাণকেন্দ্ররূপে স্বীকৃত হয়। বাস্তব সমসাময়িক ঘটনাবলী এই সব নাটকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে সংযোজিত হয়ে নাটককে আকর্ষণীয় করে তোলে, মানবীয় জীবন্ত বাস্তব চরিত্রের সমাবেশ ঘটার ফলে এই সব সাধক মহাপুরুষের জীবনের চরিত্রের সরণি বেয়ে পুরাণের অতীত যুগে ফিরে যাওয়া যায় নিশ্চিন্ত প্রশান্তির পাখা মেলে।

পাশ্চাত্ত সাহিত্যে মিরাকেল প্লের মত এদেশীয় এই শ্রেণীর নাটকের অত্যধিক জনপ্রিয়তার কিছু কারণ সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। বাস্তব ঘটনার সঙ্গে কিছু কিছু প্রত্যক্ষ ও বাস্তব শ্রদ্ধেয় চরিত্রের সমাবেশ, সমসাময়িক বা ঐতিহাসিক ঘটনার সমন্বয় এইসব নাটকের জনপ্রিয়তার উপাদানবিশেষ। সুতরাং সাধক মহাপুরুষদের জীবনী অবলম্বনে লেখা বাংলা নাটকগুলিকে স্বচ্ছন্দেই মিরাকেল প্লের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই শ্রেণীর নাটকের তালিকায় যেগুলিকে ধরা যায় সেগুলি হল—গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলা, নিমাই সন্ন্যাস, বিল্বমঙ্গল, রূপসনাতন, বুদ্ধচরিত, ও শঙ্করাচার্য। এছাড়া বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের নরোত্তম ঠাকুর, ধ্রুব, রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রহ্লাদ চরিত্র এবং অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের চণ্ডীদাস ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি নাটকও এই শ্রেণীভুক্ত। ক্ষীরোপ্রসাদে এই শ্রেণীর একমাত্র প্রতিনিধি নাটকটির নাম রামানুজ।

এই কয়টি শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে যেসব নাটককে অন্তর্ভুক্ত করলে নাটকগুলির প্রতি সুবিচার করা হয় না, সেগুলির অন্যতম পৌরাণিক নাটক হল 'নরনারায়ণ'।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় প্যাশ্চাত্য প্রভাবের সুস্পষ্ট পদক্ষেপ চিহ্নিত হওয়ার সুবাদে বাংলা পৌরাণিক নাটকও সে প্রভাবে অভিষিক্ত হয়েছিল। তাই প্রাচ্যরীতির গতানুগতিক অহেতুক ভক্তি-রসাশ্রিত ধর্মীয় চেতনার দ্যোতক আধ্যাত্ম ভাবসম্পদশালী নাট্যধারার পাশাপাশি আর এক নতুন চেতনা, আঙ্গিক ও উপলব্ধির

বাস্তবধর্মী নাট্যধারার সৃষ্টি হয়েছিল যা মুখ্যতঃ পাশ্চাত্য রীতি অবলম্বিত নাটকের সঙ্গে হয়েছিল একাত্ম আর না হয় তার অন্তরঙ্গ অনুগামী। বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য রীতিতে যে কটি সার্থক-নামা পৌরাণিক নাটক রচিত হয়েছিল তার মধ্যে ক্ষীরোদ প্রসাদের নরনারায়ণ নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য। শুধু আধ্যাত্মভাবসম্পদ আর ধর্মীয়-চেতনার পরিচিতি নিয়ে জনমানসে প্রবেশাধিকার পাবার যোগ্যতার মুখাপেক্ষী হয়ে ঐ শ্রেণীর নাটকগুলিকে থাকতে হয় নি। পাশ্চাত্যরীতির অভিনবত্বের গুণে এবং নাট্য শিল্পকলার সার্থক প্রয়োগের অনুকূল আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট এই নাটকগুলি সরাসরি নাট্যামোদী সহৃদয় দর্শকবৃন্দের মনের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে সমসাময়িক যুগ প্রভাবের ত্রুটি বিচ্যুতির কিঞ্চিৎ মসীরেখা নাট্যগুণের শুভ্রপত্রে কিছু কিছু অশোভন ও অবাঞ্ছিত নাট্যকৃতির প্রতীক হিসাবে নজীর রেখে গেছে-সেটা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। অধিকাংশ নাটকের শেষাংশে পৌরাণিক কাহিনির প্রতি আত্যন্তিক আনুগত্যের আতিশয্যে মানবীয় শক্তির স্বাভাবিক স্ফুরণের অভাব ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যান্য নাটকে যা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান নরনারায়ণে তার অস্তিত্বের পরিমাণ তুলনায় অনেক কম। দৈবশক্তির প্রাধান্যে সেখানেও নাট্য কাহিনীর স্বাভাবিক বিকাশ কিঞ্চিৎ ব্যাহত।

পৌরাণিক চরিত্রে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের অভিনব ভঙ্গি, কাহিনী বিন্যাসের দক্ষতা ও চরিত্রের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টির নৈপুণ্য, সংহত যুক্তিপ্রণোদিত ভক্তির উচ্ছ্বাস, অপূর্ব কবিত্ব ও আবেগ প্রকাশের ক্ষমতা সব কিছুর সুষ্ঠু সমন্বয়ে সুষ্ট নরনারায়ণকে একটি অবিস্মরণীয় পৌরাণিক নাটকের মর্যাদায় মণ্ডিত করেছে। নাটকটিতে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ একক ও অনন্য।

পৌরাণিক নাটকের পুরাণ উপাদান উপকরণ-এর যথাযথ উপস্থাপন নেই কিছু কিছু নাটকে এবং কাহিনীর অভিনবত্ব ও রোমাণ্টিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনে কাহিনীকে প্রচলিত প্রসিদ্ধির বিপরীত দিকে নিয়ে গেছেন নাট্যকার, ক্ষীরোদপ্রসাদ সম্পর্কে এ অভিযোগ সর্বৈব সত্য নয় বরং অতিরঞ্জিত, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রথমদিকের কিছু কিছু নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পৌরাণিক নাটকগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। সে বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিক নাটকই হোক আর পৌরাণিক নাটকই হোক সবক্ষেত্রেই প্রোজ্জ্বল। এ বৈশিষ্ট্য পৌরাণিক নাটকে রোমাণ্টিক হাওয়া প্রবাহিত করার মধ্যে। কাহিনী বিন্যাসের চমৎকারিত্বই এ সব নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনী বিস্তার বা বিন্যাসের চেষ্টা না করায় নাট্যবৃত্ত রচনার অবকাশ কমে গেছে বা তা সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। এই ধরনের নাটকগুলি অবশ্য form-এর কথা বাদ দিলে বহুলাংশে রোমাণ্টক, উপন্যাসধর্মী। উলূপী এই পর্যায়ভুক্ত নাটক বলে অনেকের ধারণা।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাট্য রচনারীতি, ভাব ভাষা প্রকৃতি ও নাট্য ধারার প্রভাব ক্ষীরোদপ্রসাদে কিছু কিছু থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এই নাট্যগোষ্ঠির অন্যতম প্রতিনিধি রামানুজ, ভীষ্ম ও সাবিত্রী—একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। "পৌরাণিক নাটকে তখন গিরিশচন্দ্র দক্ষতার চরম শিখরে উঠিয়াছেন। তাঁহার নাটকের ভাব ভাষা ও চরিত্র সৃষ্টি অন্যান্য নাট্যকারদের রচনাকে প্রভাবিত করিতেছে। সুতরাং ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনায় যে গিরিশ প্রভাব থাকিবে তাহা স্বাভাবিক।"৩

৩. বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা—ডঃ বৈদ্যনাথ শীল।

॥ পৌরাণিক নাট্য সম্ভার ॥

—কালানুক্রমিক—

প্রথম পর্যায় ঃ

(১)	প্রেমাঞ্জলি	: :	১৮৯৬—১৮ জুলাই
(২)	সাবিত্রী	: :	১৯০২—৪ঠা অক্টোবর
(৩)	বৃন্দাবনবিলাস (গীতিনাট্য)	: :	১৯০৪—৩১ শে জানুয়ারি
(৪)	উলুপী	: :	১৯০৬—১৫ই জুলাই

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ

(৫)	ভীষ্ম	: :	১৯১৩—১৫ জুন
(৬)	রামানুজ	: :	১৯১৬—৩০শে জুলাই
(৭)	মন্দাকিনী	: :	১৯২১—১৪ই এপ্রিল
(৮)	রাধাকৃষ্ণ (গীতিনাট্য)	: :	১৯২৬—
(৯)	নরনারায়ণ	: :	১৯২৬—

॥ প্রেমাঞ্জলি ॥

নাট্যকারের নিজস্ব বক্তব্য :—নৃপেন্দ্রনাথ বসুকে লিখিত পত্রে—আর কোথাও আদর না পাইলে আপনি যে ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

নাটকের বিষয়বস্তু ও বক্তব্য আলোচনা করলে দেখা যায় যে নাটকটিতে দেবতার দেবত্ব লাঞ্ছিত ও অবহেলিত হয়েছে। এই অজুহাতে নীতিবাগীশরা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের ধর্মীয় সংস্কারে আঘাত লাগার অভিযোগ তুলতে পারেন। কিন্তু নাটকে কৌতুক-সৃষ্টি এবং চরিত্রে প্রাণসঞ্চারের জন্য নাটকটির যেটুকু চাহিদা তা পূরণ করতে গিয়ে নাট্যকার নারদের দুর্দশার সূত্র ধরে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছেন। পরবর্তী যুগে দেবদেবীদের নিয়ে ব্যঙ্গ কৌতুক সৃষ্টির রীতিটি নাটকে কিংবা রসরচনায় বহুলভাবে প্রচলিত হয়েছে।

নাট্যকারের বক্তব্য—"শান্তিপর্বে'র একস্থানে নারদের দুর্দশার কথা লেখা আছে। সেই মূলসূত্র ধরিয়া মনের সাধে যথেচ্ছ লিখিয়া নারদকে বানর নাচাইয়াছি।"৪

নাটকে রমা ও সুকুমারীর কাছে নারদকে একান্তই নিষ্প্রভ মনে হয়। তার আচরণ বহুক্ষেত্রে হাস্যরসের উদ্রেক করে। তবে সে কৌতুককর পরিস্থিতির পিছনে নাট্যকারের সযত্ন প্রয়াস ধরা পড়ে। নারদের ভাগিনেয় পর্বতের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য থেকে যে সমস্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে স্বর্গমর্তের মানুষ ও দেবদেবীদের সম্পর্কের মধ্যে যে সমস্ত অসুবিধার পরিবেশ কল্পনা করা হয়েছে তা অভিনব। নারদ ও পর্বত যেন ভোজনবিলাসী বাঙালীদের প্রতীক। তাদের লোভ, আসক্তি বিশেষ করে নারদের কৃত্রিম তপস্যার একাগ্রতার অভিনয় ধর্মীয় সংস্কারে আঘাত করতে পারে—সে বিষয়ে নাট্যকারের সচেতনতার অভাব নেই। তাই তার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—'কাজটা গর্হিত হইয়াছে, কিন্তু কি করি বাংলা নাটকে নাচ না থাকিলে নাটকত্ব হয় না।' ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রেমাঞ্জলি নাটকে আক্ষরিক অর্থে নাচের ব্যবস্থা করার সুযোগ পান নি। তাই মানুষের হাতে দেবতাকে ক্রীড়ানক বানিয়ে মনের সাধ পূর্ণ করেছেন। নাটকের তৎকালীন চাহিদা যে নাচ গান, হুল্লোড় ছিল তার আভাষ কতকটা এ থেকে পাওয়া যায়। পৌরাণিক নাটকের আদলে এ নাটক বহুলাংশে রঙ্গব্যঙ্গের নাটকে পরিণত হয়েছে। রঙ্গব্যঙ্গের উপকরণ উপাদান যাই থাক না কেন, নাটকে Action এর চেয়ে সংলাপের বক্রোক্তিই বেশী প্রাধান্য লাভ করেছে।

---

৪. প্রেমাঞ্জলি পৌরাণিক নাটকে নাট্যকারের বক্তব্য—ক্ষীরোদপ্রসাদ।

পৌরাণিক নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাবের অনুকূলে কিছু কিছু লঘু বিষয়বস্তু গুরুত্বলাভ করেছে এবং এই সংযোজন পাশ্চাত্য নাটকে Iuterlude এর অনুরূপ। প্রেমাঞ্জলি নাটকটিতে নাট্যকার পৌরাণিক কাহিনীর মোড়কে একটি লঘু হাস্য-রসাত্মক উপাখ্যানকে ভিত্তি করেছেন।

যুগপ্রয়োজন ও রুচির চাহিদা মেটাতে অপেরা, গীতিনাট্য, রঙ্গনাট্য, কৌতুক নাট্যের যে মানসিকতার জঠরে জন্ম এবং ক্রমবিকাশ ঘটেছিল সেই মানসিকতাই Interlude এর অনুসরণে পৌরাণিক কাহিনীর অন্তরালে নারদের দুর্দশাকে কেন্দ্র করে প্রেমাঞ্জলি কৌতুকনাট্যটি সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছিল।

এ নাটকে গতি ও এ্যাক্সান-এর অবদান যত সংলাপের অবদান তার চেয়ে অনেক বেশী। আক্ষরিক অর্থে নাচ না থাকলেও নাট্যকার নাটকটিতে নারদকে মনের সুখে বাঁদরনাচ নাচিয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন। নাটকটিতে দেবতাদের মর্ত্যের মানুষের সামিল করে চরিত্রগুলিতে প্রাণসঞ্চারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গুরুতর বা গুরুগম্ভীর সংকটময় পরিস্থিতিকে লঘু দৃষ্টিতে দেখে লঘু বিষয় সংযোজন এবং মানানসই কৌতুককর সংলাপ প্রয়োগে নাট্যকারের স্বভাব-সুলভ বৈশিষ্ট্যের দাক্ষিণ্যে নাটকটি অভিষিক্ত হয়েছে। এছাড়া কিছু কিছু খণ্ডদৃশ্যের রাগ, অনুরাগ, অভিমান জনিত ব্যঙ্গ বা হাস্যকৌতুক নাটকের সার্থক উপাদানে রূপান্তরিত হয়েছে। বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুকসংলাপের পাশে কিছু কিছু সহজ সরল গ্রাম্য সংলাপ নাটকটিকে প্রসাদগুণমণ্ডিত করেছে।

॥ সাবিত্রী ॥

সাবিত্রী নাটকটির মাধ্যমে পৌরাণিক নাটকের আদলে একটি শ্রমলব্ধ কষ্টকল্পিত নাট্যকাহিনী উপহার দিয়েছেন নাট্যকার। ভাব ও ভাষার পৌরাণিক পরিমণ্ডল যে নেই নাটকটিতে তা নয়, চরিত্রের কৃত্রিম আচরণ ও তৎসম শব্দকণ্টকিত সংস্কৃতঘেষা ভাষার বেড়া ডিঙিয়ে সংলাপ খুব কমক্ষেত্রেই স্বাভাবিকতার পথ পরিক্রমা করতে সক্ষম হয়েছে। কাহিনীতে পুরাণের প্রতি নিষ্ঠার অভাব তো নেইই, উপরন্তু আন্তরিক নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা নাটকের গতি ব্যাহত করেছে।

পৌরাণিক নাটকের পরিবেশ ও পরিমণ্ডল, তার ভাষার প্রাচীনত্ব, নাট্যকাহিনী গ্রন্থন রীতির গতানুগতিকতা, সংস্কৃত তৎসম শব্দ কণ্টকিত কৃত্রিম সংলাপ—সব কিছু মিলিয়ে সাবিত্রী নাটক নাট্যকারের বৈশিষ্ট্যের প্রতীকরূপে গণ্য হবে না। পুরাণের প্রতি নিষ্ঠার আতিশয্য নাটকের বৃত্ত রচনার সহায়ক হয় নি।

দৈবের বিরুদ্ধে পুরুষকারের সংগ্রামের সুযোগ সাবিত্রীর কার্যকলাপের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় নাট্যকার সে চ্যালেঞ্জকে নাটকে গ্রহণ করেন নি। ভক্তি রসাশ্রিত সংলাপ নাটকের স্বচ্ছন্দগতিকে (প্রতিপদে) পায়ে পায়ে জড়িয়েছে। পৌরাণিক চরিত্রানুগ আচরণের মাত্রাধিক্য প্রয়োগ নাটকে নাট্যাবর্তের সুযোগ সৃষ্টি করতে দেয় নি। সব সময় একটা কৃত্রিম আড়ষ্টতার স্নায়বিক চাপে নাট্য বিষয়বস্তুর শঙ্কিত কুণ্ঠিত ব্যক্তিত্বের সলজ্জ আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এমন কি নির্বাচিত গানগুলি যেন পৌরাণিক পটভূমিকায় ক্যানভাসের কাজটুকুই শুধু করেছে নাট্যাবেগ বা নাট্যমুহূর্তকে উদ্দীপ্ত করতে গানগুলি সহযোগিতার উদারহস্ত প্রসারণ করতে সক্ষম হয় নি।

॥ বৃন্দাবন বিলাস ॥

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যে নাটকীয়তা থাকায় পরবর্তী যুগে এক একটি খণ্ড আশ্রয় করে এক এক'ট গীতিনাট্য রচিত হয়েছে।

চিরমধুর পদাবলী বৃন্দাবনবিলাস গীতিনাট্য এর মূল প্রেরণা বলে নাট্যকারও মুখবন্ধে স্বীকার করেছেন। নাটকটি পদাবলীর বৃন্দাবনলীলাকেন্দ্রিক।

বালক মূর্তিতে গোকুলে বিহার করছে শ্রীকৃষ্ণ। নারদ বেরিয়েছে তারই দর্শন অভিলাষে—বৃন্দাবন তীর্থ দর্শনে। নারদ কোন দিকে যাবে? সব দিকেই যে জ্বালা। বৃন্দাবন দেখতে এসেছে নারদ, ভাব বৃন্দাবন। বৃন্দার কৌতুক উক্তি ভক্তিরস থেকে মানবতাবাদের মধুরতার দিকে টেনে নিয়ে গেছে। সে তীর্থদর্শন বড়ই কঠিনকথা। অম্লরস চান তো ভাঙ্গা দধিভাণ্ডের সন্ধান করুন—কটুরস চান তো গোচারণের মাঠে যান। রাখালবালকেরা পাচন বাড়ির সাহায্যে আপনাকে পিঠ ভরে খাইয়ে দেবে। মধুর রস সে টি আর হচ্ছে না। রসের কুম্ভটি আয়ান ঘোষ দখল করে বসেছে, ওদিক পানে তাকালেই আয়ানের লাঠি। নারদের ইচ্ছা নববৃন্দাবনের সৃষ্টি—রাধামাধবের মিলন। বৃন্দার ভাষায়—কেমন করে তা সম্ভব? দুষ্টা শ্বাশুড়ী, মুখর ননদী, দুরন্ত স্বামী। দীর্ঘ সংলাপের মধ্যেও বৃন্দার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়।

মাঝে মাঝে পদাবলীর উদ্ধৃতি নাটকটির চরিত্রচিত্রনে বিশেষ করে যশোদার চরিত্র-চিত্রনের সহায়ক হয়েছে। উৎকণ্ঠিতা মায়ের আর্তি ও উদ্বেগ : এ যেন দুধের ছেলে বনে বিদায় দিয়ে দৈবে মারিবে বুঝি মায়।— এর চেযে ভাল উদ্ধৃতি আর কি হতে পারে। আমার শপথ লাগে·····

পদাবলীব এই উদ্ধৃতিটি নাট্যকারেব প্রযোগনৈপুণ্যে পরিবেশানুযাযী উদ্বেলিত মাতৃহৃদয়ের আশঙ্কা, অনিশ্চয়তা ও বিরহের চিত্রকে প্রোজ্জ্বল করে তোলে।

শ্রীরাধা স্বপ্নের মাধ্যমে মিলনোৎসুক। প্রোষিতভর্তিকা রাধিকার দীর্ঘশ্বাসের ঠিকমত ব্যাখ্যা কুটিলা খুঁজে পায় নি। কুটিলা চরিত্রটি সার্থকনামা। ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে তার কথোপকথন তাকে ক্লাসিক কুচক্রী ননদিনীতে রূপান্তরিত করেছে। কুটিলা ভাবছে রাধার ছটফটানির একমাত্র কারণ স্বামীবিরহ। কিন্তু রাধার সংলাপ কুটিলার অনুমানকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। তুমি কি মনে করেছ তোমার দাদার জন্য আমি সারারাত বিছানায় পড়ে ছটফট্ করেছি? শ্রীরাধার স্বপ্নে প্রেমাস্পদকে দর্শন পদাবলীর ভাষায় বিধৃত। রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজন রিমিঝিমি শবদে বরিষে ইত্যাদি।

অন্যত্র ব্যাকুল রাধিকাকে প্রশ্ন করেছে বৃন্দা, স্বপ্ন দেখবে না। পরিবেশটা কেমন মধুর। শ্রাবণের ধারায় জলবর্ষণ হয়েছে। দূরে দূরে মেঘগর্জন, গভীর রাত্রি। স্বামী দূরদেশে। এমন সময় রসময় তুমি গৃহের মধ্যে কোমল শয্যায় একা। তুমি যে বেছে বেছে মনের মত স্বপ্ন দেখবে তাতে আর আশ্চর্য কি? কাহিনীর শর্ত অনুযায়ী বৃন্দার করণীয় আর কিছুই রাখেন নি। ক্ষেত্র প্রস্তুত। সংলাপের মাঝে মাঝে পদাবলীর আবৃত্তি মধুর রস পরিবেশনের সহায়ক হয়েছে।

শাক্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে ধর্মীয় মতভেদ যাই থাক, বিরোধ কিছু নেই। তাই আমরা শক্তি আরাধনার সঙ্গে কৃষ্ণ ভজনাও করতে পারি অকপটে। কৃষ্ণের প্রতি আক্রোশ থাকা সত্ত্বেও আয়ানের সংলাপ তাই অর্থময়, 'ছোঁড়াটা কালো হয়েই আমাকে কাহিল করে ফেলেছে।'

সুবলকৃষ্ণের কথোপকথনে কৃষ্ণের অস্থিরতা প্রকাশ চরিত্রচিত্রন ছাড়া কাহিনী গঠনে খুব বেশী সাহায্য করে নি। কাহিনী গঠনে গীতিনাট্যের মূল দাবি—গান পরিবেশন অবশ্য সে শর্ত পালন করেছে। রাধার অবস্থাও সমান বিপন্না। টহলদার গানের ভাষায় শ্রীরাধার অসহায় অবস্থার সম্যক পরিচিতি মেলে। কুটিলা অবশ্য সার বুঝেছে তাকে ভূতে পেয়েছে—কালিয়াকুয়ার ভূত। নাম করতেই রাধা ঝাঁ করে উঠেছে।

ভাবজগৎ থেকে মাঝে মাঝে নাট্যকার আমাদের মাটির স্পর্শলাভ ঘটিয়েছেন। গুরুজন শুনলে গঞ্জনার একশেষ, সমবয়সী পাঁচজনে শুনলে কলঙ্ক।

ললিতা, বৃন্দা, বিশাখা তিন সখীর আলোচনা প্রসঙ্গ একই-শ্রীরাধাসখীর কৃষ্ণপ্রেমে জরজর অবস্থা। বৈষ্ণবপদাবলীর সজ্ঞান প্রভাবে গীতিনাট্যটি যে লেখা তার প্রমাণ অনেক জায়গায় প্রকট। পূর্বরাগ পর্বে চণ্ডীদাসের রাধার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ঠিক এই রকম অবস্থার বর্ণনা নেই অন্ততঃ চণ্ডীদাসে। (সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে না চলে নয়নের তারা)।৫ নাটকের সংলাপেও চণ্ডীদাসের বাণী যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে।

আয়ানের আচরণ সাধারণের কাছে উদ্ভট কিন্তু তার কাছে এর পেছনে অকাট্য যুক্তি। আয়ান নিজের যুক্তিতে নিজে নির্বোধ নয় কিন্তু অপরের চক্ষেতার প্রত্যেকটি আচরণ অসঙ্গত ও উদ্ভট। কালিয়াকুয়োর যেখানে এসেছে অর্থাৎ তার স্ত্রীর ঘাড়ে সেখানে সে লাঠির ঘায়ে ভূতকে শেষ করে দিতে চায়। কোথায় শালার কালিয়া কুয়োর? আমার ঘাড়ে বসা? কৈ কুটিলে দেখিয়েছে বউ এর ঘাড়ের কোথাটায় সে শালা বেম্ভদাত্যি বাসা করেছে।

'বউ কদমতলাতে আসছিল এলো চুল করে'—অন্যত্র সে ঝপাৎ করে বউ-এর ঘাড়ে পড়েছে—কুয়োর গোঙার ভূত। না লাঠি খেলে নড়বে না। এক ঘা মা কালী বলে বসিয়ে দি, শালা বাপ বাপ বলতে বলতে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাক। প্রচলিত

৫. চণ্ডীদাসের পদাবলী।

সংস্কারকে নাট্যকার কাজে লাগিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত বৃন্দা বুঝিয়ে দিয়েছে কালিয়া কুয়োর যদি কারো ঘাড়ে ভর করে থাকে তো সে আয়ানের বোনের ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আয়ানের লাঠি উত্তোলন ও কুটিলাকে প্রহার। সূক্ষ্ম হাস্যরস সৃষ্টি এখানে সম্ভব হয় নি। এই দৃশ্যের শেষাংশে কিছুটা স্থূল রঙ্গরস সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে।

নাটকে একদিকে যেমন বৃন্দা রাধিকার কথোপকথনে শ্রীরাধার অসহায় অবস্থার বর্ণনা অন্যদিকে তেমনি সুবল শ্রীকৃষ্ণের সংলাপের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের বিরহাহত হৃদয়ের আকুল আর্তি। বৃন্দার প্রস্তাবে রাধার ঘোরতর আপত্তি। কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলতে প্রাণ আকুলি বিকুলি করলেও সে নিরুপায়। সংস্কার তার মিলনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃন্দার প্রস্তাব, শ্যাম আসুন যে যার মনের ভাব স্পষ্ট করে বলুক সকল ল্যাঠা চুকে যাক। শ্রীরাধা কুণ্ঠিতা, ভীতা, সংস্কারের পীড়নে নিরুপায় অবলাবালা, তা কেমন করে হয় সখি ? আমি যে কুলবধূ। শুধু কি সংস্কার ? পাপ ননদী যে সমস্তই দেখে গেল সই ?

কৃষ্ণের রাই বিরহে আত্মহারা ভাব বোঝাবার উম্মাদনায় ভক্তি রসের স্রোতে নাটকীয় পরিবেশের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বৃষ্ণ বৃন্দার শরণাপন্ন। বৃন্দা বুদ্ধিমতী, ঘটনার গতিকে স্বচ্ছল রাখতে বৃন্দার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নাটকের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে।

শ্রীরাধার কৃষ্ণ প্রেমের গভীরতা প্রকাশের জন্য দৃশ্য পরিকল্পনা নাট্য প্রয়োজনের অনুকূলে। গানের সুরে কুটিলার সংলাপ তরজা কবিগানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সবচেয়ে চমৎকারিত্ব নাট্যকার দুরন্ত ননদীকে দিয়ে দোর আগলানোর ভার দিয়ে রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটিয়েছেন। কৃষ্ণের দেয়াশিনীর ছদ্মবেশ প্রকাশিত হওয়ার পর কুটিলা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ভাইবোনে আজ ঘাঁটি আগলে বসে আছি। আজকে ধরবোই ধরবো—

বারে বারে পাখী তুমি খেয়ে যাও ধান
এইবারে পাখী তোমার বাঁধিব পরাণ।

পরিকল্পিত গীতিনাট্যের পরিণতি কৌতুকনাট্যের দিকে এগিয়ে যায় নাট্যকারের স্বাভাবিক কৌতুক প্রবণতার গুনে।

বাইরে বেরিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সংকেত পেয়েও রাধার আনন্দ উৎকণ্ঠার রূপান্তরিত-নাটকে তা প্রকাশ পেয়েছে। সংকেত, কিন্তু সবাই জাগ্রত প্রহরায় সচেতন। দুরন্ত বাধা উত্তীর্ণ হয়ে তবু তাকে যেতে হবে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে। কি হবে উপায় ? কৃষ্ণ বিরহে রাই উন্মাদিনী। শেষ পর্যন্ত রাইকানুর মিলন হল। জটিলা কুটিলাও সে সংবাদ রাখে। জটিলা তবু বলে—দেখিস আবার যেন কেলেঙ্কারী করিস নি।

কুটিলার উত্তর সংক্ষিপ্ত সুন্দর সার্থক সংলাপের নিদর্শন—নে তুই থাম ন্যাকা মাগী। সমিল ছন্দে আবৃত্তির সুরে রাধাকৃষ্ণের সংলাপ ভক্তিরসাশ্রিত, নাটকীয় উপাদান কম। নাট্যরস জমে ওঠে—ক্লাইমেক্সের সৃষ্টি হয় বৃন্দার সতর্কবাণীতে—সর্বনাশ। ক্রুদ্ধ আয়ান উন্মত্তের মত ছুটে আসছে। এখনই প্রাণময়ী রাধার লাঞ্ছনা শুরু হবে। কি হবে শ্যাম? মুহূর্তে চতুর শিরোমণি কৃষ্ণের মাথায় বুদ্ধি গজায়—নাট্য মুহূর্তের সৃষ্টি হয়—নাটকের ঘটনার গতি ও স্রোত ঘুরে যায়। ভয় নেই রাই আশ্বস্ত হও—আমি তোমার জন্যে আজ আয়ানের ইষ্টদেবতার মূর্তি ধারণ করি। একই দৃশ্যে একই দেহে শ্যাম ও শ্যামার অভিন্ন অস্তিত্ব নাটকীয় বিন্যাসে নাটকটিকে শ্রীমণ্ডিত করেছে।

কৃষ্ণের কালীমূর্তি ধারণের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের কাহিনীর ফয়শালা হয়ে গেছে। আয়ানের আক্রোশের শিকার হয়েছে পুনরায় কুটিলা। কারণ সেই তো নাটের গুরু—যত নষ্টের মূল। নাটকের বিচিত্র ভাবধারা, ক্ষণে ক্ষণে চকিত এ্যাকসন্, ঘটনার পরিবর্তন সব মিলিয়ে শেষাংশ জমজমাট। শ্যাম ও শ্যামার মধ্যেকার পার্থক্য আমাদের ধর্মীয় মতবাদে কিছু নেই—শুধু মত্ত রূপান্তর এ তত্ত্বকথাও অতি নিপুণতার সঙ্গে প্রচারিত হয়েছে নাটকে নাট্যরসকে ক্ষুণ্ণ না করেও। আয়ানের ভক্তি গদগদভাব – কুটিলার প্রতি ভ্রূকুটি শেষ দৃশ্যটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে। রাধাকৃষ্ণের মিলন প্রত্যাশায় উৎসুক দর্শকবৃন্দের প্রত্যাশাও পূরণ হয়েছে শেষ পর্যন্ত। সেই মিলনকে অবশেষে অনিবার্য বিয়োগান্ত পরিণতির হাত থেকে রক্ষা করার দুর্লভ কৃতিত্ব ও নিঃসন্দেহে নাট্যকারের প্রাপ্য।

অন্যান্য নাটকের তুলনায় উল্লেখ্য সংলাপ এতে কম। অধিকাংশই পদাবলীর উদ্ধৃতি, গান, কিংবা সমিল ছন্দে আবৃত্তির সুরে রাধাকৃষ্ণের সংলাপ—যা পৌরাণিক গীতিনাট্যের উপযোগী।

আয়ানের সংলাপ সহজ সরল অনাড়ম্বর। তার সংলাপের গ্রাম্যতা সংলাপের স্বাভাবিক প্রকাশকে উজ্জ্বল করেছে। বৃন্দা বলছে কালিয়াকুয়োর তো পালাবে, তার লাঠির ঘায়ে বউ যে অক্কা পাবে তার কি? পরবর্তী সংলাপ আরও উপভোগ্য। গীতিনাট্য এর দ্বারা প্রায় কৌতুকনাট্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। বামুনা দিচ্ছি—তো হলে বউ আমাদের পোষ্য হয়ে কালিয়া কুঁয়োরের সঙ্গে লাগা দিক।

বৃন্দার সংলাপ বহুক্ষেত্রেই দীর্ঘ এবং কিছুটা কৃত্রিম। তার সংলাপ কোথাও বা আবার অস্বাভাবিক। আধুনিক যুগের যুক্তিবাদ তার সংলাপকে দিয়েছে দৃঢ়তা। সুবলের প্রস্তাবে বৃন্দা বিরক্তি প্রকাশ করেছে। আর আমি পারবো না। একি সহজ কথা। কুলের বউকে কথায় কথায় পরপুরুষের সঙ্গে দেখা করানো কি সহজ কথা। আবার কোথাও বা বৃন্দার সংলাপ সাহিত্যগুণমণ্ডিত। সুবলের সংলাপ—শ্যাম রাই বিরহে মৃতপ্রায়। চক্ষু দিয়ে অবিরাম জলধারা বয়ে যাচ্ছে। বৃন্দার

ব্যঙ্গাত্মক উক্তি আলঙ্কারিক সংলাপের পর্যায়ে পড়ে। তাহলে যমুনায় বান ডেকেছে বল।

কুধাকুটিলার সংলাপ নাটকীয় উপাদান বিশেষ :—

যেদিন দেখিব আপন নয়নে
তা সনে কহিতে কথা।
কেশ ছিঁড়ি বেশ দূরে তেয়াগিব
ভাঙ্গিব বাড়িতে মাথা।

বাইরে পাল্টা সংলাপ, গ্রাম্য নারীর কথায় কথায় দিব্যি, অভিশাপ দেওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়।

একি পরমাদ দেয় পরবাদ
এ ছার পাড়ার লোকে
পরচর্চায় যে থাকে সদাই
শাপ থাক তার বুকে।

দুরন্ত কুটিলার আক্ষেপ—ওমা কি ঘেন্না! কি লজ্জা। দেয়াশিনী বেশে কালা ছোঁড়াটা আমার চোখে ধুলা দিয়ে গেল। শেষে কি না আমাকে দোর আগলে বসিয়ে রেখে দাদারই ঘরে বসে বউ এর সঙ্গে আমোদ করে গেল। এ দস্যুবৃত্তি পরকীয়া প্রেম ঘটনা সংস্থাপনের গুণে, সংলাপের দাক্ষিণ্যে সার্থক নাট্য উপাদানে রূপান্তরিত হয়েছে। অবশ্য এখানে হঠাৎ কুটিলা বড় বেশী মুখরা হয়ে গেছে। দীর্ঘ সংলাপও সম্পূর্ণ বেমানান হয়েছে, অবশ্য এর পরেও রঙ্গরস জমে উঠেছে।

নাটকটিতে মোট গানের সংখ্যা আটত্রিশ। অন্য নাটকে এত গান আছে বলে মনে হয় না। এটিকে তাই মূলতঃ গীতিনাট্য বলে ধরা যায়। এর মধ্যে অধিকাংশ গানই বৈষ্ণব কবিদের লেখা। বিষয়বস্তু বিচারে বৈষ্ণব কবিদের প্রসিদ্ধ গানগুলি নাটকটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে—নাট্যরস সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করেছে। কিছু কিছু গানে উদ্ধৃতির চিহ্ন না থাকায় মনে হয় সেগুলি নাট্যকারের স্বরচিত। তাই যদি হয় গানগুলির রচনা, বাণী আধুনিক কবিদের মধ্যে ভানুসিংহের কথা অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দেয়। বৃন্দাবনলীলার রসাস্বাদনে নাট্যকার তার রচিত গানগুলির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গানগুলির ভাষা, ভাব বৃন্দাবনের বৈষ্ণবজগতকে আমাদের ঘরের দ্বারে এনে হাজির করেছে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনুকরণে গীত রচনার প্রয়াস রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারুর মধ্যে সার্থকরূপে আত্মপ্রকাশ করে থাকে তো তার মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাম অগ্রগণ্য। গান ছাড়াও গানের সুরে ছাঁচে লেখা কিছু সমিল পদও পাওয়া গেছে। এগুলি

গীত বলে চিহ্নিত করা হয় নি। তবু এগুলি গীতিধর্মী, গানের আধিক্য পাছে নাটকটির নাট্যরস ক্ষুণ্ণ করে—নাটকের ঘটনাপ্রবাহকে অযথা স্তিমিত করে দেয়—সে বিষয়ে নাট্যকার সর্বদাই সজাগ—সচেতন।

কাহিনী গঠনে গীতিনাট্যের মূল দাবি গান পরিবেশনের শর্ত পালন করেছেন নাট্যকার আটত্রিশটি প্রচলিত জনপ্রিয় গান বা স্বরচিত গান সংযোজন করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিকল্পিত পৌরাণিক গীতিনাট্যের পরিণতি কিন্তু কৌতুকনাট্যের দিকেই এগিয়ে নিয়ে গেছেন নাট্যকার তার স্বভাবসুলভ কৌতুকপ্রবণতারগুণে। রসবিচার সর্বতোভাবে নাট্যকারের অনুকূলে না গেলেও একথা অনস্বীকার্য যে নাটকের নাট্য উপাদান বা উপকরণের পরিমাণ ছিল খুবই অকিঞ্চিৎকর।

॥ উলূপী ॥

পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি নিষ্ঠা বা আনুগত্য ক্ষীরোদপ্রসাদের কম। উলূপী নাটকে নাট্যকারের স্বভাবসুলভ কল্পনার অবাধ আশ্রয়ে পুষ্ট কাহিনী গ্রন্থনে বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হয়েছে সত্য কিন্তু পৌরাণিক পরিবেশ ও অবেষ্টনীর পরিবর্তে রোমান্সের হাওয়া একটানা বয়ে গেছে নাটকটির ওপর দিয়ে। পৌরাণিক কাহিনীর কিছু কিছু রূপান্তর ঘটানো হয়েছে নাটকটির নাটকত্বের অনুকূলে।

উলূপীর কর্তব্যবোধ, পুত্র স্নেহ ও প্রেষিতভর্তৃকার স্বামীপ্রেম এর মধ্যে সংঘাত দেখানোর প্রয়োজনে নাটকে এই রূপান্তরের যৌক্তিকতাকে স্বীকার করে নেওয়া যায়। এই প্রয়োজন নাট্যকাহিনী গ্রন্থনায় নাট্যশৃংখলার জন্যেও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। মূল কাহিনীর অনুসরণে ইলাবন্তের জীবন কাহিনীর সামান্য রূপান্তর ঘটানো হয়েছে নাট্য প্রয়োজনেই। মূল কাহিনীতে আছে ইলাবন্ত প্রাণ হারায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে। নাটকে ইলাবন্তকে হত্যা করা হয়েছে অশ্বমেধ পর্বে। উলূপীর চরিত্র চিত্রনে বৈচিত্র্য ও মহানুভবতা প্রদর্শন করার জন্যে পুত্রের জীবনের বিনিময়ে স্বামীর জীবনরক্ষার প্রয়াস নাটকে সংযোজিত হয়েছে।

কাহিনী বিশ্লেষণে এ নাটকে শেকস্পীরীয় রীতির অনুবর্তন যেমন আছে, তেমনি আছে কোথাও কোথাও কাহিনী বিশ্লেষণে মনস্তত্ত্বের ভূমিকা। কিন্তু সে ভূমিকা বহুলাংশে সাধারণ বিবৃতির ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত হওয়া তো দূরের কথা।

অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে এ নাটকেও ছদ্মবেশ ধারণের ব্যাপারটি যথাযথ সংঘটিত হয়েছে (নারদের গনকের ছদ্মবেশ ধারণ) এবং সুযোগমত হাস্যরসও এর থেকে স্বতঃ উৎসারিত হয়েছে—তবে এ রসসৃষ্টি নাট্যালংকারে পরিগণিত হয় নি—শুধু মামুলি হাস্যরসের প্রয়াসরূপে কিছু কিছু উল্লেখ্য নাট্য সংলাপই যা রয়েছে। বভ্রুবাহনের সংলাপও বঞ্চিতের বেদনায়মূর্ত—সেরূপ নাট্যোপকরণের অংশ বিশেষ "সে নিমন্ত্রণ আমি খেলুম না কেন ?"

কাহিনী গ্রন্থনের স্বার্থে প্রচলিত প্রসিদ্ধির হেরফের, নাটকীয় শৃংখলা বোধ, কাহিনী গ্রন্থনের মুন্সিয়ানা, ভাবোচ্ছ্বাসের তরঙ্গমালার অন্দোলন নাটকটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

নাটকে বভ্রুবাহনের চরিত্রটিকে উজ্জ্বল করতে, তার পৌরুষ জাগাতে উলূপীর ভূমিকা নাট্যকার যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। পৌরাণিক নাটকের ভক্তি-বাদ অবশ্য নাটকে নাটকীয় অপ্রয়োজনীয়তার অনুকূলেই অনুপস্থিত।

।। ভীষ্ম ।।

ভীষ্ম চরিত্র মাহাত্ম্য আসলে আদর্শের প্রতি অন্ধ অনুকরণেরই ইতিবৃত্ত বিশেষ। আদর্শবাদের প্রতি এই আত্যন্তিক নিষ্ঠায় চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের অবকাশ কম—নাটকীয়তার সম্ভাবনাও সীমিত। এই সব নানা কারণে ভীষ্ম চরিত্রের উপকরণ ও ঘটনাবলীর অভাব না থাকলেও নাটকীয় সম্ভাবনা কম জেনেই সম্ভবতঃ বহু পৌরাণিক নাটক প্রণেতা গিরিশচন্দ্র এ কঠিন কাজে হাত দেবার কথা ভাবেন নি। যথার্থ নাটকীয় প্রেরণার জন্য মহত্ত্ব প্রকাশের কৌতূহলই যথেষ্ট নয়। "ব্রহ্মচর্য নৈতিক জীবনের একটি সুমহান আদর্শ হতে পারে কিন্তু নাটকীয় চরিত্ররূপে ব্রহ্মচারী নিষ্ক্রিয়ই (rigid)। সাংসারিক সুখদুঃখ, কামনা বাসনার আঘাত হইতে যে অন্তর মুক্ত তাহা পাষাণ প্রতিমা। ইহাকে ভক্তি করা যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে জৈব অনুভূতির স্পন্দন নাই বলিয়া আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।"৫

বিষয়বস্তু উপকরণের বিরাটত্ব সার্থক নাটক সৃষ্টির অন্তরায়। সেই অন্তরায় বা বাধা স্বাভাবিকভাবেই নাট্যকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে নাট্যকার বিরাট বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারে যত্নশীল হতে গিয়ে নাট্যবৃত্ত রচনা, চরিত্রচিত্রন, সংঘাত-সমস্যা সৃষ্টি এবং বাঞ্ছিত সমাধানের সূত্র অন্বেষণ প্রভৃতি ব্যাপারে যথাযথ সতর্ক ও সজাগ থাকতে পারেন না।

আদ্যন্ত শান্তনু থেকে শুরু করে প্রপৌত্র অভিমন্যু ঘটোৎকচ সকলকে নাটকে উপস্থিত করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই নাট্যকার তাল রাখতে পারেন নি। সমগ্র কাহিনীর পটভূমিকায় খণ্ড খণ্ড ঘটনাবলীকে একসূত্রে গ্রথিত করে ভীষ্ম নাটকটিকে নাট্যশৃঙ্খলাবদ্ধ করতেও নাট্যকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছে। পাঁচ অঙ্কের কাহিনীগুলির মধ্যে নিবিড় ঐক্য ও পারম্পর্য থেকে প্রসূত একটি সমগ্র বাঞ্ছিত অনুভূতি নাটকে সৃষ্ট হয় নি—তার কারণ নাট্যকারের নাট্যপ্রতিভার অক্ষমতা নয়—দূরদর্শিতার ও বিষববস্তু নির্বাচনে বুদ্ধিমত্তার অভাব।

পৌরাণিক নাটকের অন্যতম মূলশর্ত যে পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি নিষ্ঠা তার কোন অভাব ঘটে নি বা পৌরাণিক পরিমণ্ডল ও পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে নাট্যকার কোন প্রতিকূল ঘটনা বা প্রসিদ্ধির বিপরীত কিছু সংযোজন করতে যান নি। পুরাণকাহিনীর অনুবর্তনের ছকবাঁধা গতানুগতিক পথপরিক্রমায় নটকীয়তা সৃষ্টির অবকাশ ঘটেছে খুব কম ক্ষেত্রেই।

সমগ্র নাটকটি জুড়ে নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য যা পৌরাণিক নাটকের সংজ্ঞায় বাঁধা—পৌরাণিক মূল চরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা বা প্রচার তা সিদ্ধ হয়েছে নাটকের

৫. বাংলা নাটকের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

অন্যান্য গুণ বিসর্জনের বিনিময়েও। তবে পৌরাণিক চরিত্রের 'ইমেজ' পুরাণে যাই থাক না কেন নাট্যশৃঙ্খল সৃষ্টির মুন্সিয়ানায় তার বিশ্বাসযোগ্য মনোবিজ্ঞান সম্মত উপস্থাপন সম্ভব না হলে চরিত্র নাটকের প্রাণসঞ্চার করতে পারে না। ভীষ্ম বা অম্বা চরিত্র বিশ্লেষণে এই মন্তব্যটির যাথাথ্য' প্রমাণিত হবে। নাট্য শৃঙ্খলার প্রয়োজনে ঘটনার সম্পাদনা (editing) নাট্যবস্তু রচনার পক্ষে অপরিহার্য মনে হলে অবশ্যই তা সমর্থিত হবে। ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যান্য পৌরাণিক নাটকে সে সম্পাদনা স্থানে স্থানে মাত্রাও ছাড়িয়ে গেছে কল্পনার বল্গাহীন আশ্রয় অবলম্বনের প্রবণতায়।

কোন কোন দৃশ্যে নাট্যসংঘাতের যে সামান্যতম সুযোগ ছিল—যেমন অম্বার শল্বের প্রতি পূর্বরাগ-এর ব্যাপার জানার পর ভীষ্মের মানস প্রতিক্রিয়া—নাট্যকার তারও সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। তবে কোথাও কোথাও ভাবাবেগের অভিব্যক্তি যথাযথ সংলাপের মাধ্যমে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির অনুকূল।

নাটকটির যেটি প্রধান ত্রুটি অবশ্য বিষয়বস্তু নির্বাচনের দিক দিয়ে সেটি হল মৃত্যু যেখানে ইচ্ছাধীন সেখানে ট্র্যাজিডির আবির্ভাব সুদূরপরাহত।

নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্যঅদৃশ্য হস্তক্ষেপের বিশ্লেষণ নাটকটিকে সার্থক ও সুন্দর করতে পারতো—নাট্যকার সে ব্যাপারে সচেতন হন নি। মহাভারত কাহিনীর মূল চরিত্রের যথাযথ অনুবাদ নাটকে কাম্য নয়—নাটকে যা কাম্য তা হল তার বিশ্বাস-যোগ্য মানবিক রসসিক্ত উপস্থাপন। পুরাণ কাহিনীর মূল সুরের আনুগত্যটুকু সেখানে থাকলেই যথেষ্ট।

ভীষ্মের পতনে যে বিয়োগান্ত পরিবেশের কারুণ্য ও হাহাকার অনিবার্য ছিল—ভক্তিরসের স্রোতে এবং গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের প্রভাবে তা অন্তর্হিত হয়েছে। ভীষ্মের আত্মসমর্পণে ভক্ত দর্শক ভক্তির পাথায় ভর করে মহামানবের মাহাত্ম্য দর্শনের সুবাদে অমৃতলোকের দিকে মানস-যাত্রায় তৃপ্তিলাভ করবে। নাটকটিতে ভক্তের এই পরমলাভে নাটকটির উদ্দেশ্য বহুলাংশে সিদ্ধ হয় একথা মেনে নিয়েও বলতে হয়—নাট্য বিচারের মাপকাঠিতে সেই পরমপ্রাপ্ত-ভক্তিরসাশ্রিত তরল কারুণ্য ট্র্যাজিডির অনুকূল পরিবেশকেও তরল করে দিয়ে যায়।

॥ রামানুজ ॥

পৌরাণিক বা ধর্মমূলক নাটকে পুরাণ অন্তর্গত পৌরাণিক প্রধান চরিত্র যেমন উপজীব্য ছিল, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মগুরু বা ধর্মযাজক এবং আধ্যাত্মিক এবং আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন এবং অলৌকিক শক্তির অধিকারী কিছু কিছু ব্যক্তির জীবনীকে কেন্দ্র করেও বাংলায় তৎকালে নাটক সৃষ্টি হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে বাইবেল কাহিনী সমন্বিত বা old testament অবলম্বিত নাটকগুলি যেমন মিসট্রি প্লের প্রভাবযুক্ত, ঠিক তেমনি রামানুজ নাটকটিকেও মিরাকেল্ প্লের অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

ভূতগ্রস্তা রাজকুমারীর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার প্রসঙ্গে রামানুজের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ও আনুগত্যের দৃশ্যটিতে নাটকের মূল উদ্দেশ্য রামানুজের মাহাত্ম্য ব্যাপারটি সহজবোধ্য হয়েছে এবং সেই উদ্দেশ্যটিও এই দৃশ্যে নাটকীয় ব্যঞ্জনায় নাট্যকাহিনীর সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছে।

নাটকটিতে ধর্মীয় বিষয়বস্তু নাট্যসূত্রে ঠিকমত গ্রথিত হতে পারে নি, ফলে নাটকটি মূলতঃ ধর্মীয় ভাব ভাবনা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হয়ে গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দীর্ঘ সংলাপের একঘেঁয়েমি নাটকটির অন্যান্য গুণগুলিকে ঢেকে দিয়েছে। অবশ্য কাঞ্চির কণ্ঠে দেবমাহাত্ম্য পৌরাণিক ধর্মমূলক নাটকের পক্ষে ঈপ্সিত ও বাঞ্ছিত ভক্তিরস সৃষ্টিতে অনুকূল পরিবেশ রচনা করেছে।

নাটকটিতে অনাবশ্যক ঘটনা ও অধিক সংখ্যক চরিত্রের সমাবেশ ধর্মতত্ত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যকেই যেন বারবার প্রকাশ করেছে। বাস্তববাদী পাপিষ্ঠ বড়ককুন কিন্তু রামানুজ নাটকে একমাত্র রক্তমাংসের মানুষ। ধর্মের ভাষায় পাপিশ্ঠ হলেও নাটকের ভাষায় দোষে ও ঈর্ষায় সে একটা পরিপূর্ণ মানুষ।

যাদব প্রকাশ চরিত্রের নাটকীয় সম্ভাবনা ও উপাদানের অনাটকীয় পরিসমাপ্তি তার বিরোধিতার অন্তর্ধানে তার পরিপূর্ণ আত্মসমর্পনের নিবেদনার্ঘ্যরূপে গণ্য হবে।

নাটকের স্বপক্ষে অবশ্য বলার আছে যে মাহাত্ম্য প্রচারের ভাষার মধ্যে বাস্তব সংলাপের উত্তাপ ও স্পর্শ লক্ষ্যণীয়।

নাটকের শেষদিকে ধর্মমূলক নাটকের পরিবেশ সচেতন নাট্যকার এক বিশেষ দৃশ্যপটে দেখালেন অনন্তশয়নে লক্ষ্মী সেবিত নারায়ণের দৃশ্যপট। এ নাটক ভক্তি-রসসিক্ত অলৌকিক ঘটনা-কেন্দ্রিক পারম্পর্যহীন নাটক। নাটকটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য অলৌকিক দৃশ্য ও বাস্তবদৃশ্যের পাশাপাশি সহবস্থান আলো আঁধারের সৃষ্টি করেছে। যথারীতি পটপরিবর্তনের মাধ্যমে দেবমহিমা—দৃশ্যের অবতারণা ক্ষীরোদনাট্যের বাঁধাধরা ছকের অনুবর্তন।

রামানুজের ধর্মীয় চেতনা নাটকের অঙ্গীভূত হয় নি, তাই তার দ্বারা নাটকের বৃত্ত রচনা সম্ভব হয় নি। পরাশরকে নিয়ে অবশ্য নাট্যকার এক সুন্দর নাট্যাবর্ত সৃষ্টি করেছেন। সামাজিক নাটক হলে এ নাটকে অনুরূপ পরিস্থিতিতে নাট্য জটিলতা সৃষ্টি হতে পারতো। শাস্ত্রবাক্য পাঠের মত বর্ণনা ও সংলাপ বেশ কয়েক স্থানে সবিশেষ কণ্টকিত।

রামানুজের চরিত্র মাহাত্ম্য প্রচারে তন্ময় নাট্যকার রামানুজের ইমেজ তৈরি করতে গিয়ে নাটকটির নির্দিষ্ট form সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বিকার হয়ে গেছেন। নাটকটিকে বহু জায়গায় তাই বর্ণনামূলক বিক্ষিপ্ত স্কেচ বা রেখাচিত্র বলে মনে হয়েছে। ভক্তি সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে নাটকের গতানুগতিক ধারায় পরিসমাপ্তি নতুন করে উল্লেখ্য নয়।

রামানুজ নাটকটি মূলতঃ ধর্মীয় ভাবভাবনা প্রকাশের মাধ্যমরূপেই পরিগণিত হবে। নাটকের আঙ্গিক চরিত্রচিত্রন, ঘটনা সংস্থাপন—সব কিছুর আয়োজন পূর্ণ থাকলেও প্রচার ও সারগর্ভ বাণী কণ্টকিত সংলাপ স্বাভাবিকতাকে আচ্ছন্ন করেছে। তবে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বা বাস্তবতার দিক দিয়ে নাট্যকারের নিষ্ঠার অভাব ঘটে নি —একথা জোর দিয়ে বলা যায়। ধর্মীয় নাটকটিতে মোটামুটিভাবে ভক্তিরসের আতিশয্য নেই—আছে যুক্তিবাদের তীক্ষ্ণতা ও ধর্মীয় মতবাদের নবমূল্যায়ন প্রচেষ্টা।

॥ মন্দাকিনী ॥

উপকাহিনী আপব বশিষ্ঠের কামধেনু হরণ প্রসঙ্গ এবং মূলকাহিনী গঙ্গাবতরণ নাট্যকাহিনীর শুধু অন্তর্ভুক্তই হয় নি নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে নাট্যকারের কিছু কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করে। নাটকটি ছোট, বক্তব্য ও সংক্ষিপ্ত— শান্তনুর ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগে বাধ্য হওয়ার চমকপ্রদ নাটকীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাট্য পরিস্থিতির অবতারণা।

একাধিক উপকাহিনী নাটকটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উপকাহিনীতে বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যবাদ-সমাজবাদ এর ধারণার প্রভাব নাট্যকার সজ্ঞানেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

কাহিনী বিন্যাসের স্বার্থে নাট্য কৌতূহল জাগিয়ে রাখার ইচ্ছায় পৌরাণিক উপাদানের যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। তবে কোথাও কোথাও নাটকে প্রাণসঞ্চারের অনাবশ্যক তৎপরতায় পৌরাণিক পরিমণ্ডলের মধ্যে কিছুটা অসঙ্গত ও অশোভন লঘু ঘটনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

নাটকে পরিপূর্ণ নিটোল কেন্দ্রীয় সমস্যা না থাকলেও কিছু কিছু সাময়িক খণ্ড নাট্য সমস্যার (যেমন আতিথ্যপারণ) সৃষ্টি করে নাট্যকার নাটকটিতে গতিবেগ সঞ্চার করেছেন। নাট্য কৌতূহল ও নাট্যউদ্বেগ, চমকপ্রদ ঘটনা, রোমান্স—সব কিছুই নাটকটির মধ্যে ইতস্ততঃ বিন্যস্ত। চমৎকার মুক্ত পয়ার ছন্দ এবং ঐ ছন্দে দেহবাদের কথা নাটকটির অন্যতম সম্পদ। নাটকটিতে কিছু অপ্রয়োজনীয় অবাঞ্ছিত অংশ আছে যা নাট্য বিন্যাসে কোন কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে নি। নাট্য দ্বন্দ্বের অবতারণা অনুপস্থিত নয় নাটকে। তবে ছোটখাট সংঘাত নাট্য তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে নি এবং নাটকটিতে যথাযথ বৃত্ত রচনা করতে সক্ষম হয় নি।

পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি আনুগত্য নাটকটির একটি উল্লেখ্য বিষয়। এতে অনাবশ্যক বিস্তৃতি নেই। অপ্রয়োজনীয় চরিত্রের অযাচিত প্রাধান্য বা উপস্থিতি নেই। ত্রুটীর মধ্যে এতে চরিত্র সৃষ্টির অবকাশ কম। যে সব চরিত্রেপ্রাণ সঞ্চার হয়েছে তার সংখ্যা খুব বেশী নয়। সবকিছু মিলিয়ে এটি যত না নাটক, তার চেয়ে বেশী পৌরাণিক। সংলাপ সমৃদ্ধি অন্য কোন নাটকের তুলনায় এ নাটকে কম নয়। কিছু কিছু কাব্যিক প্রকাশ মনে রাখার মতো এবং কিছু কিছু সংলাপ হাস্যরসোদ্দীপক এবং নাট্যরসসঞ্চারের সহায়ক। নাট্যকাহিনীতে পৌরাণিক কাহিনীর মূল spirit বা প্রধানভাব-এর প্রতি নিষ্ঠার অভাব নেই। এতে অনাবশ্যক জটিলতা নেই, অপ্রাসঙ্গিক চরিত্রের ভিড়ও নেই। মূলকাহিনীর স্বার্থে ও উদ্দেশ্য

মুখীনতার জন্যে কাহিনীকে বহুলাংশে ছকে-বাঁধা পথে নিয়ে যেতে হয়েছে। তাই ঘটনাই প্রাধান্য পেয়েছে—চরিত্র সৃষ্টির তাগিদ গৌণ হয়ে গেছে। হোত্রবাহনের রসজ্ঞান, তার সরস টিপ্পনি নাটকের পক্ষে বাহুল্য হলেও তার চরিত্র সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হয়েছে। স্বল্প পরিবেশে যমুনা চরিত্র প্রাণবন্ত। শান্তনুকে মাঝে মাঝে রক্ত মাংসের মানুষ বলে মনে হয়েছে, কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য। পরবর্তী মুহূর্তে কাহিনীর প্রয়োজনে তাকে শেখানো বুলি বলতে হয়েছে। তার আচার আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সবই পৌরাণিক ঘটনা বা কাহিনীর পরিণতির বা পরিণামের ছক্ কাটা পথের দাবির দিকে চোখ রেখে। ধৌম্য চরিত্রের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশের আয়োজনের ত্রুটী নেই, কিন্তু চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে ওঠে নি। তার স্বাধীন প্রকাশ ব্যাহত হয়েছে কাহিনী বিন্যাসের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের মত এ নাটকে কয়েকটি নাট্যগুণ থাকা সত্ত্বেও নাটকটি তাই 'এ্যাকসান্' ও চরিত্র সৃষ্টি ইত্যাদির দিক দিয়ে পরিপূর্ণ নাটক হয়ে উঠতে পারে নি।

॥ রাধাকৃষ্ণ ॥

নাটকটি মূলতঃ ধর্মমূলক। রাধাকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচারই নাটকটির মুখ্য উদ্দেশ্য। মুখ্য উদ্দেশ্যের দিকে স্থির লক্ষ্য রেখে নাট্যকার শেষ পর্যন্ত ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছেন। সামাজিক নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদের অনুপস্থিতি এ নাটকের দ্বারা আংশিক পূরণ করা হয়েছে। পৌরাণিক নাটকের ফাঁকে ফাঁকে সামাজিক নাটকের পরিবেশ সৃষ্টি করে ক্ষীরোদপ্রসাদ পৌরাণিক নাটককে সামাজিক নাটকের লক্ষণাক্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। এ নাটকে রাধাকৃষ্ণে আছে মাটির স্পর্শ। কৃষ্ণ তো নিজের মুখেই প্রেম পর্বে তার দৈহিক ভূমিকাকে সমর্থন করতে গিয়ে বলেছে যে সে মাটির মানুষ। তার পক্ষে আদর্শগত সংযম সব সময় সমর্থন করা যাবে না। মহাভারত কাহিনীর ভীম অর্জুনকে একেবারে কাছের মানুষ বলে মনে হয়। মধুররস সৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণের মত অর্জুন সুভদ্রার ভূমিকাও নাট্যকার উল্লেখ্য করে তুলেছেন। নারীর মাধুর্য, লজ্জাভিনয় পূর্বরাগজনিত পরিস্থিতি—সব কিছুর সার্থক চিত্রায়ন বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ধর্মমূলক নাটক হলেও এতে ভক্তিরসের আতিশয্য নেই। নাট্যকার সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে নাট্য প্রয়োজন মাফিক চরিত্র সৃষ্টির অবাধ স্বাধীনতা অর্জন করে নিয়েছেন। রাধাকৃষ্ণ, অর্জুন-সুভদ্রা, চন্দ্রাবলী, সত্যভামা—সবাই যেন ঘরের মানুষ, মাটিতে পা দিয়ে আছে। তাদের আশাআকাঙ্খা আনন্দ বেদনা বিরহ মিলনের উত্তাপ যেন আমাদেরও অঙ্গ স্পর্শ করে। সম্পর্কের বেড়াজাল প্রেমের শাসন মানে না। চন্দ্রাবলী ও সত্যভামা তাই কৃষ্ণের বোন হলেও কৃষ্ণ অনুরাগী হতে তাদের বাধা নেই। তত্ত্বের দিক দিয়ে এর তাৎপর্য থাকলেও মধুররস সৃষ্টির দিক দিয়ে এর উল্লেখ বৈচিত্র্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে।

নাটকের প্রথম অঙ্কেই তত্ত্বের অবতারণা। রাধাকৃষ্ণের মর্তে আগমনের প্রয়োজনীয়তা দৃশ্য পরিকল্পনার মাধ্যমে সুন্দরভাবে প্রকাশিত। নাটকের গোড়ার দিকে হঠাৎ ভাষা সমস্যার অবতারণা যদিও নাট্যকারের অন্যগুণ প্রকাশ করেছে—কিন্তু নাট্যপ্রয়োজন আদৌ মেটাতে সক্ষম হয় নি। কাহ্ন—'বেদের ভাষা লুপ্ত হয়েছে। এখন যে ভাষা চলিত হয়েছে তা এত সংস্কৃত যে তা সাধারণের হতে পারে না। স্ত্রীলোকের অশিক্ষিতের এক ভাষা, শিক্ষিতের অন্য ভাষা হওয়া আমাদের মতে উচিত নয়। পাঠ্যভাষা ঐ সংস্কৃতই থাক, কিন্তু চলিত ভাষা প্রাকৃত হলেই সকলের সুবিধা হয়।' ভাষা সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে এই ধরনের মতবাদের মূল্যায়ন নাটকের বিষয়বস্তু হতে পারে না। এ ধরনের প্রচার পৌরাণিক নাটকে অভিনব। আধুনিক নাটকের সমাজচিন্তা, শিক্ষাচিন্তা-এ নাটকেও প্রতিফলিত -এটাই সবিশেষ

উল্লেখযোগ্য। নাটকের মূল উদ্দেশ্য এতে যে সিদ্ধ হয় নি সেকথা আগেই বলা হয়েছে। এই নাটকের সংলাপ বিশেষ করে স্ত্রীলোকদের সংলাপ স্বাভাবিক, প্রাণময় ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে ; ফলে চরিত্রগুলিও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

অর্জুনের নামগুণে সুভদ্রা লজ্জায় অবনতমুখী। এ দৃশ্য নাটকে অতুলনীয়। নাট্যকারের পরিবেশসচেতনতা—স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের নিদর্শন। পরস্পরের কথোপকথন ও হাস্য-পরিহাসের মাধ্যমে পূর্বরাগের দৃশ্য সর্বতোভাবে সার্থক ও রসোত্তীর্ণ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। স্ত্রীলোকেরা প্রাকৃত ভাষায় কথা বললে যে সে সংলাপ কত মধুর প্রাণবন্ত হয় ক্ষীরোদপ্রসাদ কাহ্নুর সংলাপের মাধ্যমে সে সম্বন্ধে কিছুটা যে ইঙ্গিত দিয়েছেন—সেটিকে তিনি কার্যে পরিণত করেছেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ কাহ্নুকে মাটির মানুষরূপে চিত্রিত করতে পেরেছেন। কাহ্নু আমাদের ঘরের আত্মীয় পরিজন। রাইকে তাই বলতে শোনা যায়—'আমি তোমাকে মাটির মানুষ হতে দেবো না'। এরপর তত্ত্বকথার গঙ্গাজল ছিটিয়ে নাট্যকার ধর্মমূলক নাটকের শর্ত পূরণ করেছেন। কাহ্নু ও রাই পরস্পরের পরিপূরক—একজনে যা আছে অন্যের মাঝে তার অভাব। অন্যের যা আছে অপরের তা নেই।

নাটকটিতে বহু জায়গায় আলো আঁধারের লুকোচুরি—কখনও আমাদের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা শুনিয়ে আমাদের উদ্দাম কামনা বাসনাকে সংযত করেছেন আবার কখনও রাই কানাইকে আমাদের একজন করে তাদের বিরহ মিলন পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ করে দিয়েছেন নাট্যকার।

আয়ান ঘোষ প্রত্যাখ্যাত হয়ে কংসের আশ্রয় নিয়েছে। বৃষভানুর ভাষায়—উল্টা উৎপত্তি হয়েছে। রাই-এর রূপগুণের কথা শুনে কংস নিজে তাকে বিয়ে করবার জন্যে দূত পাঠিয়েছে। কাহিনী বিন্যাসের দিক দিয়ে এ ঘটনা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

কংস চরিত্রের মধ্যে কিছুটা সংঘাতের আভাস পাওয়া যায়। কংসের প্রতিহিংসা-পরায়ণতা, তার আস্ফালন রাজোচিত। 'তোমাদের বিষদাঁত ওপড়াব। আজ যদু বংশের ন্যায্য রাজা ও রাণীকে আনতে পাঠাচ্ছি। মনে করেছিলুম দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় যাবো তা হ'ল না—যার গৃহশত্রু এত প্রবল তার অবসর কোথায় ?'

কংসের কুলগুরু সুচিরোমা চরিত্রটি ব্যক্তিত্বে, দৃঢ়তায়, ব্রহ্মতেজে দীপ্যমান। সন্দীপন মুনিরও উক্তি দৃঢ়, বলিষ্ঠ—উপনিষৎ প্রচার যদি নাস্তিকতা প্রচার হয় তা হলে আমি প্রচার করছি। দুই কুলগুরুর সংলাপ ধর্মমূলক নাটকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। দুজনের কথাতেই 'লজিক' আছে। ধর্মতত্ত্বের জটিলতায় অবশ্য এখানে নাটকীয়তা সন্ধান করার চেষ্টা বৃথা। রাধার আকস্মিক অলৌকিক আবির্ভাব সম্পূর্ণ অনাটকীয়। সুচিরোমার মাতৃদর্শন রাধাপূজা প্রচারে কার্যসিদ্ধ

ইত্যাদি ধর্মমূলক নাটকের পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক—কিন্তু নাট্যগুণে বর্জিত নাটকের অঙ্গীভূত হতে পারে নি।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় যেতে অর্জুনের অনিচ্ছা এবং সুভদ্রার প্রতি তার আসক্তির ব্যাপারটি নাটকে সার্থকভাবে রূপায়িত। রোমান্টিক দৃশ্য পরিকল্পনায় আর এক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার—রাণী হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমের পরিণয় দৃশ্যে। রাক্ষসরাজ্যে ভীমের স্বমূর্তি ধারণের মাধ্যমে নাট্যকার মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে চমৎকার একটি বক্রোক্তির সুযোগ দিয়েছেন। রাক্ষস সেনাপতি আনুগত্যের আশ্বাস দিচ্ছে। ভীম তাতে সন্দেহ প্রকাশ করছে। 'ওগো আমি রাক্ষস, মানুষ নই। মিথ্যা কথা বলা আমরা অভ্যাস নেই।'

হোক্ না পৌরাণিক নাটক, ঘরোয়া পরিবেশে মধুর রস পরিবেশনের দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ নাট্যকার ছাড়েন নি।

কৃষ্ণ—কত খেলাই জান।

রাধা—কি খেলা দেখলে তুমি ?

এই ঘরোয়া পরিবেশ থেকে পৌরাণিক নাটকের ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে বিচরণ করতে দেরী লাগে নি নাট্যকারের। এ ব্যাপারে তিনি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু নাটক এই প্রচেষ্টায় প্রচারধর্মী হয়ে গেল নাট্যকার তা খেয়াল করেন নি।

কৃষ্ণ—নিজের কাজ কি রাধা ?

রাধা—ভারতকে মহাভারত করা।

ভীমের চরিত্রটিতে যেমন বীরোচিত দৃঢ়তা তেমনি রসবোধেরও অভাব নেই। রাধা সম্পর্কে তার শ্যালিকা—হিড়িম্বা রাক্ষসীর বোন। রাধা সুভদ্রা হরণের অন্যতম প্রেরণা। তার সম্বন্ধে ভীমের সরস মন্তব্য নাটকটিকে স্নিগ্ধরসে অভিসিক্ত করেছে। এক রাক্ষসী জয়দ্রথকে গলাটিপে আনলেন, তার বোন আর এক রাক্ষসী আমাদের সকলের গলাটিপে নিয়ে যাচ্ছেন।

কৃষ্ণ বধের জন্য উদ্যত অস্ত্রের আঘাত বুক পেতে নিয়েছে চন্দ্রা। প্রেমিকের জন্য দায়িতার অপূর্ব আত্মত্যাগও কিন্তু নাটকে মনে রেখাপাত করতে না করতেই জানা গেল এ নাকি কৃষ্ণের মায়ার খেলা। অপূর্ব আত্মত্যাগের মহিমা ম্লান হয়ে গেল। পৌরাণিক নাটকে কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য প্রচার করার সুযোগ হারাতে নারাজ নাট্যকার।

অর্জুন ও সুভদ্রার সাক্ষাৎ ঘটেছে ছদ্মবেশের মাধ্যমে। পরস্পরের ব্যাকুলতা সুন্দর সংক্ষিপ্ত সংলাপে বিধৃত হয়েছে—রোমান্টিক পরিবেশ যেন আপনা হতেই গড়ে উঠেছে। সুভদ্রা সহজে ধরা দিতে চায় না। ছদ্মবেশের অন্তরালে ভালবাসার লুকোচুরি খেলবার সাধ মিটিয়ে নিয়েছে সুভদ্রা। মথুরায় গেলে আবার দেখা হবে বলে গেছে অর্জুনকে।

শেষ পর্যন্ত থ্রিলও কিছু সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সুভদ্রা নিজের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছে ছদ্মবেশে কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু না বলায় শেষ পর্যন্ত ব্যাকুল অর্জুন উত্তেজনাবশে সুভদ্রাকে অস্ত্রাঘাত করেছে। সুভদ্রার ছদ্মবেশ খুলে যাওয়ায় রোমান্টিকতার সুষ্ঠু পরিণতি সূচিত হয়েছে। সুভদ্রাকে আঘাত করার প্রায়শ্চিত্ত-সূচক (অর্জুনের) আত্মহত্যার প্রয়াস মেলোড্রামাটিক্—এই ভুয়ো ক্ষণিক সেন্টিমেণ্ট শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারে নি। কৃষ্ণরাধার সময়োচিত আবির্ভাব এবং অর্জুনকে নিবৃত্তকরণের মধ্যে কিছুটা মামুলি নাট্যক্রিয়া প্রদর্শিত হয়েছে। সত্যভামার কৃষ্ণপ্রেম ব্যাখ্যা platonic love কিন্তু কার্যত নাটকে প্রতিফলিত হয় নি। দৈহিক সম্পর্কের ভূমিকা নাট্যকার উপেক্ষা করতে পারেন নি। ফলে নাটকে মানবিক আবেদনের অভাব ঘটে নি। 'নিষ্কাম ধর্মপ্রচার করবার জন্যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছো। তোমাদের প্রেমে দৈহিক সম্বন্ধ থাকতে পারে না।' অর্জুন সুভদ্রার প্রসঙ্গে সংলাপে মধুররসের প্রয়োগ সুন্দর।

ধৃষ্টদ্যুম্নের সংলাপে নাটকের কাহিনীগত কিঞ্চিৎ সংঘাতের পরিচয় মিলবে।

পুরাণকাহিনীর আশ্রয়ে নাট্যকার সহজ সরল ঘরোয়া সংলাপের অবতারণা করে বহুলাংশে নাটকে সামাজিক নাটকের মেজাজ এনেছেন। পৌরাণিক পরিমণ্ডলের ভাব গাম্ভীর্য, উক্তি প্রাবল্য বা উচ্ছ্বাস ক্ষীরোদ প্রসাদের নাটকে অনুপস্থিত। ভক্তি প্রাবল্য বা ভক্তির বন্যায় নাটকের নাটকীয় গুণগুলি অবশ্যই ভেসে যায় নি—তবে পৌরাণিক সংস্কার নাট্য বিচারে পৌরাণিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রাথমিক শর্ত অবশ্যই দাবি করতে পারে। সেদিক দিয়ে এ নাটককে পুরোপুরি পৌরাণিক নাটকের আখ্যা দেওয়া সঙ্গত হবে না। তা ছাড়া কাহিনীর আনুগত্যের দিক দিয়েও নাট্যকার পৌরাণিক কাহিনীর অনুশাসন মানেন নি বহুক্ষেত্রেই।

ধর্মমূলক পৌরাণিক নাটকে পুরাণের দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করতে গিয়ে সামাজিক নাটকের কিছু কিছু পরিবেশ সৃষ্টি—ক্ষীরোদ প্রসাদের সরাসরি সামাজিক নাটক না লেখার পরিপূরক প্রচেষ্টা ধলে পরিগণিত হতে পারে।

সামাজিক নাটকের লক্ষণাত্মক পৌরাণিক নাটক ক্ষীরোদ প্রসাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—সে নাটকে পাশ্চাত্য Interlude নাটকের অনুরূপ শুধুমাত্র পৌরাণিক পরিবেশে ও লঘুবিষয় পরিবেশিত হ'ত। ক্ষীরোদ প্রসাদের এই নাটকে কিছু কিছু সেই জাতের উপাদান উপকরণের সন্ধান মেলে।

এ নাটকে ভক্তির আতিশয্য নেই—ভক্তিরসের বন্যায় স্থান কালপাত্রের সমন্বয়ী বাহ্যজ্ঞান নাট্যকার লুপ্ত হতে দেন নি। সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে সামাজিক পরিবেশে 'দেবতারে প্রিয় করি',—এই রকম রসোপযোগী সিচুয়েসন্ সৃষ্টি করে নাটকটিকে রমণীয় করে তোলার সচেতন প্রয়াস পেয়েছেন নাট্যকার।

প্রণয়ঘটিত কিছু কিছু ঘরোয়া কার্যকলাপ নাটকে অবিচল নিষ্ঠায় সন্নিবিষ্ট করায় নাট্যকারের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা প্রতিভাত হয়।

লৌকিক ও আধ্যাত্মিক ভাবভাবনার আলোছায়ার লুকোচুরি নাটকের বহু জায়গায়। আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা শুনিয়ে উদ্দাম কামনা-বাসনাকে সংযমের দড়িতে বেঁধে পরমুহূর্তেই কানুর ঐহিক বিরহ মিলনে পৌরাণিক কাহিনীর অনুশাসন না মানার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত বা নজীর এ নাটকে মেলে। তাই আক্ষরিক অর্থে এটিকে ঠিক পৌরাণিক নাটক বলা সঙ্গত নয়। ভাবগত ভাবে এটিকে বরং সামাজিক লক্ষণাত্মক পৌরাণিক নাটক বলাই সমীচীন।

নাটকটির বিচিত্র ভাবধারা ক্ষণে ক্ষণে চকিত এ্যাক্সান, ঘটনার দ্রুত পট পরিবর্তন, এবং নাটকে শ্যাম ও শ্যামার অভিন্ন অস্তিত্বজনিত তত্ত্বকথার নিপুণ ব্যঞ্জনা—সব মিলিয়ে নাটকটির বিশেষ করে শেষাংশের জমজমাট ভাব এর অতিরিক্ত আবেদন—অন্যতম বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত হতে পারে।

বৈষ্ণবপদকর্তাদের অনুকরণে কিছু কিছু গীত রচনার প্রয়াস রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো মধ্যে সার্থকরূপে যদি আত্মপ্রকাশ করে থাকে তো তিনি ক্ষীরোদ-প্রসাদ।

॥ নরনারায়ণ ॥

গিরিশচন্দ্রের অহৈতুকী ভক্তিবাদের নবরূপায়ণ যাত্রার সঙ্গীত প্রবণতার সূত্রে গীতিনাট্যে রূপান্তর, চরিত্র সৃষ্টিতে ও কাহিনী বিন্যাসে শেকসপীরীয় নীতির অনুবর্তন, স্বতঃস্ফূর্ত স্বকীয় কবিকল্পনার স্বচ্ছন্দ বিকাশ—সবকিছুর সমন্বয়ে নরনারায়ণ ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যসম্ভারের মধ্যে শুধু শ্রেষ্ঠনাটক নয় বাংলা নাট্যসাহিত্যের ও এটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি বিশেষ অবদান বলে চিহ্নিত হবে।

নরনারায়ণ পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে লেখা পৌরাণিক নাটক। পুরাণের অনুকরণে পুরাণ কাহিনীর যথাযথ পুনরাবৃত্তিই নাট্যকারের স্বধর্ম নয়, নাটকের প্রয়োজনে নাট্যসূত্রের অপরিহার্য গ্রন্থনায় কয়েকটি চরিত্রের অন্যরূপে চিত্রন অনাটকীয় বলে গণ্য না হলে অনায়াসে তা স্বীকৃত হতে পারে। মূলভাবের বিকৃতি না ঘটিয়ে নাটকের অনিবার্য প্রয়োজনে চরিত্রের বিস্তৃতি বা বিকাশকে স্বাভাবিক বলে প্রতিপন্ন করার শক্তিকে নাট্যকারের প্রতিভা বলে ধরা নেওয়া উচিত। অবশ্য একথাও সবসময় পৌরাণিক নাটকের নাট্যকারকে মনে রাখতে হবে যে পৌরাণিক নাটকে ঘটনা ও চরিত্র পরিকল্পনায় পুরাণ বহির্ভূত কোন অভিনব মৌলিকতা কাম্য নয়। মনে রাখতে হবে সুনির্দিষ্ট ভাবাদর্শ, ঘটনা ও চরিত্রের নাট্যরূপের অভাবে পৌরাণিক নাটক পুরাণের পুনরাবৃত্তি হলে চলবে না, তাকে পুরোপুরি নাটক হতে হবে।

নাটকের নামকরণ যাই হোক না কেন মূল চরিত্র যে কর্ণ তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। দৈব ও পুরুষকারের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত জীবন কথাই নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে যদিও মূল চরিত্র হয়েও কর্ণের নামে নাটকের নামকরণ হয় নি। সংঘাতসংকুল কর্ণের মহাজীবনের পতনে যেটুকু সহানুভূতি ও হাহাকার উত্থিত হয়েছে তার তুলনায় নরনারায়ণের কল্যাণমহিমা কিছুমাত্রও প্রকাশিত হয় নি। নাট্যকারের স্বপক্ষে যে কথা সোচ্চার তা হল মহাভারতে যাই থাক কর্ণ চরিত্র নাটকের প্রয়োজনে ট্রাজেডি পরিকল্পনার অনিবার্যতায় মহৎ চরিত্রের সামিল হয়েছে।

মহাভারতে সভাপর্বের দ্রোপদীর শ্লীলতাহানি প্রসঙ্গে কর্ণের ভূমিকায় তার কলঙ্ক তাকে কলুষিত করেছে। বিকর্ণ দ্রোপদীকে অজিত প্রমাণ করবার জন্য সভায় যে বক্তৃতা দেয়—তার সমর্থনে কর্ণের উক্তি তার চরিত্রের আলোকোজ্জল দিগদর্শন করায় না। কর্ণ দ্রোপদীকে বারস্ত্রী বলে অবমাননা করেন এবং দুর্যোধনের কটূক্তি ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গিকে উৎসাহিত করতে হাস্য করতে থাকেন। কর্ণের বীরত্বের প্রতি কটাক্ষেরও ইঙ্গিত আছে মহাভারতে। বনপর্বে গন্ধর্ব রাজ

চিত্র সেনের সঙ্গে সংঘর্ষে কর্ণ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পলায়ন করে প্রাণ বাঁচান। এ ঘটনা ও বীর আখ্যার অনুকূলে যাবে না। বিরাট-পর্বে বৃহন্নলারূপী অর্জুনের সঙ্গে সংঘর্ষে কর্ণ আর একবার বিব্রত হন। গজ যেমন অন্য গজ কর্তৃক পরাজিত হইলে পলায়ন করে তদ্রূপ তিনি তখন অশনি-সন্নিভ শরপ্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিলেন।

স্বভাবসুলভ বাগদর্প প্রকাশের জন্য কর্ণ ভীষ্ম কর্তৃক ধিকৃত হন। 'হে কাল হতবুদ্ধি কর্ণ। তুমি কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছ? মহাত্মামহেন্দ্র তোমারে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন তুমি সময় সময়ে বাসুদেবের চক্র প্রতিহত, বিদীর্ণ ও ভস্মীভূত অবলোকন করিবে।' এরপর মহাভারতের স্বীকৃত ঘটনা কর্ণ ক্ষোভবশতঃ প্রতিজ্ঞা করেন তিনি ভীষ্ম দ্রোণের জীবদ্দশায় অস্ত্রধারণ করবেন না।

কর্ণের জীবনের এমনি অনেক কিছু ঘটনা আছে যার সংস্কারকে প্রাধান্য দিলে নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য এক দৈবনিগৃহীত পূর্ণশক্তির মহাপুরুষের জীবন কাহিনীর নাট্যরূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা প্রথমেই আঘাত পেত। কর্ণের চরিত্রের যে দিকটি মহান এবং উজ্জ্বল সেই দিকটিকে উজ্জ্বলতর করে তোলাই নাট্যকার সুবিবেচনার কাজ বলে মনে করেছেন। রসবৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে পরিকল্পনার সূত্রে এক পূর্ণশক্তি মহাজীবনের দৈবহস্তে শোচনীয় নিগ্রহের কাহিনীকে ট্র্যাজেডি নাটকে পরিণত করার ইচ্ছা যে নাট্যকারের ছিল সে সম্বন্ধে কারুর দ্বিমত থাকা উচিত নয়। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটকে পাত্র-পাত্রীদের সাধারণ রূপটিকে অসাধারণ করার কৃতিত্ব নাট্যকারের। 'নরনারায়ণ' মূলতঃ কাব্যনাট্য পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। কাব্যনাট্যে কবিত্বের প্রাধান্য গৌণ নয়। কবির কৃতিত্ব সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে অর্থাৎ অনভিব্যক্ত সম্ভাব্যকে আবিষ্কার করায়। 'ঘটে যা তা সব সত্য নহে।৮ বাল্মীকির মনোভূমি যেখানে 'রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য'৯ সেখানে পৌরাণিক ঐতিহাসিক চরিত্রের ও শৈল্পিক জন্মভূমি কবির মনোভূমি। ডক্টর সাধন ভট্টাচার্যের মতে 'নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ পৌরাণিক কর্ণচরিত্রকে এখানে নূতন ভাবাদর্শে পরিকল্পিত করিয়াছেন। তিনি মহাভারতের কর্ণের বাহ্যিক রূপটি অর্থাৎ কর্ণের জীবনের তথ্যরাজি মোটামুটি গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু কর্ণের হৃদয় মন গঠনে অনেক পরিমাণে স্বাধীন কল্পনা আশ্রয় করিয়াছেন।১০ মহাভারতের কর্ণের 'অন্তঃ কৃষ্ণ বহিঃ কর্ণ" ভাবগত রূপটি নাট্যকার অক্ষুন্ন তো রেখেছেনই উপরন্তু আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে কর্ণের মধ্যে ধীরে ধীরে কৃষ্ণের প্রতি অহেতুক আসক্তি ও ভক্তি সঞ্চার করেছেন। কৃষ্ণের মহিমা প্রদর্শনকে নাটকীয় বিষয়বস্তু, চরিত্রচিত্রন এবং

৮. ৯. ভাষা ও ছন্দ—কবিতা—রবীন্দ্রনাথ
১০. নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার—ডঃ সাধন ভট্টাচার্য।
নিগ্রহ—নিগৃহীত।

ভাবব্যঞ্জনার মাধ্যমে সাঙ্গীকরণ প্রচেষ্টা বিশেষ করে পৌরাণিক নাটকের ভাবমণ্ডলের পরিধির মধ্যে-নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। পৌরাণিক পরিমণ্ডলে ভক্তিভাব সন্নিবেশ স্বাভাবিক ঘটনার পর্যায়ে পড়ে কিন্তু নরনারায়ণ নাটকে কৃষ্ণের ঐশ্বরিক বিভূতি সম্পর্কে অবিশ্বাসী কর্ণের বিশ্বাস স্থাপনের ইতিবৃত্তচরি-বিকাশ এবং ঘটনা বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত হয়েছে। মহাভারতে কর্ণ কৃষ্ণভক্ত বলে বর্ণিত হন নি কিংবা চরিত্রের সে দিকটিও চিত্রিত হয় নি, কোথাও ঘোরতর কৃষ্ণবিরোধী বলে তাকে ঘোষণা করারও প্রয়োজন দেখা যায়নি। আজন্ম দৈবনিগৃহীত এক পুরুষকার কি ভাবে নির্মম নিয়তির নেপথ্য চক্রান্তে নিজের অন্তিম পরিণতির মুখোমুখী হলেন —সেই ঘটনা টকে মহাভারতের অনুসরণে সাজিয়ে নাট্যকার কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রের সাহায্যে বিশেষ করে সাধ্বী অনুগতা স্ত্রী পদ্মাবতীর সহযোগিতায় এক পরম প্রাপ্তির পরিতৃপ্তি উপভোগ করেছেন। এতে ট্রাজিক পরিস্থিতির বিষাদময়তা, মর্মান্তিক বিয়োগব্যথার হাহাকার অন্তর্হিত হয়েছে বলে নাট্যকলাতাত্ত্বিক সমালোচনারও সম্মুখীন হতে হয়েছে নাট্যকারকে। তবে কর্ণের অন্তরে যা ছিল সুপ্ত যা ছিল মৌন তার উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ, তার সোচ্চার অভিব্যক্তি জীবনের মূল্য দিয়ে কেনা হল এতে বেদনার ভাগই বা কম কি? কর্ণের অর্জুন বিজয়ের উচ্চাশা অদৃষ্টের দুর্বোধ্য খেলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার দুঃখজনক ঘটনা পরিস্থিতির-পরিবেশের দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাবের মধ্যে কর্ণের অবচেতন ও চেতন সত্তায় শ্রীকৃষ্ণের ভাগবত বিশ্বাসের মধ্যে নিশ্চয়ই হারিয়ে যাবে না।

নাটকের বিভিন্ন চরিত্র বিশ্লেষণ করলে নাটকটির চরিত্রগুলি ধীরে ধীরে কৃষ্ণমুখীন একথা বলে গেলেও নাটকটিতে কৃষ্ণভক্তির বন্যায় নাটত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছে কিংবা নাটকটি সার্বজনীন কৃষ্ণভক্তির অন্যতম নিদর্শন এমন কিছু মন্তব্য শোভন ও সমীচীন নয়।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে কর্ণের ভক্তিবাদ যুক্তিবাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, প্রাণের মূল্যে কেনা। পদ্মাবতী ও বৃষকেতু মহাভারতের অপ্রধান চরিত্র। পদ্মাবতীর কৃষ্ণভক্তি বক্ষে সমার্পিতা প্রাণীর অবিশ্বরূপ। তার অন্তরেও যেমন বাহিরেও তেমনি কৃষ্ণ বিরাজমান। মায়ের কৃষ্ণভক্তি পুত্র বৃষকেতুর উপর আরোপিত। মহাভারতের এই দুইটি অপ্রধান চরিত্রকে নাটকে কৃষ্ণভক্ত করে তোলার প্রয়োজন ছিল কর্ণের জীবনদর্শনকে প্রভাবিত করার জন্য—কৃষ্ণভক্তির একটি পারিবারিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির জন্য। নাট্য প্রয়োজনে মহাভারতের দুই অপ্রধান চরিত্রের প্রাধান্য প্রদানে কিছু বলার নেই। অন্যান্য চরিত্র ভীষ্ম দ্রোণ মহাভারতে আপাত দৃষ্টিতে কৃষ্ণভক্ত বলে মনে হলেও কৃষ্ণে তাদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পন নেই। সাধারণভাবে মহাভারতে ভীষ্ম দ্রোণের পাণ্ডব স্নেহ এবং কৃষ্ণভক্তির উল্লেখ আছে, সঙ্গে বিদুরেরও। তা ছাড়া গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান জ্ঞান করতেন তাই তার

আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল পাণ্ডবদের ওপর—কারণ জনার্দন বা শ্রীকৃষ্ণ তাদের সহায়। 'জয়ো, হস্তু পাণ্ডুপুত্রানাং যেষাং পক্ষে জনার্দনঃ।' সুতরাং নাটকে এরা কৃষ্ণভক্তরূপে রূপায়িত হলে নাট্যকারের বিপক্ষে কিছু বলার নেই। দ্রৌপদী তো স্বাভাবিক-ভাবেই কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণী, নাট্যকার তাকে কৃষ্ণসখী করে তুলেছেন নাটকের সঙ্গত প্রয়োজনে, মানবিক আবেদনের স্পর্শে কৃষ্ণ চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্যে। সুতরাং নাট্যকার দুর্যোধনপত্নী ভানুমতীকে দ্রৌপদীর সগোত্রা কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণা করে বা কৃষ্ণসখীতে পরিণত করে অপৌরাণিক অপরাধ করেন নি একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়। তবে স্বামীর আসন্ন মৃত্যু জেনেও স্বামী-পরায়ণা পদ্মাবতীর লোকবিহ্বলা না হওয়ার অ-নাটকীয় ঘটনার উল্লেখ স্বভাবতই সমালোচকরা করতে পারেন। শেষদৃশ্যে শ্রীকৃষ্ণ আত্মসমর্পনে পরম প্রাপ্তির পরিতৃপ্তি দেবের সঙ্গে সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত বীরের পতনজনিত হাহাকারকে তরলায়িত করেছে এ অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করা যায় না। তবে পৌরাণিক নাটকে যে ট্রাজেডিকল্পনা প্রায় অচিন্ত্যনীয়—সেই ট্রাজেডি নাটকের গঠন ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে নাটকটিকে বিন্যস্ত করে পৌরাণিক নাটকে প্রায় অসম্ভবকে সম্ভবই করে তুলেছেন নাট্যকার। কর্ণের কৃষ্ণে আত্মসমর্পনে তার মহাপতনের দুঃখ মন থেকে মোছে না—নিয়তির নিষ্ঠুর কৌতুকের মাঝে কর্ণের আত্মার সদ্‌গতিতে শুধুমাত্র একঝিলিক সান্ত্বনার ও শান্তির হাওয়াই যা প্রবাহিত হয়। সুতরাং মহাভারতের অনুসরণে কয়েকটি চরিত্রে কৃষ্ণ-ভক্তি আরোপ নাটকীয় পরিণতির পক্ষে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছে এ কথার যৌক্তিকতা নেই। কৌরব সভায় লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর প্রতি অশোভন উক্তি করেছেন যে কর্ণ সেই কর্ণ চরিত্রে মহত্ত্ব আরোপ না করতে পারলে তা ট্রাজিক চরিত্রের সামিল হবে না—এ বোধ নাট্যকারের ছিল। তিনি জানতেন অদৃষ্ট বিড়ম্বিত মানবাত্মার শোচনীয় পতনেই ট্রাজেডি হয় না—তার মধ্যে এমন কিছু সন্নিবিষ্ট হওয়ার দরকার যাতে কেন্দ্রীয় চরিত্রের প্রতি সজ্জনচিত্ত স্বাভাবিক শ্রদ্ধায় অবনত হয়। নরনারায়ণে নাট্যকার কর্ণ চরিত্র চিত্রনে এবং ঘটনা সংস্থাপনে সে কাজটুকু সুষ্ঠুভাবে করতে সক্ষম হয়েছেন। অপরেশচন্দ্রের কর্ণার্জুন নাটকে উচ্চাভিলাসী এক মহাবীরের পতন এই মহত্বের অভাবে দর্শক মণ্ডলীর শ্রদ্ধা ও সমবেদনা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় নি। নরনারায়ণে শেষ দৃশ্যে শ্রীকৃষ্ণের মানবিক সহানুভূতি ও কর্ণের মহাপতনে তার আন্তরিক উদ্বেল হৃদয়ের আকুতি ট্রাজেডি অনুভূতি সঞ্চারের সম্পূর্ণ অনুকূলে। কর্ণের অবস্থা দর্শনে কৃষ্ণের চোখেও জল। 'বীরত্বের অভিমানী সংগ্রাম পরায়ণ কর্ণের মরণ এ চোখের জলের প্রেরণা নয়।' 'পৃথিবীর দৈন্য দেখে ঝরিতেছে আঁখি।' কিন্তু কিসের দৈন্য কী এমন ক্ষতি হল কর্ণ বিহনে। 'আজি দাতা কর্ণ চলে যায় নিঃস্ব করি তারে।' ট্রাজিক অনুভূতির অনুকূলে আরো একটি দৃষ্টান্ত আছে।

কর্ণের নিধন বার্তা শুনি মূর্চ্ছাগতা ভূপতিতা মাতা
কোনমতে ফিরিছে না জ্ঞান। ভাসিছে পাঞ্চালী

নয়নের জলে, হেঁটমুণ্ডে ধর্মরাজ বসে পদতলে
পার্শ্বে তার দাঁড়াইয়া ধনঞ্জয়।

জাতি পরিচয়ে পৌরাণিক এবং রসবৈশিষ্ট্যর দিক দিয়ে নাটকটিকে ট্রাজেডি শ্রেণীভুক্ত করাই বোধহয় সমীচীন। নাটকটি নামে তো পৌরাণিক বটেই এর স্বধর্মেও যে পৌরাণিক সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বাস্তব জগতে দেবতার মনুষ্যদেহে অবতরণে বিশ্বাস, মন্ত্র অভিশাপে বিশ্বাস, চরিত্রের অধ্যাত্মপরায়ণতা এবং সর্বোপরি নিয়তির অমোঘ নিয়মে আস্থা প্রভৃতি লক্ষণের দিক দিয়ে নাটকটিকে পৌরাণিক আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত।

পৌরাণিক নাটকে সাধারণতঃ ট্রাজিক অনুভূতি সৃষ্টি দুরূহ কাজ। অতিপ্রাকৃত, আশীর্বাদ, অভিশাপ এবং সর্বোপরি অধ্যাত্মপরায়ণতা দুঃখবেদনার গভীরতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না, মর্তের কোন উপলব্ধি প্রবীণ চরিত্রের নিদারুণ হাহাকারকেও আধ্যাত্ম মহিমার স্নিগ্ধ স্পর্শে স্তব্ধ করে দেয়। তবে চরিত্রের মানবিক আবেদন যত প্রত্যক্ষ, চরিত্র যত কাছের লোক বলে প্রতিভাত হবে তার দুঃখ বেদনা স্বভাবতঃই তত মনকে নাড়া দেবে, সমবেদনার স্পর্শে স্পর্শকাতর করতে পারবে। নিয়তির অমোঘ বিধানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পুরুষকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে যে নিষ্ফল সংগ্রামে শোচনীয়ভাবে নিজেকে ক্ষয় করে দেওয়া, অদৃষ্টের অনিবার্য পরিণতির স্রোতের প্রতিকূলে নিজেকে ভাসিয়ে না রাখতে পারার সত্যিকারের ট্রাজিডিই ঘটেছে কর্ণের জীবনে। নরনারায়ণ কতখানি ট্রাজেডি, কতখানি ট্রাজেডি নয় সে সম্পর্কে একটি মন্তব্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না "কর্ণে যে পরিমাণে মানবিকতা সেই পরিমাণেই আমরা ব্যথিত আর সেই পরিমাণেই কর্ণের শোচনীয় দ্বন্দ্ব ও পরিণতি ট্রাজেডি রসাত্মক হইয়াছে। কর্ণের মৃত্যু সময়ে নরনারায়ণ সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন বটে কিন্তু বেদনা বিষাদের চাপ তাহাতে সামান্যই লঘু হইয়াছে। নিয়তির নিগ্রহ, জন্ম অভিশাপের লাঞ্ছনা, নিরুপায় দ্বন্দ্ব ক্ষোভ, শোচনীয় করুণ পরিণতি—সব কিছু মিলিয়া নাটকখানি রসাত্মকই হইয়াছে।"১১

উপকরণ আয়োজন পরিকল্পনা সবকিছুর দিক দিয়ে নাটকটিতে শেকসপীরীয় ট্রাজেডির ছায়া পড়েছে বলে ধরে নেওয়া যায় এবং শেকসপীয়রীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে নাটকটিকে ট্রাজেডি বলে চিহ্নিত করার পিছনে কিছু যুক্তিও আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন।

কর্ণের মৃত্যুর মূলে তার উচ্চাশা অর্জুন-বিজয়। শুধু অর্জুন-বিজয় কেন পৃথিবী বিজয়েরও ক্ষমতা তার অধীন ছিল। কিন্তু এত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও কর্ণের পতনের মূলে দৈবের নির্যাতন, অদৃশ্য নিয়তির ব্যঙ্গ ও ছলনা। ব্রাহ্মণের অভিশাপ কর্ণের কাছে একেবারেই আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত। ব্রহ্মর্ষি পরশুরামও

১১. নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার— ডঃ সাধন ভট্টাচার্য।

তাকে যে অভিশাপ দিয়েছিলেন নিজে সূতপুত্র এই আত্মবিশ্বাসের বর্মে সে অভিশাপকে কর্ণ আশীর্বাদ মনে করেই নিশ্চিন্ত ছিলেন, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে তার রাধেয় পরিচিতির মুখোমুখি দাঁড়াল তার কৌন্তেয় এর কলঙ্কিত পরিচিতি যা ছিল তার স্বপ্নেরও অগোচর। স্নেহ মমতার আবরণে তার প্রতিজ্ঞার দীপ্তি হয়ে গেল ম্লান। তার একান্ত নিরাপত্তার প্রতীক কবচকুণ্ডল ও স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দিলেন তিনি। শেষ সম্বল একবিঘাতিনী অস্ত্র। নরনারায়ণের অপূর্ব কৌশলে ঘটোৎকচবধে সে অস্ত্রের প্রয়োগকেও যেন ব্যঙ্গ করে গেল ঘটোৎকচ। অর্জুনের প্রতি প্রক্ষিপ্ত শেষ মারাত্মক অস্ত্রও কৃষ্ণ ব্যর্থ করলেন কৌশলে অর্জুনের রথকে ভূতলে নামিয়ে দিয়ে— ব্যর্থ করলেন কর্ণের অর্জুনবিজয়ের শেষ প্রচেষ্টা। সবই যেন নিয়তির নির্মম পরিহাস—অদৃশ্য শক্তির লীলা। পৌরুষ সম্বল করে নিয়তি নির্যাতিত মানুষের ভাগ্যের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামই তো গ্রীক ট্রাজেডির অন্যতম উপাদান। কিন্তু একটু গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে কৌন্তেয় কর্ণের নূতন পরিচিতির রন্ধ্রে কোথায় যেন দুর্বলতার কীট প্রবেশ করে তার পৌরুষ চেতনাকে মোহগ্রস্ত করে রেখেছিল। তার একদিকে মৃত্যুরূপা জননী কুন্তী অন্যদিকে ইষ্টরূপী নরনারায়ণ কৃষ্ণ যেন তার মৃত্যুকে জড়িয়ে দিয়েছে জীবনের সঙ্গে। ভারতীয় ভক্তিবাদ ও আদর্শবাদ পৌরানিক নাট্যলক্ষণের সুবাদে ঈপ্সিত ট্রাজেডির মর্মান্তিক বিষাদময় পরিণতিকে মহত্তর মহামিলনের পরম পাওয়ার প্রশান্তিতে নাট্যকার তরল করে নিয়েছেন। কর্ণের জীবনের শূন্যতার হাহাকার তার স্ত্রী পদ্মাবতীর মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয় নি যদিও কিছুটা কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডবের বিস্ময় বোধের মধ্যে সে হাহাকারের প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা গেছে। শ্রীকৃষ্ণ যে নরদেহী নারায়ণ সেই অনুভূতিতে ও জীবনের মূল্যে কেনা বিশ্বাসের উত্তরণে পরম পরিতৃপ্তির মধ্যে সে শূন্যতার পূর্ণতা। অনিবার্য ট্রাজেডির প্রবাহমানতার এই আকস্মিক ব্যাঘাত সৃষ্টির ফলে এটিকে পুরোপুরি ট্রাজেডি বলতে অনেক সমালোচকই ইতস্ততঃ করেছেন। নাটকটি সেই অর্থে ট্রাজেডি লক্ষণাত্মক নাটক কিন্তু পুরোপুরি কেতাবী অর্থে ট্রাজেডি নয়।

নরনারায়ণ নাটকটির কাহিনী বিন্যাসে শেকসপীয়রীয় নাট্যশৈলীর অনুবর্তন সহজেই চোখে পড়ে। নায়কের চরিত্র বিকাশের মাধ্যমে অর্থাৎ কর্ণের চরিত্রকে পূর্ণ প্রতিভাত করার প্রয়োজনে অন্যান্য চরিত্রকে সক্রিয় রাখা হয়েছে। নাটকটিতে পূর্ববর্তী ঘটনা পরবর্তী ঘটনা স্রোতের দিকে স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিকগতিতে এগিয়ে গেছে। এ নাটকে একটি ঘটনা পরবর্তী ঘটনার অনিবার্য আকর্ষণরূপে চিত্রিত হয়েছে। কর্ণের আস্ফালন ও ভরসার ওপর নির্ভর করেই দুর্যোধন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। মহাভারতের এই সত্যটিকে নাট্যকার কর্ণ চরিত্রের উচ্চাশার সঙ্গে যোগ করে দিয়েছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যে পরোক্ষে কর্ণেরই সৃষ্টি নাটকে এই ব্যাপারটির জন্যে নাট্যকারকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় নি, এ ঘটনা মহাভারতের। কৌরব সভায়

কর্ণের অনার্যোচিত নীচ ব্যবহারের উল্লেখ নাটকে নেই— নাট্যকার কর্ণ চরিত্রে মহত্ব আরোপ করে সমবেদনার সূত্রে চরিত্রকে গ্রথিত করে গ্রীক ট্রাজেডির নায়করূপে চরিত্রকে দাঁড় করানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকবেন একথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। কর্ণের পরিণাম এবং চরিত্র বিকাশের জন্য যে যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে সেগুলির প্রযোজনীয়তা অনস্বীকার্য। ভীষ্মের সঙ্গে বিরোধ, কবচ কুণ্ডলদান প্রসঙ্গ, পদ্মাবতীর সঙ্গে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ আলোচনা, কৃষ্ণের কাছে কৌন্তেয় পরিচিতি প্রসঙ্গ সমস্ত কিছুই কর্ণের ধ্যানধারনায় বিপ্লব এনেছে, তার আজন্ম বিশ্বাসকে নাড়া দিয়েছে, তার হৃদয়বৃত্তিতে দ্বন্দ্বের ঝড় তুলেছে। তবে যা কিছু সবই ভাবগত আবেগপ্রবণতার অনিবার্যতায়, কর্মমুখরতার বাস্তবায়নে নয়। নর ও নারায়ণের মধ্যে যে ব্যবধান তার দূরীকরণের নিমিত্ত কর্ণ যে পরিমাণে অন্তরে কৃষ্ণমুখীন সেই পরিমাণেই বাসুদেব ও ধনঞ্জয় বিমুখী বাহিরে। নাটকটির গঠন বিন্যাসে নাট্যকারের স্বকীয়তা মহাভারতে যা প্রচ্ছন্ন, অব্যক্ত কর্ণের সেই রাধেয় ও কৌন্তেয় সত্তার দ্বন্দ্ব প্রকাশের যে সুযোগ তার পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। মহাভারতে কর্ণের মনুষ্যত্ব বোধ যে ভাবেই হোক প্রকাশমান কিন্তু তার মধ্যে মর্মের স্থান ছিল গৌণ। ক্ষীরোদপ্রসাদ কর্ণচরিত্রের মানসদ্বন্দ্বের মধ্যে মর্ম এর একটি বিশেষ স্থান নির্দেশ করেছেন—মর্ম চায় পরাজয়, ধর্ম চায় জয়, মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা।

সূচনা দৃশ্যে সংযোজন সম্পর্কে এবং ওটির নাট্য প্রয়োজন সম্পর্কে নাট্যকারের বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই। সমালোচক ডক্‌টর ভট্টাচার্যের মতে—তাপসের আশ্রয় সান্নিধ্যে পরশুরামের উপস্থিতি অসম্ভব ঘটনা নয় বটে, কিন্তু অপ্রস্তুত-ভাবে পরশুরামের কর্ণের জানুতে শয়ন এবং নাটকীয় নিদ্রা ঔচিত্যবোধক কিনা প্রশ্ন উঠতে পারে। মূল কাহিনীতে যাই থাক নাটকে এর উপস্থাপনা রসের দিক দিয়েও চিত্তাকর্ষক হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে সবাই একমত হবেন না। ডক্‌টর ভট্টাচার্য আরও বলেছেন, অভিশাপ দেওয়ার আগেই তাপসের ও পরশুরামের ক্রোধের উত্তেজনা অনুচিত মাত্রায় প্রশমিত হইয়া গিয়াছে। তবে পরশুরামের চরিত্রকে নাট্যকার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ভাবগম্ভীর করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বিশেষ লক্ষণীয় এই যে সূচনা দৃশ্যে নাটকের ভাব বীজটিকে নরনারায়ণের প্রতি কর্ণের মনোভাবকে নাট্যকার সুন্দররূপে স্থাপনা করিয়াছেন এবং পরশুরামের অভিশাপে সত্যিই যদি 'হীন সূতপুত্রের শোনিতে অশুচি হইয়া থাকি আমি এ পাপ না স্পর্শিবে তোমারে'—এইটুকু অমহাভারতীয় আরোপ মিশাইয়া ভাবী একটি দ্বন্দ্বের জন্য অবকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাপসের অভিশাপ অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ হিসাবে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিলে বলা যাইতে পারে দুইটি অভিশাপেরই সদ্‌ব্যবহার হইত।১২

---

১২. নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার—ডঃ সাধন ভট্টাচার্য।

নরনারায়ণ নাটকে ঘটনার কালের পরিসর প্রয়োজনানুগ, স্বল্প এবং সুসংগৃহীত। অষ্টাদশ পর্বের সামান্য অংশই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। কর্ণের জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা অনাবশ্যকভাবে নাটকের উপকরণরূপে গৃহীত হয় নি নাট্যকারের সুবিবেচনায়। উদ্যোগপর্বের ঘটনা দিয়েই মূল নাটকের সূত্রপাত। পরবর্তী ঘটনা যা কিছু এসেছে স্বগতোক্তি বা বিবৃতির সংবাদে। সূচনা দৃশ্য পরিকল্পনাও সেই সূত্রে প্রারম্ভিক দৃশ্যরূপে সংযোজিত হয়েছে। নাটকটির মূল চরিত্র কর্ণ বলে প্রতীয়মান হলেও নামকরণের সূত্রে নাট্যকারের উদ্দেশ্য যে রীতিমত জটিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। নাট্যকারের নৈপুণ্যে কর্ণের মানসদ্বন্দ্বের ও চরিত্রটির বিকাশের জন্য কৃষ্ণ চরিত্রের অবতারণা এবং যথাযথ উপস্থাপনার প্রয়োজন স্বীকৃত। ঘটোৎকচ কর্ণের জীবনের মূর্তিমান নিয়তিরূপে চিত্রিত। নাটকে মোটামুটিভাবে প্রায় সব কটি চরিত্রই কর্ণচরিত্র বিকাশের অনিবার্য প্রয়োজনেই এসেছে।

চরিত্র বিচারে কর্ণ প্রশংসণীয়ভাবে ব্যাঞ্জনায় অভিব্যক্তিতে আত্মমন ও প্রাণের জটিল দ্বন্দ্বের আবর্তে বাংলা নাট্য সাহিত্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি একথা বলা চলে, যদিও চরিত্রটির বিকাশে কিছু কিছু অসঙ্গতি চোখে পড়ে। কৌন্তেয় ও রাধেয় সত্তার মধ্যে যে বিরোধ নাটকে তার তীব্রতা কিছু কম এবং কর্ণের কৌন্তেয় সত্তায় ভ্রাতৃস্নেহের অতিশয্য সামঞ্জস্যের সীমা অতিক্রম করেছে দু একটি ক্ষেত্রে।

যুধিষ্ঠির চরিত্রটি ক্ষত্রিয় অথচ ধার্মিকরূপে চিত্রিত। শান্তিপ্রিয় অক্রোধ অনন্য এবং ঈর্ষাহীন এই চরিত্রটি মহাভারতের অনুসরণে যথার্থ শান্তিপ্রিয় একটি চরিত্র-রূপে প্রতিভাত হয়েছে। যুদ্ধের বিভীষিকার শিহরণে তার সংলাপ যথাযথ—কেশবের কাছে তার প্রার্থনা—তোমার প্রসাদে ভাই কৌরব পাণ্ডব আবার প্রশান্তচিত্তে একত্র মিলিয়া পরমানন্দে কাল যেন করিছে যাপন। যুধিষ্ঠির কিন্তু দুর্বল নন, তার আত্মিক বল ও তার ধর্মপরায়ণতার অদৃশ্য বর্মে বিরুদ্ধশক্তি সহজেই প্রতিহত হয়েছে। যুধিষ্ঠির সম্পর্কে কৃষ্ণের কাছে কর্ণের তাই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—ঠেলিলাম বাসুদেব তব অনুরোধ—পারি না উপেক্ষা করিতে তার চিরলোভনীয় সঙ্গ যার। পরম শত্রু দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের কাছে' সুযোধন' নামে সম্বোধিত। শকুনি চরিত্রটি এই মাহাত্ম্যের দিকটি অস্বীকার করতে পারে নি। ধর্মরাজই বটে তুমি যুধিষ্ঠির, একটি বারের তরে দুর্যোধন মুখ হতে বহির্গত হল না তোমার। জেষ্ঠের প্রতি আনুগত্যের মূর্ত প্রতীক ভীম চরিত্রটি। ভীমের শৌর্যবীর্য ও নাটকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত। এই শৌযবীর্য—অসীম ধৈর্য জেষ্ঠের প্রতি আনুগত্যের আড়ালে কিছুটা অনুচ্চারিত অবস্থায় রেখে নাট্যকার চরিত্রটিকে মহাভারতের অনুসরণে যথাযথভাবে মর্যাদামণ্ডিত করেছেন। কর্ণের কাছে পরাজিত হয়েও অন্যের মত তাকে শ্রেষ্ঠ বীর বলে অভিবাদন না জানানোয় তার যে

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কর্ণের সংলাপে তার স্বীকৃতি রয়েছে। 'সারা বিশ্ব পশ্চাতে রাখিয়া একবার দাঁড়াও সম্মুখে ভীমসেন। একবার স্নিগ্ধ নেত্রে চাহ মোর পানে। মনে কর ধারনায়, এ জগতে আছ মাত্র তুমি আর আমি।' এই নাটকে স্বল্প পরিসরে দ্রৌপদী চরিত্রটি মহাভারতের আদর্শে অপূর্ব মানবিক আবেদনসিক্ত চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। মহাভারতে দ্রৌপদী দেহমনে যাজ্ঞসেনী অগ্নিসম্ভবা, অহরহ অপমানের দুষ্কৃতির অগ্নিজ্বালা বহন করে তিলে তিলে দগ্ধ তিনি। নাট্যকার দ্রৌপদীর নিজের মুখেই তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতির সুযোগ দিয়েছেন। দ্রুপদনন্দিনী আমি দীপ্ত বহ্নিশিখা সম ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী—বাসুদেব প্রিয়সখী পাণ্ডুরাজ স্নুষা-ভূমণ্ডলে অতল সৌভাগ্যবতী নারী। কৌরবগণের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাবে স্বভাবতই তিনি ক্ষুব্ধা। নাটকে তার অন্তর্নিহিত তীব্রজ্বালার প্রকাশ ঘটিয়েছেন নাট্যকার দ্রৌপদীর সংলাপ মারফৎ। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের দামামা বেজেছে দ্রৌপদীর উত্তেজক বাণীতে। পরমসহিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের চোখেও বইয়েছেন সমবেদনার জল। এই দীপ্তিময়ী মূর্তিটিকেও আবার শান্তরূপের প্রতীকরূপে দেখা যায় কৃষ্ণের কাছে বিনয়াবনতা ভক্তের ভূমিকায়।

কৃষ্ণপরায়ণতার প্রতিমূর্তি পদ্মাবতী চরিত্রে বাঙালী বধূর স্নিগ্ধ ভক্তিভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে। স্বামীর প্রতি যত্ন নিষ্ঠা এবং কৃষ্ণ ভক্তির চমৎকার সমন্বয়ের চেষ্টা রয়েছে চরিত্রটিতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও চরিত্রটিকে একেবারে মাটির কাছাকাছি বলে স্বীকার করতে সবাই একমত হবেন না। ভাবের ও আদর্শের দিক দিয়ে কিংবা কৃষ্ণ ভক্তির পরাকাষ্ঠ্যা হিসাবে চরিত্রটির যতটা গুরুত্ব, মানবিক আবেদন সিক্ত হওয়ার গৌরব এর ততটা নেই।

স্বল্প সুযোগের সুবাদে সহদেব চরিত্রটি ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাহিনী বিন্যাসে সহদেবের ভূমিকা বা তার গুরুত্ব সবিশেষ উল্লেখ্য।

অপরেশচন্দ্রের কর্ণার্জুনে শকুনির যে গুরুত্ব ও যে ভূমিকার অনস্বীকার্যতার দাবি ক্ষীরোদপ্রসাদ তা মেনেই দর্শকদের নিছক মনোরঞ্জনের জন্যেই চটুল ব্যক্তিত্বের আধার অপ্রধান ঐ চরিত্রটির অবতারনা করেছেন। কোন গুরুতর উদ্দেশ্য নরনারায়ণের শকুনিতে বর্তায়নি। যাত্রাসুলভ তরল হাস্যরস পরিবেশনের যে উদ্দেশ্য তা কিছুটা সার্থক হয়েছে এই পর্যন্ত, তার বেশী কিছু মনোযোগ, গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা শকুনি চরিত্রের মাধ্যমে প্রতিভাত হয় নি। শ্রীকৃষ্ণের মানবিকতা তার আচারে আচরণে এবং সংলাপে ক্রমপর্যায়ের ধারা অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত—পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্যের এবং পরিকল্পনার বিচারে নাটকটির নামকরণ কর্ণ হলেই সঙ্গত হত বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কারণ কর্ণের বিষাদময় সংগ্রামী জীবনই নাটকটির

অবলম্বন। ভাবকল্পনার এবং কাহিনী গ্রন্থনার কৌশলে কৃষ্ণ চরিত্রটি কর্ণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে গেছে। দৈবনিগৃহীত পূর্ণ শক্তির মহাপুরুষ কর্ণের জীবনে কৃষ্ণের উপস্থিতি অনিবার্য এবং তার প্রভাব দুর্নিবাররূপে চিত্রিত হয়েছে। একই দেহে নরনারায়ণের অভিন্নতা প্রদর্শনের পরিকল্পনা রূপায়ণের মাধ্যমরূপে কর্ণের জীবন কাহিনী অবলম্বন নাট্যকারের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। তা ছাড়া এই নাটকে নর এবং নারায়ণ উভয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ায় সঙ্গত কারণেই নাটকের নামকরণ নরনারায়ণ হয়ে থাকবে।

কর্ণ নিশ্চিত ছিলেন তার মৃত্যু কারো হাতেই সম্ভব নয়। তবে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস সম্পর্কে কর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন না। 'যদি মরি অর্জুনের বাণে—যদি মরি তবে সেই মৃত্যুমুখে বাসুদেব তোমারে বলিব নারায়ণ।' এ সংলাপ নাটকের শেষ পরিণতির ইঙ্গিতবাহী। এতে নাটকের নামকরণের সার্থকতা প্রমাণের প্রয়াস।

বিভিন্ন দৃশ্য পরিকল্পার বিশদ আলোচনায় দৃশ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখলে নাটকটির যে দিকগুলির সম্পর্কে বিচার হয় নি তা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

'সত্য যদি হই আমি রাধার নন্দন, সত্য যদি অধিরথ পিতা।' তা হলে কেউ তাকে বিনাশ করতে পারবে না। কর্ণের এই নিশ্চিত বিশ্বাস ও নিরাপত্তাবোধই তার ট্রাজেডির অন্যতম হেতু। নাটকে এই কথাটি নাট্যকার মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দিয়ে নাটকের মূল বক্তব্যকে জোরালো করার চেষ্টা করেছেন।

১ম অংক ২য় দৃশ্য :—পাণ্ডবদের সন্ধি ও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা, শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যের প্রস্তাব, দ্রৌপদীর ব্যথাতুর দৃপ্ত প্রতিবাদ ও তিরস্কার এ দৃশ্যটিকে এক অবিস্মরণীয় মানবিক আবেদনে সিক্ত করেছে। শান্তি স্থাপনে যুধিষ্ঠিরের প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের আন্তরিকতা। যুদ্ধের পরিণাম কল্পনায় যুধিষ্ঠিরের এই প্রয়াস নাটকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে এবং এই প্রয়াসের সঙ্গে অর্জুন ভীম ও নকুলের জ্যেষ্ঠের প্রতি আনুগত্য ও যুদ্ধ এড়িয়ে চলার আন্তরিকতা চমৎকারভাবে ফুটেছে। কিন্তু সহদেবের ভিন্নমতের ভিন্নস্বাদের সে দৃশ্যটি হঠাৎ রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে। 'কৃষ্ণার সে অপমান রাখিতে পারেন জেষ্ঠ, আচরণে পারেন ভুলিতে মহামতি ভীমার্জুন—আমি ভুলিব না। যে কোন উপায়ে উত্তেজিত করি সেই নীচাত্মা কৌরবে, যুদ্ধের সংবাদলয়ে এসো কৃষ্ণ ফিরে।'

কিন্তু সবচেয়ে নাটকীয় সংযোজন দ্রৌপদীর অভিমানক্ষুব্ধ তিরস্কার লাঞ্ছিত ঘৃণিতসন্ধির প্রতি ধিক্কার যুক্ত প্রসাদগুণ বিশিষ্ট অপূর্ব সংলাপ। 'যে কর করিল এই কেশ আকর্ষণ সেই করে কর দিয়ে প্রেমবন্ধ আলিঙ্গনে প্রিয় দুঃশাসনে বাঁধিতে কি চলেছ কেশব?

দুর্যোধন পার্শ্বে বসে শান্তি স্নিগ্ধ করের পরশে সে বিজয়ী নৃপতির সদম্ভচালিত উরুসেবা করিবে কি বীর বৃকোদর ?'

কৃষ্ণের সান্ত্বনা শান্ত মধুর রস পরিবেশন করে সংলাপ মুখর দৃশ্যটিকে মনোরম করে তুলেছে। 'কেঁদো না, কেঁদো না কৃষ্ণে এনো না কৃষ্ণের চোখে জল।' অর্জুনের সাবধান বাণী 'নারীর লোচন জলে হইও না মুগ্ধ বাসুদেব' কেমন যেন বেমানন, সংলাপের গতির প্রতিকূল। অবশ্য দ্রৌপদীর অভিমান দ্বিগুন বেগে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে এই সংলাপে।

১ম অঙ্ক ৩য় দৃশ্য :—কর্ণের পারিবারিক জীবনের কাহিনী পদ্মাবতীর সঙ্গে তার শান্ত সংহত সংলাপ কর্ণের প্রতি সহানুভূতি উদ্রেকের পক্ষে সহায়ক হয়েছে। এ কর্ণ যেন কৌরব সভার কর্ণ নয়—এক আলাদা লোক।

পদ্মাবতীর অনেক জমানো প্রশ্নের সন্তোষজনক বুদ্ধিগ্রাহ্য উত্তর দিয়েছে কর্ণ—যে উত্তরের মধ্যে যুক্তিবাদের সঙ্গে আত্মমর্যাদার প্রশ্নও জড়িয়ে আছে। পদ্মাবতী বুঝতে পারে না কি হেতু অর্জুনের ওপর কর্ণের এত বিদ্বেষ জন্মাল। বাসুদেব নারায়ণ, এই অতি অশ্রদ্ধেয় বাণী কে তোমা শোনাল পাগলিনী ? সত্য যদি হই আমি রাধার নন্দন, অধিরথ যদি মোর পিতা শুনে রাখো নিশ্চয় নিশ্চয় আমি পরাস্ত করিব রণে নরনারায়ণে। ট্রাজিক পরিণতির ইঙ্গিত। কর্ণ জানে না যে সে কী ভীষণ পরিণতি কে আবাহন করেছে। নাটকে পদ্মাবতীর তাই সঙ্গত শিহরণ—'এ কেন সন্দেহ! হই যদি রাধার নন্দন, অধিরথ যদি মোর পিতা।'……কেন-এ পাপ সন্দেহ ?

৪র্থ দৃশ্য :—শকুনি দুর্যোধন প্রভৃতি এসেছে। কর্ণের কাছে যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যের ব্যাপারে তাকে বন্দী করার পরিকল্পনার সমর্থন চাইতে এসেছে।

এখানে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী এবং কিছুটা গতানুগতিক পদ্ধতিতে সংলাপের মাধ্যমে শকুনি হাস্যরস সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এ দৃশ্যে কর্ণের ভূমিকা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। মহাভারতের কর্ণ চরিত্রের অনুগামী। বাসুদেবকে বন্দী করার অপূর্ব সুযোগ নষ্ট করতে কর্ণও রাজী নয়। এখানে সে শঠ মন্ত্রনাদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ।—হে রাজন সুযোগ্য সুযোগ্য আতিথ্য বাসুদেবে। সুদৃঢ় বন্ধন নিভৃত অন্ধতাময় হস্তিনার কারাগারে—তার পিতামহ যেরূপ আবদ্ধ ছিল কংসের ভবনে মথুরায়।

শকুনির সংলাপে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াসে বুদ্ধিমত্তার ছাপ আছে কিন্তু কিছুটা কষ্টার্জিত হাস্যরস—সেকথা না বলে উপায় নেই।

শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন সম্পর্কে শকুনি বলেছে— 'ব'দন্ত্য' ন'য়ে' ধ'য়ে—তাহাতে দন্ত্য 'ন' দিয়ে থট্রার শ্রী পদ সঙ্গে শ্রীরজ্জু সংযোগে সপ্রেমে জড়ায়ে রাধা শ্রী গোপী বল্লভ।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও কর্ণের মনে সঙ্গত জিজ্ঞাসা—সব জেনে শুনেও শ্রীকৃষ্ণ কোন সাহসে নিরস্ত্র দৌত্যকার্যে এসেছে দুর্যোধনের কাছে। তার মনে বাসুদেব-এর অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাস ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়েছে। 'এ সাহস যার কি বলিব—হয় সে নিতান্ত জড়, নয় নারায়ণ।'

পদ্মাবতীর এই আশঙ্কাকে নাটকীয় পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু রাধেয় পরিচয় যদি মিথ্যা হয়—অন্তরের এ সংশয়কে কি বলে সান্ত্বনা দেবে কর্ণ।

রাধার মাতৃস্নেহ সে কি সব মিথ্যা। অপূর্ব তুল্য কাহিনীর অবতারণা উল্লেখ্য। পদ্মাবতী নাট্যকৌতূহলকে জাগিয়ে তুলেছে :—

বৃন্দাবনে যশোদার স্নেহ
অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হত গোপালের শিরে
কিন্তু হায় প্রিয়তম সেই কৃষ্ণ হল শেষে দেবকীনন্দন !

কর্ণ তবুও বৃথা সান্ত্বনার আশ্বাস দিয়েছে—

সর্ব নারী হয় না যশোদা
নারী শিরোমণি রাধা জননী আমার।

কৃষ্ণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নাটকে বিয়োগান্ত পরিণতির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কৃষ্ণের অপ্রত্যাশিত আগমনে যেমন চমক আছে তেমনি আছে বিস্ময় আর নাট্যকৌতূহল। তার মুখে কর্ণ তার আপন পরিচয় পেয়ে স্তব্ধ। তার রাধেয় পরিচয়ে পদ্মাবতীর সংশয় যেন হঠাৎ মূর্ত হয়ে উঠেছে। অদৃষ্টের এ কি অভূতপূর্ব পরিণাম। পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠের সম্মান নিতে তাকে আহ্বান জানাতে এসেছেন কৃষ্ণ। এ নিষ্ঠুর ইতিহাস পাণ্ডব যেন না শোনে কর্ণের এই অনুরোধ। তার পক্ষে ফেরা সম্ভব নয়। 'রাধেয় রাধেয় বল ভাই। বিয়োগান্ত এ অপূর্ব প্রথম মিলনে এই লও কৌন্তেয়ের শেষ আলিঙ্গন। আবার রাধেয় আমি।' এ দুর্লভ পরিচয়ে কর্ণের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে নাটকে।

মর্ম চায় পরাজয় সত্য চায় জয়।
মানুষত্ব চায় নিষ্ঠুরতা। বাসুদেব।
মর্মভাঙ্গা প্রীতিপুষ্প অঞ্জলিতে ধরি
শোনাতে আসিলে তুমি মনঃক্ষোভ কথা।

কর্ণ শ্রীকৃষ্ণের আগমন সংবাদ জানাচ্ছে পদ্মাবতীকে। এক অপূর্ব অতিথি এসেছে আমার ঘরে। আবাহন নাহি তার নাহি বিসর্জন। তৃতীয় অঙ্ক ১ম দৃশ্য—দ্রৌপদীর সঙ্গে নিভৃতে শ্রীকৃষ্ণের দীর্ঘ সংলাপ, সভাস্থলে তার বন্ধন, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন প্রভৃতির বর্ণনা নাটকের গতিকে অব্যাহত রাখে নি, শ্লথ

সেই প্রতিজ্ঞার প্রতি সমর্থন যথাযথ 'আমার ও প্রতিজ্ঞা মহারাজ পৃথিবী করিবে আজি কর্ণ রক্ত পান।'

নাটকে সামরিক আবেদনসিক্ত অংশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। পাঞ্চালীর মধ্যে চাঞ্চল্য জাগিয়েছেন কৃষ্ণ! কর্ণ হীন সূতপুত্র, সে মহৎ বীরশ্রেষ্ঠ, দাতা শ্রেষ্ঠ। তাকেই একদিন দ্রৌপদী অপমান করেছিল হীনসূতপুত্র বলে। তখনও কর্ণের পরিচিতি বাকি ছিল তার কাছে। তার আভাষ পাওয়া যাবে কৃষ্ণের সংলাপে।

'চলিলাম কর্ণবধে, বলিবার যদি কিছু থাকে কর্ণের জীবন শেষ করি নির্জনে বসিয়া তোমারে শুনাব সখি। এখন চঞ্চল আমি বিদায় বিদায়।' শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ কিন্তু রক্তমাংসের নর। তাই মহারথীর আসন্ন পতনে তার মন বিষণ্ণ, চঞ্চল। এই চরিত্রের আর একদিক সঙ্গত কারণেই ঘটোৎকচ বধে কৃষ্ণের উল্লাস ও নৃত্য আমরা লক্ষ্য করেছি।

দ্রৌপদীর মধ্যেও নিদারুণ প্রতিক্রিয়া সঙ্গত পরিবেশে সুন্দর সংযোজন। 'কর্ণ বধ পূর্বে সখা আমারেও বধি গেলে তুমি।' অপূর্ব সংলাপ—মৃত আজ ধর্মরাজ, মৃত ধনঞ্জয়, সেই সঙ্গে মরিল পাঞ্চালী।

দ্রৌপদীর সঙ্গেও যেমন পদ্মাবতীর সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণের তেমনি মধুর সম্পর্ক। কৃষ্ণের অনুযোগ, মাথা তোল হে অভিমানিনী—এর উত্তরে পদ্মাবতীর সংলাপ নাটকে এক কারুণ্যের হাওয়া বহিয়ে দিয়েছে।

কি হেতু তুলিব মাথা ? কেন না হইবে অভিমান ?
স্বামীরে আমার যদ্যপি বলিতে ছিল বাধা
আমারে বলিতে কি দোষ ছিল হে বাসুদেব।
সত্যই কি ভেবেছিলে তুমি তোমার নিকটে
ভিক্ষামেগে লব আমি দেবরের পরাজয় ?

পদ্মাবতী কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর পাণ্ডবসখা। যুদ্ধে তাই তার কণ্ঠে ব্যাকুলতা —বৃষকেতুর প্রতি নির্দেশ—'তুই ও বলরে শিশু ঊর্দ্ধে চেয়ে যুক্ত করেবাসুদেব রক্ষা করো তোমার পাণ্ডবে। পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ, সে যে সখা তোর, সখা মোর, সখা তোর মহাত্মা পিতার।' পদ্মাবতীর হৃদয় উদ্বেলিত, কার জয় কার পরাজয়, দেখে আসি মৃত্যু যেথা জীবনে করিছে আলিঙ্গন।

কৃষ্ণ যে সহানুভূতি দয়া মায়া মমতায় গড়া শ্রেষ্ঠ মানুষ তা কৃষ্ণের সংলাপের মধ্যেই নিহিত। কর্ণের মৃত্যুতে চক্ষু জল ফেলতে আসে নি কৃষ্ণ। 'পৃথিবীর দৈন্য দেখে ঝরিতেছে আঁখি। আজি দাতা কর্ণ চলে যায় নিঃস্ব করি তারে।' এতে যে নীরব অশ্রু বর্ষণ তার তুলনা নেই।

অভিজ্ঞতা ও ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে আজও কর্ণের কাছে পরিষ্কার নয়—

নরনারায়ণ একদেহে কি করে সম্ভব? 'কি বলিয়া তোমারে করিব সম্বোধন? ভগবান?'

শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের কাছে নিজেকে পূর্ণ সমর্পন করেছে কর্ণ—সে চরিতার্থ সমাধিস্থ। কারণ বৃকোদর আসছে। তার রূঢ় বাক্য শোনার মত কর্ণের মানসিক অবস্থা নয়। কৃষ্ণ যে 'নরনারায়ণ' নাট্যকার আর একবার তার নিদর্শন রাখলেন। ভীম আবার চমকিত। একি কৃষ্ণ, জল ভারাক্রান্ত কেন আঁখি? কি আশ্চর্য। কার শোকে? ওই পান্ডবের চিরশত্রু রাধার নন্দন কাতর কি করিল তোমারে? ঠিক এই মুহূর্তে সহদেবের প্রবেশে নাটকীয়তা আছে। তার মুখের সংলাপ নাটকের ট্রাজিক পরিণতির সুন্দর চিত্রায়ন। এক অপূর্ব বিষাদময় অনুভূতি এক দুর্লভ effect সৃষ্টি হয়েছে সহদেবের পরিস্থিতি বর্ণনায়।

কর্ণের নিধন বার্তা শুনি মূর্চ্ছাগতা ভূপতিতা মাতা
কোন মতে ফিরিছে না জ্ঞান। ভাসিছে পাঞ্চালী
নয়নের জলে, হেঁটমুণ্ডে ধর্মরাজ বসে পদতলে
পার্শ্বে তার দাঁড়াইয়া স্তব্ধ ধনঞ্জয়।

কুন্তীর অবস্থা আরও সুন্দরভাবে বিধৃত। "হলে মৃতা হতেন জীবিতা। জীবনের সাথে গাঁথিয়া মরণ জেগেছে জননী।"

কর্ণের শেষ সংলাপে কেন ভীম সেনের গালে স্নেহের চুম্বন এঁকে দিয়েছিলেন তার ব্যাখ্যা চমৎকার রূপে প্রকাশিত। তার পদতলে পঞ্চপান্ডব—এ দৃশ্য পরিকল্পনায় মুন্সিয়ানা আছে—কাব্যিক প্রকাশও স্পষ্ট। তবে এই অংশে কর্ণের সংলাপ আরও পরিমিত হলে ভাল হত। একই কথার পুনরাবৃত্তি দোষ ঘটেছে।

নিজের জীবনের জন্মের ট্রাজেডির কথা আর একবার মনে করে দিয়েছেন নাট্যকার। কর্ণের সে বেদনাময় স্মৃতির জাগরণ স্বাভাবিক। সমাজ ব্যবস্থার প্রতি কর্ণের কটাক্ষও সঙ্গত বলে মেনে নিতে বাধা নেই। কৃষ্ণকে নারায়ণ বলতে এক সময় নারাজ ছিল কর্ণ—সেই কৃষ্ণেই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ নাটকের সঙ্গতিসূচক পরিণতি বলে মেনে নেওয়ার অনুকূল পরিবেশ নাট্যকার সৃষ্টি করতে পেরেছেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

'বাসুদেব বাসুদেব, একবার সম্মুখে দাঁড়াও নর
সম্মুখে দাঁড়াও নারায়ণ।'

মূলভাব বা প্রসিদ্ধিকে অবিকৃত রেখে চরিত্রের বিকাশ বা বিস্তৃতি ঘটিয়ে নাট্যকার নরনারায়ণের নাট্যোপকরণে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এনেছেন। ঘটনা ও চরিত্র পরিকল্পনায় পুরাণবহির্ভূত কোন ঘটনা সংযোজন বা চরিত্র সৃষ্টির মৌলিকতা অভিপ্রেত নয়। তবে পুরাণের পুনরাবৃত্তিই শুধু নয়। নাটকের বিভিন্ন শর্ত পালন করে তাকে নাটকত্ব অর্জন করতে হবে।

শেক্সপীরীয় ট্রাজিডির ভাব ও আদর্শের সামিয়ানার নীচে কেন্দ্রীয় চরিত্র কর্ণের

ভাগ্য বিপর্যয়ের ইতিবৃত্ত নাটকীয়তার পথ ধরেই নাটকে তার নিজস্ব আসন করে নিয়েছে। নাটকে পাশ্চাত্যরীতির ট্রাজিডির প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট হলেও ট্রাজিডির সব শর্ত নাটকে প্রতিপালিত হয় নি। তবে গতানুগতিক বাংলা নাটকে অভিনবত্ব, চরিত্র চিত্রনে অভূতপূর্ব মানবিক আবেদন সৃষ্টি এবং সর্বোপরি ধর্মমূলক নাটকে ভক্তি রসের সঙ্গে সহজাত প্রেম, শ্রদ্ধা. প্রীতির আন্তরিক স্পর্শ নাটকটিকে মহিমান্বিত করেছে।

এক দৈব নিগৃহীত পূর্ণশক্তিধর মহাপুরুষের জীবনকাহিনীর নাট্যরূপ বাঞ্ছিত লক্ষ্য পথেই পরিণতি লাভ করেছে। নাট্যকারের মৌলিক মনোভূমিতে যে কোন কল্পনারই জন্মস্থান। কর্ণ চরিত্রের নব রূপায়ণ নূতন ভাবাদর্শের হাত ধরেই নাটকে নিজ স্থান লাভ করেছে।

পৌরাণিক নাটকের লক্ষ্যমাত্রা ও আধ্যাত্মিক ভাব চেতনার দিক দিয়ে যে কথাটি নাটকটির সম্বন্ধে সাহস করে বলা যায় তা হল কর্ণের ঈপ্সিত ভক্তিবাদ যুক্তিবাদের দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত—প্রাণের মূল্যে কেনা, অভিজ্ঞতার অভিসিঞ্চনে অভিষিক্ত।

বাংলা পৌরাণিক নাটকে অহেতুকী ভক্তির দুর্বার স্রোতের উজানে কোন চরিত্রের ভাগ্য বিপর্যয়কে ট্রাজিডির উপকরণ করার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি অনুকূল নয় জেনেও নাট্যকার অসম্ভবকে সম্ভব করার দুরন্ত খেলায় মেতেছেন। কর্ণের শোচনীয় পতনের হাহাকারকেই নাট্যকার তার ট্রাজেডি পরিকল্পনার একমাত্র সম্পদ বলে মনে করেন নি। কেন্দ্রীয় চরিত্রের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষক উপকরণের সমাবেশ যে অত্যাবশ্যক তা তিনি বুঝেছিলেন।

পৌরাণিক নাটকে সাধারণতঃ ট্রাজিক অনুভূতি সৃষ্টির প্রয়াস দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। পৌরাণিক নাটকের উপাদান অতিপ্রাকৃত বিষয়বস্তু, আশীর্বাদ, অভিশাপ, চরিত্রের আধ্যাত্মপরায়ণতা, দুঃখ দুর্দশা ও হাহাকার-এর সমস্ত ঘূর্ণিঝড়কে শান্ত করে দেয় মুহূর্তের মধ্যে। গৈরিশী ছাঁচের মুক্তপয়ার ছন্দের বন্ধনে এর সংলাপ যথাযথভাবে, ইকনমিক, সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জিত।

নরনারায়ণে নর ও দেবতার মধ্যে প্রথানুগত সমস্ত ব্যবধান ও দুরত্ব ঘুচে গিয়ে নৈকট্যের অন্তরঙ্গ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পৌরাণিক নাটকে এই দুয়ের মধ্যেকার যে বিরাট পার্থক্য ও ব্যবধান ছিল, বুদ্ধিগ্রাহ্য বিন্যাস ও সিচুয়েসন সৃষ্টি ও মনস্তাত্ত্বিক আবেদনের দ্বারা নাট্যকার তা অনেক পরিমাণে হ্রাস করেছেন।

নাটকে কৃষ্ণ চরিত্রের বিকাশ রেখার দ্বারা সৃষ্ট নাট্যবৃত্তে এই পৌরাণিক নাটক যেমন অভিনব, ঠিক তেমনি এ নাটকে কর্ণ চরিত্রের নাট্যসূত্রের সুতোতে সমস্ত নাটক নির্দিষ্ট তালে আন্দোলিত হয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

নরনারায়ণ পৌরাণিক নাটকটি ক্ষীরোদপ্রসাদের পরিণত নাট্য প্রতিভার দাক্ষিণ্যে অভিষিক্ত এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়।

॥ বিবিধ নাটক ॥

॥ কালানুক্রমিক তালিকা ॥

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়বস্তু । নাটক	প্রকাশকাল
১)	ফুলশয্যা (দৃশ্যকাব্য)	২রা মে, ১৮৯৪
২)	কুমারী (নাট্যকাব্য)	১৮৯৯
৩)	রঘুবীর	১৮ ডিসেম্বর, ১৯০৩
৪)	রঙ্গাবতী	৪ অক্টোবর, ১৯০৪
৫)	মিডিয়া (কল্পনামূলক)	১৪ জুলাই ১৯১২
৬)	নিয়তি (নাটিকা)	৯ এপ্রিল, ১৯১৪
৭)	রত্নেশ্বরের মন্দির	২৮ ডিসেম্বর ১৯২২

পুস্তকটির কলেবর বৃদ্ধিকে সংযত রাখতে অনন্যোপায় হ'য়ে ভিন্নস্বাদের উল্লিখিত নাটকগুলি আপাততঃ অনালোচিত থেকে গেল। বিভিন্ন স্বাদের নাটকগুলির মধ্যে অবশ্য একমাত্র রঘুবীরই বহুবার অভিনয়ের সুবাদে নাট্যামোদীমহলে সে সময়ে সুবিদিত ছিল। রঘুবীর এর জনপ্রিয়তার আর একটি কারণ ছিল রঘুবীর এর ভূমিকায় শিশির ভাদুড়ীর অনবদ্য অভিনয়। সে সব দিক্ বিবেচনা করে একমাত্র 'রঘুবীর' নাটকটির আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হল।

॥ রঘুবীর ॥

নাটকটি এক বিপন্না নবাবনন্দিনীকে কেন্দ্র করে। প্রথম দৃশ্য থেকেই আমরা দেখেছি নাটকটিকে রীতিমত গতিশীল করার মত উপাদানের অভাব নেই। উচ্চাশা, প্রতিহিংসা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি থেকেই নাটকের বিয়োগান্ত পরিণতির উদ্ভব।

পাপ, প্রতিহিংসা, ষড়যন্ত্র সব কিছুর মধ্যেও কিন্তু প্রভুভক্তি, বিশ্বাসপরায়ণতা ও মায়া মমতার স্থান আছে। নবাবনন্দিনীকে দেখতে চাওয়ার অপরাধে জাফর দণ্ডিত হয়েছে। 'তিনদিন প্রাচীরে আবদ্ধ ছিলুম, পিপসায় চোখের তারা ঠিকরে গেছে, তবু একফোঁটা জল পাইনি। তার প্রতিশোধ—মর্মন্তুদ যাতনার প্রতিকার —নবাবনন্দিনী পরীবানুকে বাঁদী করবো।' নাট্যকাহিনীর মূলবীজ এই প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশোধ স্পৃহার মধ্যে।

নবাব মামুদসার বিশ্বাসী ভৃত্য সাহাজাহান কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের ব্যতিক্রম। বৃদ্ধ শক্তিহীন দুরাত্মারা সশস্ত্র, সতর্ক, সংখ্যায় অনেক।

প্রথম দৃশ্য থেকেই নাট্যকাহিনীর গতিবেগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কৌতূহল সৃষ্টির অবকাশ নেই। নবাব মামুদসাকে হত্যা করে বিশ্বাসঘাতক জাফর এখন নবাব। নতুন নবাবী আমলে সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া তা নিখুঁত না হলেও মোটামুটি একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা হয়েছে নাটকটিতে।

এ নাটকটিকে একদিক দিয়ে ধর্মমূলক নাটক বলা চলে। অনন্তদেবের কাছে ধর্মই সহায়। রঘুবীরের কাছেও তাই। নাবিক পলায়নপর অনন্তদেবকে তাই নদী পার করতে সাহস করে নি—কি করবো হুজুর, গরীব, ছেলেপুলে আছে। উপার্জন করতে একা আমি, জানের ভয় করি। অনন্তদেবের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে হঠাৎ আত্মগোপনের মধ্যে কিছুটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার নাটকীয় সমাবেশ আছে বলে ধরে নেওয়া যায়। মুন্না যেভাবে নবাবের হত্যার বর্ণনা দিয়েছে কাহিনীর দিক দিয়ে তা কতকটা ম্যাকবেথ্ নাটকের অনুরূপ। লক্ষণীয় মুন্না আসল খবর একেবারে দেয় নি।

দুলিয়া—বুঝতে পেরেছি, তারপর কি বলে যা।

পাশ্চাত্ত্য নাটকের অনুরূপ (কাহিনীগত)। জাফর খাঁ—যত বড় বড় নবাব বংশের ওমরাও ছিল তাদের নেমন্তন্য করে বাড়ীতে এনে মেরে ফেলেছে।

তৃতীয় অঙ্কে নবাব নন্দিনী পরীবানুর পক্ষে বনবাস কষ্টকর বলে বর্ণিত হয়েছে। তাই রঘুবীর এ অবস্থায় পরীবানুর মুখ চেয়ে সন্ধি করতে চায়। এখানে

রঘুবীর দুর্বলতা ও মানবতা—দুই পরস্পর বিরোধী দোষগুণের আধার হয়ে উঠেছে। কিন্তু এখানে তার মানস-দ্বন্দ্বের সুযোগ নাট্যকার গ্রহণ করতে পারেন নি।—তোমার মত জনবার জন্যে জিজ্ঞাসা করেছি তোমার মনে আঘাত দেবার জন্যে নয়। তোমার তৃপ্তির জন্যে রাজ ঐশ্বর্যের মস্তকে পদাঘাত করে দরিদ্রতাকে চিরদিনের জন্যে পদানত করতে পারি।

পরীবানুর মর্য্যাদাবোধ সুন্দর সংলাপে বিধৃত হয়েছে। আমার পিতা—আমার ভাই একটা গোলামের কাছে মাথা হেঁট করবে?

সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলীর প্রবেশ যাত্রারীতির অনুগামী। তবে নাটকীয়, চমকপ্রদ, ভাবসমৃদ্ধ। —কখন না, কখন না। পা রাখবার স্থানে মাথা ছোঁয়াবে?

শ্যামলী এস্থানে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত—অসম্ভব কল্পনার সামিল। কিন্তু নাট্যকারের যুক্তিও অকাট্য। কার নাম করব? যিনি দেবতার দেবতা—যিনি অঘটন-ঘটন-পটিয়সী—সেই ভবানী!

নাটকে নতুন ঘটনার ঘনঘটার ও সম্ভাবনার পথ খুলে দেওয়া হয়েছে শ্যামলী ও রঘুবীর এর সংলাপ মারফৎ। শ্যামলী ও পরীবানু সাহস দিয়েছে, তারা কারুর ভারস্বরূপ হয়ে থাকতে চায় না। রঘুবীর তবু তাদের সাবধান করে দেয়। 'সাবধান, আমরা যখন থাকবো না তখন কোন মতেই এস্থান ত্যাগ কোরো না।'—

আসলে রঘুবীরের অত্যধিক ধর্মপ্রবণতা নিষ্ক্রিয়তারই সামিল। এর দ্বারা নাটকে ঠিক আদর্শের জয়ধ্বনি শোনা যায় না। ধর্মযুদ্ধ পিয়াসী রঘুবীরের মানসিক অস্থিরতা ও রঘুবীরের এই ধর্মভীরুতা নাটকে গতির শৃংখলরূপে দেখা দিয়েছে। তবুও এর দ্বারা নাটকের প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পেঁছানোর ব্যাপারটা কণ্টকর হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বনের পর রঘুবীর তবে প্রভুর (অনন্তরাও) রক্ষায় অগ্রসর হয়েছে। এ ঘটনা চরিত্রানুগ নয়।

রঘুবীর মৃত্যুর মূল্যে বাঁচাতে চেয়েছে বলদেবকে—নিবৃত্ত করতে গেছে অনন্তরাও। রঘুবীরের জাগরণ নাটকে উত্তাপ সঞ্চার করছে।

সপ্তম দৃশ্যটিকে নাটকের ক্লাইমেক্স বলা চলে। দৃশ্যটিতে বন্দিনী পরীবানুর চরম পরীক্ষার মুহূর্তগুলি ধরা রয়েছে। জাফর তাকে বল প্রয়োগে আপনার করে নিতে চায়। তার আগে সৌজন্যমূলক প্রস্তাব।

এখনও বলছি, কৃপাভিক্ষাদানে গোলামকে চরিতার্থ কর।—পরীবানু শুনল—তার প্রভু বন্দী রঘুবীরকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছে জাফর। একটু পরে তার লাঞ্ছনার কলঙ্কিত অধ্যায় শুরু হবে। দ্রৌপদীর কাকুতি ও প্রার্থনার সমতুল সংলাপ শুনি এই পর্বে। 'তোমার চরণে আশ্রয় নিয়েছি। পায়ে ঠেলো না, দোহাই দীনবন্ধু।' নাটকীয় মুহূর্ত—হস্তপদ বন্ধ রঘুবীরের দীর্ঘশ্বাসের পর জাফরের উক্তিতে 'আর কেন প্রাণেশ্বরি: মুখ তুলে চাও···নাও এস, এগিয়ে এস। হৃদয় সিংহাসন

উন্মুক্ত, শূন্যে বসে স্থান পূর্ণ কর।' নাটকে Action এর মুহূর্তগুলি পর পর সাজিয়েছেন নাট্যকার। এর পরে নারী লাঞ্ছনার এই চরম মুহূর্তে হঠাৎ রঘুবীর এর শৃংখলভঙ্গ করে তাকে দিয়ে শক্তি ভিক্ষা করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

বিশ্বত্রাতা দেব প্রভঞ্জন : শক্তি দাও শক্তি দাও শক্তিস্বরূপিনী। চরম মুহূর্তে শ্যামলীর নাটকীয় প্রবেশ ঘটনার ঘনঘটার গুরুত্ব বাড়িয়েছে।

কেবা যাচে শক্তির আশ্রয়, নাহি ভয়
শক্তির সেবিকা আমি।

শেষ পর্যন্ত নাট্যকার নাটকের শেষ রক্ষা করেছেন। জাফরের পলায়ন অবশ্য চরিত্র চিত্রনের দিক দিয়ে অযৌক্তিক। কাহিনী বিন্যাসের প্রয়োজন এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। ঘটনা নির্ভর কাহিনীকে চলমান রাখতে এ ছাড়া অনেক সব বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে।

পতিত দুলিয়ার সামনে তার হাত থেকে শ্যামলীর অস্ত্র গ্রহণ করা—সখার মার জল সেচনে দুলিয়ার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা, পীরবানুকে হঠাৎ ধরে নিয়ে যাওয়া, শ্যামলীর এই ঘটনায় পাগলিনীর মত ছুটে যাওয়া প্রভৃতি বিচিত্র ঘটনা নাট্যকাহিনী বিন্যাসের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

নাট্য কাহিনীর অবশিষ্ট আকর্ষণ রঘুবীরের জাগরনের পর তার দ্বারা বলদেব সখারামের উদ্ধার সম্ভব হয় কিনা ? কৌতূহল জাগ্রত রাখার নাট্যোচিত প্রচেষ্টা :
'পরীর উদ্ধারে যদি করিয়াছ দয়া, তবে বল কেন মহামায়া
অসম্পূর্ণ রাখিবি আমায় ?'

কিন্তু মুহূর্তমধ্যে জানা গেল সব শেষ। সখারাম অনন্ত শয়নে। দৃশ্য পরিবর্তনের মাধ্যমে কারাগারের অভ্যন্তরে মৃত সখারামকে প্রত্যক্ষ করানোর মধ্যে নাট্যকারের দৃশ্য পরিকল্পনার মুন্সিয়ানা লক্ষণীয়। একই রীতিতে বলদেবের মর্মান্তিক পরিণতি দৃশ্যান্তরে দেখানো হয়েছে।

নাটকটির কয়েকস্থানে ট্রাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিকল্পনা থাকলেও নাটকটি ট্রাজেডির পর্যায়ভুক্ত হতে পারে নি। সখারামকে হত্যা প্রসঙ্গে জাফরের পরিকল্পনার নিষ্ঠুরতা চরিত্রটিকে নির্মম করে তুলেছে। এ পরিকল্পনায়— পাশ্চাত্য নাটকের কাহিনীর আনুগত্য আছে। যে ভাবে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে মার হাত দিয়ে সন্তানকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে তার সঙ্গে Ghost নাটকের মিল আছে। এ বিষাদময় পরিস্থিতি ট্রাজেডির ছায়া সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তফাৎ এ ট্রাজেডি তো রঘুবীর কিংবা পরীবানুর নয়। নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য পার্শ্বচরিত্রের ক্ষেত্রে এটি যুক্ত, তাই এর মূল্যায়নের গুরুত্ব কমে গেছে।

বলদেবের মর্মান্তিক পরিণতি—নাটকে করুণরস সঞ্চারে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে।

নাটকের এ ট্রাজেডিতে মন টলে না। এ যেন যুদ্ধের অনিবার্য পরিণতি। শেষ আশা নবার নন্দিনীর উদ্ধারকার্য। দুলিয়ার সংলাপ—'এখনও জীবিত আছে নবাবনন্দিনী—সে প্রাণের তুমি আবরণ।' ট্রাজেডি এখানেই। দুলিয়া যা ভাবছে—শেষ ভরসা শেষ লক্ষ্যেও পৌঁছাতে পারল না তার বিপুল সামর্থ্য ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও। এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কী হতে পারে। এ শুধু রঘুবীরের ধর্মভীরুতাজনিত বিলম্বের জন্যে। রঘুবীর চরিত্রের মধ্যেই নাটকটির ট্রাজেডির বীজ নিহিত।

নাটকটি যখন ঘটনাবহুল হতে হতে বিষাদময় পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে ঠিক তখন রঘুবীরের মুখে দীর্ঘ মুক্ত পয়ারের সংলাপ বিরক্তিকর।

নাটকে প্রকাশ্যে জাফরকে হত্যার দৃশ্য সংস্কৃত নাটকের অনুবর্তন নয়—পাশ্চাত্য নাটকের অনুরূপ। কিন্তু এর মাঝে দীর্ঘ বক্তৃতা নাটকে হত্যার দৃশ্যকে লঘু করে দিয়েছে। অবশ্য রঘুবীর প্রত্যেক কাজের একটি করে ব্যাখ্যা মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে বা নেওয়াটা তার রীতি। মৃত্যুর মিছিলে যেন নাটকটির পরিসমাপ্তি। শ্যামলীর শেষ সংলাপ বিয়োগান্ত নাটকের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে।

রেখে গেনু পদপ্রান্তে
দুলিয়া আমার
তব দত্ত উপহার, কাছে রেখো
সুখে দুঃখে রেখো সান্ত্বনায়
আমি চলি, দাও পদধূলি।

শোকোন্মত্ত বিহ্বল রঘুবীরের আচরণ বিষাদান্ত নাটকের অনুরূপ। পরীবানুর জন্যে যে সিংহাসন তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাই পদাঘাতে সে সিংহাসন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে রঘুবীর। চরম দুঃখে পরম হতাশায় সে চেয়েছে পৃথিবীর ধ্বংস-প্রলয়—'যেন স্মৃতি চিহ্ন না রয় ধরায়।' রঘুবীরের মর্মজ্বালার সুষ্ঠু প্রকাশ নাটকের শেষাংশে তার সুন্দর সংলাপে :—

ঢেলে দেরে কর্ণদ্বারে গলিত পাষাণ
বেঁধে চক্ষু কালফণী দাঁতে
বিদারিয়া হৃদয় আমার—সহস্র ধারায় ছুটে আয়
সহস্র খাণ্ডবনাশী দাবানল।

নাটকটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর সংলাপ সমৃদ্ধি। মুক্ত পয়ার ছন্দের ভাবসমৃদ্ধ সংলাপ নাটকটিকে স্থানে স্থানে সাহিত্য গুণমণ্ডিত করে তুলেছে।

নিদ্রিতা পরীবানু তার অতর্কিত বিপদের কথা শুনে কিংকর্তব্য-বিমূঢ়া। তার মুখের সংলাপ মুক্ত পয়ার ছন্দে গ্রথিত, কবিত্বময়।

জেগে দেখি নিদ্রার অপর পারে
সমস্ত জীবন-স্বপ্নময় রাজত্বের স্মৃতিছায়া
পিতৃহীনা, স্থানহীনা ভিখারিণী নাম।

তরুতলে আশ্রয়লাভকারী অনন্তরাও এর দীর্ঘ মুক্ত পয়ার ছন্দের সংলাপ কিছুটা সাহাজাহান চরিত্রের সংলাপের অনুরূপ। বলা বাহুল্য এতে নাটকের গতি ব্যাহত হয়েছে।

মুক্ত পয়ার ছন্দের সংলাপ-সৌন্দর্যের আরও কিছু কিছু নিদর্শন তুলে ধরা যায়। রঘুবীরের সেই একই অদৃষ্টবাদের দোহাই তার পৌরুষে ও ব্যক্তিত্বে কলংক লেপন করেছে।

বাঁচিবার হয় যদি পিতা
জাফরের সহস্র পীড়নে বেঁচে রবে।
অপঘাত মৃত্যু যদি নিয়তি তাহার
জাফরের রক্তে তাহা ধৌত নাহি হবে।

এ দৃশ্যে সংলাপ কবিত্বময় অথচ নাটকীয়। বলদেব অদৃষ্টবাদের প্রতিবাদে দৃপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠে—অসমর্থ কার্যের বিচার করে,

মূর্খ দেখে পাণ্ডিত্যে কালিমা
প্রাণ যার ধন, সেই দেখে শৌর্যবীর্যে পিশাচেরলীলা।

রঘুবীরের প্রতি উত্তেজক সংলাপ কবিত্বময় তো বটেই, নাটকীয় উপাদান সৃষ্টির সহায়ক বলেও ধরে নেওয়া যায়।

কার কুটিলতা বিষে জর্জরিত প্রভু তব প্রভুভক্তবীর
কেন এত স্থির? সদা স্থিরতায় পুণ্য নাই ভাই, সদা ক্ষমা কাপুরুষ করে।

সখার ক্ষত-বিক্ষত দেহ দেখে তার ওপর কে এই অত্যাচার করেছে জানতে গিয়ে সখা যে কৌতুহল সৃষ্টির চেষ্টা করেছে তা কষ্টার্জিত। চলে যা পাগলা। এ রহস্যের সময় নয়। সখার সম্বন্ধে নাট্য সমালোকদেরও ঐ একই কথা, 'এ রহস্যের সময় নয়।'

রঘুবীরের এক নাটকীয় আবির্ভাবের এক নাটকীয় মুহূর্তে নাটকত্ব নাশ করেছে তার দীর্ঘ সংলাপের কবিত্বময় বক্তৃতা—

ধর ধর, কাঁপে কেন কর? ত্বরা
মোরে দাও পুরস্কার। তোমার জীবন
রেখে প্রভু দ্রোহী আমি। আমার উচিত শাস্তি
তব করে প্রাণ বিসর্জন।

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের নাটকের অন্তিম মুহূর্তে রঘুবীরের দীর্ঘ সংলাপ নাটকটিকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। শেষ দৃশ্যে অবশ্য পরীবানুর অনুসন্ধানের ব্যাপারে রঘুবীরের সংলাপ হৃদয়স্পর্শ করুণরস বিস্তারের সহায়ক।

বিশ্বাসঘাতক দেবল এবং দেবলপুত্র বিষাণ যেন দুটি বিপরীত চরিত্র। অনন্ত রাওকে হত্যা প্রসঙ্গে বিষাণ প্রতিবাদ করেছে। গুরুতর মুহূর্তে দেবলের সংলাপ পরিস্থিতিকে লঘু করে দিয়েছে। বিষাণ চরিত্রটিকে দার্শনিক চরিত্র হিসাবে চিহ্নিতকরার প্রচেষ্টা বহুলাংশে সার্থক। তার সংলাপে বদমাইসের প্রকার ভেদ লক্ষণীয়। বোকা বদমায়েস আত্মহত্যা করে, মূর্খ বদমায়েস মানুষ মারে আর সেয়ানা বদমায়েস দেশ নষ্ট করে।

অনন্ত রাও কন্যা শ্যামলীর স্বামী দুলিয়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য– ব্যস্ততা, কর্তব্যপরায়ণতা চমৎকার ফুটে উঠেছে শ্যামলীর সংলাপে। মুন্না খবর আনলে, ভীষণ বিপদ, দুলিয়াকে যেতে হবে। শ্যামলীর সুন্দর সংলাপ—আর মুখ চাইলে হবে কি, যেতে হবে সে অনেকক্ষণ বুঝতে পেরেছি।

শ্যামলীর মধ্যে স্বাধীনচেতা রমণীর আত্মপ্রকাশ লক্ষণীয়। শ্যামলীর বিভিন্ন পর্যায়ের সংলাপ যুক্তিগ্রাহ্য, তবে অশিক্ষিত রমণীর পক্ষে সব জায়গায় স্বাভাবিক নয়।

কৌতুক সংলাপের নিদর্শন কিছু কিছু ছড়ানো আছে নাটকে—যা নাট্যকারের প্রতি নাটকেই থাকে। নায়কের সংলাপ—'ওরে বাবা, আঙুলে এত জোর!' সাধারণ পরিবেশে কৌতুক সৃষ্টির প্রয়াস সার্থক। আঙুলে চাপ দেবার জের আরও কৌতুককর সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশিত। উং কট্‌কট্‌, ঝন্‌ঝন্‌ চিড়িক চিড়িক কটাস কটাস ধড়াস ধড়াস – নানা জাতের আওয়াজ।

সাহজাহানের আকস্মিক দুর্ঘটনায় অস্থির পরীবানুর মুখে যে সংলাপ তা যাত্রারীতির অনুসৃত পথেই চলেছে। সাহজাহান, কোথা তুমি? অন্ধকারে পথ দেখতে পাচ্ছি না। খোদা রক্ষা কর। সাহজাহানকে রক্ষা করো। ঠিক এই মুহূর্তেই ত্রাতার ভূমিকায় রঘুবীরের অতর্কিত আগমনও যাত্রারীতির অনুসারী। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কয়েকটি চরিত্রের এইভাবের আকস্মিক প্রবেশ যাত্রার আঙ্গিকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

জাফরের শূন্যে আস্ফালন—দেবলের সামনে রাগোক্তি উপভোগ্য। দেবলের ভূমিকাও নাটকে হাস্যরসের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'বাপ্‌ বাঁচলেম আমাকে নয়, (স্বগত)। শালা চাষা বলছে তাকে, আর খিঁচোচ্ছে আমাকে!

হঠাৎ দুলিয়াকে দেখে বিষাণ ও দেবলের ভয়ের অভিনয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে সংলাপের মধ্যে। যত বীরত্বের আস্ফালনই করুক না দেবল, ভয় তার কাটে নি। সংলাপে সেই ভয় চমৎকার প্রকাশিত।

পরীবানুর অদৃষ্ট নিয়ে শ্যামলীর দীর্ঘ স্বগতোক্তি নাটকের প্রত্যাশিত গতি সঞ্চারের পথে অন্তরায় হয়ে উঠলেও কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করার মত। এই বালিকার ঘরে সূর্যকিরণও যদি প্রবেশ করতে চাইত তাহলে বোধ হয় তাকেও লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে যেতে হত। কিন্তু আজ! নিদাঘ তপনের প্রখর দৃষ্টি হিংস্রক জীবের বিলোল রসনা, পিশাচের লোভ, দস্যুর অত্যাচার সকলে চারিদিক হতে তোমার প্রতীক্ষায়।

নাটকে মুক্ত পয়ার ছন্দের আর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ রঘুবীর চরিত্রের নিরুত্তাপ প্রকাশ :—

আশা দীপ নির্বাপিত
অন্ধকার কবলিত জীবনের অতি দীর্ঘ পথ
কন্টকিত জটিল বন্ধুর।
সংলাপ হৃদয়াবেগ নিষিক্ত, কিন্তু বীরোচিত নয়।

'রঘুবীর' এর সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্পর্কে বিদগ্ধ সমালোচকরা অনেকেই প্রায় একমত।

'রঘুবীর' নিজে ইংরাজী বটতলা উপন্যাসের নায়কের মত, তাহার ভগিনী শ্যামলী বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত সীতারাম উপন্যাসের শ্রী চরিত্রের অনুকরণে রচিত, পরীবানুর বনবাস জীবনের চিত্রও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রাণা প্রতাপের বনবাস জীবনেরই অনুরূপ। ১

১ —বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস—(২য় খণ্ড)—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

ভীল রঘুবীরের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসাত্মক চরিত্রগুলির ন্যায় ধর্মদ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি রহিয়াছে। প্রায়শঃ এইরূপ দ্বন্দ্ব দর্শকের পক্ষে বিরক্তিকর। ঘটনা সংস্থাপন অনেকস্থলেই দুর্বল ও অবিশ্বাস্য। ২

জন্মগত সংস্কারসূত্রে অর্জিত পাপাচার, প্রতিহিংসাপরায়ণতা ইত্যাদির পাশে প্রভুভক্তি, বিশ্বাসপরায়ণতা ও স্নেহ মায়া মমতার সন্নিবেশ ঘটেছে রঘুবীর চরিত্রে। নাটকে রঘুবীর চরিত্র বৈপরীত্যের দোলায় বারবার দোদুল্যমান। কখনও তা সবল কখনও তা মানবিতার অভিঘাতে দুর্বল। দস্যু বৃত্তির উন্মাদনায় কখনও সে রুদ্র কখনও বা ধর্মপ্রবণতার আবেগে শান্ত—সমাহিত।

'একমাত্র উল্লেখযোগ্য চরিত্র রঘুবীরের। তাহার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।...মামুদশাহর দেওয়ান অনন্তরাও নামক একজন ব্রাহ্মণের সান্নিধ্যে আসিয়া তাহার চরিত্রের আকস্মিক পরিবর্তন হইয়া গেল। সে ধর্মপথ অবলম্বন করিল। ...দস্যুবৃত্তির পরিবর্তে তাহার মধ্যে পরোপকার প্রবৃত্তি দেখা দিল। প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তির পরিবর্তে তাহার মধ্যে ক্ষমাগুণ বিকশিত হইয়া উঠিল। জন্মগত সংস্কার ও শিক্ষাগত সংস্কারের মধ্যে তাহার যে

দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই এই নাটকের একমাত্র গুণ। পরিণামে দেখা গেল শিক্ষাগত সংস্কারের উপর জন্মগত সংস্কারই জয়ী হইয়াছে।' ৩

নাটকটিতে অন্য নাটকের তুলনায় স্বাভাবিক কারণেই গানের সংখ্যা কম। অন্য নাটকের সঙ্গে তফাৎ এতে সূচনায় গান নেই। ১ম অংকের ৪র্থ দৃশ্যে প্রথম গান শ্যামলীর কণ্ঠে। দুলিয়ার আগমনের মুহূর্তে ঘরোয়া পরিবেশে এই গান এক প্রশান্ত মধুর ভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

কৃষকদের কণ্ঠে রঙ্গগীতিটিতে বৈষ্ণবীয় ভাবকে কৌতুকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। 'বৃন্দে দূতি গো। তোমার কালায় নাকি পেঁচোয় পেয়েছে।' সখার মার সঙ্গে কৃষকদের হাস্যরসাত্মক সংলাপের প্রাক্‌কালে নাট্যকার তার ইংগিত দিয়েছেন এই ধরণের একটি রসাল কৌতুকগীতি উপহার দিয়ে। সুযোগ পেলেই ক্ষীরোদপ্রসাদ বুদ্ধিদৃপ্ত হাস্যরসের পিচকিরি দিয়ে হাসির জলধারা ছিটিয়ে দিতে জানেন।

তৃতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে পরীবানুর গানটি যদিও দীর্ঘ তবুও 'বনের মধ্যে তার একাকীত্ব' এ গানের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করে।

২—বাংলা নাটকের ইতিহাস —ডঃ অজিত কুমার ঘোষ।

৩—বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস—(২য় খণ্ড)—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

॥ বিভিন্ন শ্রেণীর নাট্যগ্রন্থের কালানুক্রমিক তালিকা ॥

১। ফুলশয্যা (দৃশ্যকাব্য) ১৮৯৪ (২রা মে)
২। প্রেমাঞ্জলি (পৌরাণিক নাটক) ১৮৯৬ (১৮ জুলাই)
৩। আলিবাবা (রঙ্গনাট্য) ১৮৯৭
৪। প্রমোদরঞ্জন (রঙ্গনাট্য) ১৮৯৮ (১৯ অক্টোবর)
৫। কুমারী (নাট্যকাব্য) ১৮৯৯
৬। জুলিয়া (গীতিনাট্য) ১৯০০ (২৪ জানুয়ারি)
৭। বভ্রুবাহন (নাট্যকাব্য) ১৯০০ (২৫ ফেব্রুয়ারি)
৮। সাবিত্রী (পৌরাণিক নাটক) ১৯০২ (৪ অক্টোবর)
৯। সপ্তম প্রতিমা (নাটক) ১৯০২ (১৩ ডিসেম্বর)
১০। বেদৌরা (গীতিনাট্য) ১৯০৩ (১৩ জানুয়ারি)
১১। বঙ্গের প্রতাপাদিত্য (ঐতিহাসিক নাটক) ১৯০৩ (২৯ আগস্ট)
১২। রঘুবীর (নাটক) ১৯০৩ (১৮ ডিসেম্বর)
১৩। বৃন্দাবনবিলাস (গীতিনাট্য) ১৯০৪ (৩১ জানুয়ারি)
১৪। রঞ্জাবতী (নাটক) ১৯০৪ (৪ অক্টোবর)
১৫। উলুপী (নাটক) ১৯০৬ (১৫ জুলাই)
১৬। পদ্মিনী (ঐতিহাসিক নাটক) ১৯০৬ (১৫ নভেম্বর)
১৭। পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (ঐতিহাসিক নাটক) ১৯০৭ (৫ জানুয়ারি)
১৮। রক্ষঃ ও রমণী (নাটক) ১৯০৭ (১০ জানুয়ারি)
১৯। চাঁদবিবি (ঐতিহাসিক নাটক) ১৯০৭ (২৪ আগস্ট)
২০। নন্দকুমার (ঐতিহাসিক নাটক) ১৯০৮ (১ ফেব্রুয়ারি)
২১। দাদা ও দিদি (রঙ্গনাট্য) ১৯০৮ (৮ ফেব্রুয়ারি)
২২। অশোক (ঐতিহাসিক নাটক) ১৯০৮ (২৫ জুন)
২৩। বাসন্তী (গীতিনাট্য) ১৯০৮ (৫ জুলাই)
২৪। বরুণা (গীতিনাট্য) ১৯০৮ (১০ জুলাই)
২৫। ভূতের বেগার (রঙ্গনাট্য) ১৯০৮ (২৮ ডিসেম্বর)
২৬। দৌলতে দুনিয়া (নাটক) ১৯০৯ (১৫ জানুয়ারি)
২৭। বাঙ্গলার মসনদ (ঐতিহাসিক নাটক) ১৯১০ (১৬ জুলাই)
২৮। পলিন (গীতিনাট্য) ১৯১১ (২ মার্চ)
২৯। মিডিয়া (কল্পনামূলক নাটক) ১৯১২ (১৪ জুলাই)
৩০। খাঁজাহান (ঐতিহাসিক নাটক) ১৯১২ (২৫ জুলাই)
৩১। ভীষ্ম (পৌরাণিক নাটক) ১৯১৩ (১৫ জুন)

৩২। রূপের ডালি (রঙ্গনাট্য) ১৯১৩ (২১ অক্টোবর)

৩৩। নিয়তি (নাটিকা) ১৯১৪ (৯ এপ্রিল)

৩৪। আহেরিয়া (ঐতিহাসিক নাটক) ১৯১৫ (২০ জানুয়ারি)

৩৫। বাদশাজাদী (কল্পনামূলক নাটক) ১৯১৫ (৩১ ডিসেম্বর)

৩৬। রামানুজ (ধর্মমূলক নাটক) ১৯১৬ (৩০ জুলাই)

৩৭। বঙ্গে রাঠোর (ঐতিহাসিক নাটক) ১৯১৭ (৮ সেপ্টেম্বর)

৩৮। কিন্নরী (গীতিনাট্য) ১৯১৮ (১৭ আগস্ট)

৩৯। মন্দাকিনী (পৌরাণিক নাটক) ১৯২১ (১৪ এপ্রিল)

৪০। আলমগীর (ঐতিহাসিক নাটক) ১৯২১ (৯ ডিসেম্বর)

৪১। রত্নেশ্বরের মন্দির (নাটক) ১৯২২ (২৮ ডিসেম্বর)

৪২। বিদূরথ (ঐতিহাসিক নাটক) ১৯২৩ (১০ মার্চ)

৪৩। গোলকুণ্ডা (ঐতিহাসিক নাটক) ১৯২৫ (২০ সেপ্টেম্বর)

৪৪। জয়শ্রী (নাটক) ১৯২৬

৪৫। রাধাকৃষ্ণ (গীতিনাট্য) ১৯২৬

৪৬। নরনারায়ণ (পৌরাণিক) ১৯২৬

এগুলি ছাড়াও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত, অথচ মঞ্চস্থ নাট্যতালিকার মধ্যে পড়ে :—

১। আলাদিন ১৯০৭ (২৫ ডিসেম্বর)

২। শিরীফরিদ—১৯০৭ (১৩১৩ ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত)

তালিকাটি সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৬ষ্ঠ খণ্ড) থেকে সংকলিত।

॥ অন্যান্য মুদ্রিত গ্রন্থ তালিকা ॥

(কালানুক্রমিক)

সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৬ষ্ঠ খণ্ড) থেকে সংকলিত।

১। রাজনৈতিক সন্ন্যাসী (গল্প)
প্রথম খণ্ড ১৮৮৫ (১ জুন)
দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৫ (১৫ জুলাই)

২। কবি কাননিকা (রঙ্গন্যাস) ১৮৯৬

৩। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা (ধর্মগ্রন্থ) ১৯০০ (২৪ এপ্রিল)

৪। নরোয়ণী (উপন্যাস) ১৯০৪

৫। বিরামকুঞ্জ (গল্পলহরী) ১৯০৯ (২০ আগস্ট)

৬। দুর্গা (পৌরাণিক আখ্যান) ১৯০৯ (৯ অক্টোবর)

৭। পুনরাগমন (সামাজিক উপন্যাস) ১৯১২ (২৮ অক্টোবর)

৮। নিবেদিতা (উপন্যাস) ১৯১৯ (৩ ফেব্রুয়ারি)

৯। গুহামুখে (উপন্যাস) ১৯২০ (১২ জানুয়ারি)

১০। গুহামধ্যে (উপন্যাস) ১৯২৩ (২৯ জুলাই)

১১। পতিতার সিদ্ধি (উপন্যাস) ১৯২৪ (২০ মার্চ)

১২। চাঁদের আলো (উপন্যাস) ১৯২৪

॥ গ্রন্থপঞ্জী / উৎস ॥

যাঁদের দেখেছি :: হেমেন্দ্রকুমার রায়
বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) :: ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
বাংলা নাটকের ইতিহাস :: ডঃ অজিতকুমার ঘোষ
অথ নটঘটিত :: সূত্রধর
নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার :: ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য
শ্রদ্ধাস্পদেষু :: নলিনীকান্ত সরকার
শিশির সান্নিধ্যে :: রবি মিত্র / দেবকুমার বসু
রঙ্গালয়ের নানাগল্প :: গোপাল রায়
নাট্যাচার্য শিশিরকুমার :: শংকর ভট্টাচার্য
হাসির অন্তরালে :: নলিনীকান্ত সরকার
ইতিহাস :: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তারাবাই ভূমিকা :: ডি. এল. রায়
নাটকের কথা :: ডঃ অজিতকুমার ঘোষ
নাটক প্রসঙ্গে :: দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
প্রবন্ধের উদ্ধৃতি :: লুই হোল্ড লেসিড
ঐতিহাসিক উপন্যাস (প্রবন্ধ) :: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা (প্রবন্ধ) :: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর :: অপরেশ মুখোপাধ্যায়
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কবি ও নাট্যকার :: ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়
প্রতাপাদিত্য :: নিখিলনাথ রায়
বঙ্গের প্রতাপাদিত্য (ভূমিকা) :: মন্মথ মোহন বসু
মহারাজ প্রতাপাদিত্য :: সত্যচরণ শাস্ত্রী
প্রতাপাদিত্য চরিত্র :: রামরাম বসু
বউঠাকুরাণীর হাট :: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজপুত্রেনেকা ইতিহাস :: গৌরীশংকর হীরাই
বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা :: ডঃ বৈদ্যনাথ শীল
মহারাজ নন্দকুমার :: সত্যচরণ শাস্ত্রী
সাহিত্য সমীক্ষা :: ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী

নাট্যতত্ত্ব পরিচয়	::	ডঃ অজিতকুমার ঘোষ
বাংলা নাটক ও নাট্যশালা	::	শচীন সেনগুপ্ত
সাহিত্য সাধক চরিতমালা (ষষ্ঠ খণ্ড)	::	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা	::	বিভাস রায় চৌধুরী
বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধপ্রভাব	::	ডঃ আশা দাস
শতবর্ষে নাট্যশালা	::	সম্পাদনা—আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অজিতকুমার ঘোষ
ভারতকোষ	::	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সম্পাদিত
পুরাতন বাংলা নাটক	::	সম্পাদনা ডঃ অসিত বন্দ্যোঃ
বাংলা নাটকে গান	::	
Calcutta Essays on Shakespeare	::	Calcutta University edited.
শেকসপীয়ার	::	ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	::	ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক বাংলা নাটক	::	ডঃ প্রভাতকুমার গোস্বামী
পদাবলী	::	চণ্ডীদাস
কাহিনী	::	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য	::	বার্ণিক রায়
Musical Drama	::	Wagner